শনিবারের চিঠি

৯ম সংখ্যা]   আষাঢ়, ১৩৪২   [৭ম বর্ষ

বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে জল্পনা

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রধান কথা এই যে, ইহার কোন ইতিহাস নাই। ইতিহাস যে নাই তাহার কারণ উনবিংশ খৃষ্ট শতকের পূর্ব্বে বাংলা সাহিত্যই ছিল না। শাদার উপরে কালির দাগ দিলেই তাহা সাহিত্য হয় না, সে দাগ কালের উপরেও পড়া চাই। শাদার-উপরে-কালির-দাগ-রচনা যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তাহা সাহিত্য নহে। আর যে-কয়টি রচনা কালের উপরেও দাগ রাখিয়া গিয়াছে, তাহা এতই সামান্য যে ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষার পক্ষে তাহা যথেষ্ট নহে। ধারাবাহিক সত্যই ইতিহাস। কাজেই বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু বলার অর্থ ইহার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলা।

বাংলা সাহিত্যের বর্ত্তমান আর বিদ্যমান নহে। কারণ যে-যুগটাকে এখনো আমরা বর্ত্তমান বলিতেছি বস্তুত তাহা অতীতের কোঠায় গিয়া পড়িয়াছে। রাজনৈতিক যুগ-গণনার একটা সুবিধা যে তাহা অনেক

পরিমাণে রাজার দৈহিক জীবনের উপর নির্ভর করে। রাজা মরিল, 'রাজা দীর্ঘ জীবী হোক' বলিয়া লোকে নূতন যুগ আরম্ভ করে, কিন্তু ভাব-জগতের যুগান্তর এমন প্রত্যক্ষ নহে, ভাবুক বাঁচিয়া থাকিতেও ভাবীযুগ আরম্ভ হইতে ক্ষতি নাই। একটা যুগান্তর যে ঘটিয়াছে তাহার প্রধান লক্ষণ সাহিত্যের ধারাবাহিকতা হঠাৎ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

মধুসূদন হইতে নূতন বঙ্গসাহিত্য এবং তাহার ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে। মধুসূদনের মৃত্যুর পূর্ব্বেই বঙ্কিমচন্দ্রের অবিসম্বাদিত উদয়; কাজেই মধুসূদনের ধারা বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে রূপান্তর পাইলেও যুগান্তর ঘটে নাই। আবার বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ স্বরূপ দেখা গিয়াছিল, তাঁহার মধ্যে পূর্ব্বসূরিদের ধারা রক্ষিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের বয়োভাগ্য মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্রের ঘটে নাই; তাঁহার বৃদ্ধ বয়সেও এমন কেহ আসিয়া জুটিল না যাঁহার হাতে ইতিহাসের ধারাকে তিনি তুলিয়া দিতে পারেন। অবশ্য শরৎচন্দ্র আছেন, কিন্তু তিনি পূর্ব্বোক্ত তিন জনের মত গ্রহ নহেন, উপগ্রহ মাত্র। তিনি বড় সাহিত্যিক, ভাবজগতের নেতৃত্ব শক্তি তাঁহাতে নাই। কাজেই মধুসূদন বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের ধারা উপযুক্ত উত্তরাধিকারীর অভাবে নষ্ট হইয়া গেল।

এখন যে যুগটা আরম্ভ হইয়াছে তাহাকে বহু-র যুগ বলিতে পারি। আগে ছিল মহা-র যুগ এযুগের প্রধান লক্ষণ অপ্রধান সাহিত্য। মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের যুগেও বহু লেখক ছিল, অপ্রধান সাহিত্যেরও অভাব ছিল না। কিন্তু মিছরি যেমন একটি সূত্রকে অবলম্বন করিয়া দানা বাঁধিয়া ওঠে আগের যুগে তিন মহা সাহিত্যিককে কেন্দ্র করিয়া বহুর সাহিত্য রূপ পাইয়াছিল। ইহাতে মহা ও বহুর মাঝে ভার-সাম্য স্থাপিত হওয়াতে অপ্রধান সাহিত্য প্রাধান্য লাভ

করিতে পারে নাই। কিন্তু এখনকার যুগ সূত্রহীন মিছরির মত দানা বাঁধিতে পারিতেছে না, মহা-হীন বহুর সাহিত্য বহুখণ্ড হইয়া পড়িয়াছে, এ খণ্ডকালের কাব্যলক্ষ্মী একান্ত ভাবে খণ্ডিতা।

অপ্রধান সাহিত্য সকল সময়েই থাকে। কালিদাসের আমলেও ছিল, কিন্তু মুদ্রাযন্ত্র ছিল না বলিয়া যাহা মরণীয় তাহা মরিয়া গিয়াছে। সাহিত্যে এক প্রকার প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন আছে, তাহাতে যোগ্যতমেরই উদ্বর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বপ্রধান ভীতি মুদ্রা রাক্ষস, এ রাক্ষস মারে না, বাঁচাইয়া রাখে, বোধ করি বাঁচাইয়া রাখিয়াই শেষ পর্য্যন্ত মারে। এযুগে অপ্রধান সাহিত্যের প্রাধান্যের প্রথম কারণ মুদ্রাযন্ত্রের অবাধ প্রসার। প্রসারের সবটাই সার নহে, বাকিটা উপসর্গ। এই উপসর্গে মানুষের ওজন জ্ঞান নষ্ট করিয়া দেয়। ছাপার অক্ষরে রবীন্দ্রনাথ ও রামশর্ম্মা দুই জনের রচনাই এমন সপ্রতিভ ভাবে তাকাইয়া থাকে যে ক্রমে পাঠকের ভেদজ্ঞান লোপ পায়। তারপরে গ্রন্থ রচনা ও বিক্রয় একটা মস্ত ব্যবসায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শিল্পকে ক্ষুধার অন্নের বাহন করা অর্থ ভাবজীবনকে জীবনের অভাবের সহিত যুক্ত করা, ইহাতে যে দ্বন্দ্ব তাহা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। ছাপার অক্ষরে যেমন ভেদ বোঝা যায় না, মলাটেও তেমনি গোল বাধায়। কাচের জানালায় বিচিত্রবর্ণ গ্রন্থমালা পীতালোক দীপ্ত পণ্য নারীর মত পথিককে লুব্ধ করিতেছে। শুনিয়াছি রুষ দেশে নারীপণ্য আইন করিয়া বন্ধ করা হইয়াছে, গ্রন্থ পণ্য সম্বন্ধে সেখানে কি ব্যবস্থা, জানি না। বোধ করি সে সাহস আধুনিক-স্বর্গ রুষদেশেরও নাই। শিক্ষা ও শিল্পের নামে নূতন ধরণের পাপবৃত্তি প্রশ্রয় পাইতেছে। কোন্‌টা বেশি ভীতিকর? নারীপণ্যে দেহ-মনের অপচয়, গ্রন্থপণ্যে শুধু মনের। আমার তো মনে হয় শেষেরটাই অধিক ভয়ঙ্কর, সুস্থদেহে অসুস্থ মনের মত ভীষণ

জিনিষ কমই আছে। অসুস্থ-দেহ-মনে খারাপ কাজ করিবার শক্তিই চলিয়া যায়, সুস্থদেহে অসুস্থ মন যাবতীয় অশুভ কার্য্যের মূলে। বাস্তবিক-পক্ষে আধুনিক জগতের মূল সমস্যাই ইহা।

তার পরে সার্ব্বজনীন শিক্ষার কৃপায় জগতে একদল নব্য বর্ব্বরের উদ্ভব হইয়াছে। আমাদের দেশে এখনো তাহার পূর্ণ স্বরূপ প্রকট হয় নাই, কিন্তু দিগন্তে তাহার বিকট উদ্ধত নাসিকাগ্র দেখা গিয়াছে। সার্ব্বজনীন শিক্ষার প্রভাবে যে-বিরাট জনতা শিক্ষিত (সিকি-শিক্ষিত)-হইয়া উঠিতেছে মানুষের লড়াই এবার তাহার সঙ্গে। সে লড়াই-এর পরিণাম ইতিহাসে ইতিপূর্ব্বে যাহা হইয়াছে, এবার তাহার বিপরীত হইবার কোনো কারণ নাই। দুইটি জাতির মধ্যে, একটি সভ্য অপরটি অসভ্য, একটি শিক্ষিত, অপরটি সিকিশিক্ষিত (ইহা অশিক্ষার চেয়েও ভয়ানক), এইরূপ দুইটি জাতির মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে সভ্যজাতির, শিক্ষিতজাতির ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। ইহা ইতিহাসের একটি বহুসিদ্ধ নিয়ম। রোমক, গ্রীক, বাবিলনীয়, আসীরিয় সকল সভ্যতাই এশিয়াগত বর্ব্বর জাতি-সঙ্ঘের সংঘাতে যে আঘাত পাইয়াছিল তাহার ফল এই সব সভ্যজাতির পক্ষে সাংঘাতিক হইয়াছিল। য়ুরোপে সেদিন যে যুদ্ধ-শেষ করার যুদ্ধটা হইয়া গেল (যুদ্ধ শেষ করার যুদ্ধ নহে ; আন্তর্জাতিক যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার প্রথম যুদ্ধ) তাহার মত ভীষণ ব্যাপার নাকি পূর্ব্বে আর হয় নাই! (কথাটা য়ুরোপীয়েরা দুঃখের সহিত স্বীকার করে কিনা আমার সন্দেহ হয়, তাহাদের উক্তিতে একটা প্রচ্ছন্ন গর্ব্বের ভাব আছে।) এ যুদ্ধে যে যুধ্যমান জাতি বিনষ্ট হয় নাই (যদিও এখনো সময় যায় নাই। তবু তাহারা বাঁচিয়া থাকুক, নতুবা আমার যুক্তির গুরুত্ব অনেকটা কমিয়া যায়।) তাহার কারণ ইহাদের মধ্যে সভ্যতায় ভেদ তেমন গুরুতর ছিল না।

এই সত্যটাকে শিক্ষার ক্ষেত্রে আরোপ করিলে দেখিতে পাই, এবারকার দ্বন্দ্ব, এ দ্বন্দ্ব মহাযুদ্ধের চেয়ে কম নয়, জগতের যথার্থ জ্ঞানী ও নব্য বর্ব্বরদের মধ্যে। এই বৃহৎ বর্ব্বর সম্প্রদায় স্বকীয় কুরুচি, অশিক্ষা, মানসিক স্থূলতা ও মনঃপ্রকর্ষের অভাব দ্বারা ইতিমধ্যেই জগতের সঞ্চিত মানসিকতাকে (চর্য্যা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি যে শব্দই গ্রহণ করিব, অন্যদল বিরক্ত হইবেন, কাজেই দূর হইতে সকলকে নমস্কার) মলিন করিয়া ফেলিতেছে। য়ুরোপের সকল দেশের সাহিত্যেই এই মন্দা আজ লক্ষিত। আজকাল প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যা যে পরিমাণে বাড়িয়াছে সেই পরিমাণে তাহার সারবত্তা কমিয়াছে। এই বিরাট বর্ব্বরের গল্প-গ্রাসী ক্ষুধা মিটাইতে পারে এমন সাধ্য কাহারো নাই। সিকি শিক্ষার কৃপায় বিজ্ঞানের প্রতিও ইহার লোভের অন্ত নাই, কাজেই বৈজ্ঞানিক তথ্যের সহিত যথেষ্ট পরিমাণে রোমান্স মিশাইয়া পপুলার সায়ান্সের দুগ্ধও এ ব্যক্তি পান করে। আমাদের দেশে ইহার প্রধান খাদ্য *কঁতিনাতাল নবেল। এই জনতাযোগ্য এক সাহিত্য গড়িয়া উঠিতেছে,* ইহাতে গৌণ সাহিত্যের প্রসার অবশ্যম্ভাবী। দশহাজার গ্রন্থের মধ্যে দশখানা উৎকৃষ্ট পুস্তক থাকিতে পারে, কিন্তু আর ন হাজার ন শ নব্বই, সংখ্যার দ্বারা সত্যকে চাপিয়া মারিতেছে।

ইহার পরে আমাদের দেশে বেকার সমস্যা আছে। কেরানীগিরির জন্য যাহার কলম, সে লিখিতেছে কবিতা; মাটি খুঁড়িবার জন্য যাহার কোদাল সে করিতেছে ঐতিহাসিক অনুসন্ধান; পকেট কাটিবার জন্য যাহার কাঁচি, সে এক শিশি আঠা লইয়া সমালোচক সাজিয়াছে আর সম্পাদকের কলম বোধকরি সিঁদকাঠি পিটিয়া প্রস্তুত, আমাদের দেশে সাহিত্য রচনার ন্যূনতম গুণ একখানা হাত।

এতক্ষণে আমরা দুটি বিষয় দেখিলাম, নূতন কালের সাহিত্যিক

চিন্তানেতার আবির্ভাব হয় নাই, এবং অপ্রধান সাহিত্যের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। দুটিই যে কার্য্যকারণ সূত্রে গ্রথিত ইহা সহজেই বোঝা যায়। এখন সাহিত্যকে এই অরাজকতা অথবা বহুরাজকতা হইতে বাঁচাইবার উপায় কি? একথা সত্য যে আমরা প্রতিভাবান্ ব্যক্তি সৃষ্টি করিতে পারি না, কিন্তু এমন একটা প্রতিষ্ঠাপন্ন প্রতিষ্ঠানকে সৃষ্টি করিতে পারি, কিছু পরিমাণেও যাহা এই অরাজকতাকে শাসন করিতে পারে। বহু চেষ্টা করিলেই মহা হইয়া উঠিতে পারে না, কিন্তু মহা-প্রতিষ্ঠান হইয়া উঠিতে বাধা কোথায়! ফল কথা আমরা এমন একটা সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে পারি, বিপদ কালে যাহা আমাদের আশ্রয় স্বরূপ; এমন হইতে পারে, হওয়া উচিত, অন্যদেশে হইয়াছে।

কিন্তু প্রতিষ্ঠানের নামে অনেকেই বিরক্ত হইবেন, কোনোরূপ স্থাপনার উপর আর আমাদের আস্থা নাই। সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা সকলেই চায়, কিন্তু, প্রতিষ্ঠান নাকি কেবল অনুদারের আবদার। একদল লোক আছেন যাঁহারা কোনোরূপ শৃঙ্খলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে অনিচ্ছুক। সীমাকে ইঁহারা সঙ্কীর্ণতা মনে করেন। ইঁহাদের মতে ভাঙা কলসীই সার্থক, কারণ তাহার সীমা না থাকাতে সঙ্কীর্ণতাও নাই।

বাস্তবিক পক্ষে আধুনিক কালের যুগ-লক্ষণ ভঙ্গপ্রবণতা। কিন্তু কালাপাহাড়দের মনে রাখা উচিত ভাঙনের নেশায় ভাঙিবার হাতুড়িটা পর্য্যন্ত ভাঙিয়া ফেলা চলে না। এযুগে ঘটিয়াছে তাহাই, সেই জন্যই এযুগ এমন অসহায় ভাবে নিরস্ত্র। (অস্ত্রহ্রাসের বৃথা তর্ক, আমার তো মনে হয় [আমার ধারণাই সত্য, কারণ আমি কিছু না জানাতে সব বিষয়ে নিরপেক্ষ ভাবে মত প্রকাশ করিতে পারি,] বর্ত্তমানের প্রধান অস্ত্র আজও প্রস্তুত হয় নাই, ইহার জীবন-দর্শন।)

বাংলা সাহিত্যের প্রকৃতির আলোচনা করিলে বুঝিতে পারিব কেন এই জাতীয় একটা প্রতিষ্ঠান আসন্ন ভাবে আবশ্যক।

বাংলা সাহিত্যের ভাবের প্রধান বাহন পদ্য। মধুসূদন প্রধানত কবি। বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য আংশিক ভাবে কাব্য লক্ষণগ্রস্ত। রবীন্দ্রনাথ প্রধানত কবি ও কবিপ্রধান। তাঁহার গদ্য কবির গদ্য। অত্যাধুনিকদের মধ্যে যাহাদের গদ্য অপাঠ্য, তাহাদের পদ্যও অপেক্ষাকৃত সুখ পাঠ্য। এখন, পদ্য রচনার বাঁধা ধরা নিয়ম প্রস্তুত সম্ভব নহে, কাজেই তাহা ব্যক্তিগত ও জন্মগত সম্ভাবনার উপরে ছাড়িয়া দিতে হয়। কিন্তু গদ্যকে কিছু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করা অসম্ভব নহে। অবশ্য, আমাদের প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য এ নহে যে তাহার সদস্যগণ উপন্যাস, নাটক প্রবন্ধ রচনা করিবেন। যে-গদ্য আমাদের জাতির পক্ষে স্বাভাবিক নহে, অর্থাৎ চেষ্টা ও শিক্ষাসাপেক্ষ তাহার সংস্কৃতি ও পরিস্কৃতি সাধন এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান দায়িত্ব। যেমন অস্ত্র প্রস্তুত করা, আর সেই অস্ত্র ব্যবহার করা। ভাষাকে গড়িয়া পিটিয়া তৈয়ারী-করা এক, আর তাহাকে সুনিপুণভাবে ব্যবহার করা আর। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্। বাংলা ভাষায় কিছুপরিমাণে ফার্সি ও ইংরেজি শব্দ পাঙ্‌ক্তেয় হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আধুনিক সাহিত্যের পঙ্‌ক্তি-ভোজনে অজস্র অপরিচিত ফার্সি ও ইংরেজি শব্দ প্রবেশ করিয়াছে। ইহাতে ভাষার ঐক্য নষ্ট করিয়া ইহাকে শিথিল করিয়া দিতেছে। এই সভা, ভাষায় প্রচলিত ও যাহা চলা উচিত এমন সব বিদেশী শব্দের একটা অভিধান সঙ্কলন করিতে পারে, এই সব বিদেশী শব্দের প্রয়োগ দেখাইয়া গ্রন্থ লিখিতে পারে। অবশ্য বড় লেখকরা ইহার ব্যতিক্রম করিবেন, কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য বড় লেখক সৃষ্টি নয়; আটপৌরে লেখকদের ব্যবহারোপযোগী ভাষার সংস্কার। কিন্তু মুস্কিল এই আমাদের

দেশে সকলেই নিজের মানদণ্ডে বড়, কিন্তু ভুলিয়া যাই যে মানদণ্ড-খানা প্রমাণ (Standard) দণ্ড হওয়া আবশ্যক। এই সভার হাতে বাংলা সাহিত্যের মানদণ্ড থাকিবে; নিরপেক্ষ হাতে মানদণ্ড রাজদণ্ডের গৌরব ধারণ করে।

আরও একটি কারণে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন। আমাদের ভাষায় একটি যথেচ্ছাচারের ভাব আছে, ইহার খানিকটা ইহার স্বভাব-সিদ্ধ, খানিকটা বাহিরের নানা কারণে ঘটিয়াছে। বাহ্য কারণটা ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব।

ইংরেজি সাহিত্যে নিয়মচর্য্যার অভাব লক্ষিত হয়। এই নিয়মমুক্তিই ইংরেজি কাব্যকে এমন অবাধ প্রাণপূর্ণ ও ইংরেজি গদ্যকে এমন বর্ব্বরোচিত সম্পদ দিয়াছে, বর্ব্বরের শিক্ষার অভাব ও দুরন্ত প্রাণবেগ। কিন্তু তৎসত্বেও ইংরেজি সাহিত্য-রূপ সার্থক। তার কারণ এ জাতিটার মধ্যে এমন অমোঘ নিয়ম শৃঙ্খলা আছে, যাহার সুদৃঢ়ভিত্তিজাতীয় সংস্কৃতির উপরে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে এই বর্ব্বরোচিত গদ্যসাহিত্য নিরর্থক হইয়া পড়ে নাই। ইংরেজ দোকানদারের জাতি; লোকব্যবহারে ইহারা অত্যন্ত চাপা, কিন্তু এই জাতিই আধুনিক জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রোমান্টিক কাব্য লিখিয়াছে। ইহাই স্বাভাবিক, কারণ সাহিত্য জীবন নহে, জীবনের ছায়াও নহে, সাহিত্য না-জীবন অর্থাৎ জীবনে যাহা ঘটেনা, সাহিত্য তাহার ঘটনা। সাহিত্য ও জীবন পরস্পর পরিপূরক।

আবার দেখি ফরাসি জাতি লোকব্যবহারে অনেকটা আমাদের মত, মন তাহাদের মুখে। লোকব্যবহারে রোমান্টিক এই জাতির বৈশিষ্ট্য কাব্যে নয়, রোমান্টিক কাব্যে নয়, অনেক পরিমাণে ক্লাসিকাল রূপপ্রাপ্ত গদ্যসাহিত্যে। এই জাতীয় সম্পাদকে বাঁচাইবার জন্য, রক্ষা

করিবার জন্য, উন্নত ও প্রয়োগযোগ্য করিবার জন্য তাহাদের সাধনার অন্ত নাই। কবিত্ব-শক্তি জন্মসিদ্ধ, আর গদ্য লেখন ক্ষমতা আজন্ম সাধনার ফল। ফরাসি দেশে গদ্য সাহিত্যের অধিনায়ক বিখ্যাত ফরাসি একাডেমি।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের ইংরেজি কাব্য যে গৌণ তাহার কারণ ফরাসি সাহিত্যের প্রভাব। প্রকৃত পক্ষে বর্ত্তমান ইংরেজি গদ্যের আবির্ভাব এই সময়টাতে, তাহার মূলেও ফরাসি গদ্যের প্রভাব। অষ্টাদশ শতকের শেষ হইতে ইংরেজি কাব্য আবার স্বাধর্ম্ম্য লাভ করিয়াছে, তখনকার কাব্য চূড়ান্ত ভাবে রোমান্টিক।

এখন, বাংলা সাহিত্যের মূলে যে-ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব তাহা এই রোমান্টিক পর্ব্বের কাব্য। একে আমাদের জাতীয় বৃত্তি রোমান্টিক তার উপরে বাহিরের রোমান্টিক কাব্যের প্রভাব, দেখিতে দেখিতে প্রকাণ্ড রোমান্টিক বাংলা সাহিত্য গড়িয়া উঠিল; এমন কি আমাদের গদ্য, ভাবে, উপজীব্যে ও ভাষায় পর্য্যন্ত রোমান্টিক মূর্ত্তি গ্রহণ করিল। বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্টিক-উপন্যাস। কিন্তু আমাদের গদ্যের পঙ্গুত্ব ঘুচিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে তাহা গিরি লঙ্ঘন করিয়াছে বটে, কিন্তু সাধারণ লেখকদের হাত নেহাৎ বেহাত হইয়া রহিল। আমাদের সাহিত্যের গঠন সময়ে ফরাসি সাহিত্যের এমনকি ফরাসি প্রভাবগ্রস্ত ইংরেজি গদ্যের প্রভাব পড়িলে গদ্যের এ দুর্দ্দশা হইত না; কাব্যও অবিকৃত রহিত কারণ তাহা জাতীয় মন-বৃত্তিজাত।

যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। এখন গদ্যকে সংস্কার করিবার উপায় কি! 'ফরাসি একাডেমি'র উদ্দেশ্য অনুমান করিয়া একটি সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা উচিত। আর একটি কথা ব্যক্তিগত ভাবে লেখক-দের মনে রাখা আবশ্যক। সবদেশের একটা করিয়া ক্লাসিকাল সাহিত্য

আছে, কালের কষ্টিপাথরে ইহার বিচার হইয়া গিয়াছে, সাহিত্যের ইহা ধ্রুবপদ অংশ। লেখকের মানসিক পটভূমি হইবে এই ক্লাসিকাল সাহিত্য। ইহার অর্থ এ নয় যে, প্রত্যেক লেখককে হোমার বা বাল্মীকির ছাঁচে কলম কাটিয়া লইতে হইবে বা সব ছাড়িয়া মহাকাব্য লিখিতে বসিতে হইবে। সব সাহিত্যই জন্মকালে রোমান্টিক, টিঁকিয়া গেলে ক্লাসিকাল। মানুষের স্মৃতির ছাঁকনীতে যাহা টিঁকিয়া যায়, সেই সাহিত্যই শরণ্য, ও অনুধাবনযোগ্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের প্রধান মানসিক খাদ্য বর্ত্তমান সাহিত্য, কঁতিনাতাল সাহিত্য, যাহার সানুনাসিক উচ্চারণে পাঠকের সংস্কৃতির জিহ্বা সজল হইয়া ওঠে। এ কঁতিনাতাল, ফরাসি সাহিত্য হইলেও চলিত, কারণ যদি কোনো আধুনিক সাহিত্যে ক্লাসিকাল সাহিত্যের গুণ থাকে তবে তাহা ফরাসি সাহিত্যে। সংস্কৃত সাহিত্য হইলেই সব চেয়ে ভালো হয়; সংস্কৃতির সহিত সংস্কৃতের নিত্যসম্বন্ধ।

যদি আমরা বঙ্গ সাহিত্যের এই অধিনেতৃহীন দুঃসময়ে সাহিত্যিক ব্রত উদ্‌যাপন করিতে চাই, কাব্যকে রক্ষা করিতে চাই, গদ্যকে সংস্কার করিতে চাই, তবে ইহা ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই। সকলে সংঘ-গত ভাবে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে পারি, আর প্রত্যেক ব্যক্তিগতভাবে মানসিক পটভূমিতে ক্লাসিকাল সাহিত্যের আদর্শকে স্থাপন করিয়া সেই অত্যুচ্চ মহিমার প্রতি বদ্ধদৃষ্টি হইতে পারি, তবেই হয় তো কোনো গতিকে এ দুঃসময়টা অতিক্রম করিতে পারিব। নতুবা ইতিহাসহীন বঙ্গসাহিত্য পুনরায় যবনিকার অন্তরালে চলিয়া যাইবে। তখন মাঝখানের এই অত্যুজ্জ্বল পর্ব্বটাকে লোকে ভুলিয়া গিয়া হয় তো নিশ্চিন্তমনে আবার পাঁচালী, টপ্পা, যাত্রা, রূপকথা ও পল্লীগাথারূপ মহা সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করিবে। আর ভবিষ্যতের ঐতিহাসিক আনন্দাশ্রু ফেলিতে ফেলিতে চলিবে, আহা এতদিন পরে Prodigal পুত্র আবার পল্লী সাহিত্যের গোয়ালে ফিরিয়া আসিয়াছে।

পদি পিসি

জান না বন্ধু, পদি পিসি কোথা থাকে ?
—দেখনি কখনো তাঁকে !
অর্থাৎ যিনি সবার বাড়ীতে
কাঠি দিতে চান প্রতিটি হাঁড়িতে,
কায়দা মাফিক ফোড়ন ছাড়িতে
সকল কথার ফাঁকে
দেখনি কখনো তাঁকে ?

শোন নি কি তাঁর অভিজ্ঞতার বাণী ?
সবেতেই 'জানি' 'জানি' !
নিমোনিয়া হল বীরেন পালের
পদি পিসি কন, "নিমের ছালের
পুলটিস্ দাও পুরান চালের
সঙ্গে হলুদ ছানি।"
অভিজ্ঞতার বাণী !

গাছ থেকে পড়ে' মরিল মথুর মাঝি,
পদি পিসি খোলে পাঁজি !
'ত্র্যহস্পর্শ'-'ত্রিপাদ' প্রভৃতি
দেখিয়া সবার উপজিল ভীতি
"প্রায়শ্চিত্ত করাটাই রীতি,

—ব্যবস্থা কর আজই !"
পদি পিসি খোলে পাঁজি !

মকদ্দমায় পড়েছে বিপিন রায় ;
পদি পিসি বলে, "হায়,
উকীল-টুকিলে হবে না কিছুই
নিরামিষ খেয়ে থাকো দিন দুই
কবচটা পর ! তুমি হিন্দুই
তোমারে বল কে পায় !"
পদি পিসি দিল রায় !

বসন্ত রোগ হল যবে চারিদিকে
পদি পিসি নিল টিকে !
অথচ মাথাটি নাড়ি ঘন ঘন
কহিল, "পাড়ার সকলে শোন
শীতলা পূজার কর আয়োজন
বুঝি না ও টিকে-ফিকে !"
পদি পিসি নিল টিকে !

মারা গেল যবে রাধু ঘোষালের নাতি,
ফুলায়ে মস্ত ছাতি
পদি পিসি কন—"জান্‌তাম, আরে
বারণও করেছি ছেলেটার মা'রে
জোলাপ কখনও খায় শুক্রবারে !

—ডাক্তারি, না এ হাতী !"
কহিল ফুলায়ে ছাতি !

দেখ নি বন্ধু, আজো তুমি পিসিটিকে ?
দেখ তবে ওই দিকে !
আরে যা' হেসেই হলে দেখি খুন,
ওই পদি পিসি, পরি পাৎলুন !
ওরি এত কথা, ওরি এত গুণ
ওরি জোরে আছি টিকে !
দেখে রাখ পিসিটিকে !

লেখা পড়া জানা ভারি নাকি পণ্ডিত ও !
ডিগ্রীতে মণ্ডিত !
টিকি ঢাকা আছে টুপিতে সোলার
কণ্ঠি ঢাকিয়া রেখেছে 'কলার'
যায় নাক দেখা জামার তলার
চাবি-বাঁধা উপবীত !
ভারি নাকি পণ্ডিত ও !

লেখা পড়া জানা মস্ত ও বিদ্বান—
চুলভরা দুটি কান !
হেসোনা বন্ধু, চেয়ে দেখ ফের
পুংলিঙ্গই পিসিমা মোদের !
নস্য টানিছে হাঁড়ল নাকের

দেখ মরি-বাঁচি টান ;”
চুল-ভরা দুটি কান !

পিসি আমাদের নানাবেশে দেন দেখা
কভু সোজা, কভু বেঁকা !
নানাবেশে তার চির অভিসার
কখনও কেরানী, কভু অফিসার
কভু ডাক্তার, কভু প্রফেসার
কভু পাজি, কভু ন্যাকা !
নানারূপে দেন দেখা !

———

সামনের মাসে

খুকীটা তাহার ছোট্ট খালি পা-খানি তুলিয়া ধরিয়া বলিল, “বাবা, জোতো।” সস্নেহে বলিলাম, “এই সামনের মাসেই তোমার জুতো কিনে দেবো।” খুকী খুশী হইয়া উঠিল।

গৃহিণী বলিলেন, “দেখ, একজোড়া মিলের রঙীন শাড়ী না কিন্‌লে আর চল্‌ছে না।” বলিলাম, “সামনের মাসে।”

ভাগ্নে জানাইল, তাহার সংস্কৃত বইয়ের অর্থপুস্তক না কিনিলে তো সে হাফ্‌-ইয়ারলিতে ফেল করিবে। বলিলাম, “সামনের মাসের প্রথমেই মনে করিয়ে দিস্‌।”

পাড়ার বালক-বালিকা-সঙ্ঘ হইতে চাঁদা চাহিতে আসিল। বিনীতভাবে বলিলাম, “ভাই, সামনের মাসে।”

খাঁটি গাওয়া ঘির টিন লইয়া একটি যুবক আসিয়া অনুরোধ করিল, "একবার খেয়ে দেখুন—একেবারে খাঁটি বিক্রমপুরের।" বলিলাম, "এ মাসের কটা দিন যাক্।"

কাঁসারির ঠং ঠং শব্দে গৃহিণীর মনে পড়িল, দুইটা বাটি ও একখানা থালা বদলাইতে হইবে। আর কিছু বেশী দিলেই একখানা ভাল বগি থালা হইতে পারে। প্রস্তাব শুনিয়া বলিলাম, "এ মাসে থাক্।"

ছোট বোন্‌টি ধরিয়া বসিল, "দাদা, অনেকদিন বায়োস্কোপ দেখি নি, চল না একবার সিনেমায় যাই।" বলিলাম, "বেশ ত' সামনের মাসের প্রথমেই যাব।"

দেশের বাড়ী হইতে জেঠামশায়ের পত্র পাইলাম, একুশ টাকা সাড়ে বারো আনার জন্য আমাদের একখণ্ড লাভবান্ জমি বিক্রীত হইবার উপক্রম হইয়াছে। লিখিলাম, "কোনমতে এ মাসটা ঠেকাইয়া রাখুন।"

একদিন বিকাল বেলা গৃহিণী বলিলেন, "দেখ, অফিস থেকে এসে একটু জিরোতে পার না, একখানা ছোট দেখে ঈজি চেয়ার কেন।" বলিলাম, "এমাসে ত হ'ল না। সামনের মাসে।"

* * *

চাকর বেতন লইল। মাসকাবারের বাজার আসিল, বালক-বালিকা-সঙ্ঘের চাঁদা দিতে হইল। জেঠামশায়কে টাকা পাঠান হইল। ভাগ্নের অর্থপুস্তক আসিল। ইন্সিওরেন্সের প্রীমিয়ামও দেওয়া হইল মোটকথা আমাকে বেষ্টন করিয়া উপগ্রহসমূহ দুইতিন দিন ক্রমাগত ঘুরিল এবং তদনন্তর তাহারা কেহ প্যারাবোলা কেহ হাইপারবোলার curve লইয়া দৃষ্টিপথ হইতে সরিয়া গেল।

* * *

এখন ভাবিতেছি, এক জোড়া অ্যালবার্ট স্লিপার কিনিবার দরকার ছিল—থাক্, হাফসোল লাগাইলেই চলিবে। গরমের দিনে একটি

আলগেঞ্জী হইলে মন্দ হইত না—থাক্‌গে, খদ্দরের ফতুয়া ত আছে—ওতেই চলিয়া যাইবে। পিসিমা বুড়ীটা বড় কাকুতি মিনতি করিয়া পাঁচটা টাকা চাহিয়া পত্র লিখিয়াছেন—এমাসে আর হইল কই? ইচ্ছা ছিল, বি. এন্. আর-এর কণ্ডাক্টেড্ টুরের একখানা টিকিট কিনিয়া পুরীটা দেখিয়া আসিব। তা থাক্, এ রকম টুরত আর এইটিই শেষ নয়—আবার যখন হয়, তখন গেলেই হইবে। ঘড়িটা মাঝে মাঝে বন্ধ হইয়া যায় একবার অয়েল করাইতে পারিলে হইত। থাক্, দেখি আরো কিছুদিন চলে কি না। চশমার পাওয়ারটা বাড়ান দরকার—তা এমাসটা যাক্ ত; এক মাসে আর চোখের কি হইবে? চা-খাওয়ার অভ্যাস যখন আছেই, তখন খুচরা বাজে চা দুদিন অন্তর না কিনিয়া একটু ভাল দেখিয়া দুতিন পাউণ্ড চা কিনিয়া রাখিব মনে করিয়াছিলাম, তা এমাসে আর হইয়া উঠিল কই? আর চায়ের ফ্লেভারটা দোকানেই থাকে ভাল। পায়ে একটা পুরাতন বেদনা রহিয়াছে, ভাবিয়াছিলাম, একটা কবিরাজকে দেখাইয়া কিছুদিন ঔষধ খাইব। কিন্তু এখন আর হয় কই? সামনের মাসে দেখা যাইবে। শ্যামবাজারে ছোট শালী থাকে। কতদিন নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইয়াছে। একদিন তাহাদের কি খাইতে বলা উচিত নয়? কিন্তু বলিতে হইলে একজনকে ত বলা যায় না। অন্ততঃ পাঁচ সাত জন ত হইবেই। যাতায়াতের গাড়ীভাড়াটাও ত আমারই দেওয়া উচিত। সুতরাং আপাততঃ থাক্। বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছি হঠাৎ গৃহিণী কক্ষপথে উদিত হইয়া বলিলেন—"আপিসের বেলা হ'লো যে। চান্ কর্‌বে না?"

বলিলাম, "সামনের মাসে," বলিয়াই সুধরাইয়া পুনরায় বলিলাম, "হ্যাঁ যাই।"

"দেখ, আজ কিন্তু আপিস্-ফেরতা একখানা ঈজিচেয়ার অর্ডার দিয়ে এস।"

"সামনের মাসে।"

প্রসঙ্গ কথা

পৃথিবীতে যত প্রকার সমস্যা আছে তাহার যদি কোন হিসাব থাকিত তাহা হইলে দেখা যাইত যত দিন যাইতেছে, সমস্যা-সংখ্যাও ততই বাড়িয়া যাইতেছে। সাধারণ বিষয়গুলি দেখিতে দেখিতে সমস্যা হইয়া উঠিতেছে, ক্ষুদ্র সমস্যা বৃহৎ সমস্যায় রূপান্তরিত হইতেছে, সমস্যা সমাধানের উপায়গুলিও আপন আপন কার্য্য সমাধা করিয়া নিজেরাই সমস্যায় রূপান্তরিত হইতেছে। কিন্তু পৃথিবীতে এরূপ সমস্যাও আছে যাহা সমাধানের ভার মানুষের হাতে নাই। যথা, মৃত্যু। ইহা বহুকাল ধরিয়া বুদ্ধিমান মানব-সন্তানকে অকারণ অপমান করিয়া আসিতেছে। সময় হইলে, কোথায় যাইতে হইবে, কিছুই না জানাইয়া মৃত্যু ভদ্রলোক-দিগকে ঘাড় ধরিয়া কোন অজ্ঞাতরাজ্যে টানিয়া লইয়া যায়। আত্মীয় স্বজন বৃথাই কাঁদে, মৃত্যু কাহারও সম্মান রক্ষা করে না। কিন্তু তথাপি মানুষ মৃত্যু সমস্যা লইয়া দুশ্চিন্তা করে না। কারণ মৃত্যু মানুষের তুলনায় অতিরিক্ত প্রবল, মৃত্যু-সম্পর্কে বৈদ্য-আইন এবং গুণ্ডা-আইন দুইই অচল।

* • *

অর্থাৎ, অন্য কথায়, মৃত্যু একটি সমস্যাই নহে। অপর পক্ষে জন্মটাই সমস্যা। জন্ম-শাসন এবং জন্ম-নিরোধ নামক নব-আন্দোলন প্রতিদিন ইহা প্রমাণ করিতেছে। মানুষ অকালমৃত্যুর হাত এড়াইয়া কি করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে ইহা এখন আর সমস্যা নহে; সমস্যা, মানুষ কি করিয়া আর জন্মগ্রহণ না করিতে পারে। বিজ্ঞান মোটরকার

আবিষ্কার করিয়াছে, কিন্তু মানবমাত্রেরই ইহাতে চড়া উচিত কি না ইহা লইয়া কেহ প্রবল আন্দোলন করে নাই। বিজ্ঞান ম্যালেরিয়ার জন্য কুইনিন আবিষ্কার করিয়াছে কিন্তু কুইনিন কে খাইবে, কে খাইবে না, ইহা লইয়া প্রতিদিন কোনও আন্দোলন হইতেছে না। যদি বা হয় তাহা চিকিৎসকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে। বিজ্ঞান জন্ম-নিরোধের উপায় আবিষ্কার করিয়াছে কিন্তু ইহা লইয়া মানুষ এত আন্দোলন আরম্ভ করিল কেন? Spermatozoa যদি ম্যালেরিয়া জীবাণুর মত একটি ব্যাধি উৎপাদক জীবাণু হইত তাহা হইলে তাহাকে ধ্বংস করাই বুদ্ধিমানের কাজ হইত। কিন্তু spermatozoa-তে ম্যালেরিয়া হয় না, হয় মানুষ (বা অমানুষ)। ইহা ব্যাধি নহে, সুতরাং ইহার কার্য্য বিফল করিয়া দিলে ম্যালেরিয়া নিবারণের আনন্দ পাওয়া যায় না। লোক-বিশেষে, অবস্থা-বিশেষে, জন্ম নিরোধ বা জন্ম-শাসন প্রয়োজন। যেমন অবস্থাবিশেষে পেটের সন্তানকে মারিয়া ফেলিয়া প্রসূতিকে বাঁচাইতে হয়। কিন্তু এত সহজে জন্ম-নিরোধের মীমাংসা হয় না। ইহার মধ্যে নীতিশাস্ত্র আসিয়া পড়ে। কুইনিনের বেলায় নৈতিক আন্দোলন হয় না।

* * *

অর্থাৎ কাঁহারও কাহারও ধারণা যে মানব-জন্ম ঘুচাইয়া দিবার একটা প্রবল বাসনা মানুষের মনে আছে। ব্যাঘ্র-বংশ বা সিংহ-বংশ যাহাতে ধরাপৃষ্ঠ হইতে একেবারে লুপ্ত না হয় তাহার জন্য নানারূপ সংরক্ষণী আইন প্রস্তুত করিলেও মানুষ নিজেকে উচ্ছেদ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইতে পারে। পৃথিবীতে আর মানুষ থাকিবে না এই কল্পনা বোধ হয় মানুষকে আনন্দ দেয়; কিন্তু কল্পনা ত কল্পনামাত্র। পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের বেলায় আমরা কি দেখিলাম? পাট চাষ কমাইয়া

দিলে বাংলা দেশের কৃষকদের অবস্থা ফিরিয়া যাইবে। এ কল্পনা সকলকেই খুশী করিল। কৃষক খুশী হইয়া ভাবিল সে ধনী হইবে। কিন্তু সভাক্ষেত্র হইতে স্বক্ষেত্রে পৌঁছিয়া তাহার অভ্যস্ত হাতকে শাসন করিতে পারিল না। ফলে সে প্রতি বৎসরই নিয়মিতরূপে ঋণের পরিমাণ বাড়াইয়া চলিয়াছে। মানববংশের যে পৃথিবী হইতে লুপ্ত হওয়া উচিত ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই, মানুষ যুগে যুগে ইহা কল্পনা করিয়া মুগ্ধ হইবে কেননা না জন্মিয়া জন্ম-সমস্যা সমাধান করিতে সে কোনদিনই পারিবে না। কিন্তু ইতিমধ্যেই জন্ম-নিরোধ আন্দোলন রোধ করা একটা সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে।

* * *

ভারতবর্ষে একটি অতি-আধুনিক সমস্যার কথা শুনা যাইতেছে অর্থাৎ বেকার সমস্যা। অথচ বেকার-সমস্যা নামক বস্তু আমাদের দেশে কোন কালেই ছিল না। এখনও নাই। অদূর ভবিষ্যতেও এ সমস্যা দেখা দিবে কি না সন্দেহ। যাহা আছে তাহা বেকার-সমস্যা নহে চাকরি-সমস্যা। হিন্দু-মুসলমান কে শতকরা কত চাকরি পাইবে এ সমস্যা মহাত্মা গান্ধীও সমাধান করিতে পারেন নাই। সুতরাং ভারতবর্ষে ইহা ছাড়া আর কোনও প্রবলতর সমস্যা নাই। ভারতবর্ষে বেকার-সমস্যা যদি প্রবল হইত তাহা হইলে দেশ-নেতাগণ বাঁচিয়া যাইতেন। যাঁহারা সরকারী চাকরি করেন তাঁহারা ছাড়া দেশের অবশিষ্ট জনসমষ্টিকে যদি বেকার ধরা যায় তাহা হইলে সেখানে হিন্দু মুসলমানের কোনও বিরোধ নাই। সকলেই যদি চাকরির ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া বেকারের ক্ষেত্রে আসিতেন তাহা হইলে শতকরা-ভাগ লইয়া এরূপ কাড়াকাড়ি পড়িত না। দেশের ত্রিশকোটি পরিমাণ লোককে বেকার কল্পনা করা দেশ-নেতার পক্ষেও সহজ নহে। মাথা

সহজেই ঘুরিয়া যায়—কিন্তু মত যতবার ইচ্ছা ঘুরুক—মাথা একবার ঘুরিলেও নেতা হওয়া চলে না, তাই নেতাগণ বেকার-সমস্যার নাম লইয়া প্রকারান্তরে চাকরি-সমস্যার আন্দোলনে ঢুকিয়াছেন। কিন্তু চাকরি-সমস্যা মৃত্যুর চেয়ে প্রবল, ইহা সমাধান করিতে মানুষ কোনদিনই পারিবে না।

*　　　*　　　*

লক্ষ্মীলাভের শ্রেষ্ঠ উপায় বাণিজ্য। তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি। অর্থাৎ বাণিজ্যের লভ্যাংশ যদি শূন্য হয় তাহা হইলে কৃষির অর্দ্ধেক, এবং বাণিজ্যের সিকি হইবার কথা। কিন্তু বাঙালীর ভাগ্যগুণে ইহার বিপরীতটাই সত্য। যাঁহারা চাকরি (রাজসেবা) করেন তাঁহাদের অবস্থা অনেক ভাল। রাজসেবায় পাওনা, বাণিজ্য এবং কৃষিতে দেনা। বাঙালীর পক্ষে ভিক্ষাই লক্ষ্মীলাভের শ্রেষ্ঠ উপায়। ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ—মিথ্যা কথা। বড় বাঙালী এবং ছোট বাঙালী উভয়েই ভিক্ষাবৃত্ত। চেহারা দেখিয়া চেনা যায় না। বড় বাঙালীর ভিক্ষার ঝুলি পোষাকের আড়ালে আত্মগোপন করিয়া থাকে। বড় কুকুর যখন ছোট কুকুরকে তাড়া করে তখন সাধারণ কুকুর হয়ত বড় কুকুরের কৌলিন্য দেখিয়া মুগ্ধ হয়। কিন্তু আমরা মানুষ, আমরা উভয়েরই লাঙুল দেখিয়া বুঝিতে পারি এক অন্য হইতে তফাৎ নহে—উভয়েই কুকুর। তেমনি ধনী যখন দরিদ্রকে দেখিয়া নাসিকা কুঞ্চন করে তখন মানুষ বুঝিতে পারে না যে উভয়েই ভিক্ষাজীবী। একজন ভিক্ষা করিয়া ধনী, অপরজন দরিদ্র বলিয়া ভিখারী। এই দুইজনের জীবিকাগত ঐক্য বোধহয় একমাত্র কুকুরই বুঝিতে পারে—তাই সময়বিশেষে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী কল্পনা করিয়া উভয়কেই তাড়া করিয়া থাকে।

*　　　*　　　*

বিশ্বলক্ষ্মীর সহিত বাণিজ্যের সম্পর্ক থাকিলেও বঙ্গলক্ষ্মীর সহিত যে নাই ইহা নিঃসন্দেহ। তাই বাঙালী ব্যবসায়ীরা দেনায় ডুবিয়া মারা যায়। বাণিজ্যযাত্রা গঙ্গাযাত্রারই তুল্য। উভয়েরই লক্ষ্য মৃত্যু। এই লক্ষ্য প্রায় স্থির হইয়া গিয়াছে বলিয়া বাণিজ্য আর বাঙালীর নিকট সমস্যা নহে। যেমন মৃত্যু সমস্যা নহে, জন্মগ্রহণই সমস্যা। তাহা হইলে বাণিজ্যক্ষেত্রে বাঙালীর সমস্যা কোন্‌টি? সমস্যা, বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপন লিখিবার ভাষার জন্য বাঙালী গত একশত বৎসর ধরিয়া মাথা খুঁড়িয়া মরিতেছে। একশত বৎসরের চেষ্টায় মাত্র চারি পাঁচটি শব্দ সংগৃহীত হইয়াছে, শব্দ আরও চাই—অর্থ চাই না, মান চাই না, যশ চাই না, বিজ্ঞাপন লিখিবার জন্য আরও গোটাকত বাংলা শব্দ চাই। যে শব্দগুলি পাওয়া গিয়াছে তাহাতে কুলাইতেছে না। "শ্রেষ্ঠ" "অব্যর্থ" "বিফলে মূল্য ফেরৎ" "গ্যারাণ্টী" ও "অবদান" এই পাঁচটি কথা যেন পাঁচটি রত্ন। পাঁচকোটী বাঙালীকে ইহারা একশত বৎসর ধরিয়া আনন্দদান করিয়াছে।

* * *

প্রত্যেকেরই বিজ্ঞাপিত জিনিস পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অনেকসময়ে অদ্বিতীয়ও বটে। আমরা কয়েকটি সাময়িক পত্র হইতে নমুনা দেখাইতেছি—১। ইহা অম্লশূলের "অব্যর্থ" মহৌষধ। ২। স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য প্রভৃতির শক্তিশালী "অব্যর্থ" মহৌষধ। ৩। "শ্রেষ্ঠ" শিল্পীগণের অঙ্কিত। ৪। যাবতীয়…রোগ দূর করিবার "শ্রেষ্ঠ" উপাদান আছে। ৫। কলেরা, অম্বল, ও অন্যান্য স্নায়বিক ব্যাধির "অব্যর্থ" মহৌষধ। ৬। আমাশয় ও কলেরা রোগে "অদ্বিতীয়" মহৌষধ। ৭। স্বাদে ও গন্ধে বাজার অপেক্ষা "শ্রেষ্ঠ"। ৮। যাবতীয় জটিল রোগ…"গ্যারাণ্টী" দিয়া চিকিৎসা করা হয়।

* *

সুতরাং শুধু যে শ্রেষ্ঠ তাহা নহে, ইহার সঙ্গে পুরস্কার…গ্যারান্টি প্রভৃতি মহামূল্য ত্যাগও আছে। ত্যাগের দ্বারা যতখানি আত্মোন্নতি হওয়া সম্ভব তাহার ত্রুটি হয় নাই। বাঙালী এত করিয়াছে তবু তাহার মৃত্যুপথ রোধ হয় নাই। শ্রেষ্ঠ জিনিসের বাণিজ্য করিতে হইলে বাগজাল বিস্তার করিতে হয় বেশি। সাধারণ জিনিসের জন্য জাল পাতিবার প্রয়োজনই নাই। ভেজালের সঙ্গে জালের নিবিড় যোগ। ম্যালেরিয়ার জন্য কুইনিনের বিজ্ঞাপন না দিলেও চলে। কেননা কুইনিন ম্যালেরিয়ার ঔষধ। কিন্তু যক্ষ্মার কোনো অব্যর্থ ঔষধ নাই বলিয়াই তাহার জন্য বহুপ্রকার "শ্রেষ্ঠ" এবং "অদ্বিতীয়" ঔষধ প্রস্তুত করিতে হয়। অনেকে সাহস করিয়া "অব্যর্থ" পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। যাহার বলিবার কিছুই নাই তাহার পক্ষে চুপ করিয়া থাকাই দায়। অর্থাৎ তাহাকেই বলিতে হয় সবচেয়ে বেশি। সেই জন্য "যক্ষ্মার ঔষধ" কাহারও নাই, আছে যক্ষ্মার "অব্যর্থ" ঔষধ কিংবা "শ্রেষ্ঠ" ঔষধ।

* * *

বাঙালী জাতির শতকরা আশী ভাগ চিকিৎসা-ব্যবসায়ী। সেই জন্য এদেশের প্রধান বাণিজ্য ঔষধ, অথবা ঔষধোত্তর কিছু অর্থাৎ মাদুলী। ইহারই "শ্রেষ্ঠ" সংস্করণ স্বপ্নাদ্য মাদুলী। এই মাদুলী বিজ্ঞাপনের ভিতরে পড়িয়া কামধেনুর রূপ পরিগ্রহ করে। ভগবান লজ্জায় ঔষধের ফর্ম্মুলা কাহাকেও স্বয়ং আসিয়া দিতে পারেন না, স্বপ্নের সাহায্যে পাঠাইয়া থাকেন। রসিক ভগবান নগদ টাকা না পাঠাইয়া ঔষধের ফর্ম্মুলা পাঠান, অথচ আর একটু দয়া করিয়া ঐ মাদুলী কিনিবার জন্য জনসাধারণকে স্বপ্নাদেশ পাঠান না, ফলে কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে হয়। বাংলা কাগজ ভগবানের ইচ্ছা সফল করিবার জন্য ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে প্রস্তুত। সততাই বাঙালীর একমাত্র সম্বল। নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপনগুলি বাংলা মাসিকপত্র হইতে গৃহীত।

১। এই আশ্চর্য্য ম্যাজিক আংটী পরিলে সর্ব্বপ্রকার গ্রহবৈগুণ্য দূর হইয়া সৌভাগ্য দেখা দেয়। সত্বরই পুরাতন বা নূতন ব্যাধির উপশম হয় প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজয় এবং মামলা মোকদ্দমার জয় পরাজয় লাভ পরীক্ষায় কৃতকার্য্য এবং মৃত আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের সংবাদ, নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির খোঁজ লটারীতে কোন নম্বর উঠিবে, গুপ্তধনের খবর, খামের চিঠির বিবরণ, বন্ধ বাক্সের দ্রব্যাদির খবর ইত্যাদি জানিতে পারা যায়। ইহা ধারণে বাঞ্ছিত ব্যক্তিকে বশীভূত···ইত্যাদি করা যায়। ইহার ফল নিশ্চিত।

পুলিস কর্ত্তৃপক্ষ এই আংটি ব্যবহার করেন কিনা জানি না কিন্তু আমাদের সন্দেহ হয়, করেন। না হইলে এইরূপ বিজ্ঞাপন প্রচারকারীর কোনো শাস্তি হয় না কেন?

* * *

বাণিজ্যের দ্বারা মৃত্যুলাভই যখন কাম্য, তখন পুলিসবিভাগের পক্ষে এরূপ একটি মারিবার সুযোগ ত্যাগ করা উচিত হয় না। এ মারে কাহারও কোনো ক্ষতি হইবে না—বরঞ্চ বিজ্ঞাপনের ভাষার আর একটু উন্নতি হইতে পারে। এই বিজ্ঞাপন যাঁহারা ছাপেন তাঁহারা মৃত্যুকে পণ করিয়াই বসিয়াছেন। আর একটি বিজ্ঞাপন—

২। ৫০০৲ টাকা পুরস্কার অত্যাশ্চর্য্য Indrajal—কয়েকটি কথা মাত্র। নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে আপনার প্রিয়তম কিংবা প্রিয়তমার নাম উচ্চারণ করিলে রাত্রে স্বপ্নে দেখিবেন। পরে তিনি আপনার সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন হইবেন। স্বপ্নে আপনি হারানো বস্তুর সন্ধান পাইবেন ও অপরের মনোভাব জানিবেন

কোনও গণকের প্রয়োজন হইবে না। আপনি ইহার সাহায্যে অশরীরী আত্মার সহিত কথা কহিতে পারিবেন এবং দূর অজ্ঞাত দেশের স্বপ্ন দেখিবেন। মূল্য ২॥০ টাকা।

আড়াই টাকা দূরের কথা আড়াই পয়সার মোদক খাইলে খুব সম্ভব ইহার অনুরূপ স্বপ্ন দর্শন করা যায়। কিন্তু তবু দেশের লোককে আড়াই টাকাই দিতে হয়, কেননা বিশ্বাসের একটা মূল্য আছে।

*　　　　*　　　　*

বাণিজ্য যে সমস্যা নহে ইহাই তাহার প্রমাণ। অতএব হে বাঙালী, তোমরা বাণিজ্য লইয়া ডুবিতে থাক—কিন্তু ইহা লইয়া মাথা ঘামাইও না। বাণিজ্যের বিজ্ঞাপন অংশই যে বাণিজ্যের সর্ব্বস্ব ইহা ত সহজেই বুঝিতে পার। তুমি লাখখানেক মাদুলীতে কিছু কিছু ধূলা পূরিয়া খবরের কাগজে পূর্ণ পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন দিতে থাক—দেখিবে তোমার অবস্থা হয় ত ফিরিয়া যাইতে পারে। কিন্তু সাবধান ঐ মাদুলী তুমি নিজে ধারণ করিও না—কেনো বিক্রেতাই নিজে ধারণ করে না, কেন-না মাদুলী ধারণ করিয়া ধনপ্রাপ্তিবিষয়ে বিক্রেতার কোনো মোহ থাকা উচিত নহে। নিজে ধনী হইলে দেশের উপকার করিবার প্রবৃত্তি নাও থাকিতে পারে

চিঠি

শনিবারের চিঠির সঞ্চালক (সম্পাদক + পরিচালক) মহাশয়
সমীপেষু,

মহাশয়গণ,

কিছুদিন হইতে আপনারা Salaism (শালাইজম্) সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন। কিন্তু ওদিকে যে কম্যুনিজম্ আসিতেছে তাহার খোঁজ রাখেন কি ? জানি ধন-বিভাগে আপনাদের ভয় নাই, কারণ আপনারা যে ধনে ধন্য তাহা কমিবার নহে। কিন্তু কম্যুনিজমের জন্য সাহিত্যিক হিসাবে প্রস্তুত হইতে হইবে তো ? Comrade শব্দের কিছু অনুবাদ করিয়াছেন ? তবেই দেখুন, তিনি আসিয়া পড়িলে কোন ধ্বনিতে তাঁহার অভ্যর্থনা করিবেন ? Comrade শব্দটি অত্যন্ত মুখ-রোচক, স্মরণমাত্রে জিহ্বা সজল হইয়া ওঠে, কিন্তু ওটা যে বিদেশী। এই ভারতভূমে যেখানে মহামানবের সাগরতীরে শিখহূনদল পাঠান মোগল একদেহে হ'ল লীন সেই যেখানে হুঁ-হুঁ-হুঁ (হাত তালি) ইত্যাদি, সেখানে আর যাহা বিদেশী চলে চলুক, বিদেশী শব্দ তো চলিবেনা। তবে কিছু ভাবিয়াছেন কি ? আপনারা না ভাবিলেও মনে রাখিবেন জাগ্রত ভগবান হে! তিনি আমার মুখ দিয়া একটি দৈবী বাণী প্রেরণ করিয়াছেন। এই বাণীর প্রেরণায় সেদিন আমি ছন্দোবাণ-বিদ্ধ বাল্মীকির মত ঠিক তমসার তীরে নয়, বেলেঘাটার খালের ধারে ঘুরিতেছিলাম, বিশ্বাস না হয় পাঁচু গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিবেন। সেই দৈবাৎ-প্রাপ্ত দৈবী বাণীকে আর গোপন রাখিব না, বলিয়াই ফেলি ; ইহা আমাদের চির পরিচিত **শালা**, একেবারে

খাঁটি ভারতীয় শব্দ, আদি ও অকৃত্রিম, এমনকি হস্তদ্বারা পর্য্যন্ত স্পৃষ্ট নহে। মহাশয়গণ, Comrade শব্দের পরিবর্ত্তে এই খাঁটি ভারতীয় শালা কি চলে না? ইহার কতকগুলি সুবিধা আছে—

(ক) ইহা খাঁটি ভারতীয় মাল, অর্থনীতির ভাষায় যাহাকে বলে Indegenous Production। বিদেশের কোনো প্রভাব ইহাতে নাই।

(খ) এই শব্দ প্রয়োগে হিন্দু মুসলমান ভেদের কোনো প্রশ্ন উঠিবে না। জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে হিন্দু শিখ জৈন বৌদ্ধ পারসীক মুসলমান খৃষ্টান সকলেই ইহা ব্যবহার করিতে পারিবেন। আমি স্বয়ং একদা প্রসিদ্ধ জয়স্বাল সাহেবকে ভাষাতত্ত্ববিদ সুনীতিবাবুর সহিত আলাপ করিবার সময় 'সালে' শব্দ উচ্চারণ করিতে শুনিয়াছিলাম। ইহা বোধ হয় আমাদের পরিচিত শালারই বিহারী সংস্করণ। মনে করুন তো সেই গৌরবময় দিন, যেদিন হিমাদ্রি হইতে সুদূর কুমারিকা পর্য্যন্ত শালা শালা গর্জ্জনে ধ্বনিত খ্যাত হইয়া উঠিবে সেদিন কি—হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ (পুনরায় হাত তালি)।

(গ) ইহাতে এমন একটি মধুর স্নিগ্ধ পরকে-আপন-করা আত্মীয়-তার ভাব আছে, যাহা আপনাদের কমরেড শব্দে নাই। এই শব্দ-মন্ত্রে মুহূর্ত্তে পর আপন হয়, এমনকি অনেক সময় অঙ্গে হস্তক্ষেপ করিবার অনুমতির পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে না।

কাজেই যেদিক দিয়াই বিচার করুন শালা ছাড়া গত্যন্তর নাই! আপনারা শনিবারের চিঠির প্রসিদ্ধ সঞ্চালক, আপনারা এই শালা-তত্ত্ব ছাপিতে রাজি হইয়াছেন, কাজেই ইহার প্রাথমিক পরীক্ষাটা আপনা-দের উপর দিয়াই হইয়া যাক্।

ধরুন যদি কোনো সভার প্রারম্ভে সভাপতি ঘোষণা করেন, অদ্যকার এই মহতী সভায় যেখানে (ফরমূলাটির জন্য বসুমতীর বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য),

আমাদের প্রিয় বন্ধু শালা শ্রীসজনীকান্ত দাস মহাশয় কিছু বলিবেন! একবার ভাবুন তো—কি আর ভাবিবেন, যাহা ঘটিবে তাহা অভাবনীয়। আবার ধরুন নিখিল ভারতীয় শালা সঙ্ঘের সম্পাদক মহাশয় যদি কমিটির অধিবেশনে বলেন অদ্যকার এই অধিবেশনে দেশে মুক্তধনের উপকারিতা সম্বন্ধে প্রিয় বন্ধু শালা শ্রীপরিমল গোস্বামী একটি বিশিষ্ট প্রস্তাব করিবেন! অথবা শালা-ismএর আদি প্রবর্ত্তক শালা "বনফুল" সভায় উপস্থিত থাকিয়া সভা অলঙ্কৃত করিবেন! অহো সে কি গৌরবময় দিন!

কেমন নেহাৎ মন্দ শোনাইল কি? আশা করিতেছি অচিরাৎ সেদিন আসিবে, কিন্তু যতদিন জনগণমনঅধিনায়কদের কণ্ঠে এ ধ্বনি ধ্বনিত না হয়, ততদিন

জগৎসভার কাছে অখ্যাত অজ্ঞাত
কবিকণ্ঠে, ভ্রাত,

শ্রবণ করুন,

জয় শালা শ্রীসজনকান্ত কী জয়!
জয় শালা শ্রীপরিমল গোস্বামী কী জয়!!
জয় শালা "বনফুল" কী জয়!!!

অবশেষে আমি অগঠিত নিঃ ভাঃ শালা সঙ্ঘের পক্ষ হইতে আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি যে আপনারা এই শালাবাদের প্রাথমিক পরীক্ষা আপনাদের উপরে করিতে দিয়া আন্তর্জ্জাতিক শালা সঙ্ঘের অশেষ কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। *

* Comradeএর বাংলা প্রতিশব্দের জন্য শালা লেখককে ধন্যবাদ।—শ, চি, স,

রাইকমল

[শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত বড় গল্পের বই]

রাইকমল গল্পটিতে প্রধান লক্ষ্য করিবার বিষয় ইহার অবিরাম এবং দ্রুত গতি। গল্পটি ঘটনা পরম্পরার মধ্য দিয়া হু হু শব্দে ছুটিয়া চলিয়াছে, কাহিনীর বিষয়-বস্তুর সঙ্গে এই গতির একটা সামঞ্জস্য আছে। সাধারণ বাঙালী গৃহস্থের বিষয়ে গল্প হইলে এই দ্রুত গতি অশোভন হইত, কেন না আমাদের সমাজ প্রধানত স্থিতিশীল। কিন্তু যে বোষ্টম সমাজের কাহিনী এই গ্রন্থের উপজীব্য তাহা অনেকটা পরিমাণে গতিধর্ম্মী তাহা যেন হিন্দু সমাজের জিপ্সি-বেদের দল। হিন্দু সমাজের এই স্থিতিশীলতার প্রধান কারণ হিন্দু বিবাহের অমোঘ, আমরণ অবিচলনীয় বিবাহের রীতি। স্ত্রী পুরুষ এইরূপে বিবাহে বদ্ধ হওয়াতে অনেকটা পরিমাণে স্থাবর হইয়া পড়ে। কিন্তু বোষ্টম সমাজে বিবাহ এমন অমোঘ শৃঙ্খলিত নহে ; বিবাহের নাম মালাচন্দন ; ইচ্ছা বা প্রয়োজন অনুসারে মালাচন্দনের পাশ হইতে পুরাতনকে বিদায় দেওয়া চলে, নূতনকে বাঁধা চলে। বিবাহ পাশের এই শিথিলতার জন্য এই প্রত্যন্ত সমাজ গতিবান, এবং সেই জন্য পথটাই ইহাদের প্রকৃত বাসস্থান। গল্পটা এই গতিশীল সমাজের, কাজেই কাহিনীর টেক্‌নিকে অবিরাম গতি বেশ মানানসই হইয়া গিয়াছে।

এই গল্পে দুইটি প্রধান চরিত্র, রাইকমল ও রঞ্জন। প্রধানত ইহাদেরই সংঘর্ষে কাহিনীর সৃষ্টি, এবং তৎপরে ঘটনা-বিন্যাসের মধ্য দিয়া ইহাদের চরিত্র দুটি দুই ভিন্ন পরিণামের মধ্যে ছুটিয়া চলিয়াছে। রাইকমলের দুইবার মালাচন্দন হইয়াছে, রঞ্জনের তিনবার। কিন্তু

উভয়ের মনস্তত্ত্বে কত প্রভেদ! রাইকমল তৃপ্তি পায় নাই বলিয়াই রসিক দাসকে ত্যাগ করিয়াছে। রঞ্জনের আবার বিপরীত কারণ, সে এক একবার বিবাহ করিতেছে, কিন্তু তাহাতে মন তৃপ্ত হইলেই নূতন রূপ যৌবনের সন্ধানে ছুটিয়াছে। কেহই নিজেকে দোষী মনে করে না; রঞ্জন ভাবে ইহাই তো বৈষ্ণবের রীতি। কমলকে বিবাহ করিয়া সে যখন পুনরায় নূতন সেবাদাসী ঘরে আনিল, কমলের ব্যবহারে তখন সে অপ্রস্তুত হইয়া বলিতেছে—"তুমি তো জান বৈষ্ণবের সাধনা রাধারাণীর কল্পনা যৌবনরূপ—"। কমলও জীবনে প্রেমের নানা এক্সপেরিমেণ্ট করিয়াছে, রসিক দাস, শ্যামসুন্দরের শিলামূর্ত্তি, আবাল্য বাঞ্ছিত রঞ্জন; না কেহই তাহাকে তৃপ্তি দিতে পারে নাই। রঞ্জন বৈষ্ণব প্রেম সাধনার আক্ষরিক অনুসরণ করিয়াছে, কমল করিয়াছে আন্তরিক।

কিন্তু এই চরিত্রগুলি কেবল বোষ্টম সমাজের বিশিষ্ট সম্পত্তি হইলে ইহাদের সাহিত্যিক মূল্য বেশি হইত না। কমল, পরী, ইহাদের বাহ্-রূপটা বোষ্টম, কিন্তু সেই বহিস্ত্বকের নিম্নেই তাহাদের চিরন্তন নারী হৃদয়, প্রেমে, করুণায়, রহস্যে ও সপত্নী ঈর্ষ্যায় পূর্ণ। রঞ্জনের কমলকে ঘরে আনিবার পর মুমূর্ষু পরীর সেই বুক ভাঙা ক্রন্দন! আর নূতন সেবাদাসীকে দেখিয়া কমলের নীরবে গৃহত্যাগ! এই দুই দৃশ্যের কমল ও পরীর সঙ্গে জগতের সমস্ত নারী চরিত্রের নিগূঢ় ঐক্য।

কমলের চরিত্রটি বড় রহস্যময়। রহস্যময় এই জন্য যে তাহাকে আমরা সম্পূর্ণ ভাবে বুঝিতে পারি না, যেমন পারি না জীবনকে বুঝিতে। জীবনের অপরিমেয় রহস্য খানিকটা পরিমাণে এই নারীর মধ্যে আছে। নূতন সেবাদাসী আনিয়া কমলকে গৃহে থাকিবার জন্য রঞ্জন অনুরোধ করিতেছে এবং নিজের কাজকে পোষণ করিবার জন্য

বলিতেছে—"তুমি তো জান বৈষ্ণবের সাধনা—রাধারাণীর কল্পনা—যৌবনরূপ—"

বাধা দিয়া কমল বলিল, "জানি যৌবন রূপ সামনে না থাকলে ধারণায় কল্পনায় বাধা পড়ে, রূপ রসের উপলব্ধি হয় না। কিন্তু আমিও ত' বৈষ্ণবী, আমারও ত' চাই, চাই একটি শ্যামকিশোর।"

ইহা তাহার ছলনা, না সত্য কথা! অভিমান না সঙ্কল্প। কে বলিয়া দিবে! এই রহস্যের জন্যই কমল অপূর্ব্ব।

আধুনিক কালের উপন্যাসের চরিত্র বড় সহজ, কারণ তাহা জটিল কিন্তু ইহা জ্যামিতিক জটিলতা, বুদ্ধি দ্বারা তাহার সমাধান চলে। কমলের চরিত্র জটিল নয়, তাহা রহস্যময়, বুদ্ধিতে তাহার সবটুকু ধরা পড়ে না। দুর্য্যোধন দেয়ালের স্ফটিক খণ্ডকে দ্বার মনে করিয়া আহত হইয়াছিলেন। কমলের মধ্যে তেমনি একটি স্বচ্ছতা আছে, তাহাতেও প্রবেশ তেমন অবাধ নহে। 057.54|

ঘটনার মধ্যে মাঝে মাঝে সুন্দর নাটকীয় অভিব্যক্তি আছে। কমলের হঠাৎ রসিক দাসকে মালাচন্দন দান। আবার কমলকে ঘরে আনিবার পরে জীর্ণ দালানের মধ্য হইতে জীর্ণতর পরীর ঈর্ষ্যা-কাতর ক্রুদ্ধ বিলাপ, রঞ্জনকে মালা পরাইতে গিয়া পিছনে দণ্ডায়মান কমলের নববধূ দর্শন। এ তিনটি দৃশ্য অভাবনীয় বিস্ময়ে পাঠককে চকিত করিয়া দেয়, কিন্তু পরে মনে হয় ইহা কত অবশ্যম্ভাবী, কত অনিবার্য্য।

অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় বলিয়া গ্রন্থ সমালোচনার একটা রীতি আছে। তাহার সুবিধা সে-সমালোচনা না-পড়িয়া করা যায়, অধিকাংশ সমালোচক তাহাই করেন। এবং নিজে না পড়া সত্ত্বেও পাঠককে তিনি বইখানি বার বার পাঠ করিতে বলেন। আমাদের ঠিক বিপরীত, আমরা বইখানি পড়িয়াছি, কিন্তু পাঠককে পড়িতে নিষেধ করি। কারণ

অধিকাংশ পাঠক মূর্খ, এমন সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের তাঁহারা কিছুই বুঝিবেন না, আর যে কয়জন সত্যকার রসিক পাঠক আছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই এ সমালোচনা পড়িবার আগেই গ্রন্থখানি পড়িয়া ফেলিয়াছেন। এখন তাঁহারা এ সমালোচনা পড়িতে পারেন, দেখিবেন যে Great minds never think alike.

একশত বৎসর পূর্ব্বের সমাজ

(সংবাদ পত্রে সেকালের কথা ২য় খণ্ড হইতে)

১৪ মে ১৮৩১। পরম 'কল্যাণীয় শ্রীযুত সম্বাদ প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় কল্যাণবরেষু।—কতিপয় দিবস গত হইল কলিকাতার একজন গৃহস্থ আপন পুত্রকে সঙ্গে লইয়া ৺জগদম্বার দর্শনে কালীঘাটে আসিয়া এক দোকানে বাসা করিয়া অবগাহনান্তর পূজার নৈবেদ্যাদি আয়োজন-পূর্ব্বক সমভিব্যাহারে জগদীশ্বরীর সন্নিধানে উপনীত হইয়া তাবতের সহিত অষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন কিন্তু উক্ত গৃহস্থের সুসন্তানটি প্রণাম করিলেন না ব্রহ্মাদি দেবতার দুরারাধ্যা যিনি তাঁহাকে ঐ ব্যলীক বালক কেবল বাক্যের দ্বারা সম্মান রাখিল যথা গুড মার্ণিং ম্যডম ইহা শ্রবণে অনেকেই শ্রবণে হস্ত দিয়া পলায়ন করিবায় তাহার পিতা তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হওয়ায় কোন ভদ্রব্যক্তি নিবারণ করিয়া কহিলেন শান্ত হও এস্থানে রাগ প্রকাশ করা উচিত নয় তাহাতে ঐ ব্যলীকের পিতা আক্ষেপ করিয়া কহিল ওরে আমি কি ঝকমারি করেয়্য তোরে

হিন্দুকালেজে দিয়াছিলাম যে তোর জন্যে আমার জাতি মান সমুদায় গেল মহাশয় গো এই কুসন্তানের নিমিত্তে আমি একঘরো হইয়াছি ধর্ম্মসভায় যাইতে পারি না এই সকল খেদোক্তি শুনিয়া অনেকেই সে ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন আমরা শুনিয়াছি কলিকাতার অনেক বাঙ্গালী বড় মানুষ হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষতা করেন তবে কেন ছেলেরদের এমন কুব্যবহার হয় মহাশয় গো বাঙ্গালী বড় মানুষের গুণের কথা কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন না দেখুন দেখি ঘরের টাকা দিয়া কেমন তাবল্লোকের পরকাল টণ্টনে করিতেছেন অতএব আমারদের বাঙ্গালী বাবুদের গুণের কথা কত কব ইতি। কস্যচিৎ কালীকিঙ্করস্য।—[সংবাদ প্রভাকর]

আষাঢ়ের শনিবারের চিঠি আষাঢ়ের শেষেই বাহির হইল বলিয়া কেহ কিছু মনে করিবেন না। আমাদের একমাত্র জোর ছিল উত্তরা। গত বৈশাখ মাসে উত্তরার মাঘ সংখ্যা বাহির হইতে দেখিয়া আমরা পরম নিশ্চিন্তে দেরী করিতেছিলাম। কিন্তু সেদিন হঠাৎ উত্তরার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা হস্তগত হওয়াতে তৎপর হইয়া উঠিয়াছি। আশা করিতেছি অতঃপর আর কোনো গোলমাল হইবে না।

পরিব্রাজকের ডায়েরি

ধাওতাল উরাওঁ

মধ্যপ্রদেশে স্বরগুজা ও যশপুর নামে যে দুইটি করদ রাজ্য আছে তাহার সন্নিকটে বিহার প্রদেশের মধ্যে পালামৌ জেলার কয়েকটি পরগণা গভীর অরণ্যে আচ্ছাদিত। গাছের মধ্যে শাল, আসন, গাম্ভার প্রভৃতি বেশী; তাহা ছাড়া কোথাও কোথাও বিস্তীর্ণ পাহাড়ের দেহ বাহিয়া শুধু বাঁশের বন দেখা যায়। বাঁশের বন যে পাহাড়ের উপর হয়, সেখানে মাটির উপরে বেশী ঝোপ-জঙ্গল থাকে না। বাঁশঝাড়ের নীচে প্রায় পরিষ্কার থাকে, কেবল বাঁশের শুকনা পাতাই পড়িয়া থাকে। শালের বনে নীচে ঝোপ বেশী হয়। হাতে ধারাল কুঠার না থাকিলে পথ চলিতে পদে পদে বাধা পাইতে হয়।

এই সকল জঙ্গলের মধ্যে জীবজন্তুদের এক একটি এলাকা থাকে। পাহাড় ও জঙ্গলের মাঝে মাঝে ছোট নদীনালা প্রায়ই দেখা যায়। বাঘেরা বনের ভিতর দিয়া চলাফেরা করিতে হইলে নদীপথ আশ্রয় করে। বাঘেরা অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জানোয়ার। যেদিকে চোরকাঁটা সেদিকে তাহারা পারতপক্ষে যায় না। শূকর অথবা হরিণ মারিয়া খাইবার পর বাঘ সচরাচর নদীর জলে গলা পর্য্যন্ত ডুবাইয়া অনেকক্ষণ বিশ্রাম করে। এই জন্য বাঘেরা সচরাচর জলপথের কাছাকাছি ঘুরিয়া বেড়ায়। হরিণ বাঘের এই স্বভাব জানে বলিয়া বনের মধ্যে অপেক্ষাকৃত উঁচু ঘাসালু জমি দিয়া নিঃশব্দে চলাফেরা করে।

জীবজন্তু চলিয়া চলিয়া জঙ্গলের মধ্যে কতকগুলি পথ হইয়া যায়। মাঠের উপর দিয়া মানুষের পায়ে চলার পথে যেমন ঘাস মরিয়া একটা

দাগ হইয়া যায়, জঙ্গলেও কতকটা সেইরূপ হয়। দুইদিকে উচ্চ ঘাস এবং তাহার মাঝখান দিয়া একটি রেখা দেখা যায়, যেখানে সব ঘাস একদিকে নীচু হইয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া থাকে। পদদলিত হইয়া ঘাসগুলি একেবারে মরিয়া যায় না বটে, তবে তাহাদের বৃদ্ধি নষ্ট হইয়া যায়।

এমন জঙ্গলের ভিতর মাঝে মাঝে মানুষের বাস আছে। দুই ক্রোশ, তিন ক্রোশ অন্তরে এক একটি পার্ব্বত্য গ্রাম। মানুষেরা সুবিধামত একটা পথ করিয়া লয়, নয়ত জঙ্গলের ভিতর জীবজন্তুর অনুসৃত পথকে আরও একটু সরল, আরও প্রশস্ত করিয়া লয়।

পালামৌ জেলায় যাহারা এই সব বনে বাস করে তাহারা প্রধানতঃ চাষ করিয়া থাকে। বন্য হাতী, মহিষ, হরিণ ও শূকরের হাত হইতে শস্যের অর্দ্ধেক রক্ষা করিতে পারিলে ইহারা যথেষ্ট মনে করে। বাড়ীর চারিদিকে অথবা গরুমহিষের বাথানের চারিদিকে উচ্চ শালের বেড়া দিয়া ইহারা বাস করে। তাহাব ভিতর হইতেও কখন কখন বাঘ গরুবাছুর ধরিয়া লইয়া যায়। শস্যক্ষেত্রে শস্য রক্ষা করিবার জন্য বেড়া দিয়াও নিস্তার পাওয়া যায় না। সর্ব্বদা সতর্ক হইয়া পাহারা দিতে হয়। চাষীরা উঁচু মাচা বাঁধিয়া তাহাতে শুইয়া থাকে এবং চারিদিকে গাছে এক একটা টিনের কানেস্তারা ও লাঠি বাঁধিয়া রাখে। এই সকল লাঠির সঙ্গে এমনভাবে দড়ি বাঁধা থাকে যে মাচায় শুইয়া দড়ি টানিলেই চতুর্দ্দিকে গাছের টিন একসঙ্গে বাজিয়া উঠে। ইহাতে রাত্রে হরিণেরা ভয় পাইয়া পলাইয়া যায়।

এমনিভাবে সতত বন্যজন্তুর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া পাহাড়িয়ারা বাঁচিয়া থাকে। পাহাড়ে অনেক জাতি বাস করে। তাহাদের মধ্যে উরাওঁ একটি বিশিষ্ট জাতি। একবার পালামৌ জেলায় ধাওতাল উরাওঁ নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল। ধাওতাল গ্রামের মধ্যে

বেশ বর্দ্ধিষ্ণু গৃহস্থ ছিল। তাহার নিজের গরুমহিষ ও চাষবাস বেশ ভালই ছিল। ধাওতাল খুব দীর্ঘকায় ছিল না বটে, কিন্তু তাহার দেহে খুব বল ছিল। বয়স ষাটেরও বেশী হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তখনও হাতের কুঠারের একঘায়ে সে তিন চার ইঞ্চি মোটা শালের চারা এক কোপে কাটিতে পারিত; সাধারণ লোকের পক্ষে তাহা কাটিতে চার কোপ লাগিয়া যাইত।

ধাওতাল বেশী কথা বলিত না, তাহার চলন কতকটা ভাল্লুকের মতন ছিল। একটু হেলিয়া দুলিয়া বাঁ হাতে টাঙ্গি ঝুলাইয়া সে বন-পথে যাতায়াত করিত। ভয় তাহার বিশেষ কিছু ছিল বলিয়া মনে হয় না। একদিন একটি জঙ্গলের সংবাদ লইবার জন্য তাহাকে পাঠান হইয়াছিল। সে জঙ্গলে পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর একটি ছোট হাতীর পাল আসিয়াছিল। এ বৎসরও তাহারা সেখানে থাকিলে শিকারের অসুবিধা ঘটিবে ভাবিয়া ধাওতালকে পাঠান হইল। ধাওতাল বিনা বাক্যব্যয়ে দুইদিনের মত খাদ্যদ্রব্য বাঁধিয়া একাই সেই গহন বনের উদ্দেশে রওনা হইয়া গেল। পথে এক গ্রাম হইতে মনবাহাল নামে অপর একজন শিকারীকে তাহার ডাকিয়া লইবার কথা ছিল।

তৃতীয় দিনে যখন ধাওতাল ফিরিয়া আসিল তখন মনবাহালের কাছে তাহার কার্য্যকলাপের কথা শোনা গেল। মনবাহাল বলিল গত রাত্রে অন্ধকারের সময়ে তাহারা যেখানে আশ্রয় লইয়াছিল সেখানে পাশে একটি সঙ্কীর্ণ গুহার মধ্যে হঠাৎ তাহারা এক যোড়া জ্বলন্ত চোখ দেখিতে পায়। মনবাহাল কিছু ভয় পাইয়াছিল বটে, কিন্তু ধাওতাল নির্ব্বিবাদে হামাগুড়ি দিয়া গুহার মধ্যে ঢুকিয়া গিয়াছিল। জন্তুটিও দেখাদেখি আরও পিছাইয়া গেল। কিছুক্ষণ আগুপিছু করিবার পর ধাওতাল বাহির হইয়া আসিলে জন্তুটি অত্যন্ত ভয় পাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে

পলাইয়া গেল। তখন দেখা গেল যে উহা কোনও ভয়াবহ জীব নয়, একটি সজারুমাত্র।

যাহাই হউক, মহবাহাল যখন গল্পটি বলিতেছিল, ধাওতাল তখন বসিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিল। জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল যে তাহার ভয় পাওয়ার কোনও কারণ ছিল না। কারণ জন্তুটি যদি চিতাবাঘও হয়, তবু গর্ত্তের মধ্যে অমন বে-বাগে পড়িয়া সে কিছু করিতে পারিত না। হয়ত কিছু করিতে পারিত না একথা সত্য; কিন্তু নিরাপদ জানিয়াই বা কয়জন লোক এরূপ অবস্থায় ভয়ের হাত এড়াইতে পারে?

আমার যে আত্মীয়ের সঙ্গে পালামৌজঙ্গলে গিয়াছিলাম, ভাল শিকারী বলিয়া তাঁহার খুব খ্যাতি আছে। একদিন শিকারে ধাওতালও সঙ্গে ছিল এমন সময়ে একজনের অসাবধানতায় একটি বাঘ গুলি খাইয়া আহত হইয়া পলাইয়া গেল। জঙ্গলে বাঘকে জখম করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া শিকারীদের রীতি নয়। এরূপ অবস্থায় তাহারা অত্যন্ত হিংস্র হইয়া উঠে এবং মানুষ দেখিলে অনিষ্ট না করিয়া ছাড়ে না।

অতএব আহত বাঘটিকে মারিবার জন্য শিকারীর দল তাহার পিছু লওয়া স্থির করিলেন। স্থির করিলেও সকলের সাহসে কুলাইল না। বন্দুকধারী দুএকজন অগ্রগামী হইলেন এবং ধাওতাল হাতের টাঙ্গি দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া তাহাদের সঙ্গে চলিল। আহত বাঘের রক্ত ও পদচিহ্ন দেখিয়া স্থির হইল যে তাহার পেটে বা বুকে গুলি লাগে নাই, কেবলমাত্র একটি পা ভাঙিয়া গিয়াছে।

বনের ভিতর দিয়া বাঘের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া যাওয়া অসাধারণ দক্ষতার ব্যাপার। শিকারীরা যাইবার সময়ে ধাওতালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ধাওতাল, যদি বাঘ হঠাৎ আসে, তুমি পলাইবে না ত'?" ধাওতাল বলিল, "বাবু, তা কেমন করিয়া হইতে পারে? তুমি ও

আমি দুইজনে পূবমুখে যাইতেছে। বাঘ যদি আসে তোমার মুখ পূবদিকে থাকিবে, আর আমার মুখ পশ্চিমদিকে হইবে, ইহা কেমন করিয়া হইতে পারে ?”

কয়েক ঘণ্টা পরে দেখা গেল কতকগুলি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের আড়ালে বাঘ আশ্রয় লইয়াছে। সেখানে সহসা যাওয়া কঠিন। ঠিক কোন্ পাথরের আড়ালে বাঘ আছে তাহা জানা না থাকায় শিকারীদের বিপদের সম্ভাবনা ছিল। যখন সকলে এমনি ইতস্তত: করিতেছেন, তখন ধাওতাল সম্মুখে একটি ছোট কেন্দ গাছ দেখিতে পাইয়া বলিল, “আমি ঐটিতে গিয়া উঠি। আমাকে দেখিয়া বাঘ যেমন লাফ দিয়া বাহির হইবে, আপনারা তাহাকে মারিয়া ফেলিবেন।”

যেমন বলা, তেমনই কাজ। সাবধানে গাছটির কাছে গিয়া ধাওতাল উপরে চড়িতে লাগিল। কয়েক হাত চড়িয়াই সে বাঘটিকে দেখিতে পাইল এবং সঙ্গে সঙ্গে আঙুল দেখাইয়া চেঁচাইয়া উঠিল। তখনও কিন্তু সে এত উপরে উঠে নাই যে বাঘ তাহাকে ধরিতে পারিবে না, তবু সঙ্গের শিকারীদের উপর তাহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল বলিয়াই সে এইরূপ দু:সাহসের কাজ করিল। বাঘ তাহার শব্দ শুনিবামাত্র দুরন্তবেগে তাহার দিকে লাফাইয়া উঠিল ; সঙ্গে সঙ্গে শিকারীর গুলিতে সাংঘাতিকভাবে আহত হইয়া সে পুনরায় পড়িয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরেই তাহার মৃত্যু হইল। তখন আমরা লোকজন ডাকিয়া বাঘটিকে তাঁবুতে লইয়া গেলাম। সন্ধ্যার সময়ে তাঁবুতে আগুনের ধারে বসিয়া গল্প করিতেছি, এমন সময়ে ধাওতালকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম তাহারা সব সময়ে এমনভাবে বিপদের মধ্যে থাকে কেন ! জঙ্গলের বাহিরে কোনও গ্রামে, যেখানে আরও নির্ব্বিঘ্নে চাষ-আবাদ করা যায়, সেখানে থাকিলেই ত' ভাল হয়। ধাওতাল আমার

কথায় হাসিয়া প্রশ্ন করিল, "বাবু, তোমাদের ওখানে কি মানুষ মরে না?"

আমাকেও হাসিতে হইল বটে, কিন্তু ইহার কোনও সদুত্তর খুঁজিয়া পাইলাম না।

১৩।২।১৯৩৫

বনের সংবাদ

ছেলেবেলায় আমার ধারণা ছিল যে বনের মধ্যে বাঘ ভালুক বুঝি গাছের ফাঁকে ফাঁকে খুব ভিড় করিয়া সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়ায়। কিন্তু যখন যথার্থই বড় বন দেখিবার সৌভাগ্য হইল, তখন দেখিলাম সত্যই যাহাকে অরণ্য বলা যায় তাহা আমাদের সব কল্পনাকে অতিক্রম করিয়া যায়।

সে যেন আর একটা রাজ্য। মানুষের জগতের সহিত তাহার কোনও যোগ নাই। চারিদিকে বিশাল বৃক্ষরাজি সার বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছে; উপরে আকাশের আলো পত্ররাজির মধ্য দিয়া কোথাও বা দেখা যায় কোথাও দেখা যায় না। এক একটি বিশাল বৃক্ষের কাণ্ড প্রায় চল্লিশ হাত, পঞ্চাশ হাত সোজা উঠিয়া তবে উপরের দিকে ডালপালা মেলিয়া ধরিয়াছে। যে সকল গাছ বড় গাছের সঙ্গে জীবনযাত্রার যুদ্ধে পারিয়া উঠে না, তাহারা লতার আকার ধারণ করিয়া বড় গাছের কাণ্ডের অবলম্বনে উপরের দিকে অগ্রসর হয়; আর সুবিধা পাইলে মূল গাছটিকে মারিয়া ফেলিতে ছাড়ে না; তাহার সব রস নিজের পুষ্টির জন্য টানিয়া লয়। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় যে এই সকল রাক্ষুসে গাছের লতাপাতা এবং ফুলের বাহার

শাল, আসন প্রভৃতি মহীরুহ অপেক্ষা অনেক বেশী। লতানে গাছ-গুলি পরের কাণ্ড আশ্রয় করিয়া বৃদ্ধি পায় বলিয়া তাহাদের সকল শক্তি যেন নিজের অঙ্গশোভার জন্য ব্যয় করিতে পারে। পাতার বিস্তারে ও বৈচিত্র্যে তাহারা চক্ষে চমক লাগাইয়া দেয়। অথচ যাহা-দের কাণ্ডকে আশ্রয় করিয়া এই সকল ঘটনা ঘটিয়া থাকে, সে সব গাছের এমন বাহার কখনও হয় না। তাহাদের কাণ্ডই শুধু পুরুষোচিত বীর্য্যের ভরে স্থির ঋজুভাবে আকাশের দিকে ঘন পত্ররাজি মেলিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

গহন বন যেন একেবারে স্বতন্ত্র একটি জগৎ। মানুষ এখানে অপরা-পর জীবেরই মত সামান্য জীব; বনদেবতার দয়ায় কোনরকমে বাঁচিয়া থাকে। বনের মধ্যে মানুষের চলাফেরা এত কম যে কোন স্থায়ী পথ সেখানে গড়িয়া উঠে না। হয়ত একজন কাঠুরিয়া নিজের ব্যবহারের জন্য একটি পথ কাটিয়া যায়, এবং যাইবার সময়ে দুইপাশের গাছে কুঠারের আঘাতের চিহ্ন রাখিয়া দেয়। পরের মানুষেরা সেইটুকু আঘাতের চিহ্ন দেখিয়া নিজেদের পথ বাছিয়া লয়।

ছোটনাগপুরে এমনই একটি সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া যাইতে যাইতে একদিন দেখিলাম এক জায়গায় অনেকগুলি ছোট পাথর কে যেন স্তূপের মত সাজাইয়া রাখিয়াছে। আমাদের সঙ্গে যে ব্যক্তি যাইতেছিল সে বলিল যে এদিক দিয়া মহাজনেরা বলদের পিঠে মাল বোঝাই করিয়া মাঝে মাঝে যাতায়াত করে। গরুর গাড়ীরও এ পথে চলিবার কোন উপায় নাই। যাহারা যায় তাহারা সকলে এই জায়গায় বনদেবতার উদ্দেশে স্বহস্তে ঐ স্তূপের উপর আরও একটি পাথর ফেলিয়া দিয়া যায়।

বনের ভিতর মানুষের দর্শন এমনই দুর্লভ যে তবু মানুষের হাতে ছোঁড়া এক টুকরা পাথর দেখিয়াও পরের পথিকেরা হৃদয়ে ভরসা পায়।

এইরূপ কত শত বৎসর ধরিয়া এক অজ্ঞাত পথের পাশে কোন অখ্যাত বনদেবতার অর্ঘ্যবেদী গড়িয়া উঠিয়াছে।

একদিন কয়েক জন শিকারী বন্ধুর সঙ্গে শিকার দেখিতে গিয়াছিলাম। বনের একধার ঘেরিয়া কতকগুলি গাছের উপরে মাচা বাঁধা হইল এবং বহু দূর হইতে গ্রামের লোকজন কেরোসিনের টিন বাজাইয়া বনের জন্তুগুলিকে আমাদের মাচার শ্রেণীর দিকে হাঁকাইয়া আনিতে লাগিল। যে মাচায় শিকারীরা বসিয়াছিলেন আমরা সে মাচায় বসি নাই। যে মাচার পাশে বাঘ আসিবার সম্ভাবনা ছিল না এমন একটি মাচায় আমার এক বন্ধু ও আমি, দুইজনে ছবি তুলিবার যাবতীয় সরঞ্জাম লইয়া বসিয়া রহিলাম। আমাদের মতলব ছিল যে আমরা শুধু বনের জীবজন্তু দেখিব এবং যদি সম্ভব হয় তাহাদের ছবি তুলিব।

আমরা দুইজনে নিস্তব্ধ বনের মধ্যে কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলাম। চারিদিকে জীবজন্তুর কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না, পাতার মর্ম্মর ধ্বনি ও ঝিল্লীরব ছাড়া আর প্রায় কিছুই শোনা যাইতেছিল না। ঝিল্লীরা অরণ্যের মধ্যে অবিশ্রাম ভাবে ডাকিয়া যায়। আমাদের কখনও মনে হইতেছিল ঝিল্লীরা একদিক হইতে ডাকিতেছে, কখনও বা সম্পূর্ণ বিপরীত দিক হইতে। সত্যই একটি ঝিল্লী যখন ডাকিয়া ডাকিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়ে তখন যেন তাহারই স্থান পূরণ করিবার জন্য অন্য কোনও বৃক্ষকোটর হইতে আর একটি ঝিল্লী সেই তান ধরিয়া লয়।

এমনি ভাবে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকার পর আমরা বুঝিতে পারিলাম হাঁকোয়ারা দূরে তাহাদের হাঁক সুরু করিয়াছে। তাহাদের কোলাহল প্রথমে দূর হইতে অতি ক্ষীণভাবে আসিতেছিল, কিন্তু ক্রমশঃ সে শব্দ

আরও নিকটে ও আরও গাঢ় হইয়া আসিল। কিন্তু শব্দ আরম্ভ হইবা-মাত্র যে বনের জীবজন্তু চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি আরম্ভ করিল তাহা নহে। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত কোনও শব্দ শুনা যায় নাই। একাগ্রভাবে শুনিবার চেষ্টায় আমাদের শ্রবণশক্তি যেন তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। হঠাৎ হাঁকোয়াদের ডাক এবং ঝিল্লীরব ছাড়াও আমরা খস্ খস্ করিয়া একটি শব্দ শুনিতে পাইলাম। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই তাহা থামিয়া গেল। আমরা চারিদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সন্ধান করিতে লাগিলাম, কোথাও কিছু নড়ে কিনা। এমন সময়ে দেখা গেল দু'তিনটি বেশ বড় হরিণ গাছ-পালার অন্তরালে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া এদিক ওদিক চাহিতেছে। কোন্ দিক হইতে মানুষের আওয়াজ আসিতেছে তাহারা যেন তখনও ঠিক বুঝিতে পারে নাই, তাই কোন্ দিকে পলাইবে তাহা স্থির করে নাই। হাঁকোয়াদের শব্দ ক্রমে আরও কাছে আসিতে লাগিল, এবং হয়ত হঠাৎ বুঝিতে পারিয়া হরিণের ক্ষুদ্র দলটি নিমেষের মধ্যে আমাদের মাচার পাশ দিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল।

ইহার পরে অনেকক্ষণ আর কোনও শব্দ শোনা গেল না। হাঁকোয়ারা আরও কাছে আসিতে লাগিল; কিন্তু কোনও বাঘ ভালুক দেখিতে না পাইয়া আমরা যেন নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিলাম। এমন সময়ে হঠাৎ একটি ভারি জন্তু সবেগে আমাদের দিকে দৌড়াইয়া আসিতেছে এইরূপ আওয়াজ শোনা গেল। আমার সাথী বন্ধুটি বলিলেন ইহা শম্বর বা অন্য কোন খুরবিশিষ্ট জন্তুর শব্দ নয়, বাঘ হইলেও হইতে পারে। আমরা এই সব ভাবিতেছি এমন সময়ে আমার বন্ধু হঠাৎ চুপি চুপি বলিলেন, "বাঘ!" তিনি যেদিকে দেখাইয়া দিলেন সেদিকে চাহিয়া দেখি যে সত্যই একটি পূর্ণকায় বলিষ্ঠ বাঘ আমাদের মাচা হইতে প্রায় কুড়ি হাত দূরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সে যেন

করিবে তাহা ভাবিয়া উঠিতে পারে নাই। আমাদের উপর শিকারীদের নির্দ্দেশ ছিল যে যদি বাঘ ভ্রমক্রমে আমাদের মাচার নিকটে আসে আমরা যেন খুব শব্দ করিয়া তাহাকে উল্টাদিকে ফিরাইয়া দিই। সেই নির্দ্দেশ মত আমার বন্ধুটি হঠাৎ সশব্দে হাততালি দেওয়া আরম্ভ করিলেন। আমিও তাঁহাকে অনুসরণ করিলাম।

বাঘ এতক্ষণ আমাদের দেখে নাই। কিন্তু এবার শব্দ শুনিয়া উপরে চাহিতেই আমাদের দেখিতে পাইল। তখন সহসা সে একটি হুঙ্কার দিল এবং দাঁত বাহির করিয়া আমাদের ভয় দেখাইবার চেষ্টা করিল। যে কারণেই হউক আমরা ভয় পাওয়ার পরিবর্ত্তে তুমুল বেগে হাততালি দিতে লাগিলাম। বাঘ ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না। তাহার পরেই সহসা উল্টা দিকে না গিয়া মাচার শ্রেণী ভেদ করিয়া তীরবেগে ছুটিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। খুব ভাল ঘোড়া যেমন বেগে ছোটে, আমাদের মনে হইল বাঘ তাহার চেয়ে বেগে বনের বৃক্ষরাজি ভেদ করিয়া চলিয়া গেল।

সেদিন অবশ্য বাঘ শিকার হইল না। বাঘ দেখার আনন্দে (?) আমি ক্যামেরার শাটারটি টিপিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। যাহাই হউক, হাঁকোয়ারা ক্রমে আমাদের মাচার কাছ পর্য্যন্ত পৌঁছিলে আমরা নীচে নামিয়া আসিলাম। হাঁকোয়াদের ভিতর একজন একটি সদ্যোজাত হরিণ-শিশু পাইয়াছিল। তাহার মা ভয় পাইয়া প্রথমেই পলাইয়াছিল বটে, কিন্তু শাবকটি কয়েকজন চলন্ত মানুষকে দেখিতে পাইয়া তাহাদেরই সঙ্গ লইয়াছিল। তাহার চোখে ভয়ও ছিল না, বিস্ময়ও ছিল না। আমরা হরিণশিশুটিকে কোলে করিলাম, তাহাকে মাটিতে নামাইয়া দিলাম। সে নিঃশঙ্কচিত্তে আমাদের সঙ্গে ছুটিয়া চলিল।

তখন একজন গ্রামবাসী তাহাকে কোলে তুলিয়া কিছুদূরে গভীর বনে ছাড়িয়া ছুটিয়া পলাইয়া আসিল। তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল যে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই হরিণমাতাটি নিশ্চয়ই তাহার শিশুকে খুঁজিয়া পাইবে।

তরুণ-সঙ্গীত

বাজ্‌রে শিঙা বাজ্‌ এই রবে,
সবাই তরুণ এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত প্রগতি গৌরবে,
স্ত্রীলোক শুধুই ঘুমায়ে রয়।

বিড়াল, কুক্কুর, মহিষ ও মুরগি,
বানর, গর্দ্দভ, অন্য কব কি,
মীন, ব্যাঘ্র, মেষ, অসভ্য, হরিণ,
তারাও তরুণ, তারাও স্বাধীন,
দাসীত্ব-প্রয়াসী নহে কোন দিন,
স্ত্রীলোক শুধুই ঘুমায়ে রয়॥

ধিক্ হিন্দুকুলে, নারী-ধর্ম্ম ভুলে,
আত্ম-অভিমান ডুবায়ে সলিলে.
দিয়াছে সঁপিয়া পতি-পদ তলে,
সোনার দেহটি করিতে ছার।

হীন শক্তি যত হয়ে কৃতাঞ্জলি,
মস্তকে ধরিতে পতি-পদধূলি,
হ্যাদে অাথ্‌ধায় মহাকুতূহলী,
তরুণীর দল যত দুর্ব্বার॥

আর ঘুমায়ো না দেখ চক্ষু মেলি,
দেখ দেখ চেয়ে নগর-মণ্ডলী,
কিবা সুসজ্জিত, কিবা কুতূহলী,
বিবিধ তরুণ তরুণী লয়ে।

মনের আবেগে, স্নায়ুর পীড়নে,
অতৃপ্ত ক্ষুধায় ত্বরিত চরণে,
বসন অঞ্চল উড়ায়ে গগনে,
দেখহে ধাইছে অকুতোভয়ে॥

এসেছিলা যবে ই-বি-আর-ট্রেনে
উজলি গগন বসন-ভূষণে,
রণরঙ্গ মত্ত পূর্ব্বসখীগণ,
যখন তাহারা করেছিলা রণ,
হরেছিলা সব মরম-বেদন,
তখন তাহারা কজন ছিল?

আবার যখন জাহ্নবীর পুলে,
ও কূল হইতে এসেছে এ কূলে,
সাবিত্রী কমল শুভা দলে দলে,
অসংখ্য তরুণ প্রেরি' রসাতলে,
না ডুবিয়া মরি পূত গঙ্গাজলে,
তখন তাহারা কজন ছিল?

এখন তোরা যে শতকোটি তার!
নারীত্ব-বিকাশ কর্‌মা কোন্ ছার,

পারিস গ্রাসিতে হাসিতে হাসিতে,
শোফার অবাধ দেবর হইতে,
বিজিত পতিকে চরণে দলিতে,
বারেক জাগিয়া করিলে পণ।

তবে পুরুষের চরণের তলে,
কেন রে পড়িয়া থাকিস্ সকলে ?
কেন না ছিঁড়িয়া পরদা সবলে,
বাহির হইতে করিস্ মন ?

কোথা সে উৎকট-হিষ্টিরিয়া-সম
নারীবীরদর্প, লম্ফ, পরাক্রম,
করিত যাহাতে গৃহ গম্ গম্,
পাকশালা হতে শয়ন-সীমা ?

সকলি ত আছে সে সাহস কই ?
সঙ্কোচবিহীন দাম্ভিকতা কই ?
ঝটিকার সম সে প্রগতি কই !
কোথায় রে আজি সে নারী-গরিমা ?

এস গঙ্গাতীরে, বৃহৎ শহরে,
কেমিষ্ট ড্রাগিষ্ট তন্ন তন্ন করে,
বিপদ নিরোধ' প্রাণ পণ করে,
স্বকার্য্যসাধনে প্রস্তুত হও।

তবে সে পারিবে তরুণে লভিতে,
পুরুষের সহ সমকক্ষ হতে,
স্বাধীনতারূপ রতনে মণ্ডিতে
যে ক্রোড়ে এখন সন্তান বও ॥

ছিল বটে আগে বিবাহের বলে,
কার্য্যসিদ্ধি হ'ত এ মহীমণ্ডলে,
আপনি আসিয়া শ্বশুর-মহলে,
আদর করিত পুরুষগণ।

এখন সে সব ক'রো নাক আশ,
পতি-আরাধনে নারীত্ব-বিকাশ,
হবে না হবে না ছাড় গৃহপাশ,
আমরা তরুণ নহি তেমন ॥

[মূঢ় ব্যক্তিগণের তীব্র আক্রমণ ও আন্দোলনের ফলে তরুণ-বাঞ্ছিত নারীপ্রগতির বেগ ক্রমশঃ প্রতিহত হইতেছে এই আশঙ্কায় তরুণদিগের উদ্যোগে,মনুমেণ্টের পাদদেশে একটি বিরাট সভার আয়োজন হয়। সেই সভায় জনৈক তরুণশার্দ্দুল শিঙাহস্তে উচ্চকণ্ঠে উল্লিখিত সঙ্গীতদ্বারা প্রগতিবিহীন নারীসম্প্রদায়কে উদ্বুদ্ধ করেন।...পরে বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে, তরুণ সাহিত্যে নারীকে যে রূপ দেওয়া হইয়াছে সে রূপ তাঁহারা কখনও চাহেন নাই এবং উক্ত সভার সংবাদ সর্ব্বৈব মিথ্যা।]

স্ত্রী-কান্ত

সেদিন সকালে গায়ের ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে আস্তাবল হইতে যখন রেঙ্গুন সহরের পথে বাহির হইলাম, তখন অভয়া ও রোহিণীদার চিন্তাটাকেও ধূলার মত ঝাড়িয়া ফেলিতে বিলম্ব হইল না। গত রাত্রে যদিও উহারা একত্র অন্ধকার ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়াছিল এবং তাহার পর কখন ও কি উপায়ে বাহির হইয়াছিল তাহা জানি না—তজ্জন্য কোন অসৎ চিন্তা আমার মনে স্থান পায় নাই। আমি নর-নারীর এত রকমের উল্টাপাল্টা ব্যবস্থা দেখিয়াছি, এত অস্বাভাবিক অবস্থায় উভয়কে প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, শুধুমাত্র ইহা হইতেই কোন বিশেষ রূপ কল্পনা করিতে যাওয়াটা ধৃষ্টতা মাত্র। একবার গভীর রাত্রে এক ব্যক্তিকে প্রতিবেশীর ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতে দেখিয়া—চোর বলিয়া ধরিতে গিয়াছি, গিয়া দেখিয়াছি—সে চোর নহে, অন্য কেহ! আর একবার একজনকে অন্য কেহ সাব্যস্ত করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছি, কিন্তু পরে জানিয়াছি—সে চোর। এ পৃথিবীতে কে অন্য কেহ আর কে চোর—ইহা লইয়া তার পর আর মাথা ঘামাই নাই। দেখিয়াছি—সর্ব্ববিষয়ে উভয়ের আশ্চর্য্য রকম মিল আছে। দুইজনই মারকে ভয় করে, অন্ধকার ভালবাসে এবং দিনের বেলায় মন-মরা হইয়া থাকে। উভয়েই দুধটি খাইয়া মুখ মুছিয়া বসিয়া থাকে, চিনিবার উপায় থাকে না। সে কারণ, অভয়া এবং রোহিণীদার মধ্যে, একজন পুরুষ ও অপর জন নারী—ইহা ব্যতীত কোন ধারণাই উহাদের সম্বন্ধে পোষণ করিলাম না। স্বচ্ছন্দ চিত্তে রেঙ্গুনের পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

কিয়দ্দূর গিয়া দেখিলাম পথের ধারে একজন নাপিত চুল ছাঁটিতেছে। দাঁড়াইয়া কিয়ৎকাল দেখিলাম মন্দ ছাঁটিতেছে না, তবে জুল্‌পিটার উপর অতখানি নজর না থাকিলেও চলিত! অগ্র-পশ্চাৎ সবই মানান-সই করা দরকার, শুধু কি জুলপির চুল তিন ঘণ্টা ধরিয়া কাটিলেই হয়? অপর এক স্থানে একজন মুচির কার্য্য দেখিয়াও বিশেষ প্রীত হইলাম না। জুতার এক জায়গায় অনাবশ্যক কতকগুলি পেরেক ঠুকিল, অথচ আসল জায়গাটায় তেমন সুবিধা হইল না। মনটা বড় খুঁত খুঁত করিতে লাগিল, একবার ভাবিলাম—জুতাটা কাড়িয়া লইয়া দিই গোটাকয়েক কাঁটি ঠুকিয়া, পরক্ষণে ভাবিলাম—কাজ কি আমার, যাহার জুতা সেই যদি খুসী থাকে, কি লাভ আমার মুখ পোড়াইয়া? আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলাম দু'টি সহিস একটি অশ্বের গাত্র-মার্জ্জন করিতেছে,—ইহাদের কাজটি বেশ সুচারু বোধ হইল। অল্পকাল মধ্যেই পরিচর্য্যার গুণে অশ্বটির সমস্ত দেহ মসৃণ ও চিক্কণ হইয়া উঠিল। রং যেন ফাটিয়া পড়িতে লাগিল। কয়েক দিন হইতে আমার স্নান করা ঘটিয়া উঠে নাই, গায়ে বোধ করি এক ইঞ্চি ময়লা জমিয়াছিল, এই চাকচিক্যের আড়ম্বর দেখিয়া আমি অত্যন্ত অপ্রস্তুত বোধ করিলাম। একটু ঈর্ষার ভাবও যে মনে জাগিল না তাহা শপথ করিয়া বলিতে পারি না। পথচারী একান্ত অপরিচিত লোকেরও দৃষ্টিপাতে লজ্জায় যেন আধখানা হইয়া গেলাম। তাড়াতাড়ি স্থান ত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইব—এমন সময় দেখি, রাস্তার অপর পার্শ্ব হইতে একজন বাঙালী একরাশ তরিতরকারি একটি ময়লা গামছায় বাঁধিয়া ঘাম মুছিতে মুছিতে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। চোখাচোখি হইতেই সে কহিল,—"এই মোটটা পৌঁছে দিতে কত নিবি রে, কাছেই যেতে হবে, বেশী দূর নয়।"

—হাসিও পাইল, দুঃখও ধরিল! বেহারী জমীদারগণের বাগান-বাড়িতে মোসাহেবি করিয়া বিলাসিতার চূড়ান্ত করিয়াছি,—কিন্তু আজ অবস্থার গতিকে একজন আমাকে মুটের অধিক ভাবিতে পারিল না। নাই নাই করিতে করিতে সাপের বিষও উবিয়া যায়। মুটে ত পদে আছে, শেষে হয়ত অপর একজন রাস্তার উপরই ধরিয়া ফেলিয়া কালীঠাকুরের মানসিক করিয়া বসিবে। না, না, ভাল কথা নয়, কোমরে জড়ান পৈতার গোছাটি টানিয়া বাহির করিলাম, লোকটি তৎক্ষণাৎ রাস্তার উপর লম্বা হইয়া প্রণাম করিল, আমার পায়ের ধূলা লইয়া পেটে, মুখে, মাথায় মাখিল, কহিল,—

"মশয়, আপনারা?"

"রাঢ়ি-শ্রেণী।"

"মশয়ের নিবাস?"

প্রথমে মনে হইল বলি—যমালয়, চিন্তা করিয়া সত্য কথাই বলিলাম—"সাত পুরুষ আগে কোথায় ছিল, জানি না; বাকী ছ' পুরুষের বাস নেই কোথাও, এক রকম বেড়িয়েই বেড়ান হচ্ছে, উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ।"

"মশয়ের এখানে থাকা হয়েছে কোথা?"

"পরশু রাত্রে কেটেছে নাশ-চেরাই ঘরে, কাল কেটেছে এক আস্তাবলে—আজ যে কোথায় যাব ভেবে পাচ্ছি না, তবে জাহাজের উপর নন্দ মিস্ত্রী ব'লে একজন লোকের সঙ্গে আলাপ হ'য়েছিল—তার বাসার খোঁজটা পেলে,—"

লোকটি মুখ ভ্যাঙাইয়া কহিল,—"অমন সব শালা নিজেকে মিস্তিরি কব্লায়। হুঁ:, মিস্তিরী! সেবারে মর্কট সাহেব যখন খুসী হ'য়ে এক জোড়া পুরানো জুতা আমায় বখ্শিস দিয়ে বললে—হরিপদ, তুমি

ছাড়া ত আর মিস্তিরী হবার লোক দেখিনে, তখন মর্কট সাহেবের ক'টি জোড়া জুতো চুরি গেছল জানেন ?"

বলিলাম—"না।"

—"আরে মশয়, একটি শো। আরে একি জুতো চুরির কর্ম্ম,—গাধা পিটে ঘোড়া করতে পারি যে !"

"তা হ'লে নন্দ মিস্ত্রীকে আপনি চেনেন না ?"

"আরে মোলো যা ! তিন পুরুষ এই রঙ্গিনে বাস করছি, বলে কিনা চেনেন না। এখানকার ফড়িংটি সুদ্ধ জানি যে ! কোন নন্দ, নন্দ-টগরের নন্দ ?"

অকূলে কূল পাইয়া কহিলাম—"হাঁ হাঁ—সেই।"

"ও মশয়, টগর এখন খেয়ে দেয়ে ঘুমুচ্ছে, এমন সময় ডাকাডাকি ক'রে ওঠালে—পেটে পা তুলে দেবে।"

স্বীকার করিলাম তাহা সত্য, কিন্তু, এখন উপায় ?

হরিপদ কহিল, "মশয়, অমন তোফা দিদি-ঠাকুরণের হোটেল আছে, সেখানেই কেন যান না !"

কহিলাম—"তা ছাড়া আর উপায় কি।"

পথি-মধ্যে দিদি-ঠাকুরণের হোটেলের ইতিহাস শুনিলাম হরিপদর মুখে। স্বামীর সহিত বনি-বনাও না হওয়ায় ইনি মনের কষ্টে অল্প বয়সেই ভৃত্যের সহিত রেঙ্গুন চলিয়া আসেন। এখানে আসিয়া ভৃত্যটি হয় দা-ঠাকুর, মনিবটি হন দিদি-ঠাকুরণ। স্বামীর বাক্স ভাঙিয়া যে টাকা আনিয়াছিলেন, তাহাতেই হোটেলটির প্রতিষ্ঠা হয়। ইহার অল্প দিন পরে দিদি-ঠাকুরণের সহিত মন কসাকসি করিয়া দা-ঠাকুর আফিং খাইয়া প্রাণত্যাগ করে। তার পরই একোহহং বহুধা ভবামি। এখন হোটেলের সবাই দা-ঠাকুর। তা ছাড়া এক এক বাবুর হেপাজতে

এক একটি ঝি নিযুক্ত আছে, তাহারাই সব তদ্বির তদারক করিয়া থাকে,—দিদি-ঠাক্‌রুণের যে দিন যাহার উপর কৃপা হয়, সে দিন তাহার ঘরে আসিয়া হাসি-তামাসা করেন।

আমি যাইবামাত্র দিদি-ঠাক্‌রুণ আমাকে মহা সমাদরে গ্রহণ করিলেন, এবং একটি কাঁচা বয়সের ঝিকে ডাকিয়া আমাকে তাহার জিম্মা করিয়া দিয়া কহিলেন, "এখন যাই ভাই, তুমি খেয়ে দেয়ে জিরিয়ে নাও, সন্ধেবেলা তখন দেখা-শুনা হবে।"

ঝি আমাকে একটি ঘরে বসাইয়া আসন পাতিয়া দিয়া কহিল, আপনি আহ্নিকটা সেরে ফেলুন, আমি তেল গামছা নিয়ে আসছি।"

আমি কহিলাম—"তুমিও যেমন, এই অবেলায় আবার আহ্নিক, যা হয় চাট্টি-খানি এখন—"

সে মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল—"তাই আবার হয় নাকি গো ঠাকুর! দু'টো মন্তর ততখণ আউড়ে নাও, আমি এসেই তোমার চানের যোগাড় করছি।"

যাক, আপনি হইতে তুমিতে নামিলাম, এইবার তুই বলিয়া না ডাকিলেই বাঁচি! এইরূপ হারে ঘনিষ্ঠতার মাত্রা হু হু করিয়া বাড়িয়া চলিলে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই কোথায় গিয়া পৌছিব—তাহা কল্পনা করিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। আসনে বসিয়া বিড় বিড় করিয়া বকিতে লাগিলাম, ঝি খুসী-মনে প্রস্থান করিল, পেটের মধ্যে ইঁদুর চরিতে লাগিল।

(৫)

সেদিন হাতে কোন কাজ ছিল না। সারা সকালটি বসিয়া বসিয়া একুশ কলিকা তামাক সাজিয়াছি, একষট্টিবার হাই তুলিয়াছি ও

একাত্তরটি মাছি মারিয়াছি। ঝি মাছ কুটিতেছিল, কি খেয়াল হইল, পিছন হইতে তাহার চুল খুলিয়া দিলাম। সে আশবঁটি লইয়া তাড়া করিয়া আসিল, কহিল—নিশ্চয় আমার নাক কাটিয়া দিবে। পথে বাহির হইয়া পড়িলাম।

বাজারের নিকট আসিয়া হঠাৎ রোহিণীদার সঙ্গে দেখা। একঝুড়ি আনাজ, তরকারী এবং একটি পাঁঠার ঠ্যাং কাপড়ে বাঁধিয়া রোহিণীদা হন হন করিয়া চলিয়াছে। কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, পরনের কাপড় এক জায়গায় ছিঁড়িয়া 'ব'এর আকার ধারণ করিয়াছে, জামার তিন জায়গায় তিনটি 'দ' হইয়াছে আর জুতাটা ত অক্ষরে অক্ষরে ভরিয়া গিয়াছে। একস্থানে রাস্তায় ভিড় ছিল, রোহিণীদা লাফাইয়া পাশের বেনে মশলার দোকানে উঠিয়া পড়িল। উদ্দেশ্য অবশ্য পাশ কাটাইয়া বাহির হইয়া যাওয়া, কিন্তু একটি ডালের চাঙারিতে পদক্ষেপ করায় দোকানদার সক্রোধে তাহাকে গলা ধাক্কা দিল। রোহিণীদা মোট-ঘাট সমেত আবার পড়িল রাস্তার পাশে এক মেছুনির মাছের ঝুড়িতে। সে তাহার জামার ফাঁকটিতে আঙুল গলাইয়া আগা-গোড়া ফর ফর করিয়া ছিঁড়িয়া দিল। রোহিণীদাকে মাছের ঝুড়ি হইতে উঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম ব্যাপারখানা কি, অন্নপ্রাশন নাকি? রোহিণীদা পরিতৃপ্ত মুখে হাসিয়া বলিল, "না ভাই, তবে পেটে দুটো খেতে হবে ত? তা না হলে রোজগার আর কার জন্যে বল না! অভাগাটাও খেটে খেটে চড়াই পাখীটির মত হ'য়ে গেল। এই সব নিজের হাতে রাঁধবে, আমায় দেবে, নিজে খাবে। কোন কথা কানে তুলবে না। যাবেন একবার শ্রীকান্তবাবু? বুঝিয়ে সুজিয়ে একটা ব্যবস্থা করে আসবেন?"—বলিতে বলিতে রোহিণী-দা মোট নামাইয়া একটা কাগজে বাসার ঠিকানাটা লিখিয়া

আমার হাতে দিল, এবং পরক্ষণেই বস্তা ঘাড়ে করিয়া দৌড় দিল। কেন জানি না, রোহিণীদার পথের পানে চাহিয়া অশ্রুজলে আমার দুই চক্ষু ঝাপ্‌সা হইয়া গেল। চাদরের খুঁটে চোখ মুছিতেছি ও মনে মনে বলিতেছি, এই ভালবাসাটার মত এত বড় শক্তি, এত বড় শিক্ষক আর সংসারে নাই। ইহা পারে এমন কাজও বুঝি নাই, নচেৎ রোহিণী-দা পাঁঠার ঠ্যাং লইয়া ডালের উপর পড়িত না, আমিও সারা সকাল ধরিয়া মাছি মারিয়া বেড়াইতাম না! চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল, পশ্চাতে সাইকেলের ক্রিং শব্দ, অপ্রকাশ্য এবং অবাধ্য স্থানে দারুণ অগ্নিদাহ ও তৎসহ পতন, যদিও মূর্চ্ছা নহে। ফলতঃ নীচে আমি, আমার উপর সাইকেল, সাইকেলের উপর একজন সওয়া সাতফুট লম্বা শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তি। তিনি প্রথমে একটা শিস দিলেন, পকেট হইতে পাইপটা বাহির করিয়া মুখে লাগাইলেন, ধীরে ধীরে খাড়া হইয়া দাঁড়াইলেন।

তারপর সাইকেলটা টানিয়া তুলিলেন এবং সর্ব্বশেষ আমাকে ধরিয়া দাঁড় করাইলেন। লুকাস ল্যাম্পের ছ্যাঁকায় জ্বলিয়া যাইতেছিলাম,—এবারে আর চোখের জল বাধা মানিল না—ভ্যাঁ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম।

বলিলাম—"সাহেব আমার করলে কি।"

"—Sorry Babu, tell me how can I help you?"

চক্ষু মুছিয়া বলিলাম, "সাহেব, একটা চাকরি—"

All right, see me at my office to-morrow,"

একটি ছোট কার্ড হাতে দিয়া সাহেব সাইকেলে উঠিলেন। আমিও ফোস্কার উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে বাসায় ফিরিলাম।

সে দিন রাত্রে ব্যথার স্থানগুলিতে তেল গরম করিয়া দিবার

প্রাক্কালে ঝি অভিমান ভরে কহিল—"কেন তুমি অমন করে' রাস্তা চল বল দেখি? আজ সাইকেল, কাল গরুর গাড়ী—এমনি করে রোজ তুমি একটা কিছু চাপা পড়, আর আমিও তেলের বাটি নিয়ে তোমার পিছনে পিছনে ঘুরি! আমার দিব্যি রইল, এবার থেকে চোখ চেয়ে পথ চলবে, মাইরি; না হয় কাল থেকে আর তোমায় আমি পথে বেরুতে দেব না, ঘরে শেকল তুলে রাখব, একবার যা সেই নাইতে খেতে বার করব, বাস্, আর মাথা খুঁড়ে মরে গেলেও না, কেমন? ঠিক হবে, বেশ জব্দ!"—বলিয়াই খিল খিল করিয়া হাসি।

আমি তাহার থাঁদা নাকটি ধরিয়া নাড়িয়া দিয়া কহিলাম—"পাগলি, চাপা-পড়াটাই দেখলি, চাকরিটার কথা একবার ভেবে দেখলি না?"

আমার মুখের উপর নত হইয়া সে কহিল, "তাহ'লে আমিও বাটি নিয়ে তাড়া না করলে ত তোমার চাকরি হ'ত না!"

আমার কি বখশিস দেবে বল?"

উঃ, মেয়েটা কি দুষ্ট, পারিয়া উঠা দায়! আদর করিয়া তাহার চুল টানিয়া কহিলাম—"বখশিস কিরে পাগলি—কিন্তু আর বলা হইল না, সে ততক্ষণে যেন কাদার মত ঢলিয়া পড়িয়াছে,—তাহার কি মৃগীরোগ ছিল?

(৬)

গাড়ীভাড়া করিয়া অভয়াকে চাকরীর খবরটা দিতে গেলাম। ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখি ঘরের মেঝের উপর এক গ্লাস জল, একটি রেকাবিতে খানকয়েক ফুল্‌কা লুচি ও গুটিকয়েক পটোল ভাজা। লুচির একপার্শ্বে রোহিণীদা অপর পার্শ্বে অভয়া মুখে কাপড় চাপা দিয়া বসিয়া

আছে। দ্বারের নিকট থমকিয়া দাঁড়াইলাম, শুনিলাম, রোহিণীদা ভাঙা গলায় কহিতেছে—

"তোমার যদি মাথাই ধরেছিল, লুচি ভাজতে গেলে কেন?"

অভয়া ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কহিল, "ক'খানি ত লুচি, এ না খেলে তুমি যুঝবে কিসে?"

রোহিণীদা কান্নার সুরে কহিল "আমি কি বলেছি সে কথা?"

"আহা, তুমি বলবে কেন—"

"তবে? তুমি কি জানতে না যে আজ আমার পেট খারাপ করেছে, তার উপর কি লুচি খেলে আমি বাঁচব?"

"তুমিই কি বলেছ সে কথা?"

"ওঃ, তোমার মনে মনে জিলিপির প্যাঁচ, বলিনি ব'লেই খেতে হবে, নয়?"

"নাই বা খেলে, বললুম ত মিছরির সরবৎ করে আনছি।

"হ্যাঁ, মিছরির সরবৎ করে আনবে! আমার হয়েছে যেচে মান আর কেঁদে সোহাগ—মাইরি বলচি, এবার আমি আত্মঘাতী হয়ে মরব।"

"তুমি কেন মরবে, কিসের দুঃখ তোমার, ভাত ছড়ালে আবার কাকের অভাব! আমায় বরঞ্চ একগাছা দড়ি এনে দিয়ো—"

"শুনে রাখুন আপনারা"—রোহিণীদা জানালার দিকে তাকাইয়া কল্পিত শ্রোতৃবৃন্দের উদ্দেশ্যে কহিল—"একবার শুনে রাখুন আপনারা, ..৫ ডিগ্রী জ্বর, পেটজোড়া পিলে,—কিছু গ্রাহ্য করিনি, ধুঁকতে ধুঁকতে ..ব ছেড়ে বেরিয়েছি—"

"কেন বেরিয়েছিলে? আমি ত ও পাড়ার রমজান মিস্ত্রিকে ব'লে ক'য়ে রাজি করিয়েছিলুম—"

রোহিণীদার সহ্যের সীমা অতিক্রম করিয়াছিল, অবরুদ্ধ কান্নার ভারে মেঝের উপর চিৎ হইয়া পড়িয়া গোঁ গোঁ শব্দ করিতে লাগিল। মাঝে কেবল একবার ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল, কহিল, কেন তাহার এখনই কলেরা হইতেছে না, কেন কেউটে সাপ তাহাকে ভুলিয়া আছে, ইত্যাদি।

লুচি ও পটোল পরস্পর নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল।

আমি বজ্রাহতের ন্যায় কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া নীরবে প্রস্থান করিলাম।

(৭)

সেদিন বড়সাহেবের কাছে একটি ফাইল সই করিতে গিয়াছি, সাহেব আমার হাঁটুতে আড়াইবার জুতার ঠোকর দিয়া বলিলেন, "শ্রীকান্ত বাবু, আজ হতে আড়াইগুণ মাহিনা বেশী পাইবে এবং ঐ টেবিলে বসিয়া কাজ করিবে। হাড়গিলা পাখীর মত টেবিল পরিত্যাগ করিয়া একেবারে ময়ূর সদৃশ বনাতমোড়া টেবিলের উপর চড়িয়া বসিলাম। চেহারাটাও ত কতকটা কার্ত্তিকের মতোই ছিল, সাহেব-ব্যাটা এতদিনে ধরিয়া ফেলিয়াছে দেখিতেছি।

কয়েক দিনের মধ্যেই অফিসের বড়বাবু হইয়া বসিলাম। বড়-সাহেবও মুঠার মধ্যে আসিল। আমাদের ক্যাশিয়ার নিবারণ বাবুর একটি বছর-বারো বয়সের টুকটুকে মেয়ে স্কুলের ফেরত, বাপের সহিত বাড়ী ফিরিবার জন্য প্রায়ই আফিসে আসিত। একদিন অন্যমনস্ক হইয়া তাহার গাল টিপিয়া দিয়াছিলাম। তাহাতে নিবারণ বাবু চটিয়া বড় সাহেবের কাছে নালিশ করিয়া বসিলেন। বড়সাহেব ব্যাপারটি

শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন—স্ত্রীকান্ত বাবু এমন আর কি অপরাধ করিয়াছেন! তোমার মেয়ের টুলটুলে গাল দুটি দেখিলে আমারই ত —ইত্যাদি।

পরদিন নিবারণ বাবুর ক্যাশ হইতে পাঁচটি শ' টাকা চুরি গেল— এবং তাঁহার চাকরিও খতম হইল।

ইহারই কিছুদিন পরে বড়সাহেবের চাপরাশি আমার টেবিলে একটি ফাইল রাখিয়া গেল,—পড়িয়া দেখিলাম—ব্যাপারটি এই:— আমাদের প্রোম অফিসের একজন কেরানী কাঠ চুরি করিয়া ধরা পড়িয়া যায়, সেই লইয়া সেখানকার অফিসের সাহেবের সহিত তর্কাতর্কি হওয়ায় কেরানীটি সাহেবের নাকে ঘুসি মারিয়া তাঁহার নাক ভাঙিয়া দিয়াছে। কেস্‌টি আমাকেই নিষ্পত্তি করিবার জন্য বড়সাহেব আদেশ দিয়াছেন। কেরানীর নাম দেখিয়াই বুঝিলাম ইনি আমাদের অভয়ার স্বামী। ইহার পনের মিনিটের মধ্যেই তিনি সশরীরে হাজির হইলেন। দেখিয়া গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। যেন আফ্রিকার জঙ্গল হইতে একটা গরিলা এই মাত্র বাহির হইয়া আসিল। সর্ব্বাঙ্গে লোম, গায়ের রং বেজায় কালো, এক মুখ দাড়ি, বাঘের মত নখ, কুমীরের মত চো এবং গণ্ডারের মত চামড়া। পান চিবাইতেছে কি ঘাস খাইতেছে বুঝা যায় না—সর্ব্বাঙ্গ হইতে আলকাতরার মত ঘাম ঝরিতেছে, শরীরে এমন একটা দুর্গন্ধ যে কাছে আসিলেই গায়ে ফিনাইল ঢালিয়া দিতে ইচ্ছা করে। একেবারে টিপিক্যাল ভিলেন, মনে করিলাম অভয়া রোহিণী-প্রীতির যথেষ্ট সুযুক্তি আছে বটে। এই রকম যাহার স্বামী সে নারী পরপুরুষাক্ত হয় না—তাহা কল্পনারও অতীত। বস্তুতঃ অভয়া ও রোহিণীদার প্রেম সার্থক করিয়া তুলিবার জন্যই তাহাদের বিধাতা এই লোকটাকে তাঁহার মনের মত কদাকার করিয়া গ

য়াছেন। নচেৎ হয়ত অভয়া স্বামীকে ভালবাসিয়াই ফেলিত, াহিণীদাও বিবাহ করিয়া সংসারী হইত। কিন্তু সে কথা ভাবিয়া ভ কি? যদি মাসীর গোঁফ বাহির হইত, মামা হইত!

লোকটিকে বসিতে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, সত্যই সে অপরাধী না। প্রত্যুত্তরে সে যত বকিল, তাহার অধিক পানের পিক কাপড় মায় ও টেবিলের কাগজপত্রের উপর ছড়াইল, অবশেষে শূন্যে ঘুসী কাইয়া বলিল, সে ছোট সাহেবের নাক ত ভাঙিয়াছেই, প্রয়োজন লে বড় সাহেবের কান কামড়াইতেও প্রস্তুত আছে।

আমি একটি স্লিপে অভয়ার ঠিকানা লিখিয়া তাহার হাতে দিয়া ইলাম,—"যদি এর কাছ থেকে লিখিয়ে আনতে পার ত তোমার করী বজায় থাকবে, লোকটি কিছুক্ষণ অবাক হইয়া আমার মুখের তি চাহিয়া রহিল, তার পর ধীরে ধীরে কহিল—"সে এখানে এল াথেকে?"

আমি কহিলাম সে তার রোহিণীদার সঙ্গে এসেছে।"

লোকটি জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল—"দেখে নেব, আমি দেখে নেব— াতে সাধ মিটল না—আবার নচ্ছারটাকে সঙ্গে করে এখানে আসা ছে,—"এই বলিয়া সে টেবিলের উপর প্রচণ্ড ঘুসি মারিয়া ষাঁড়ের গর্জ্জন ছাড়িতে ছাড়িতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। ভাবিলাম াদ গেল!

(৭)

ইহারই দিন সাতেক পরের কথা। অভয়ার স্বামীর একখানি পত্র লাম। সে লিখিয়াছে,—আমার সম্মান রক্ষা করিতে গিয়া তাঁহার

মান সম্ভ্রম সকলই ডুবিয়াছে। অভয়াকে সে লইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহার বাসায় যাইয়া অবধি অভয়া কোন বিষয়ে তাহার বশ্যতা স্বীকার করে নাই। সে যদি তাহাকে উত্তর দিকে যাইতে বলিয়াছে ত অভয়া দক্ষিণ দিকে গিয়াছে, পান আনিতে বলিলে জল আনিয়াছে, ঘর ঝাঁটাইতে বলিলে কাপড় কাচিয়াছে। খাইতে বলিলে শুইয়াছে, শুইতে বলিলে খাইয়াছে। ইহাও সে সহিতেছিল। অবশেষে একদিন শেষ রাত্রে অভয়ার সেই গুণধর ভ্রাতাটি সিঁদ কাটিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। ঘুম ভাঙিয়া ফিসফাস আওয়াজ শুনিতে পাইয়া সে আলো জ্বালিয়া দেখিতে পায় যে তক্তাপোষের তলায় আগন্তুকটি একটি শালপাতার ঠোঙা হাতে করিয়া অভয়াকে আচার খাওয়াইতেছে। লণ্ঠনের আলোকে উভয়েই ভিজা বিড়ালের মত তাকাইয়া থাকে, জিজ্ঞাসা করিলে অভয়া উত্তর দেয় যে তাহার অরুচির জন্য রোহিণীদাকে আচার আনিতে বলিয়াছিল, দরজা বন্ধ, কাজেই দেওয়ালে গর্ত্ত করিয়া ঘরে ঢুকিতে হইয়াছে, ইত্যাদি। স্বামী আমায় জিজ্ঞাসা করিয়াছে, এই অবস্থায় পড়িলে, আমি কি করিতাম! সে যাহা করিয়াছে, তাহা সে জানাইয়াছে। উভয়কে টানিয়া আনিয়া—তাহাদের পৃষ্ঠে তাহার জুতাজোড়াটি যতক্ষণ না ছিঁড়িয়াছে, ততক্ষণ ছাড়ে নাই। ছাড়িবার সময় রোহিণীদার পৃষ্ঠে ও অভয়ার উদরে এক একটি লাথি মারিয়া—আচারের ঠোঙা সমেত তাহাদের পথে বাহির করিয়া দিয়াছে। জানিতে চাহিয়াছে—সে ইহাতে কোন অপরাধ করিয়াছে কি না!

ব্যাপারটির সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্য তখনই রোহিণীদার বাসার উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িলাম। গিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে বুদ্ধি সুদ্ধি সব লোপ পাইল। রোহিণীদার পৃষ্ঠের আঘাত refracted

হইয়া তাঁহার উদরস্থ প্লীহা ফাটিয়াছে, এবং অভয়ার একটি শিশু-সন্তান অকালেই, অর্থাৎ ছয়মাসে—ভূমিষ্ঠ হইয়াছে।

যে সকল দৃশ্যে মানুষ পৌরুষ হিতাহিত জ্ঞান হারাইয়া ফেলে, ইহাও তাহারই একটা। আমার কঠিন মুখের প্রতি চাহিয়া অভয়া চক্ষের নিমেষে সমস্ত বুঝিয়া ফেলিল এবং একটুখানি হাসিয়া কহিল—"স্ত্রীকান্ত বাবু, এ আমার সতীধর্ম্মের একটুখানি পুরস্কার!"…বলিয়া সে পেট খুলিয়া সুস্পষ্ট জুতার দাগ দেখাইল। বলিল, আরো এমন অনেক আছে, যাহা সে আপাততঃ আমাকে দেখাইতে পারিল না।

আমি কহিলাম—"কিন্তু—"

সে বাধা দিয়া বলিল—"এই কিন্তুটারই ত আজ আপনাকে বিচার করতে হবে, স্ত্রীকান্ত বাবু! আজ রোহিণী বাবু (বাবু বলিতে এই প্রথম শুনিলাম) এবং আমি দু'জনেই আপনার আসামী। যদি অপরাধী হই, আমরা আবার আপনারও জুতার সমুখে পিট খুলে দাঁড়াব—"

আমি ব্যস্ত হইয়া কহিলাম—"না না, না, সে কথা বল্‌ছ কেন—"

—"শুনুন স্ত্রীকান্ত বাবু, কিন্তু, কেন, নচেৎ, তথাপি, এসব আজ বাদ দিতে হবে। বিবাহের বৈদিক মন্ত্রের যত জোরই থাক, কিন্তু পেটের পিলে অথবা ছেলে—কোনওটা ফাটাবার অধিকার সে দেয় কি না, তাই আজ জানতে চাই। আজ না হয় আমার ছেলে বেঁচে গেছে, কিন্তু—"

আমি স্মরণ করাইয়া দিয়া কহিলাম—"আবার কিন্তু?"

অভয়া নাক মলিয়া কহিল—"ঘাট হয়েছে। ওগুলো জন্মার্জ্জিত সংস্কার স্ত্রীকান্ত বাবু, তাই ছাড়তে পারি না। কিন্তু, যাক্ কিন্তুর কথা বাদ দিন। শুধু একদিন আমাকে বিয়ের মন্ত্র বলিয়ে নেওয়া হ'য়েছিল.

সেইটেই আমার জীবনে একমাত্র সত্য, আর সবই কি মিথ্যা! আমি হিন্দুর ঘরে জন্মেচি বলেই কি আমার সকল দিক বন্ধ হ'য়ে গেছে স্ত্রীকান্ত বাবু, আমার কি মা হবারও অধিকার নেই?"

অত্যন্ত কঠিন প্রশ্ন। বলিলাম—"রোহিণীদার পেটে ফোমেণ্ট করলে হয় না?"

অভয়া বাধা দিয়া কহিল—"রোহিণীদাদা নয়,—রোহিণী বাবু।"

"বেশ, বেশ, তাই না হয় হ'ল—পেটটা ত ঠিকই আছে গো, সেটা ত আর বদলায় নি। তাকেই ফোমেণ্ট করবার কথা বলচি।"

অভয়া অন্যমনস্কভাবে কহিল—"তা করতে পারেন, তবে শীঘ্রই বাংলা মুলুকটা বর্ম্মার মত মুসলমানে ছেয়ে যাবে। কেন জানেন? তারা আমাদের ফেলতে পারবে না, আদর করে বুকে স্থান দেবে, আচ্ছা স্ত্রীকান্ত বাবু, আমরা যদি মুসলমান হই, আসবেন আমাদের বাড়ীতে?"

উত্তর দিতে কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিতে হইল। অভয়া মনে মনে বলিতেছিল—আজ একজন বড় মোল্লা সাহেব এখানে এসেছেন, পয়গম্বর বলে' শুন্‌ছি,—রোহিণীদার দিকে ফিরিয়া কহিল—হ্যাঁগা রাখবে আজ একবার ছেলেটাকে, তাহ'লে মসজিদে ওঁর বক্তৃতাটা শুনে আসতাম। বড্ড নামী লোক গো, তোমাদের সমাজের আসল গলদের জায়গাগুলি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্চেন।"

প্রত্যুত্তরে রোহিণীদা চিঁ চিঁ করিয়া কি বলিল সঠিক বুঝা গেল না। অভয়া আমার দিকে ফিরিয়া দৃপ্ত কণ্ঠে কহিল,—"আমার গর্ভের সন্তান সত্যের মধ্যে জন্মেছে, স্ত্রীকান্ত বাবু, সত্যই তার সম্বল। রোহিণী বাবু তার বাবাই হোন, আর মামাই হোন, তাতে কিছু এসে যাবে না। ও শুধু কথার ধাঁধাঁ। ভুল কথার ভিতর দিয়া মানুষের বুদ্ধির চিন্তার

ও জ্ঞানের ধারা যে কত বড় ভুল পথে চালনা করা যায়, সে কি আপনি জানেন না ?"

কহিলাম—"জানি।"

—"তবে ?"

মনে মনে বলিলাম—তবে আমার পিণ্ডি। কারণ বাহ্যতঃ তাহার কথার উত্তর দিবার মত বুদ্ধি অথবা চিন্তা-শক্তি আমার ছিল না। এক এক সময় তাই ভাবিতাম,—ভগবান কি এই মাথাটা শুধু পাঁকেই ভর্ত্তি করিয়াছেন ? তাহাই যদি করিলেন, তবে তিনি আমায় নারিকেল গাছ করিলেন না কেন ? কত ফলিতাম, কত দুলিতাম! কত হুঁকা হইতাম,—কত ঝাঁটা হইতাম! কত বাড়ীর কত ঝি-দের স্পর্শ-সুখ পাইতাম, তাহারা কেমন আশ্চর্য্য ভঙ্গিতে আমার মাথাটা ধরিত!

অভয়া আমার চিন্তাক্লিষ্ট মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল,—"আর যাই করুন শ্রীকান্ত বাবু, কখনো দুটো মন্ত্র-পড়ার জোরে কারও পেটের উপর পতিত্ব ফলাতে যাবেন না—বিশেষ করে যখন তার মধ্যে সত্যের বীজ—"

বাধা দিয়া কহিলাম—"পতিত্ব কারও উপর করবার দুঃসাহস আমার হবে না অভয়া! পতিত্বের উপকূলেই এ জীবনের বাকী ক'টা দিন লুকোচুরি করে' কাটিয়ে দেব।"

অভয়ার ছেলেটা প্যাক প্যাক শব্দ করিয়া উঠিল। অভয়া তাহাকে চুমা খাইয়া কহিল—"হ'য়ে অবধি হাঁসের মত ডাকছে। আহা, কোথায় বাছার লেগেছে কে জানে, হ্যাগা তুমি ত দেখেছিলে, কোন দিক চেপে লাথিটা মেরেছিল—"

রোহিণীদা বিকৃত কণ্ঠে কহিল, "আমার পেটের মধ্যে নিশ্চয় শেয়াল ঢুকেছে, নচেৎ এমন আঁচড়াচ্ছে কিসে ?"

দেখিয়া শুনিয়া আমারও চিত্তে ছাগ-যুদ্ধ সুরু হইল! সহজাত সংস্কার, নিষিদ্ধ প্রেম, সেই প্রেমের বংশবৃদ্ধি,—এক একটি দুরন্ত পাঁঠার আকার ধারণ করিয়া আমার মনের খোঁয়াড়ে মারাত্মক রকম হুটপাটি আরম্ভ করিল। অভয়া ততক্ষণে তাহার সন্তানটিকে আমার কোলে ছাড়িয়া দিয়া রোহিণীদার পেটে কান দিয়া শুনিতেছিল—কোন আওয়াজ পাওয়া যায় কি না। ছেলেটিকে নাড়াচাড়া করিয়া দেখি আরে মোলো যা, এটা যে একটা শিখণ্ডি! বিরক্ত হইয়া তাহাকে বাঁদর বাচ্চার মত তাহার মায়ের পৃষ্ঠে ছাড়িয়া দিয়া প্রস্থান করিলাম।

(ক্রমশঃ)

—শ্রীপূর্ণ গ্রাস।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা

অকরুণ একজন বিখ্যাত শারীর-তত্ত্ববিদ,—দীর্ঘ এবং ঋজু তার দেহ। প্যাণ্টের উভয় পকেটে হাত রেখে সে তার পাঠাগারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে,—তার সমুখে জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকিয়ে দুই ব্যক্তি,—একজন সুবিখ্যাত জীব-তত্ত্ববিদ, শ্রীঅচপল, আর একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবচ্ছেদবিদ, শ্রীঅচঞ্চল। অকরুণের মাথার চুল ছোট করে কাটা —গোঁফদাড়ি পরিষ্কার করে কামানো, মুখের ভাব দৃঢ়ত্ব-ব্যঞ্জক,—একটা ভীষণ সঙ্কল্পের ভাব ফুটে উঠেছে তার মুখে। উভয় শ্রোতার প্রতি ঈষৎ নত হ'য়ে প্রশান্ত স্বরে, অথচ প্রত্যেক কথাটির উপর জোর দিয়ে সে বললে,—

"আমি আজ সন্ধ্যায় তোমাদের ডেকে এনেছি, একটা সাংঘাতিক এবং রোমাঞ্চকর পরীক্ষা দেখবার জন্যে। সাধারণ লোকে নিশ্চয়ই একাজ করতে ভয় পাবে, কিন্তু এর ফলাফলের উপর সমগ্র মানব-জাতির কল্যাণ নির্ভর করছে। তোমরা আমার পরীক্ষাগারে আসবে কি ?"

মনের মধ্যে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করলেও তারা নীরবে অকরুণের পিছনে পিছনে এল। যদি জগতে অকরুণের কোন বন্ধু থাকে ত তারা এই দু'জন! অকরুণ রাত্রি দশটায় তাদের ডাকিয়ে এনেছে, এমন আকস্মিক ও রহস্যজনক তার আহ্বান যে, হাজার কাজ ফেলেও তারা আসতে বাধ্য হয়েছে। তার অসাধারণ প্রতিভার দুঃসাহস তাদিকে সদাই বিচলিত করে তুলত। গবেষণার ব্যাপারে তার দ্বিধাহীন কার্য্য-কলাপ জনসাধারণের ঘোরতর আপত্তির কারণ হয়েছে, এমন কি

অনেকবার কেলেঙ্কারিও হ'য়ে গেছে এই নিয়ে। এবারে তার কথাবার্ত্তা থেকে একটা অতিরিক্ত রকমের অস্বাভাবিক উদ্দেশ্যের পরিচয় পাওয়া গেল।

সুবৃহৎ পরীক্ষাগারের দরজা জানালা সব বন্ধ। উপর থেকে শক্তিমান বৈদ্যুতিক আলোকের ঝাড় শুভ্র জ্যোতি বিকীরণ করছে। এখানকার অদ্ভুত যন্ত্রপাতি এদের কাছে সুপরিচিত। তারই মধ্যস্থলে তারা আশ্চর্য্য হয়ে দেখলে—একটি প্রকাণ্ড স্নানাধার। তাতে গরম জল ভর্ত্তি করা হয়েছে এইমাত্র, জল থেকে এখনও ধোঁয়া উঠছে। একধারে খাকি হাফ-প্যাণ্ট এবং ঢিলা শার্ট পরিহিত একজনলোক বসে আছে। তার মুখচোখ পাণ্ডুর, হাত-পা কাঁপছে, দু'জোড়া হাত-কড়া তার হাতে ও পায়ে বাঁধা। তারই ঠিক পিছনে, সতর্ক দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে আছে একজন বলিষ্ঠ-দেহ গুর্খা চাকর,—অকরুণের কাছে বহুদিন কাজ করছে, অগাধ তার প্রভু-ভক্তি।

অকরুণ বললে, "এই লোকটা—যাকে তোমরা টুলের উপর হাতপা বাঁধা অবস্থায় দেখছ, এ কাল রাত্রে আমায় খুন করে আমার মনি-ব্যাগ নিয়ে পালাবার চেষ্টা করেছিল। দেখ এ আমার কি করেছে!"

অকরুণ তার শার্টের বোতাম খুলে দেখালে তার পাঁজরের উপর একটা গভীর ক্ষত।

—"কিন্তু আমি এর চোয়ালে এক ঘুঁসি মেরে তখনই একে ধরাশায়ী করেছিলাম। এ ব্যাপারটি আমার ঘরের সামনেই ঘটেছিল, আমার গুর্খা চাকরকে ডেকে একে ঘরের মধ্যে তুলে এনেছি। দেখলাম—এ সেই বিখ্যাত গুণ্ডা এবং খুনী আসামী—রঘুনাথ! দু'তিন বার এর ফাঁসির হুকুম হ'য়ে গেছে, কিন্তু প্রতিবারই এ জেল থেকে পালিয়েছে,

পুলিস একে ধরতে পারে নি। এখন আমার কি কর্ত্তব্য নয় একে ধরিয়ে দিয়ে ফাঁসিকাঠে ঝুলান ?”

একটা গভীর নীরবতার মধ্যে কথাগুলি উচ্চারিত হ'ল। আসামী একবার কেঁপে উঠল—অকরুণ বলে যেতে লাগল—

“কিন্তু আমার আর একটা উদ্দেশ্য আছে। তোমরা জান, প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীদের জীবন্ত দেহ আমি বহুবার কর্তৃপক্ষের কাছে ভিক্ষা চেয়েছি, আমার বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে লাগাবার জন্যে তাতে মানব-জাতির প্রভূত কল্যাণই হ'তে পারত, কিন্তু এখনও দেশ এমন অন্ধ সংস্কারে আচ্ছন্ন যে আমি অরণ্যেই রোদন করেছি, আমার কথায় তাঁরা কর্ণপাত করেন নি। এখন ভাগ্য-বিধাতা হঠাৎ আমাকে রঘুনাথের জীবন-মৃত্যুর ক্ষমতা দিয়েছেন, আমি তার সঙ্গে একটা চুক্তি করেছি। আমি তাকে পুলিসের হাতে দেব না, আমার দেহের উপর তার আক্রমণও আমি ক্ষমা করব ; আমি তাকে মুক্তি দেব ; শুধু তাই নয়, আমি তাকে দশ হাজার টাকা বখসিস দিয়ে দেশান্তরে পাঠিয়ে দেব,—যদি সে তার দেহের উপর আমাকে একটা পরীক্ষা করতে দেয়। খুব সম্ভবতঃ এতে তার মৃত্যু ঘটবে না।”

অচঞ্চল অভিভূত হ'য়ে বললে,—“কি করতে চাও তুমি ?”

অকরুণ বললে,—“আমি একটা দ্রব্য আবিষ্কার করেছি, যা আমার বিশ্বাস, সম্পূর্ণরূপে মানুষের দেহে রক্তের কাজ করতে পারবে। বাস্তবি এটা কৃত্রিম রক্তবিশেষ, এবং আমি আশা করছি, নরদেহের শোণি অপেক্ষা এর প্রাণশক্তি অনেকগুণেই বেশী হবে।

আশা করছি বললাম—তার কারণ যতক্ষণ না ঠিকভাবে একবা পরীক্ষা করে দেখছি—ততক্ষণ নিশ্চয় করে বলতে পারি না। সেইখানে রঘুনাথের প্রয়োজন॥ এই স্নান-পাত্রের মধ্যে আমি তার হাতে

একটা শিরা কেটে দেব। যখন তার শরীর থেকে সমস্ত রক্ত বেরিয়ে যাবে, অর্থাৎ তার মৃত্যুর কয়েকমিনিট পরে, আমি আমার আবিষ্কৃত দ্রব্যটি তার দেহের মধ্যে চালিয়ে দেব। তাতেই তার দেহে পুনর্ব্বার উষ্ণ রক্ত ও নব-জীবন ফিরে আসবে।"

অচপল বিস্মিত কণ্ঠে বললে,—"ঔষধের জগতে কি অভিনব আবিষ্কার তুমি করেছ অকরুণ!"

"হাঁ, যদি আমার আবিষ্কার সত্য হয়, আমি রঘুনাথকে পুনর্জ্জীবন দান করব। অবশ্য প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক-পরীক্ষার প্রথম প্রয়াস কৃতকার্য্য হওয়ার চেয়ে অকৃতকার্য্য হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী। কিন্তু সাফল্যের আশাও আছে। আমি অন্ততঃ আমার আবিষ্কার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিশ্বাসবান। সুতরাং আমি এই ব্যক্তিকে, যার দেহ ফাঁসিকাঠের জন্য উৎসর্গ হ'য়ে আছে, আমি বলেছি যে এই সুযোগ তার নেওয়া উচিত। বাঁচতেই যদি চায় ত নব-জীবন লাভ করে সে বাঁচুক,—একটা মধুর ও মৃত্যু-যন্ত্রণাহীন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। রঘুনাথ তুমি বলবে কি, আমার সর্ত্তে তুমি রাজী হয়েছ কিনা?"

শৃঙ্খলিত ব্যক্তি কথা বলবার চেষ্টায় শুষ্ক কণ্ঠতালুতে যেন কি একটা গলাধঃকরণ করলে। অবশেষে ক্ষীণ-স্বরে বললে—"হাঁ, আমি রাজী।"

অচপল বললে, "কিন্তু এ অসম্ভব অকরুণ, আমি এ কাজের মধ্যে থাকতে চাই না। হয় তুমি একে বধ করতেই যাচ্ছ, নচেৎ বর্ত্তমান কালের সব চেয়ে ভয়ঙ্কর অপরাধীকে পুনর্ব্বার তুমি সমাজের মধ্যে ছেড়ে দিতে চাইছ!"

রঘুনাথ পাগলের মত বলে উঠল,—"যদি আমি বেঁচে উঠি, হুজুর, যদি সত্যই আমি বেঁচে উঠি; ঈশ্বরের শপথ, আমি এদেশ ছেড়ে চলে যাব, বহুদূরে—সব লোকালয়ের বাইরে।"

অকরুণ দৃঢ়স্বরে বললে,—"আমি তা বিশ্বাস করি। যে পরীক্ষা সে আজ সহ্য করবে, তার পর অন্ততঃ সে মৃত্যুকে ভয় করেই চলবে। আমি মনে করি না যে রঘুনাথের অস্তিত্ব লোপ হ'লে পুলিস বিশেষ ক্ষুব্ধ হবে—এই গেল আমার কথা। তার পর অবশ্য রইল বিবেক। অচপল, তুমি এই পরীক্ষার শেষ পর্য্যন্ত দেখতে চাও কিনা!"

অচপল নীরব, তার মুখ পাংশুবর্ণ। কয়েক মিনিট পরে সে উত্তর দিলে, "না, দেখেই যাব। মোটের উপর একটা কুৎসিত মৃত্যু-বিভীষিকার স্থলে রঘুনাথ সহ্য করবে—একটা ধীর, স্থির, প্রশান্ত মৃত্যু, এই ত?"

অচঞ্চলের দিকে ফিরে অকরুণ বললে—"আর তুমি?"

"আমি নিশ্চয় থাকব। যদি সত্যই এমন একটা অদ্ভুত আবিষ্কার তুমি করে থাক অকরুণ, সমগ্র মানবজাতির কি অচিন্তনীয় কল্যাণই হবে এতে! রঘুনাথ, শুধু একথা মনে করেই যে তুমি শক্তি পাবে!"

রঘুনাথ আচ্ছন্নস্বরে বললে,—"আমার মত অবস্থার লোক নিজের কথাই ভাবে। তবে এ ক্ষেত্রে আমার আশাও আছে। আর কারাগারের মধ্যে এক প্রত্যূষে আমায় খাবার খাওয়াবে, তার পর আমার মুখে চাপা দিয়ে নিয়ে যাবে ফাঁসিকাঠের তলায়,—" তার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করে কেঁপে উঠল, ভাঙা গলায় সে বললে—"না না আমায় শীঘ্র নিয়ে চলুন, স্নানাধারেই আমি মরব।"

রঘুনাথের হাত-কড়া খুলে তাকে স্নানাধারের পাশে বসান হ'ল—তার মাথার কাছে বসে তাকে দৃঢ় করে ধরে রইল সেই ভীষণাকৃতি গুর্খা ভৃত্যটা। অকরুণ কাছে এসে রঘুনাথের ডান হাতটি তুলে ধরে তার শার্টের হাত গুটিয়ে দিয়ে বললে—

"এখনো বল, রাজী আছ ত? পরীক্ষা সুরু হ'লে পালাবার চেষ্টা করবে না ত? তখন কিন্তু ছাড়া হবে না।"

—"না না যা ইচ্ছা হয় করুন, শুধু আর দেরী করবেন না।"

চোখ বুজে সে দাঁতে দাঁত চাপল।

অকরুণের হাতে ছুরি দেখে রঘুনাথ আর একবার কেঁপে উঠল।

...অকরুণ তার হাত গরম জলের মধ্যে চেপে ধরেছে, হাত বেয়ে রক্তস্রোত জলের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে।

দর্শকদের দিকে ফিরে অকরুণ বললে,—"এবার কি হবে, তা জান তোমরা? এর নাড়ীর গতি দ্রুত হবে, তার তেজ কমে আসবে, তার পরে মাথা ঘোরা, প্রবল তৃষ্ণা, চক্ষে অন্ধকার-দেখা এবং অবশেষে মূর্চ্ছা—পর পর এই লক্ষণগুলি তোমরা মিলিয়ে যাও।" অকরুণ রঘুনাথের নাড়ী টিপে রইল এবং একটি যন্ত্রের সাহায্যে নাড়ীর ক্ষীণায়মান স্পন্দন পরীক্ষা করতে লাগল।

রঘুনাথের নিশ্বাস দ্রুত পড়ছে। দর্শকদের মনে দারুণ চঞ্চলতা যদিও তারা দু'জনেই অভিজ্ঞ ডাক্তার। গুর্খা-ভৃত্যটার দৃষ্টি সতর্ক এবং তার মুখ পাষাণের মত কঠিন। অকরুণের মুখেও দুর্ভেদ্য প্রশান্তি।

রঘুনাথের নিশ্বাস আর দ্রুত পড়ছে না, চোখের পাতা বুজে আসছে। মৃত্যুর ছায়া ক্রমশঃ গাঢ় হ'য়ে আসছে তার মুখে, স্নানাধারের জল ঘোর লাল হ'য়ে উঠছে। অকরুণ বললে—

"নাড়ীর বেগ দ্রুত হয়েছে, তেজও কমে এসেছে।"

রঘুনাথ ভাঙা গলায় বলে উঠল, "জল—"

অকরুণের নির্দ্দেশে গুর্খাটা তার মুখে ফোঁটা কয়েক জল ঢেলে দিলে। আরও দু'বার আর্ত্তনাদ করে সে চুপ করল। এক একটি মিনিট নিঃশব্দে গভীর আতঙ্কে কেটে যেতে লাগল। অকরুণ বললে—

"আর নাড়ী খুঁজে পাচ্ছি না,—এইবারই শেষ হ'য়ে এল।"

রঘুনাথ অতি ক্ষীণকণ্ঠে, যেন প্রেতলোক থেকে বলবার চেষ্টা করলে—"সব শেষ ?"

হঠাৎ তার চোখের পাতা খুলে গেল, দীর্ঘ আয়ত এবং ঘোলাটে তার চোখের দৃষ্টি। যেন কিছুই দেখছে না চোখ দিয়ে, দৃষ্টিশক্তিই গেছে হারিয়ে। আর একবার মৃদু কেঁপে উঠে সে তেমনি স্বরে বললে—

"আমায় ছেড়ে দাও, আমি পারব না।"

অকরুণ মৃদুগলায় বললে—"মূর্চ্ছা। এরপরই মৃত্যু অনিবার্য্য।" রঘুনাথের গলা থেকে ঘড় ঘড় করে খানিকটা আওয়াজ বেরিয়ে এল, যেন বলতে চাইলে—"না না— ।" তার পর যেন মরীয়া হ'য়ে একবার উঠে বসবার চেষ্টা করলে, কিন্তু মাথাটি একটুখানি উঠেই আবার লুটিয়ে পড়ল।

তার দেহ নিস্পন্দ, প্রাণহীন।

অকরুণ দৃঢ়স্বরে বললে—"মৃত্যু হয়েছে।"

অচঞ্চল স্নানাধারের নিকটে গিয়ে বললে,—"হাঁ,—সত্যই রঘুনাথের মৃত্যু হয়েছে। এবার তার দেহ তুলে নিয়ে এস। মিনিট পাঁচেক পরে তোমার আবিষ্কৃত দ্রব্যটি দাও ওর দেহে চালিয়ে। আহা বেচারা! কিন্তু যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দিয়েছে বলতে হবে। এবার বেঁচে উঠলে বেশ করে খানিকটা পিঠ চাপড়ে দেব। অকরুণ যদি তোমার পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হও, কি গৌরবই তোমার হবে!"

অকরুণের মুখে এক অদ্ভুত হাসি!

বললে—"আমার পরীক্ষা শেষ হয়েছে।"

বৈজ্ঞানিক বন্ধুরা বিস্ফারিত নেত্রে তার দিকে চেয়ে রইল। অকরুণ

বলে যেতে লাগল, "আমি এতক্ষণ তোমাদের কাছে সত্য-গোপন করেছিলাম। আমার এ পরীক্ষা ঠিক যেমনটি তোমাদের বলেছি, তা নয়। যা তোমরা দেখলে—এ কেবল মানবচিত্তের উপর প্রযুক্ত ভাবের সক্রিয় প্রত্যুত্তর, অভিব্যক্তিও বলতে পার।"

দুইজনেই সমস্বরে বলে উঠল—"তার মানে?"

"তোমাদের এখানে ডেকে আনা, এই স্নানাধার, আমার কথাবার্ত্তা—এ সবই ঐ লোকটার মনে ধারণাটি আরোপ করবার জন্য। মানুষের স্নায়ু-মণ্ডলীর গ্রহণশীলতা পরীক্ষা কববার জন্যই আমার এই আয়োজন। এর হাতের শিরা আমি কাটিনি, রক্তও কিছুমাত্র ওর দেহ থেকে বেরোয় নি। ও কেবল বিশ্বাস করেছে, রক্তপাতে তার মৃত্যু হচ্ছে, আর তোমরাও তাই মনে করেছ।"

অকরুণ মৃতের হাতখানা তুলে মুছে নিয়ে প্রদীপ্ত বৈদ্যুতিক আলোকের তলায় ধরে বললে, "এই দেখ, রক্তপাতের কিছুমাত্র চিহ্ন নেই। আমি শুধু ছুরির ডগা দিয়ে ওর চামড়াটা একটুখানি আঁচড়ে দিয়েছিলাম। আর ঠিক ওর হাতের নীচেই একটা লালজলের নল খুলে দিয়েছিলাম—স্নানাধারের জল তাতেই রক্তবর্ণ হয়েছে। ব্যাপারটি অতি সহজ। রক্তপাতজনিত মৃত্যুর লক্ষণগুলি একে একে আমার নির্দ্দেশ অনুসারেই রঘুনাথ প্রকাশ করেছে। সেই উপায়েই শেষ পর্য্যন্ত সে এই গভীর মূর্চ্ছাতে আচ্ছন্ন হয়েছে। বড়ই অপূর্ব্ব! নয়?"

অচঞ্চল রঘুনাথের নিশ্চল দেহ পরীক্ষা করে বললে—"তুমি যা মনে করেছ অকরুণ, তোমার পরীক্ষাটা তার চেয়ে অধিক সম্পন্ন হয়েছে, লোকটা সত্যই মরে গেছে!"

অকরুণ বললে,—"তাতে কি হয়েছে? ও একজন খুনী আসামী বই ত নয়!"

—তথাপি অকরুণের মুখখানা একটু ম্লান হ'য়ে গেল। *

---

* Frederic Boutet অবলম্বনে।

ত্রয়ী

তৃতীয় দৃশ্য

পূর্ব্ব প্রকাশিত ভাগের সারাংশ

প্রথম দৃশ্যে, নবীন ব্যারিষ্টার, চারু ও তাহার মাতা, উভয়ের কথোপকথনে জানা গেল যে, পুত্র বিলাতফেরৎ, ও "আনুষঙ্গিক" নবভাবগ্রস্ত হইলেও জননীর একান্ত অনুরক্ত এবং উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় মনের মিল আছে। চারু বিবাহ করে নাই, এবং নীতিবাগীশ নয়, কিন্তু এ যাবৎ "পরের ধনে লোভ" করে নাই!

প্রসঙ্গতঃ, যোগেশ রায়ের কথা উঠিতে জানা গেল যে সে প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক, বয়স ৪০ সারাজীবন বিজ্ঞান-সাধনায় দিনযাপন করিয়াছে। মাঝে বিবাহ করিয়াছে শুভাকে, তাহার বয়স মাত্র ২২। চারু এই পরিবারের বন্ধু, কিন্তু যোগেশের সময়াভাববশতঃ, শুভার সহিতই তাহার বেশী মেলামেশা হইয়াছে। যোগেশের ইহাতে সম্পূর্ণ অনুমোদন এমন কি, আগ্রহ আছে। কিন্তু যোগেশের আবাল্য ব্যর্থ প্রতিদ্বন্দী, সুরেন ডাক্তার ইহাতে সন্দেহের গন্ধ পাইয়াছে।

দ্বিতীয় দৃশ্যে, যোগেশের বিজ্ঞানাগারে যোগেশ গভীর গবেষণায় নিমগ্ন। শুভা আসিয়া তাহাকে নিমন্ত্রণে লইয়া যাইবার চেষ্টায় ব্যর্থ হইল। শুধু জানিতে পারিল যে যোগেশ সর্পাঘাতের ঔষধ বাহির করিবার উদ্দেশ্যে সাড়ে ছ'শোবার বিফলকাম হইয়াছে, কিন্তু সাফল্যের অতি নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে। এই সময়ে চারু উপস্থিত হওয়াতে যোগেশ "কূল পাইল," এবং জোর করিয়া শুভাকে চারুর সহিত নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতে বাধ্য করিল। যোগেশ বাহিরে গিয়াছিল, সেই অবসরে চারু ও শুভার বিশ্রম্ভালাপে দেখা গেল যে শুভার কোনো বৈলক্ষণ্য প্রকাশ না পাইলেও, নিজের অলক্ষিতে চারু ধীরে ধীরে তাহার অনুপম মোহে আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছে।

ঠিক এই আলাপের মধ্যে সুরেন ডাক্তার প্রবেশ করিল এবং ভাবগতিক দেখিয়া তাহার সন্দেহ আরও ঘনীভূত হইল। শুভা-চারু প্রস্থান করিলে, সে যোগেশের নিকট তাহার এই উদাসীনতার তীব্র প্রতিবাদ করিল,—"ঘৃতকুম্ভ" ও "তপ্ত অঙ্গারের" উপমার উল্লেখ করিল,—কিন্তু যোগেশ তাহা উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিল।

(চারু একা একটি সোফাতে বসিয়া আছে। পাশে একটি খালি চেয়ার। মুখ অত্যন্ত চিন্তাকুল, কেশবেশ অসম্বদ্ধ। মুহুর্মুহু সিগারেট খাইতেছে, মধ্যে মধ্যে কেশের মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করিতেছে। বেহারা প্রবেশ করিল, এবং একটি ঝাড়ন দিয়া টেবিল, চেয়ার, ইত্যাদি ঝাড়িতে লাগিল। তাহাকে দেখিয়া চারু অত্যন্ত বিরক্ত হইল।)

চারু। কি করছিস্, যা এখন যা। (বেহারা অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল)—(অত্যন্ত রুক্ষস্বরে) বল্‌চি এখান থেকে যা, চলে যা।

বেহারা। (সভয়ে) আজ্ঞে। (চলিয়া গেল।) (কিছুক্ষণ পরে চারুর মাতার প্রবেশ। চারুর পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন ও তাহাকে অতিশয় মনোযোগ সহকারে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন,—চারু তাহা জানিতে পারিল না। হঠাৎ একবার ঘুরিয়া দাঁড়াইবার সময়ে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া চমকিয়া উঠিল। তবু, তাহার মাতা কোনো কথা বলিলেন না, তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। চারু সে দৃষ্টি সহ্য করিতে পারিল না। সোফায় বসিয়া পড়িল এবং অন্যদিকে চাহিয়া কথা কহিতে আরম্ভ করিল। প্রত্যেক বাক্যে, প্রত্যেক ভঙ্গীতে অস্বস্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।)

চা। (শুষ্কস্বরে) কি মা, কি খবর ? (মা কিছুক্ষণ উত্তর দিলেন না, তারপর অতি ধীরে কথা কহিলেন।)

মা। তোর কি হয়েছে ?

চা। কই না, কিছুই ত হয়নি। (উভয়েই নীরব)

মা। কি হয়েছে বল।

চা। কি আবার হবে ? বেশ ভালই তো আছি।

মা। শরীরের কথা জিজ্ঞাসা করছি নে। কি হয়েছে বল।

চা। (একটু থামিয়া) কেন তুমি বারবার ঐ এক কথা জিজ্ঞাসা করছ মা? কিছুই হয় নি তো।

মা। বৃথা কথা বাড়াসনি চারু। আমি জানতে এসেছি, না জেনে যাব না।

চা। তুমি কি জানতে চাও, তাই তো বুঝতে পারছি নে।

মা। খুব বুঝতে পারছিস। আমার কাছে লুকুবি তুই, এত বড় স্পর্দ্ধা তোর কবে থেকে হল চারু?

চা। কি লুকিয়েছি?

মা। তা তুই জানিস্। আমি তো অন্তর্যামী নই, যে তোর মনের প্রত্যেক কথাটি গুণে বল্‌ব। তবে তোর মনের অবস্থাটা আমার কাছে লুকোবার সাধ্য আজও হয়নি তোর। কি হয়েছে —সব খুলে বল। (চারু নীরব হইয়া রহিল। চারুর মাতা এতক্ষণ দূর হইতে কথা বলিতেছিলেন, এইবার তাহার পাশের চেয়ারে আসিয়া বসিলেন ও অতি কোমল, স্নেহসিক্ত স্বরে বলিতে লাগিলেন)—সেই ছোটবেলা থেকে কি বলে আস্‌ছি মনে নেই? লুকোলেই অনর্থ। যত উপদ্রব, সব এই ঢাকা-ঢাকিতে। কতবার না বলেছি, সব প্রকাশ করে দিবি, মনের মধ্যে এতটুকু জঞ্জাল যেন লুকোনো না থাকে? জঞ্জাল তো আস্‌তেই পারে, সবারই আসে, কিন্তু জমা হতে দিস্‌নে। মানুষের মন, ধূলোবালি তো এসে পড়বেই, কেউ ঠেকাতে পারে না। কিন্তু যেই নজরে পড়বে, অম্‌নি ঝেড়ে একেবারে বার করে ফেলে দিবি। তা'তে যদি জগৎসুদ্ধ লোক জান্‌তে পারে, সেও ভালো। মনে নেই, কতবার বলেছি, পাপের মুক্তি হয়

তার প্রকাশে? (চারু নিজের দুই হাতে মুখ আচ্ছাদন করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার মাতা ধীরে ধীরে তাহার পিঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন।) কিচ্ছু ভাবিসনে, মোটেই ভাবিসনে। আমি বলছি চারু, জীবনের এমন কোন অবস্থাই নেই, যার আর কোন চারা নেই। উপায় আছেই আছে। একেবারে হাল ছেড়ে দিয়ে বসতে হবে, এমন কোন অবস্থা থাকতেই পারে না।

চা। (মুখ হইতে হাত সরাইয়া সোজা সম্মুখের দিকে তাকাইয়া গভীর নৈরাশ্যের স্বরে বলিল) না আর কোন উপায় নেই।

মা। নিশ্চয় আছে। তুই আমাকে বল। আমি বলছি, উপায় আছে, ভরসা হারাসনে।

চা। মা আমাকে ছেড়ে দাও। আমাকে ভুলে যাও। তুমি আমাকে ত্যাগ কর।

মা। কি পাগলের মত বকছিস? যখন হাঁটতে গিয়ে পড়ে যেতিস, তখন আমার হাঁটু ধরে দাঁড়িয়েছিস। আজ তোর আটাশ বছর বয়েস হয়েছে ব'লে কি সে নিয়ম উল্টে যাবে ভাবছিস?

চা। মা, আমার ক্ষমা নেই।

মা। অন্য কোথাও না থাকলেও আমার কাছে আছে। আমি যে তোর মা, সেটা ভুলে বসে আছিস?

চারু। বল্‌তে পারিনে মা, বল্‌তে পারিনে। মুখে আন্‌তে জিভে আট্‌কে যায়। আমি কি করেছি মা! আমার এমন মতিভ্রম কেন হোল!

মা। (কিছুক্ষণ স্থিরভাবে চিন্তার পর) আচ্ছা, সে আমি বুঝব। তুই আমাকে বল, আমি সমস্ত ফলাফলের ভার নিচ্ছি। (চারু

এই কথা শুনিয়া বিহ্বল হইয়া তাহার মাতার দিকে চাহিল। তারপর, অন্যদিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল।)

চা। অন্ধের মত চলেছিলুম। ডাইনে বাঁয়ে কোনো দিকে দেখিনি। সমাজ কোনো বাধা দেয়নি—এম্‌নি আমাদের সমাজ। তারপর কোন্ এক মুহূর্ত্তের ভুলে জ্ঞানশূন্য হয়ে কি কাণ্ড করে বসেছি,— এতক্ষণে সব জানাজানি হয়ে গেছে,—আর ফেরবার পথ নেই।

মা। (ধৈর্য্যের বাঁধন হারাইয়া তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিলেন) চারু—!

চা। মা! (উৎকণ্ঠার সহিত) তবে যে,—তবে যে সেদিন বল্‌লি তোর দ্বারা চুরি কখনো হবে না।

চা। তাতো হয়নি মা।

মা। তবে এ কি বল্‌ছিস্? জানাজানি হয়ে গেছে, ফেরবার পথ নেই?

চা। চুরি করি নি মা। চুরি করতে হাত বাড়িয়েছি, আর ধরা পড়ে গেছি।

মা। ধরা পড়েছিস! (অধীরভাবে) কি করেছিস, স্পষ্ট করে বল। আর বাজে কথা বলিসনি।

চা। রূপে কিছু করতে পারত না মা, রূপ অনেক দেখেছি! কিন্তু তার সেই কাঁচা স্বভাবেই ডুবে গেলুম মা, সব ভুলে গেলুম।

মা। তারপর?

চা। এক মুহূর্ত্তের ভুলে—(থামিল)

মা। এক মুহূর্ত্তের ভুলে কি করেছিস তাই বল।

চা। চিঠি লিখে পাঠিয়েছি। (মাথা নত করিল)

মা। চিঠি! (স্বস্তির দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন) মিসেস রায়কে তো? (চারু ধীরে ধীরে শির সঞ্চালন করিল) কবে?

চা। কাল।

মা। কাল কখন ?

চা। সকালে।

মা। ডাকে পাঠিয়েছিস, না লোকের হাতে ?

চা। ডাকে।

মা। ডাকে পাঠাতে সাহস হল তোর ?

চা। যোগেশ তার চিঠি খুলবে না। আর কেউ নেই।

মা। তা হলে এতক্ষণে পৌঁছে গেছে বোধ হয়।

চা। তাই তো বলছিলুম মা, আর ফেরবার পথ নেই।

মা। কি লিখেছিলি তাতে ? (চারু লজ্জায় মাথা নত করিল) লজ্জার সময় নেই চারু। শীগগির বল।

চা। লিখেছিলুম আমার সঙ্গে পালিয়ে যেতে। যোগেশের—

মা। যাক্, বুঝেছি।…কিন্তু তুই এত উতলা হয়েছিস কেন ? তোর কি মনে হয় সে চিঠি পড়ে তিনি তোর ওপর বিরক্ত হবেন ?

চা। বিরক্ত ? তোমাকে আমি কি করে বোঝাব মা ? সেও যে তোমারই শিক্ষায় শিক্ষিত, তোমারই মন্ত্রে দীক্ষিত। লুকিয়ে কিছুই রাখতে পারে না যে। এতক্ষণে যোগেশ নিশ্চয় শুনেছে, আমার আর পথ নেই। (মাতাপুত্র উভয়েই কিছুক্ষণ গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া রহিলেন।)

মা। চারু! বলেছিলুম উপায় বলে দেব। যা বলি, তাই কর, এখনও বাঁচবার আশা আছে। (চারু উদ্‌গ্রীব হইয়া চাহিয়া দেখিল) কিন্তু চিঠি ছাড়া— ?

চা। (কাতর ভাবে) না মা, আর কিছু না, আর কিছু না।

মা। বেশ। শোন। সমস্ত স্বীকার করতে হবে,—নিজের মুখে তার স্বামীর কাছে। (চারু চমকিয়া উঠিল) স্বীকার না করলে

মার্জ্জনা হয় না, ক্ষমা হয় না। এখুনি এই মুহূর্ত্তে চলে যাও। তার কাছে যে অপরাধ করেছ, তার চেয়ে বেশী অপরাধ করেছ তার স্বামীর কাছে। তারই কাছে গিয়ে সমস্ত দোষ স্বীকার করে এসো।

চা। যোগেশের কাছে? না মা, আমার মুখ দেখাবার উপায় নেই।

মা। নিশ্চয় করতে হবে। এ ছাড়া আর অন্য উপায় নেই। অনিয়ম করলে তার ওষুধ কখনও মিষ্টি হয় না। এই তোমার প্রায়শ্চিত্ত, মাথা পেতে নিতে হবে।

চা। যদি তিনি ক্ষমা না করেন?

মা। সে তাঁর ইচ্ছে। তাঁর কাছে নিজেকে একান্ত ভাবে সমর্পণ করে দিবি। তারপর তাঁর ইচ্ছে। যে শাস্তি তাঁর ইচ্ছে হয়, দেবেন। তোকে নিতেই হবে।

চা। আর,—আর শুভা?

মা। তার কাছেও তাই। মাথা হেঁট করে, হাঁটু পেতে, পায়ে ধরে মাফ চাইবি। তারা যদি নীচ না হয় তোকে ক্ষমা না করে থাকতে পারবে না। (চারু ভাবিতে লাগিল) কি, ভাবছিস্ কি? অপমান? লজ্জা? পাপ স্বীকারে অপমান নেই, গৌরবও নেই। এ যে ওষুধ, আর কিছুই নয়। ফোঁড়া হয়েছে, কাটতেই হবে। আর ভাবিস নে, আমি যা বলছি, তাই কর,— এখুনি। আমি বলছি তোকে, সব ঘোর কেটে যাবে।

চা। কিন্তু···কিন্তু এর পরে আমি এখানে থাকব কি করে মা? আমি পারব না।

মা। নাই বা থাকলি। তোর তো আর চাকরী নয়। না হয় দাদার কাছে রেঙ্গুনে চলে যাবি। দাদা তো কত দিন ধরে লিখছেন,

বুড়ো হয়েছেন, সমস্ত প্র্যাক্‌টিস তো তুই-ই পাবি। সে সব ভেবে চিন্তে ঠিক করা যাবে। এখন যা বল্লুম, তাই কর। এতক্ষণে হয় তো চিঠি পৌঁছে গেছে। এখুনি গিয়ে সব মিটিয়ে দিয়ে আয়। (চারু চিন্তিত ভাবে বসিয়া রহিল) ওঠ, ওঠ। (তাহার হাত ধরিয়া উঠাইলেন) শীগ্‌গির কাপড় পরে নে। (চারু উঠিয়া দাঁড়াইল, আর নিজেকে সম্বরণ করিতে পারিল না।)

চা। মা, তাদের কথা তো বললে,—আর তুমি? (চারুর মা এখনো চেয়ার হইতে উঠেন নাই। চারু একেবারে মাটিতে বসিয়া পড়িয়া তাঁহার কোলে মুখ লুকাইল।)

মা। (হাসিয়া,—তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন) আমি—

[পটক্ষেপ

চতুর্থ দৃশ্য

যোগেশের বিজ্ঞানাগার

(বেলা আটটা। প্রায় সমস্ত আসবাব-আয়োজন দ্বিতীয় দৃশ্যের মত। যোগেশ সারারাত্রি জাগরণের পরেও—গবেষণা হইতে নিবৃত্ত হয় নাই। কোন সময়ে কিছু খাইয়াছে, তাহার উদ্বৃত্তাংশ টিপয়ের উপর পড়িয়া আছে। বড় টেবিলের উপরে, অন্য যন্ত্রপাতির মধ্যে চায়ের পেয়ালা। যবনিকা উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাইবে যে অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে কক্ষ মধ্যে পাদচারণা করিতেছে। গায়ে আলখাল্লা, হাতে দস্তানা পরা। মধ্যে মধ্যে ঘড়ির দিকে দেখিতেছে

হঠাৎ টেবিলের নিকটে আসিয়া একটি ছোট টিউব হইতে পিচকারী ভরিয়া লইয়া দ্রুতপদে বাহিরে চলিয়া গেল।)

যো। (নেপথ্যে চীৎকার। Eureka! Eureka! Got it, by Jove!……শুভা! (বলিতে বলিতে একটি ছোট কুকুরছানা কোলে লইয়া প্রবেশ করিল। মুখ চোখ সাফল্যের প্রভায় উদ্ভাসিত, মাঝে মাঝে কুকুরটিকে দেখে, এবং চীৎকার করিয়া ডাকে,—"শুভা! শুভা!" একটি আরকের টিউব তুলিয়া অতি মনোযোগের সহিত দেখিতে লাগিল,—যেন কত মহার্ঘ্য রত্ন নিরীক্ষণ করিতেছে। শুভার প্রবেশ। তাহার প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে যোগেশ জোর করিয়া নিজেকে সংযত করিয়া লইল,—যেন বিশেষ কিছুই হয় নাই।)

শুভা। (দ্বারপ্রান্ত হইতে) কি হয়েছে? চীৎকার করছ কেন?

যো। (শান্ত মৃদু হাস্যের সহিত দুইএক মুহূর্ত্ত তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর, যেন অনেক দিনের ভুলে-যাওয়া পাঠ আবৃত্তি করিতেছে, এই ভাবে ধীরে ধীরে)

সাঙ্গ হয়েছে রণ!
অনেক যুঝিয়া অনেক খুঁজিয়া
শেষ হল আয়োজন!
তুমি এস, এস নারী,
আন তব হেম ঝারি!
ধুয়ে মুছে দাও ধূলির চিহ্ন
জোড়া দিয়ে দাও ভগ্ন ছিন্ন
সুন্দর কর, সার্থক কর
পুঞ্জিত আয়োজন!

এস সুন্দরী নারী

শিরে লয়ে হেম ঝারি !

শু। ও বাবা, কবিতা আওড়াচ্ছে যে! শেষটা মাথাটা একেবারে খারাপ হয়ে গেল ! কি ! ব্যাপার কি ?

যো। (পূর্ব্ববৎ)

আঁধার নিশীথ রাতি

গৃহ নির্জ্জন, শূন্য শয়ন

জ্বলিছে পূজার বাতি !

তুমি এস, এস নারী

আনো তর্পণবারি।

অবারিত করি ব্যথিত বক্ষ

খোলো হৃদয়ের গোপন কক্ষ

এলো কেশপাশে শুভ্র বসনে

জ্বালাও পূজার বাতি !

এসো তাপসিনী নারী,

আনো তর্পণবারি !

(স্বাভাবিক স্বরে) How's that ? হা। হা ! হা ! হা !

(উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল)

শু। কি, ব্যাপার কি ? কি হয়েছে কি ?

যো। আমি গান জানিনে, নাচ জানিনে, কবিতা জানিনে। কি করে জানব ? আমি যে একটা doddering old fool of a scientist !···আপন ভোলা ধ্যানী মহাদেব !···কিন্তু, কি রকম নির্ভুল recite করেছি দেখলে ?

শু। কিন্তু হয়েছে কি, তা বল !

হঠাৎ টেবিলের নিকটে আসিয়া একটি ছোট টিউব হইতে পিচকারী ভরিয়া লইয়া দ্রুতপদে বাহিরে চলিয়া গেল।)

যো। (নেপথ্যে চীৎকার। Eureka! Eureka! Got it, by Jove!······শুভা! (বলিতে বলিতে একটি ছোট কুকুরছানা কোলে লইয়া প্রবেশ করিল। মুখ চোখ সাফল্যের প্রভায় উদ্ভাসিত, মাঝে মাঝে কুকুরটিকে দেখে, এবং চীৎকার করিয়া ডাকে,—"শুভা! শুভা!" একটি আরকের টিউব তুলিয়া অতি মনোযোগের সহিত দেখিতে লাগিল,—যেন কত মহার্ঘ্য রত্ন নিরীক্ষণ করিতেছে। শুভার প্রবেশ। তাহার প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে যোগেশ জোর করিয়া নিজেকে সংযত করিয়া লইল,—যেন বিশেষ কিছুই হয় নাই।)

শুভা। (দ্বারপ্রান্ত হইতে) কি হয়েছে? চীৎকার করছ কেন?

যো। (শান্ত মৃদু হাস্যের সহিত দুইএক মুহূর্ত্ত তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর, যেন অনেক দিনের ভুলে-যাওয়া পাঠ আবৃত্তি করিতেছে, এই ভাবে ধীরে ধীরে)

সাঙ্গ হয়েছে রণ!

অনেক যুঝিয়া অনেক খুঁজিয়া

শেষ হল আয়োজন!

তুমি এস, এস নারী,

আন তব হেম ঝারি!

ধুয়ে মুছে দাও ধূলির চিহ্ন

জোড়া দিয়ে দাও ভগ্ন ছিন্ন

সুন্দর কর, সার্থক কর

পুঞ্জিত আয়োজন!

এস সুন্দরী নারী
শিরে লয়ে হেম ঝারি!

শু। ও বাবা, কবিতা আওড়াচ্ছে যে! শেষটা মাথাটা একেবারে খারাপ হয়ে গেল! কি! ব্যাপার কি?

যো। (পূর্ব্ববৎ)

আঁধার নিশীথ রাতি
গৃহ নির্জ্জন, শূন্য শয়ন
জ্বলিছে পূজার বাতি!
তুমি এস, এস নারী
আনো তর্পণবারি।
অবারিত করি ব্যথিত বক্ষ
খোলো হৃদয়ের গোপন কক্ষ
এলো কেশপাশে শুভ্র বসনে
জ্বালাও পূজার বাতি!
এসো তাপসিনী নারী,
আনো তর্পণবারি!

(স্বাভাবিক সুরে) How's that? হা। হা! হা! হা!
(উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল)

শু। কি, ব্যাপার কি? কি হয়েছে কি?

যো। আমি গান জানিনে, নাচ জানিনে, কবিতা জানিনে। কি করে জানব? আমি যে একটা doddering old fool of a scientist!...আপন ভোলা ধ্যানী মহাদেব!...কিন্তু, কি রকম নির্ভুল recite করেছি দেখলে?

শু। কিন্তু হয়েছে কি, তা বল!

যো। (ধীরে ধীরে আরকের টিউবটি উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া বিহ্বলনেত্রে সেই দিকে চাহিয়া দেখিল, তারপর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধীরে ধীরে নিজের মুখের কাছে নামাইয়া লইয়া তাহাতে নিবিড় চুম্বন করিল) Now, don't get jealous, dear! The parting kiss! Boy! (খানসামা প্রবেশ করিল, এবং যোগেশ তাহার হাতে কুকুরটিকে দিল) লে যাও। দুধ পিনে দেও (খানসামা চলিয়া গেল) And that's that!

শু। ও হরি! এতক্ষণে বুঝেছি। ওষুধটা বেরিয়েছে বুঝি, তাই এত লাফালাফি!

যো। (শুভার দুই বাহু ধরিয়া তাহার চোখে চোখ মিলাইয়া) 675, 675, 675! দেখ, যখন মরে যাব, আমার জন্যে একটা বড় স্তম্ভ তৈরী করিও, আর তার ওপর বড় বড় করে লিখে দিও—675.

শু। আহা, কি কথাই বললেন। যেমন সব ছোটলোকের মত কাণ্ড-কারখানা, তেমনি বুলি! 675 আবার কি?

যো। ছ'শো চুয়াত্তর বার ফেল। ৬৭৫ বারে পাস। একেবারে অনারে পাস। কি করি বল দিকি শুভা? একটা কিছু করা উচিত, না করলে পাগল হয়ে যাব। এসো একটু dance করি। (শুভাকে ধরিয়া নাচিবার উপক্রম করিল)

শু। (জোর করিয়া নিজেকে ছাড়াইয়া লইতে লইতে) আঃ, ছাড়ো ছাড়ো। তুমি কি পাগল হ'লে নাকি?

যো। ও! বিশ্বাস হয় না যে আমি নাচব! তুমি তো ভারী জানো! Latest গুলো জানি নে বোধ হয়। কিন্তু, Boston, Black

Bottom, এমন কি Rumbaটাও এককালে নেচেছি। হ্যাঁ—এই scientist!

শু। সে আবার কি?

যো। You don't know your hubby, darling! তোমার অনেক কিছু জানতে বাকি আছে। চিরদিন শুধু শিশি বোতল ঘেঁটেই বেড়াইনি গো। (সুরের চেষ্টা করিয়া) Pale hands I loved beside the Shalimar!...না, তুমিই গাও। একটা গান কর না, শুভা!

শু। বয়ে গেছে আমার গান করতে।

যো। করবে না? তবে নাচার। কিন্তু একটা কিছু আজ করতেই হবে।

শু। বেশ তো, কোরো। অত অস্থির হচ্ছ কেন?

যো। কি বলছ শুভা, আজ অস্থির হব না? তুমি কি বুঝতে পারছ না?

শু। খুব বুঝতে পাচ্ছি। (তাহার বাহু ধরিয়া কৌচে বসাইল) তা হোক্! এখন দিন কতক একটু বিশ্রাম কর।

যো। বিশ্রাম? হ্যাঁ, এইবার অনেক দিনের বিশ্রাম। A long, long holiday! Dolce Far Niente!

> "With a loaf of bread beneath the bough,
> A cup of wine, a book of verse, and thou
> Beside me singing in the wilderness,
> And wilderness was paradise enow"

(শুভার দিকে চাহিয়া) ওমর খৈয়াম পড়েছ? না, ওসব তোমাদের মডার্ণ শাস্ত্রে বাদ?...কিন্তু এ কি করছি! আজ

তো বিশ্রামের সময় নয়। তার দেরী আছে শুভা। এখুনি cable করতে হবে। তারপর সবটা লিখে ফেলতে হবে, আজই পাঠাতে হবে। তুমি জানো না, চুরি হয়ে যেতে পারে। অনেকবার ঠকেছি।

শু। কিন্তু, তাই বলে এখুনি? একটু পরেই না হয় খবর দিও এখন।

ঘো। না, না, (লাফাইয়া উঠিল) সবাইকেই আজ জানাতে হবে। সুরেনকে promise করেছিলুম। তাকেও খবর দিই। (দরজার কাছে গিয়া) ওকে আজ রাত্রে নেমন্তন্ন করি, কেমন? (শুভার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া নেপথ্যে টেলিফোনের মুখে বলিতে লাগিল) 675, 675.

শু। ওকি বলছ?

ঘো। কি? Oh, sorry, Exchange! Just a moment··· Central 403, please!

শু। সত্যি সত্যি ক্ষেপে যাবে নাকি?

ঘো। Hallo, hallo! Who you? 675. I said I am 675.

শু। আঃ, কি ছাই ঐ এক কথা বার বার—

ঘো। চুপ!···হ্যাঁ হে আমি···ব্যাপার ঐ যা বললুম, 675···অ্যাঁ? শীগগীর চলে এস, বুঝতে পারবে। হ্যাঁ। আর দেখ, আজ রাত্রে এইখানেই ডিনার, বুঝলে?······কি? পারবে না? কেন?···ও, আচ্ছা. ডিনারের পরেই না হয় এসো। কিন্তু এখন তো এসো, সে সব কথা পরে হবে।···At once! ট্যাক্সিতে! এলে বলব, এখন আর একটি কথাও নয়। (টেলিফোন বন্ধ করিয়া দিল এবং ফিরিয়া আসিয়া কোচে

বসিল) চার বচ্ছর পর !···ভালো কথা, চারুকেও আসতে বলি।
(উঠিল)

শু। না, না, তুমি বোসো।

যো। সে কি, তাও কি হয় ?

শু। কেন এত লোক ডাকাচ্ছ, মিছে ভিড় করে লাভ কি ?

যো। ও! চারুর বেলাই বুঝি যত ভিড় হোল ? তুমি বড় নেমক-হারাম, শুভা! চারু বেচারী তোমার জন্যে এত করে, তোমায় এত ভালবাসে (শুভা একবার যোগেশের দিকে কটাক্ষপাত করিল, যোগেশ হাসিল) আর তুমি তাকে একটুও দেখতে পার না।···না, সে সব হবে না। চারুকে বলতে হবে বই কি। (টেলিফোনের কাছে যাইতে যাইতে) আর চারু এলে তাকে তোমার এই নেমকহারামির কথা বলে দেব। (টেলিফোনের মুখে) Central 139, please···আমি যোগেশ, যোগেশ রায় ······কোথা ? বাড়ী নেই ? কখন আসবে ?······আচ্ছা। (টেলিফোন বন্ধ করিল) বাড়ী নেই। কুছ পরোয়া নেই—চিঠি লিখে দিচ্ছি। (টেবিলের কাছে বসিয়া লিখিতে লাগিল।)

শু। আজকেই এত হাঙ্গামা না করলে কি হ'ত না ? না হয় আজ একটু ছুটি নিতে। (যোগেশ কোন উত্তর না দিয়া চিঠি শেষ করিল ও খামে মুড়িল।)

যো। ছুটি ?···সে কাল, আজ নয়। Boy! ("হুজুর" বলিয়া বেহারা প্রবেশ করিল। যোগেশ তাহার হাতে চিঠি দিল।) ই চিঠ্ঠি আবি ঘোষ সাহেব বারিষ্টারকো পাস ভেজোয়া দেও। জবাবকো বাস্তে ঠাহ্‌রে গা।

খানসামা। বহুৎ আচ্ছা হুজুর (চলিয়া গেল।)

শু। যাও! থেকো তুমি তোমার বন্ধুদের নিয়ে, আমি তো সন্ধ্যেবেলা থাকব না।

যো। থাকবে না তো যাবে কোথা? তোমার বাহন তো চারু! সে তো এইখানেই থাক্‌বে!

শু। তুমি বড়—! (অভিমান করিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইল।)

যো। না, না, রাগ কোরো না শুভা। আজ রাগারাগির দিন নয়।··· আচ্ছা আমার আজ কি হয়েছে দেখছ না? তোমার একটুও আহ্লাদ হচ্ছে না?

শু। বয়ে গেছে আহ্লাদ হতে! কি এক ভারী তো সাপের ওষুধ! (অন্যদিকে ফিরিয়া মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিল।)

যো। (তাহা বুঝিতে পারিল না) সত্যি! একটুও আহ্লাদ হচ্ছে না? দেখ্‌ছ না শুভা—(হঠাৎ শুভার মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিতে পারিল) ও! দেখি, দেখি! (শুভার মুখ ফিরাইয়া জোর করিয়া তাহার মুখের কাপড় সরাইয়া দিল, শুভা মুখ নীচু করিয়া প্রকাশ্যে হাসিয়া উঠিল।) ও! বটে! এখনও দুষ্টুমি? (এই বলিয়া তাহাকে দুই বাহু দিয়া আলিঙ্গন করিতে যাইবে, এমন সময়ে বাহির হইতে সুরেনের আওয়াজ আসিল, কি হে যোগেশ আছ?")

যো। (বিরক্ত হইয়া শুভাকে ছাড়িয়া দিল।) The deuce! কে? সুরেন? এস এস। (সুরেনের প্রবেশ) At last, my boy! আজ কেল্লা ফতে! দেখছ কি? (টেবিল হইতে টিউবটি তুলিয়া দেখাইল।)

সু। (শুভাকে) নমস্কার, মিসেস্‌ রায়, ভাল আছেন?

শু। (প্রতিনমস্কার করিয়া, শুষ্কস্বরে) নমস্কার, আপনি ভাল আছেন ?

সু। আপনাদের অনুগ্রহে। (শুভা প্রস্থানোদ্যত)

যো ! কোথায় যাচ্ছ, শুভা ? একটু বোসো না।

শু। যাই, একটু কাজ আছে।

যো। আঃ, তোমার আবার কাজ কি ? (শুভা একটু হাসিয়া চলিয়া গেল) যত সব বাজে ! বোসো সুরেন, বোসো।

সু। (বসিতে বসিতে) তোমার স্ত্রী আমাকে বড় একটা পছন্দ করেন না।

যো। সে কি হে ? না, না, ওসব তোমার যত বাজে খেয়াল। তোমাকে পছন্দ কর্‌বে না কেন ? বরং চারুকেই যেন আমল দেয় না।

সু। চারুকে আমল দেয় না ? কি রকম ?

যো। এই দেখ না, ওকে নেমন্তন্ন করাতে কি ভয়ানক আপত্তি কর্‌ছিল।

সু। (অত্যন্ত আগ্রহের সহিত) আপত্তি কর্‌ছিল ?

যো। হ্যাঁ হে ! আমি তো অবাক ! শেষে অনেক বলা কওয়াতে রাজী হয়। আশ্চর্য্য নয় ?

সু। (আপন মনে) চারুকে আপত্তি করেছে ?

যো। কি হে, ভাব্‌ছ কি ?

সু। (যেন এতক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছে) ও !······কি ভাব্‌ছি ? যা বরাবর ভেবে এসেছি তাই।

যো। কি ?

সু। তোমাকে বলা বৃথা ! তুমি তো শুন্‌লেই হেসে উড়িয়ে দেবে।

যো। তবু শুনি।

সু। নতুন কিছুই নয়, সেদিন যা বল্‌ছিলুম তাই।

যো (চিন্তা করিয়া) ও ! বুঝেছি। তোমার সেই Great Eternal Triangle ? (সুরেন মাথা নাড়িল। যোগেশ হঠাৎ খুব গম্ভীর হইয়া গেল) Now look here, Suren, that will be about all from you on that subject! A joke's all very well; কিন্তু এই এই খানেই ইতি কর আর বাড়িও না। তোমার ঘি আর আগুনের লেকচার অন্যত্র দিও, এখানে নয়। (সুরেন নীরবে বসিয়া রহিল। যোগেশ নিজেকে সংযত করিয়া লইল, এবং রূঢ়ভাবে কথা বলিয়াছে বলিয়া অনুতপ্ত হইয়া পুনরায় পূর্ব্বেকার মত সরলভাবে বলিতে লাগিল) Sorry old man একটু কড়া করে বলেছি বলে কিছু মনে কোরো না,—কিন্তু ভাই, আমার ওসব ভালো লাগেনা। যেতে দাও ওসব বাজে কথা। এখনও আমাকে congratulate করলে না ?

সু। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া যোগেশের করমর্দ্দন করিতে করিতে) Hearty congratulations, যোগেশ। কখন হোল ?

যো। এই তো আধঘণ্টাটাক্ আগে। ৬৭৪ বারের পর।

সু। তাই বুঝি 675 675 বলে চেঁচাচ্ছিলে ? ধন্য তুমি! বাবাঃ, যা কামড়ে ধরেছিলে, এর কাছে সাপের কামড় লাগে! কই দেখি, ওষুধটা কই ? (যোগেশ অতি সন্তর্পণে টিউবটি সুরেনের হাতে দিল) কিন্তু এযে বড় সামান্য হে! এতটুকুতে কি হবে ?

যো। ক্রমশঃ হবে। এই তো আরম্ভ। সব আছে এই কখানা পাতার মধ্যে! (একখানি মোটা বাঁধানো খাতা খুলিয়া

কয়েকটি পাতা দেখাইল) What precious leaves are these!

সু। Precious নয়? উঃ কি টাকাটা লুটবে!

যো। টাকা? তুমি অত টাকার কথা কেন ভাবো হে? বেশী টাকা নিয়ে করব কি?

সু। ও, তাও তো বটে! বেশী টাকা নিয়ে করবে কি? (ব্যঙ্গ-হাস্যের সহিত) ঠিক ঠিক! মাত্র তিনচার হাজার হলেই তো তোমার মাস চলে যায়।

যো। আবার সেই টাকা, টাকা, টাকা। ওসব যেতে দাও। এখন কথা হচ্ছে, কি করে খবরটা সব জায়গায় প্রচার করা যায়।

সু। কোথায় কোথায় পাঠাবে ভাব্‌ছ? বাইরে পাঠাবে নাকি?

যো। নিশ্চয়! বাইরে তো আগে পাঠাতে হবে। বিশেষ করে আমার পুরোনো জার্মান প্রফেসরদের কাছে। সমস্ত দিন ধরে ফর্মুলাগুলো লিখে শেষ করতে হবে। (খানসামা একরাশি ডাকের চিঠিপত্র লইয়া প্রবেশ করিল) ডাকটা এল দেখছি। (খানসামা সমস্ত চিঠি টেবিলের উপরে রাখিল। যোগেশ চিঠি বাছিতে লাগিল) হুঁ। হুঁ। (দুইখানি চিঠি তুলিয়া লইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া রাখিল। একখানি চিঠি খুলিয়া পড়িতে লাগিল। সুরেন বাকি চিঠিগুলির ঠিকানা দেখিতে লাগিল।)

সু। উঃ, কি 'মেল'! লণ্ডন, প্যারিস, বার্লিন, বাবাঃ, কোন দেশই আর বাদ দাওনি। (হঠাৎ একখানি চিঠি তুলিয়া লইয়া খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল) এটা! এটা চারুর লেখা না? (পড়িল) মিসেস শুভা রায়—হ্যাঁ হে, এটা

চারুর লেখা নয়? (যোগেশ অন্যমনস্ক হইয়া কি উত্তর দিল বোঝা গেল না। সুরেন খুব মনোযোগ সহকারে খামখানি পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে কি চিন্তা করিতে লাগিল) ওহে, দেখনা একবার।

যো। (চিঠি হইতে মুখ তুলিয়া) কি?

সু। (খামের ঠিকানা দেখাইয়া) এটা কা'র হাতের লেখা হে?

যো। এতো চারুর লেখা। (পুনরায় নিজের চিঠি পড়িতে লাগিল। সুরেন কিছুক্ষণ নির্ব্বাক রহিল।)

সু। কা'কে লিখেছে দেখেছ? (যোগেশ পুনরায় অস্পষ্ট জবাব দিল) আ—ঃ। একবার দেখইনা, কা'কে লিখেছে। (যোগেশ বিরক্ত হইয়া চিঠির ঠিকানা দেখিল।)

যো। শুভার চিঠি। তা'র আবার দেখ্‌ব কি?

(পুনরায় পত্রপাঠে মগ্ন হইয়া গেল। প্রথম পত্র শেষ করিয়া দ্বিতীয় পত্রখানি খুলিতে যাইবে, সুরেন তাহাকে বাধা দিল। যোগেশ তাহার দিকে চাহিল।)

সু। থামো। চারু কি প্রায়ই এইরকম লেখে?

যো। লেখে মধ্যে মধ্যে। বড় একটা নয়। কেন?

সু। তুমি কি হে যোগেশ? এতেও কি তোমার চৈতন্য হবে না? তুমি কি বাস্তবিক ঘুমিয়ে আছ, না জেগে জেগে ঘুমোচ্ছ?

যো। (ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চিন্তা করিল) তোমার বক্তব্যটা কি?

সু। আমার বক্তব্য এই যে তুমি এই চিঠি খুলে দেখতে বাধ্য। (যোগেশ চমকিয়া উঠিল, এবং কিছুক্ষণ সুরেনের দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। তারপর অতি ধীরে ধীরে সুরেনের কাঁধে একটি হাত রাখিল।)

যো। সুরেন, তুমি একটি আস্ত পাগল। শুভার চিঠি আমি খুলব?
(হাসিতে হাসিতে তাহার নিজের চিঠি খুলিয়া পড়িতে লাগিল এবং মধ্যে মধ্যে হাসিতে লাগিল। সুরেন শুভার চিঠি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল, একবার জোড়ের মুখটা পরীক্ষা করিয়া দেখিল।)

সু। না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এ রকম সহ্য হয় না। তুমি অন্ধ বলে তো আর আমরা অন্ধ হ'য়ে যাই নি। তোমার বাধা থাকতে পারে,—কিন্তু তোমার বন্ধু হয়ে এ আমি দেখতে পারব না।··· আমি এ চিঠি খুলব, তোমাকে পারমিশন দিতেই হবে। আমার কি রকম মনে হচ্ছে, এ চিঠি খুললেই তোমার চোখও খুলে যাবে। (অত্যন্ত জোরের সহিত) I take all risks··· পরে আমাকে খুন কোরো, লাথি মেরে দূর করে দিও। I take all risks······কি বল, খুলি? (জিজ্ঞাসুনেত্রে যোগেশের দিকে চাহিল। যোগেশ তাহার নিজের চিঠি পড়িতে পড়িতে বিভোর হইয়া গেছে, সুরেনের একটি কথাও কানে যায় নাই, তাহার প্রশ্নের উত্তরে অসহিষ্ণু ভাবে "হুঁ" "হুঁ" করিয়া মাথা নাড়িল। সুরেন তাহাই সম্মতি বলিয়া ধরিয়া লইল, এবং অতি সন্তর্পণে খামখানি খুলিয়া ফেলিল। তার পর পত্র বাহির করিয়া পাঠ করিল, ও সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল)

সু। যোগেশ!—(চিঠি দেখাইয়া) উঃ! এই দেখ!

যো। ওকি! তুমি চিঠিখানা খুলেছ নাকি?

সু। তুমিই তো বল্‌লে! (যোগেশ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া দন্তে ওষ্ঠ চাপিয়া ভ্রূকুটি করিল।) চটে যেও না। আগে দেখ। (চিঠিখানি সম্পূর্ণ খুলিয়া যোগেশের চোখের সম্মুখে ধরিল।

যোগেশ যন্ত্রচালিতের ন্যায় অন্যমনস্কভাবে পড়িল, প্রথমটা বুঝিতে পারিল না, একবার সুরেনের দিকে চাহিল। পুনরায় পড়িল। পড়িয়া সম্মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সুরেন কি বলিতেছে, কিছুই শুনিতে পাইতেছে না। কি ভাবিতেছে তাহা কিছুই বোঝা যায় না। কিন্তু গভীর চিন্তায় নিমগ্ন তাহা মুখ দেখিলেই বোঝা যায়। শেষের দিকে অতিশয় তীব্র দৃষ্টিতে সুরেনের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিবে, এবং তাহার প্রত্যেক কথাটি লক্ষ্য করিবে।)

সু। কেমন দেখছ তো? (অত্যন্ত পুলকিত, ব্যঙ্গের সুরে) আমরা uncultured, unpolished, চাষাভূষো লোক, ইউরোপ, অ্যামেরিকা দেখিনি, তোমাদের মতন আমরা উদার মন পাব কোথায় বল? "ঘি আর আগুন" নিয়ে কত তামাসাই করেছ। কিন্তু সত্যই কাঙালের কথা বাসি হলে খাটে হে! তা ছাড়া কথাটা তো কাঙালের নয়, তোমার চেয়ে বড় পণ্ডিতের, চাণক্য পণ্ডিতের। ফলল কি না? (আপন মনে) Just in time, by God! (পুনরায় যোগেশকে) এখন বসে বসে ভাবছ কি? প্রতিকার করবে, না এখনও হেসে উড়িয়ে দেবে? কি স্পর্দ্ধা! পরস্ত্রী! উঃ, মনে করলেও সর্ব্বাঙ্গ আগুন হয়ে ওঠে। কি করবে ঠিক করেছ? একটা কিছু তো করতে হবে? (যোগেশের দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিল।)

যো। (স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় সুরেনের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া) হ্যাঁ, —একটা কিছু করতে হবে। হবেই হবে। না করে উপায় নেই।

সু। কি করবে?

যো। কি করব? ভাবতে হবে, একটু ভাবতে হবে। তবে, শেষ করতে হবে, এটা ঠিক। একেবারে শেষ।

সু। (চমকিয়া) সে কি হে, শেষ করবে কি? (যোগেশ চিন্তিত) না, না, হঠাৎ কিছু করে বোসো না। ভেবে চিন্তে যা হয় একটা কিছু স্থির করা যাবে এখন। আমার কথা শুনবে?

যো। শুনব। তোমার কথা শুনব। কিন্তু একটা কিছু করতে হবে, কি বল?

সু। সে আমি ঠিক করে দেব। এখন, তোমার যা কাজ আছে সেটা সেরে নাও। লেখাটা শেষ করে ফেল। তোমার 675 যেন ভুলো না।

যো। আমার 675? (অট্টহাস্য হাসিতে গিয়া থামিয়া গেল। অন্যমনে আংটিটি হাত হইতে খুলিয়া নিবিষ্ট মনে দেখিতে লাগিল। সুরেন তাহা লক্ষ্য করিল। যোগেশের দৃষ্টি সুরেনের দিকে পড়িবামাত্র যোগেশ অপরাধীর মত মুখ নামাইয়া লইল, ও আংটিটি পুনরায় পরিল) হ্যাঁ, কি বলছ? একটা কিছু করতে হবে, না? (হঠাৎ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া) সুরেন, তুমি ঠিক বলেছ,—এর শেষ করতেই হবে,—হবেই হবে,—আজই, to night's the night, my boy! And I want you to be in at the finish, কেমন, আসবে, বল?

সু। দেখি যদি ১০টা আন্দাজ আসতে পারি। কিন্তু তোমার মৎলবটা কি? একটা কিছু করে বসবে না তো? Promise me, আমি না আসা পর্য্যন্ত কিছু করবে না।

যো। না, না, সে সব কিছু ভেবো না। তাছাড়া, তুমি না থাকলে তো কিছুই হবে না। তুমিই তো ঘুম ভাঙিয়েছ আমার, তুমি না থাকলে তো কিছুই হবে না। But you must come.

সু। আচ্ছা আসব। (চিঠিখানির উপর নজর পড়িল) হঁ্যা, চিঠি-খানা পাঠিয়ে দিতে হবে যে। (শুভার চিঠিখানি পুনরায় খামে ভরিয়া গঁদ দিয়া জুড়িল, ও স্পিরিট ল্যাম্পএর শিখায় ধরিয়া সম্পূর্ণরূপে পূর্ব্বেকার মত করিয়া দিল। যোগেশ তাহার প্রত্যেক কার্য্য তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করিতে লাগিল। এবং মধ্যে মধ্যে সুরেনের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল, যেন কোনো অদ্ভুত লোকের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে।) বেহারা! (খান-সামার প্রবেশ) দেখো, বিলকুল চিটঠি মেমসাবকো পাস লে যাও, আপনা চিটঠি চুন লেঙ্গে। (খানসামা যোগেশের দিকে চাহিল, সে যাইবার ইঙ্গিত করিল। খানসামা চিঠি লইয়া চলিয়া গেল।) এইবার আমি চলি। দেখো, এর মধ্যে যেন তোমার স্ত্রীকে কিছু বোলো না। বুঝলে? এতে তাঁরও একটু চোখ ফোটা দরকার।

যো। (শুনিতে পায় নাই) কি বলছ?

সু। বলছি, মিসেস্ রায়েরও এতে একটু শিক্ষা হয়ে যাবে। তিনি আস্কারা না দিলে কি—(যোগেশ এক অদ্ভুত মুখবিকৃতি করিয়া তাহাকে হাত নাড়িয়া চুপ করিতে বলিল, এবং চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া ভাবিতে লাগিল। কয়েক মুহূর্ত্ত পর যেন পথ দেখিতে পাইয়াছে, এই ভাবে উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।)

যো। Got it, by Jove, got it, after all! You're right, old boy, every time! (হাসিতে হাসিতে নিজের আঙুলে গুণিতে লাগিল) one, two, three—

সু। কি হে, কি গুণছ?

যো। (পূর্ব্বেকার মতই হাস্য সহকারে) পাখী হে পাখী!

সু। সে আবার কি?—না, তোমার ভাবগতিক ভালো ঠেকছে না। তোমাকে একলা রেখে যাওয়া খুব বুদ্ধির কাজ হবে না। চল, আমার সঙ্গে একটু ঘুরে আসবে চল।

যো। আরে না না থাক। I am quite all right.

সু। না, আমি শুনব না। চল, একটু ঘুরে আসবে। You are not normal, সব গোলমাল করে বসে থাকবে! একটু মাথায় হাওয়া লাগানো দরকার হয়েছে।

যো। না হে না, থাক।

সু। না, আমি শুনব না। তুমি সব পণ্ড করবে। যাও, কাপড় পরে এস। না, আমি শুনব না। You must! ওঠো! (জোর করিয়া উঠাইল) শুধু মোটরে করেই একটু ঘুরে আসবে, নামতে হবে না। আমি তোমাকে না নিয়ে যাব না; that's flat. যাও, change quickly and come back! (যোগেশ যেন নিঃসহায় শিশুর মত হাসিতে হাসিতে ভিতরে যাইতে উদ্যত হইল, সুরেন থামাইল) কিন্তু দেখো! Not a word to the wife, বুঝলে? এখন একটি কথাও নয়। (যোগেশ মাথা নাড়িয়া চলিয়া গেল। সুরেন কপালের ঘাম মুছিয়া চেয়ারে বসিল...কিছুক্ষণ ভাবিতে লাগিল, চোখেমুখে প্রতিহিংসা-তৃপ্তির প্রতিচ্ছবি। এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে যোগেশের খাতার দিকে দৃষ্টি পড়িল। সেটিকে তুলিয়া লইয়া পাতা উল্টাইতে লাগিল। হঠাৎ টেবিল হইতে পেন্সিল কাগজ লইয়া খাতার কোনো স্থান হইতে নকল করিতে লাগিল। এমন কৌশলের সহিত এই কার্য্যে ব্যাপৃত হইল যে হঠাৎ কোনো লোক আসিয়া পড়িলেও কাগজটি লুকাইয়া ফেলা

অসম্ভব হয় না। মধ্যে মধ্যে দরজার দিকে দেখে। নকল শেষ হওয়ার দিকে যোগেশ প্রবেশ করিল, সুরেন ক্ষিপ্রহস্তে কাগজটি লুকাইয়া লইল, খাতাটি প্রকাশ্যে ধরিয়া রহিল। যোগেশের মুখ দেখিলে মনে হয় না যে সে এই চুরি দেখিতে পাইয়াছে।)

সু। তোমার খাতাটা দেখছিলুম। I hope, you don't mind. কিন্তু কিছুই বোঝা যায় না যে হে! থাক। চল, চল, এইবার বেরিয়ে পড়া যাক। তোমার স্ত্রীর সঙ্গে কোনো কথা? (যোগেশ মাথা নাড়িল।) That's very good! চল। (যোগেশ স্থির হইয়া কি ভাবিতেছে।) কি হে, আবার ভাবছ কি?

যো। না, কিছু না। But, (হাসিতে হাসিতে) what a day, by Jove! What a glorious, glorious day!

সু। আবার পাগলামি সুরু করলে? না, আর দেরী করা নয়, চল। (তাহাকে টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া গেল। যাইবার সময়ে যোগেশ আবার তাহার দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিল।)

যো। কিন্তু একটা কিছু করতে হবে, না?···(উভয়ে প্রস্থান করিল। তারপর কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলে অকস্মাৎ উদ্‌ভ্রান্ত, উত্তেজিত ভাবে শুভা প্রবেশ করিল। সদ্যস্নাতা, মুক্তকেশ পিঠের উপর ছড়ানো, মাথায় কাপড় নাই, শাড়ীর অঞ্চল মাটিতে লুটাইতেছে। বেগে প্রবেশ করিয়া কক্ষ শূন্য দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। বদ্ধমুষ্টির মধ্যে চারুর চিঠি। চোখ মুখ উদ্দীপ্ত, ভ্রূকুটিভরা তীক্ষ্ণ চাহনি।)

শু। Boy! ("হুজুর।" বলিয়া খানসামা প্রবেশ করিল।) সাব?

খা। সাব আবি বাহার গিয়া মেম সাব।

শু। আচ্ছা, যাও। (সোফায় বসিল। সেখানে যোগেশের আলখাল্লাটি পড়িয়া ছিল। কিছুক্ষণ নিশ্চল অবস্থায় বসিয়া থাকিবার পর সেটির উপরে শুভার দৃষ্টি পড়িল। অন্যমনস্ক ভাবে সেটিকে হাতে জড়াইতে জড়াইতে একবার আবেগভরে সেটিতে নিজের মুখ লুকাইল। বোধ হয় কাঁদিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে উঠিয়া স্থির হইয়া বসিল, এবং টেবিলের উপর হইতে দোয়াত, কলম, চিঠির কাগজ, খাম আনিয়া চিঠি লিখিতে বসিল। চিঠিখানি সমাপ্ত করিতে না করিতে খানসামার আওয়াজ শুনিতে পাইল,—"কার্ড, মেমসাব।" অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল,—"লে আও!" খানসামা কার্ড লইয়া প্রবেশ করিল। শুভা কার্ড দেখিয়া প্রথমে হতবুদ্ধি হইয়া গেল,—কারণ কার্ড-খানি চারুর, পরে তাহার ক্রোধের মাত্রা শতগুণে বাড়িয়া গেল।)

শু। সাব নেহি হ্যায় বোলাথা?

বে। জি হুজুর। তব্ আপকো কার্ড দেনে কহিন্। (শুভা অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কিন্তু একবার নিজের লেখা চিঠির দিকে নজর পড়াতে নিজের কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইল।)

শু। আচ্ছা, সেলাম দেও। (খানসামা "বহুত আচ্ছা, হুজুর" বলিয়া চলিয়া গেল। শুভা নিজের কেশবেশ সংযত করিয়া কঠিন ভাবে চারুর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে চারু প্রবেশ করিল। তাহার বদন শুষ্ক, অতি দীনহীন ভাব।)

শু। আপনি এখানে কি চান? কোন সাহসে আপনি আবার এ বাড়ীতে ঢোকেন? আপনি আমাকে কি ভেবেছেন? (চারু

নত মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।) এতবড় অপমান করবার সাহস আপনার ? তাঁর বন্ধু ভেবে আপনাকে আমি বন্ধুর স্থান দিয়েছিলুম, কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি আপনি এত নীচ, এত জঘন্য ! (টেবিল হইতে তাহার সদ্যলিখিত চিঠি তুলিয়া লইয়া চারুর দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।) ঐ নিন আপনার প্রেমপত্রের উত্তর। চলে যান আমার সমুখ থেকে,—আর কখনও আসবেন না। (মুখ ফিরাইয়া লইল। চারু নীরবে চিঠিখানি তুলিয়া লইল, পাঠ করিল না। নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।) দাঁড়িয়ে রইলেন যে !

চা। আমার একটা কথা আছে।

শু। কোনো কথা শুনতে চাইনে, আপনি যান।

চা। মাত্র একটি কথা।

শু। আধখানাও নয়। Boy ! ("হুজুর" বলিয়া খানসামা প্রবেশ করিল) সাব্‌কো ফাটক দেখ্‌লা দেও। (চারু অপমানে, লজ্জায় যেন মরিয়া গেল। কিন্তু কোনো কথাই বলিল না। স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।)

বেহারা। এক মায়ীজি আয়েহেঁ।

শু। মায়ীজি ? কোন্ মায়ীজি ?

চা। আমার মা।

শু। আপনার মা ? তিনি কি চান্ (চারুর মাতার প্রবেশ) আচ্ছা আভি তুম যাও। (খানসামা চলিয়া গেল। চারুর মাতার শান্ত, স্থির, আত্মসমাহিত মূর্ত্তি দেখিয়া শুভা আপনা হইতে কিঞ্চিৎ অভিভূত হইয়া গেল, এবং কিছু না বলিয়া তাহার দিকে চাহিল।)

মা। না বলে ঢুকে পড়েছি মা, কিছু মনে কোরো না। অন্য উপায় ছিল না। তোমার স্বামী বাড়ী নেই? (শুভা নীরবে মাথা নাড়িল) না থাকুন, তুমি তো আছ তাহলেই আমার চল্‌বে। তোমাকেই যে আমার বিশেষ দরকার। (শুভাকে আপাদমস্তক একবার দেখিয়া যেন প্রীতি হইলেন।) চারুর চিঠি পেয়েছ? (শুভা ঘাড় নাড়িল।) মা, আমি বেশী কিছু বল্‌তে পার্‌ব না। তোমাকে দেখেই বুঝেছি তুমি সতীলক্ষ্মী, আমার ছেলে তোমাকে অপমান করেছে। মুহূর্ত্তের ভুলে তোমাকে বড় কষ্ট দিয়েছে। কিন্তু ভুল, মা, ভুল! ভুল কি মানুষে করে না মা? বড় অনুতপ্ত হয়ে তোমার কাছে এসেছে, ক্ষমা ভিক্ষা করতে। তাকে মাপ করবে না মা? (শুভা তথাপি নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।) বুঝেছি মা, তোমার বড় আঘাত লেগেছে। কিন্তু তুমি বিশ্বাস কর, এ আঘাত শুধু তোমার নয়, আমার প্রাণেও লেগেছে। নইলে ওকে একাই পাঠাতুম। কিন্তু না এসে পারলুম না। মা, তোমার মা আছেন কিনা জানিনে, কিন্তু আমি তোমার মার বয়েসী হব বোধ হয়। আমার ছেলের হয়ে তোমার কাছে হাত জোড় করে ক্ষমা চাইছি,—আমাদের মাপ কর মা! (করজোড় করিলেন।)

শু। (একেবারে গলিয়া গিয়া,—চারুর মাতার হাত ধরিয়া ফেলিল।) ও কি! কি করছেন? আপনি? আপনি আমার কাছে মাপ চাইছেন কেন? ছি, ছি, আমাকে অপরাধী করবেন না। আপনি বসুন। (চারুর মাতা চারুকে ইঙ্গিত করিলেন। চারু তৎক্ষণাৎ শুভার সন্নিকট হইয়া জোড়হস্তে শুভার চরণস্পর্শ করিতে যাইবে, শুভা তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল।) এ কি!

ছি, ছি, মিঃ ঘোষ, একি করছেন? (চারু পুনরায় তাহার পায়ের দিকে ঝুঁকিল।) আচ্ছা, আচ্ছা, বলছি, আপনার সব অপরাধ ক্ষমা করলুম। আমি তো জানতুম না যে আপনার এমন মা আছেন! শুধু এই গৌরবেই যে আপনার সব দোষ ভুলে যাওয়া যায়। বসুন মা, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? (চারুর মাতা বসিলেন। তারপর শুভা ও চারুও বসিল।)

মা। আমরা শুধু এই জন্যেই তো আসিনি। বিদায় নিতেও এসেছি।

শু। বিদায় নিতে? সেকি?

মা। আমরা যে শনিবারের ষ্টিমারে রেঙ্গুনে যাচ্ছি।

শু। সেকি? কতদিনের জন্যে? হাইকোর্ট কি এখন বন্ধ?

মা। না মা, তা নয়। চারু এখন রেঙ্গুনেই প্র্যাকটিস্ কর্‌বে।

শু। সেকি? কই আগে তো শুনিনি? (চারু ও তাহার মাতা নীরব) তবে কি এই জন্যেই?

মা। তোমার কাছে মিথ্যে বল্‌বনা মা, কতকটা তাই বটে, তবে অন্য কারণও আছে। অনেকদিন থেকেই ওর মামা,—আমার একটিমাত্র ভাই—ওকে ডেকে পাঠাচ্ছেন। তিনি সেখানকার একজন পুরানো ব্যারিষ্টার। চারু গেলেই তিনি অবসর নেবেন। তাঁর সব কাজ চারু পাবে। তাঁর তো ছেলেপুলে নেই। (শুভা নতমুখে ভাবিতে লাগিল।)

শু। বুঝেছি মা। কিন্তু এছাড়া কি আর উপায় ছিল না? এসব তো আমি ভুলে যেতুম।

মা। না মা, তুমি ক্ষুণ্ণ হোয়ো না। শুধু ঐ কারণই নয়। এখানকার কাজকর্ম্মের অবস্থা তো জানো। এ কথা তো অনেকদিন থেকেই চলছে। কেন, চারু তোমাকে বলে নি?

শু। কই, না!

মা। আচ্ছা মা, তাহলে আমরা চললুম। আবার দেখা হবে নিশ্চয়। (উঠিলেন, সঙ্গে সঙ্গে শুভা ও চারুও উঠিল।)

শু। একটু দাঁড়ান। (চারুকে) আপনি ওঁর চিঠি পেয়েছেন?

চা। কিসের চিঠি? কই না!

শু; আপনাকে আজ রাত্রে খাবার নেমন্তন্ন করেছেন। ওঁর সেই ওষুধটা বেরিয়েছে কিনা।

চা। (সোল্লাসে) বেরিয়েছে? কবে?

শু। আজ সকালে। সেই জন্যে একটু আমোদ করতে চান। সেটা আমি নষ্ট করতে চাইনে। আমার ইচ্ছে আপনি আজ আসবেন। মা, আপনি ওঁকে পাঠিয়ে দেবেন। (চারু ভাবিতে লাগিল।)

মা। নিশ্চয় আসবে। আমি পাঠিয়ে দেব। ওর কাজ বাকি আছে যে। তোমার স্বামীর কাছেও এমনি করে ক্ষমা চেয়ে যাবে। তুমি তাঁকে এখনও বলনি বোধ হয়?

শু। না।

মা। তাহ'লে এখন বোলো না। চারুই বল্‌বে।

শু। না, না, তাঁকে আর জানাবার দরকার কি? এ তো সব চুকে গেল, আর কেন?

মা। না মা, ও ভুল কোরোনা। এ সব চাপা থাক্‌লে চুকে যায় না। সব প্রকাশ করে দিতে হয়। নইলে প্রায়শ্চিত্ত হয় না, গ্লানি যায় না। চারু ওর নিজের মনের শান্তির জন্যেই সব জানিয়ে দেবে। তারপর, তোমার স্বামীর যা ইচ্ছে হয় করবেন।

শু। মা, আমি কি বল্‌ব। তিনি যা কর্‌বেন, তা আমি জানি।

আমার দুঃখ রইল, আপনি তাঁকে দেখলেন না। আচ্ছা বেশ, আপনার যখন ইচ্ছে, তখন তাই হবে। (চারুর প্রতি) আপনার সঙ্গে তো সন্ধ্যেবেলা দেখা হবে। (চারুর মাতার পদপ্রান্তে প্রণাম করিল) ভুলে যাবেন না মা।

মা। (তাহাকে হাত ধরিয়া তুলিয়া বুকের কাছে টানিয়া আনিলেন এবং চিবুকে হাত দিয়া চুম্বন করিলেন।) ওমা সেকি? চির এয়োস্ত্রী হও মা, স্বামীপুত্র নিয়ে সুখে সংসার কর। কিরে চারু! এই তোদের নৈকষ্যকুলীন বিলেতফেরতের জাতের মেয়ে, নয়? (চারু হাসিল) তা হোক! আমি তো চিনি। এ যে আমাদেরই মেয়ে, জুতো মোজা আর ঘুরিয়ে শাড়ী পরলে কি হবে? (এইবারে শুভা হাসিয়া ফেলিল।) তোমাকে কি ভুলতে পারি মা? (একটু থামিয়া) তবে এখন আসি মা?

শু। কলকাতায় এলে নিশ্চয় জানাবেন, আমি গিয়ে দেখা করব।

মা। নিশ্চয় জানাবো। আমি নিজে এসে নিয়ে যাব। আচ্ছা, তবে আসি। (শুভা আবার তাঁহাকে প্রণাম করিল, ও চারুর মাতা তাহাকে মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।) আয় চারু। (চারু ও শুভা নমস্কার বিনিময় করিল। চারু ও তাহার মা প্রস্থান করিলেন। শুভা স্মিতমুখে বিহ্বল নয়নে সেই দিকে চাহিয়া রহিল।)

[পটক্ষেপ

পৃথিবীর পাগলামী

রকফেলারের সঙ্গে এই সাক্ষাৎ হবার পর লেখকের ফোর্ডের সঙ্গে দেখা করবার কথা ছিল; কিন্তু ফোর্ড তখন তাঁর আর্থারের ঐতিহাসিক মিউজিয়ামে প্রাচীন আমেরিকা সংক্রান্ত ঐতিহাসিক তথ্য ও বস্তু সাজাতে ব্যস্ত ছিলেন; এই সংগ্রহের জন্য ইনি আজ পর্য্যন্ত প্রায় এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ ডলার খরচা করেছেন। যাই হোক্, ফোর্ডের সঙ্গে দেখা কর্ব্বার আগে যে সময়টুকু ছিল, সেই সময়ের মধ্যে লেখক বিখ্যাত 'জার্ণলিষ্ট' আর্থার ব্রিস্‌বেনের সঙ্গে দেখা করেন। ইনি সংবাদপত্র সেবা কার্য্যে যে রোজগার করেন, অন্য কেহই এত রোজগার করে না, এবং এঁর পাঠক সংখ্যা এত যে, অন্য কান জার্ণালের পাঠক সংখ্যার সঙ্গে তার তুলনাই হয় না। এই ভদ্রলোকই হার্ষ্ট-এর সম্পাদক, যিনি 'এডিটোরিয়েল' লেখেন্। এই কাগজ থেকে, এঁর বছরের নির্দ্দিষ্ট মাইনে হচ্ছে, তিন লক্ষ ডলার।

তাঁর সঙ্ঘের জার্ণালরা ক্রাইসিস্ সম্বন্ধে কি ধারণা করে বা এ সম্বন্ধে কি করে বা এটাকে দমন করবার জন্যে কি সাহায্য প্রদান করে, এ কথা লেখক তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "আমরা যা কর্ত্তে পারি, এবং সব চেয়ে বেশী যা কর্ত্তে পারে আমাদের সম্পাদকীয় মন্তব্য (editorial) সে হচ্ছে পাঠকের মনে চিন্তার অবসর দেওয়া, এই পর্য্যন্তই। প্রতিদিন কেন আমরা লক্ষ লক্ষ লোককে আহ্বান করি? —কারণ, এডিটোরিয়ালের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সংজ্ঞা হচ্ছে এই,—Editorial writing is the art of saying in a commonplace, 'what everybody knows long ago, এই। ব্রিস্‌বেন ও তাঁর মনিব

আর. ডব্লিউ. হার্ষ্ট! তাঁদের কাগজের প্রতিদিন নব্বুই লক্ষ কপি ছাপা হয় সুতরাং দু কোটি ষাট লক্ষ আমেরিকান্ পরিবারের প্রতি তিন জনের এক জনকে এঁদের কাগজ স্পর্শ করে। ব্রিস্‌বেন অবশ্য আমেরিকার অতি সাধারণ ধারণা নিয়েই কথা বলেছিলেন, কারণ আমেরিকায় সংবাদপত্রের মতের কোন মূল্যই নেই, যা কিছু ব্যাপার, সংবাদ নিয়েই।

* * *

এরোপ্লেনে দুরাত্রি। ফোর্ড অতি অল্পই কথা বলেন, এবং যা বলেন, তা অতি দ্রুত।

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে, পিতৃ পিতামহের এক পুরোন গোলাবাড়ীর উঠানে ইনি এক মোটরের উপর হাতুড়ীর ঘা দিয়ে পাড়া-প্রতিবাসীদের ঘুমুতে দেননি।......সে যুগে ইনি এক নতুন জগতের উপর হাতুড়ী মারতে আরম্ভ করেন, যার গণ্ডগোল শীঘ্রই সমস্ত জগতে ছড়িয়ে পড়ে, কাহাকেও ঘুমুতে দেবে না। তাঁর তাড়নাই আজ সমস্ত জগৎকে ক্রাইসিসে নিক্ষেপ করেছে কি না, কে জানে?

ইনি কিছুদিন হোল, এঁর কারখানার জনমজুর কর্ম্মচারীদের কিছু কিছু করে জমি দিয়েছেন, যার দ্বারা এরা কিছু ফসল তৈরী করে এর আর্থিক অস্বচ্ছন্দতা থেকে একটুও রেহাই পেতে পারে।

ইনি লেখককে বল্লেন, "আমাদের দেশের আজকের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ হচ্ছে, আমাদের কৃষকদের দুর্দ্দশা। কৃষি-'ক্রাইসিসের' ফলে, কোটী কোটী ক্রেতা আজ বিপদগ্রস্ত।* কৃষকেরা অর্থ চাইছে, কিন্তু ব্যবসাসংক্রান্ত খুব কম ব্যাধিই খালি অর্থের দ্বারা আরাম করা যায়। লাভ যদি কম হয়, জীবন ধারণের জন্যে যতটুকু অর্থের দরকার

---

* অর্থাৎ কৃষকরা আজ পয়সার অভাবে 'অটোমোবিল্ কিনতে পারছে না।

তাও কুলিয়ে ওঠে না। কৃষক অর্থ দিয়ে মৃত্তিকাকর্ষণ করে না, কাজেই তার যে বিপদ তা অর্থসংক্রান্ত নয় এবং বিক্রয় করার প্রশ্নেরও ওপর খালি নির্ভর করে না; নির্ভর করে বরং উৎপাদন-কার্য্যের উপর।” হেন্‌রী ফোর্ড কাঁচের এক ‘হ্যাঙারের’ সাম্‌নে পায়চারী কর্ত্তে কর্ত্তে হঠাৎ থেমে আবার বল্‌তে আরম্ভ করলেন, “আমাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে, কৃষিকার্য্য ও ইণ্ডাষ্ট্রী এ দুটো দুরকম জিনিষ এবং একের সঙ্গে অন্যের সম্বন্ধ নেই, এই ধারণা ভুলে যাওয়া। এ দুটোর মেলা উচিত এবং ইণ্ডাষ্ট্রীর গ্রামে গ্রামে গিয়ে বসা উচিত। এই এক পথ, যার দ্বারা ইতিমধ্যেই আমরা কিছু সফল হয়েছি। কৃষির industrialisation ততদিন সফল হবে না, যতদিন পর্য্যন্ত না, কৃষকেরা বুঝ্‌বে যে, আইনের * দ্বারা বা অর্থের † দ্বারা কৃষিকার্য্য চলে না; এর ফলেই, ‘ক্রাইসিস’ ক্রমশঃ দূরে চলে যাবে।”

*　　　*　　　*

পাঁচ দিনের হপ্তা, কৃষিকার্য্যের রূপান্তর, জাতদ্রব্যের পরিবেশনের অন্য প্রথা, নির্দ্দিষ্ট পথে চালান অর্থনীতি,—এই হচ্ছে কয়েকটি উপায় যার দ্বারা এই অর্থ-নৈতিক সমস্যার সমাধান হোতে পারে, এ কথা লেখক বারে বারেই শুনেছেন।

সকলের সঙ্গেই লেখকের এ বিষয়ে কথাবার্ত্তা হয়, বাকী ছিলেন খালি টমাস এলভা এডিসন; যে সমুদয় উপায়ের আবিষ্কার ফলে আজ জগৎ এত উন্নত, তার অধিকাংশই যিনি একাই আবিষ্কার

* আইন্, যথা, কংগ্রেস গত বছরে কৃষক সমাজে তিনশো কোটী টাকা সাহায্য করেছে; সেটা একটা আইনের ফলেই। ফ্রান্সেও যেমন আইন হয়েছে যে, সরকার কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট দামের নীচে কেউ গম বিক্রী কর্ত্তে পার্ব্বে না।

† অথবা ক্রেডিট্।

করেছেন, অথচ যাঁর সমস্ত আবিষ্কারই আজ সকলের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছে ইনি সেই এডিসন্। মৃত্যুর পনের দিন পূর্ব্বে লেখক এই স্বনামধন্য পুরুষের সঙ্গে দেখা করেন। এঁর সংবাদ জান্‌বার জন্যে ব্যগ্র হয়ে এঁর বন্ধুরা নিউজার্সির ওয়েষ্ট অরেঞ্জে আসেন এবং সঙ্গে সঙ্গে লেখককেও নিয়ে আসেন। কিছুদিন পূর্ব্বে এডিসন্ বড় ভুগছিলেন; একটু ভাল হয়ে আবার তখন কাজে লেগেছেন। তিনি লেখককে অভ্যর্থনা করেন; সেইই শেষ ইণ্টারভিউ, যা তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে দিতে পেরেছিলেন।

বিখ্যাত আবিষ্কার কর্ত্তা, তাঁর লাইব্রেরি ঘরে বসে বলতে লাগলেন "আমাদের যুগ 'দ্রুতগামিতায়' ও 'অসন্তোষে' অন্য সমস্ত যুগকে ছাড়িয়ে গেছে, আর ঠিক্ এই দুটি জিনিষই উন্নতির অগ্রগামী দুই দূত।" এক গ্লাস দুধ পান করে, তিনি লেখককে জিগ্যেস্ করলেন, ঠিক্ কি বিষয় আপনি জান্‌তে চান্?" লেখক বল্লেন, "সমস্ত বড় বড় ইণ্ডাষ্ট্রীই আজ আপনার আবিষ্কারের ভিত্তির উপর গঠিত..........."

এডিসন্ প্রায় হেসে, এক ব্লক্ কাগজ ও কতকগুলো পেন্‌সিল লেখকের দিকে এগিয়ে দিয়ে বল্লেন, "শুনেছি যে, আমার পেটেণ্ট যারা exploit করে সেই সব ইণ্ডাষ্ট্রীতে দশ বিলিয়ন ডলার খাটে। এই অর্থ-বাজারের দুরবস্থা সত্ত্বেও এই সব কারবারের অন্ততঃ এক বিলিয়ন লাভ করা উচিত। ব্যক্তিগত ভাবে আমি সে সব বিলিয়নের কিছুই পাই নি। ব্যবসাদার হিসাবে আমি finanacially successful বটে, কিন্তু আবিষ্কারক হিসেবে নয়। গত দশ বৎসর যাবৎ আমার আবিষ্কারের ফল নিজে ভোগ কর্ব্বার জন্যে আমাকে ক্রমাগতই সংগ্রাম কর্ত্তে হচ্ছে। সর্ব্বদাই লোকে আমার বিপক্ষে আদালত করেছে, কেবল সময় নেবার ফন্দীতে। আমার ৭৯ ইলেক্‌ট্রিক্ বাল্‌ব্ যাতে বাজারে

চলে, এজন্যে আমি আজ চোদ্দ বছর ধরে লড়াই করছি। আইনানুসারে আমেরিকায় পেটেণ্ট সতের বছর রক্ষিত হয়। কাজেই আমার হাতে আর বেশী দিন নেই যে, এর লাভ যোগ কর্ব্ব। যা কিছু 'নর্ম্মাল,' তার জন্যে আজ কত সংগ্রাম, কত রকম অশান্তি,—কেহই এ বিষয়ে চিন্তা করে না। আপনি জিগ্যেস কচ্ছেন যে, পরবর্ত্তী ত্রিশ বছরে অতীতে যত নতুন নতুন আবিষ্কার হয়েছে, তত হবে কি না। আমি এ বিষয়ে একেবারে স্থির নিশ্চিন্ত হয়েছি। জিগ্যেস করছেন, পরবর্ত্তী আবিষ্কার কি বিষয়ের প্রতিবিধান করবে?—আমি তা দিব্য দৃষ্টিতে দেখবার চেষ্টা করতে চাইনে, আমি কখনই রহস্য ভাঙবার চেষ্টা করিনি। আমার যা কিছু সফলতা তার শতকরা একভাগ inspiration-এর ওপর, আর বাকী নিরেনব্বই ভাগই long systematic and arduous গবেষণার ওপর নির্ভর করেছে। আমার কাজ আমার মত বৃদ্ধ লোককেও সন্তুষ্ট করেছে, যদিও তাতে আমায় খুব বড় লোক করেনি।

* * *

আমেরিকার যে সব বিখ্যাত লোকের সঙ্গে লেখকের আলোচনা হয়, সে সব আলোচনার সঙ্গে লেখকের অন্য এক আলোচনা যোগ করবার বড়ই ইচ্ছা ছিল ; সেটা হচ্ছে, অন্য কোন আবিষ্কার কর্ত্তাকে খুঁজে বার করা, যিনি এই কলকারখানার যুগের যে ভীষণ সমস্যা তা সমাধান করে, জীবন ধারণের কিছু নতুন উপায় আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছেন। কিন্তু আমেরিকায়, তিনি এ বিষয়ে বিফলমনোরথ হ'ন কিন্তু তবুও তিনি এটা স্বীকার করতে বাধ্য যে, আমেরিকা কয়েক বর্ষ পূর্ব্বে, এমনকি কয়েকমাস পূর্ব্বেও, এত গর্ব্বিত, এত চিন্তাশীল ও তার সফলতা সম্বন্ধে এত নিশ্চিন্ত ছিল, সেই আমেরিকা আজ বিশ্বাস করতে

আরম্ভ করেছে যে, এ সভ্যতাযুগের প্রায় শেষদিনে এসে সব ঠেকেছে এবং নতুন একটা প্ল্যান, নতুন এক জীবন ধারণোপায়, খুঁজে শীঘ্রই বা'র করা অবশ্যকর্ত্তব্য।

কিন্তু আমেরিকাও এই নতুন ধরণের জীবন যাপন সম্বন্ধে কিছুই জানে না। আটলান্টিকের অপরপারেও, লোকে জানে না, কেমন করে এই বিশৃঙ্খলা থেকে পথ খুঁজে বের করা যায়।

* * *

একদিন ও একরাত্রির 'জার্ণির' পর, লেখক এবার হলিউডে। ১৯২৯ সালে, অর্থাৎ তিনবছর আগে, লেখক যে এখানে চাকরী করে গেছেন, একথা লেখকের স্মরণ হয়। এদিনের মতই, তিনি সেই বিরাট আলোকিত হলঘর, যাতে তিনি দুমাস কাটিয়ে গেছেন, দেখলেন নতুন মুখ যদিও, নতুন কর্ত্তা যদিও, রুটীন সেই আগের মতই।

১৯২৯ সালে, এখানে, ইনি 'মেশীন' সাহায্যে খোলা খাম থেকে 'সীনারিও' টেনে বা'র করতেন, সমস্তদিন ধরে এই তাঁর কাজ ছিল। এই সব খাম, ফ্রান্স থেকে, বলকান উপদ্বীপ থেকে, চীন থেকে, যে যে স্থানে লোকে বাস করে, জগতের সে সব স্থান থেকেই, আসত। লেখকের কর্ত্তব্য ছিল, এই সব সীনারিও, যা কখনই পড়া হয় না, তার সঙ্গে polygraphed refusal এর এক কপি জুড়ে ফেরৎ পাঠান।

তাঁর সোসাইটী এ কাজের জন্যে তাঁকে হপ্তায় আঠার ডলার মাইনে দিত! অন্যান্য সব 'সিনেম্যাটোগ্রাফিক্ ফার্ম্মেও' এই রকমের চাকরীর অভাব নেই কারণ 'সিনেমা ইণ্ডাষ্ট্রী,' অটোমোবিল ইণ্ডাষ্ট্রীর মতই এ দেশে বেশ রীতিমতই organised।

যাই হোক্, এইরকম ভাবেই কয়েক হাজার পাণ্ডুলিপি 'সিনারিও' ও 'আইডিয়া,' লেখকের কার্য্যকালে তাঁর হাত দিয়ে, যেন কলের মত

গিয়েছিল; পার্শ্বের অন্যান্য ব্যুরো সমূহে এ সব কাগজ পত্রের প্রবেশ কর্ব্বার কোন সুযোগই ছিল না, কারণ সে সব ঘরে সাতাশ জন সাহিত্যিক সর্ব্বদাই তাঁদের master pieces তৈরী কার্য্যে, অথবা Dumasর নভেল, বা বাইবেল বা ব্রড্‌ওয়ের latest success কাটা কার্য্যে ব্যস্ত থাকতেন্। লেখক যে ঘরে কাজ করেন, ডিরেক্টাররা সেথায় কখনও পদার্পণ কর্ত্তেন না এবং কোন 'সীনারিও রাইটারই' অনুগ্রহ করে সেই এত আশার সঙ্গে লেখা সব কাগজ হাতে তুলে দেখতেন না। তাঁদের কারুই সময় ছিল না। লেখকের নিজেরও সে সব পড়বার সময় ছিল না, কাজেই ফেরৎ পাঠাতে হোত। অথচ কে জানে সে সব কাগজের মধ্যে কখনও কখনও master pieces থাকত কি না?……কিন্তু কে দেখবে সেই গাদা গাদা, দিস্তে দিস্তে কাগজ? পরীক্ষা করে দেখা তো দূরের কথা, খালি সেগুলো পড়তেই তো যুগান্তর কেটে যাবে!—

Carl Laemmle লেখককে বলেছিলেন, "জানি, এই রকম ভাবে আমরা অনেক new talents হারাচ্ছি। কিন্তু এটাও দেখতে হবে যে, যদি আমরা পাহাড় পরিমাণ কাগজ সব দেখতে আরম্ভ করি, তা'হলে তার পিছু আমাদের যে খর্চা হবে, সেটা, দুতিনখানা ভাল ভাল worksএর দরুণ আমাদের যে আয় হবে, তাকেও ছাড়িয়ে যাবে। আবার অন্য দিকে ভেবে দেখুন বিখ্যাত গ্রন্থকারদের সঙ্গে আমরা কিরকম সুন্দর চুক্তি করি; এঁদের শুধু নামই বিনা পয়সার বিজ্ঞাপন, এঁদের নামই কেবল কত দর বাড়ায়………"

কিছুদিন বাদে যখন কর্ত্তারা বুঝলেন যে, লেখক যথেষ্ট পরিমাণে 'সীনারিও' "দুঃখের সহিত প্রত্যর্পিত হইল" করেছেন তখন তাঁরা তাঁকে সেক্রেটেরিয়েটে বদলী কর্লেন—'জার্ম্মান চিঠিপত্রের বিভাগে।' সেখানে প্রতিদিন একশো দশ থেকে একশো ষাট উত্তর পাঠাতে হোত। "দুঃখের সঙ্গে প্রত্যর্পণের" মামুলী বোলের পাঁচ রকম বিভিন্ন polygraphed কাগজ টেবিলের ড্রয়ারে ভর্ত্তি থাকৃত। দুজন steno এখানে কাজ কর্ত্ত।

প্রতি পত্রেরই ধাঁচে মনে হোত যে পত্র লেখকদের অনেকেরই বিশ্বাস

আমেরিকায় সব ডলার নিয়ে খেলা করে। আশ্চর্য্য রকমের সব চিঠি! উদাহরণ স্বরূপ—তেরা বেঁকা রোগা ধরণের এক যুবক তার ফোটো পাঠিয়ে সেই সঙ্গে লিখছে,—"আমার বয়স মাত্র একুশ এবং আমার গানের গলা শুনে Monsieur l'abbe' de Rutt-berg আমাকে অনেক তারিফ করেছেন। Talkies সম্বন্ধে আমার অনেক রকম ফন্দী মনে আছে। আমি আপনাদের ষ্টুডিওতে গান কর্ত্তে চাই। অনুগ্রহ করে আমার রাহা খর্চা পাঠাবেন, কারণ আমার নিশ্চয়ই বিশ্বাস যে, সে কয়েক ডলারের জন্যে আপনাদের কোন অসচ্ছলতা হবে না…"। আপনারা ভাবছেন এটা ঠাট্টা, মোটেই না, অতি বিশ্বাসে seriouslyই লেখা। লেখকের হাতে এরকম ডজন খানেক চিঠি আছে, যা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে এসেছে, যথা—বার্লিন, তুলোঁ, পারী, মার্সেই, হংকং এমন কি তীরোলের ছোট ছোট গ্রাম থেকেও।

Screenই আধুনিক যুগে দেব প্রতিমূর্ত্তির স্থান দখল করেছে। কত কত জনই সর্ব্বদা স্বপ্ন দেখছে এই হলিউডের এবং বিনা খাটুনিতে সেখানে দৈবক্রমে কেমন বাজী জেতা যায় অর্থাৎ সৌভাগ্য অর্জ্জন করা যায়। এদের মনের দৃঢ় বিশ্বাস যে, এখানে এলেই চাকরী মিলবে। Studio-তে কোন রকমে প্রবেশের সুযোগ পেলেও কয়েক বছরে এদের জীবন নষ্ট হয়ে যাবে, তাও এরা জানে, তবুও……! পোলা নেগ্রী লেখককে বলেছিলেন, "কেমন করে আপনাকে বুঝিয়ে দেব, projector-এর এই দহনকারী আলোর নীচে এই অন্তর্দাহী কাজ করা আমি কত ঘৃণা করি……"; Screenএর Don Quixoteরা? দশটা নরম কথা, অমি তাদের সব আশা ভর্সা নষ্ট। * শারীরিক সৌন্দর্য্য? লেখক অনেক সুন্দরী মহিলাই এখানে দেখেছেন, যারা practically stranded বল্লেই চলে, অর্থাৎ কোন উন্নতিই কর্ত্তে পারে নি। হলিউড্—সে একটা দুর্গের মতই, যার দরজা খোলবার চাবী হচ্ছে—সিদ্ধি, জীবনের সফলতা, success।

* অর্থাৎ ডিরেক্টারের মিষ্টি কথাই কেবল, কিন্তু তাতে তো চিঁড়ে ভেজে না; কাজেই, অনেকেরই ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়। ইতি। অঃ

চলচ্ছবি

কৌতূহল

দেখ মা, শিশির ভাদুড়ী

ধৈর্য্য

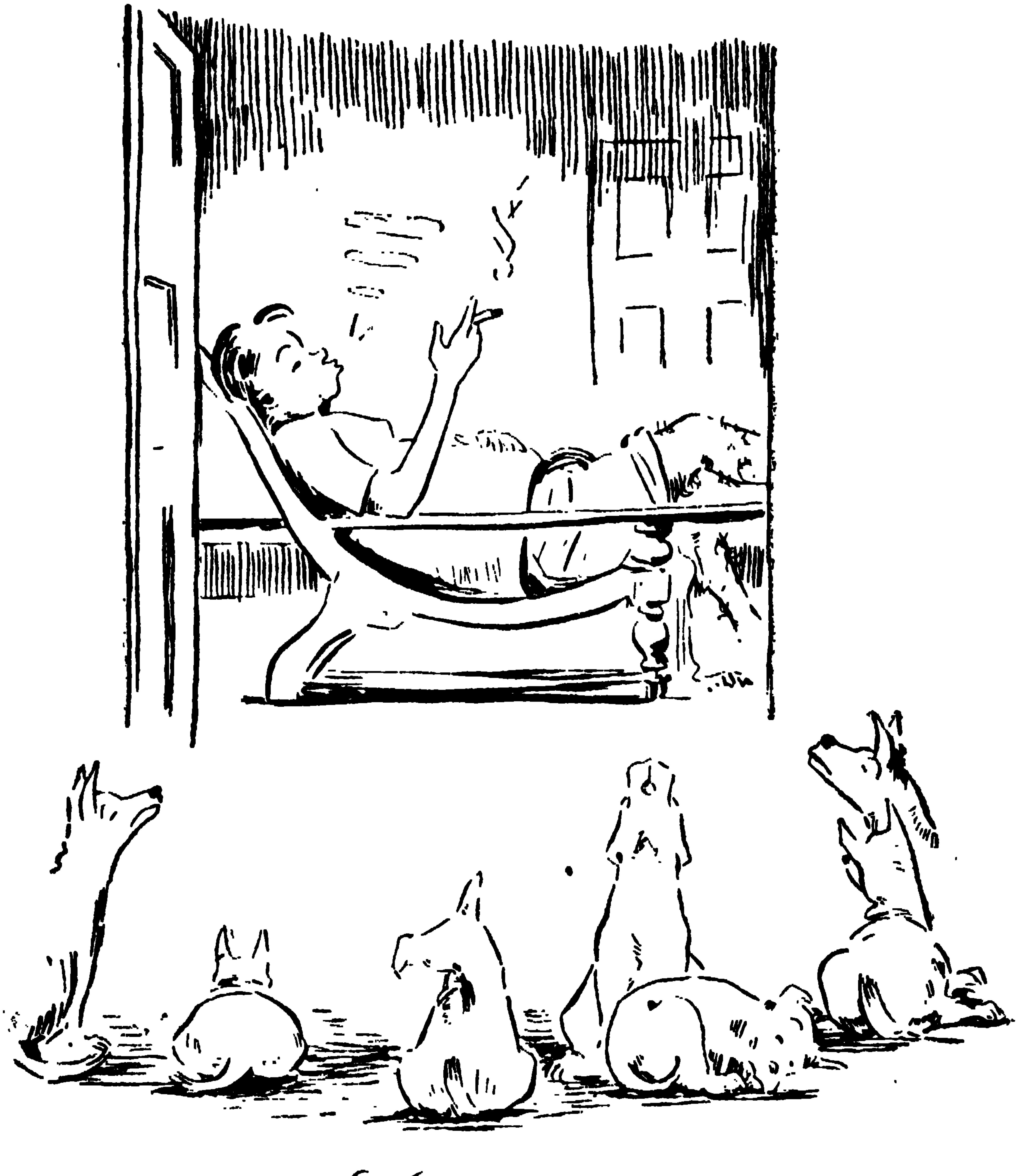

নির্ব্বেদ পাওনাদার সঙ্ঘ

তর্ক ও স্বপ্ন

তর্ক হইতেছিল।

প্রথম তার্কিক-প্রাণীটি বলিতেছিলেন, "মাংস আগে ভেজে পরে সিদ্ধ করে নিলে সুস্বাদু হয়।"

দ্বিতীয়টি তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করিলেন। তিনি বলিতে চান—"মাংস আগে ভাজলে সিদ্ধ হওয়া শক্ত। সেজন্য মাংস আগে সুসিদ্ধ হলে পরে—ঝোলটা মেরে ভাজা-ভাজা করে নিলেই ভাল হয়। তুমি জান না।"

—"আমি জানি না! মাংস ত ভাজা উচিতই, মশলাও ভাজা উচিত।"

"পাক-প্রণালীতে ওকথা লেখে না!"

"পাক-প্রণালীর কথা রেখে দাও। বড় বড় বাবুর্চির মুখে আমি শুনেছি মাংসটা আগে সিদ্ধ—"

"পাক-প্রণালী"র কথা তুমি মানতে চাও না?

"না।"

"কেন শুনতে পাই কি?"

"কারণ নানা পাক-প্রণালীর নানা মত। সুতরাং বাবুর্চিরা—অর্থাৎ যারা নিত্য রাঁধছে—তাদের কথাই প্রামাণ্য।"

প্রথম তার্কিক একটু থতমত খাইয়া গেলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাঁহার বুদ্ধি খুলিল।

—"সব বাবুর্চিও ত সব সময়ে একমত নয়।"

"যে সব বাবুর্চিরা মাংস আগে ভাজতে চায় তারা বাবুর্চি নয়—বেকুব। জাপানে কি করে শুনবে?"

প্রথম তার্কিক ধৈর্য্য হারাইলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন—"জাপান টাপান বুঝি না! তুমি বাবুর্চির অপমান করবার কে? অভদ্র কোথাকার!"

—"তোমার যতবড় মুখ নয় ততবড় কথা! নিজে ত্নিয়ার কোন খবর রাখবে না—আবার ফদর ফদর করে তর্ক করতে আসে! বেকুব!"

"ফের বেকুব বলছ?"

"ক্রমাগত বল্‌ব!—"

"তবে রে—"

"তবে রে—"

তর্ক যুদ্ধে পরিণত হইল।

একটি শৃগাল অনতিদূরে বসিয়া তর্ক-প্রগতি উপভোগ করিতেছিল। উভয়কে সমরোন্মুখ দেখিয়া হাস্যভরে কহিল—"হে পুঙ্গবদ্বয়, তোমরা ত উভয়েই নিরামিষ-ভোজী। আমিষ বিষয়ক তর্কে লিপ্ত হইয়া অনর্থক গোলমালের সৃষ্টি করিও না। তোমাদের প্রভু জাগরিত হইলে মুস্কিল।"

তাহারা তখন পরস্পর শিঙে শিঙ্ বাধাইয়া ঘোর-নাদে যুদ্ধ করিতেছে। শৃগালের উপদেশবাণী তাহাদের কর্ণগোচর হইল না।

আচমকা ঘুম ভাঙিয়া গোশকটচালকটি দেখিল এই রাত্রি দ্বিপ্রহরে তাহার বলীবর্দ্দযুগল লড়াই করিতেছে। এবম্বিধ যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে শান্ত করিবার সদুপায় শকটচালকের অবিদিত ছিল না। লগুড় এবং প্রাকৃত ভাষার প্রচুর ব্যবহার সে করিল। তৎপরে গরু দুটিকে পৃথক করিয়া দূরে দূরে বাঁধিয়া সে উপসংহারে কহিল—"খা শালারা খা,—বেশী জেঁপোমি করিস্ না!"

খাইতেও দিল। বিচালি

*   *   *

চট্ করিয়া আমার ঘুমটাও ভাঙিয়া গেল। স্বপ্নটাও। যে দুইজন উগ্র প্রকৃতির যুবক জাপান-জার্ম্মানী-সংবাদ, হিট্‌লার-মুসোলিনি প্রভৃতি লইয়া তর্কমুখর হইয়া উঠিয়াছিলেন তাঁহারা দেখিলাম নামিয়া গিয়াছেন। ট্রেন থামিয়াছে। নাথনগরে।

"বনফুল"

সংবাদ-সাহিত্য

একদিকে বর্ষা অন্যদিকে ফুটবল, সাহিত্য-বিলাসীর পক্ষে এই দুই বিপরীত ঘটনা মারাত্মক বলিলেও চলে। এমন সময় মাসিকপত্র খুলিব, না খেলা দেখিব, না কবিতা লিখিব, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিলাম না। হঠাৎ বৃষ্টির বেগ প্রবল হইয়া উঠিল, খেলা দেখার ক্ষীণ আশাটিও মিলাইয়া গেল। ভিজা মাঠে ইংরেজরা জিতিয়া যাইবে—ভারতবাসীর মুখের কালিমা গাঢ়তর হইবে কল্পনা করিতেও সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। মনে করিলাম হয়ত ইনফ্লুয়েঞ্জার পূর্ব্বলক্ষণ, না হয় সুপ্ত ম্যালেরিয়ার পুনর্জ্জাগরণ, না হয় দেশের অপমানের ভীতি দেহ-মনের উপর তাহার ক্রিয়া প্রকাশ করিতেছে।

ঠিকানা ভুল করিয়া কাহার একখানি মাসিকপত্র আসিয়াছিল; টেবিলের উপর প্যাকেট মোড়া অবস্থাতেই পড়িয়াছিল, হঠাৎ বিবেচনা-শূন্য হইয়া প্যাকেট খুলিয়া ফেলিলাম। খেলা দেখার দুঃখ একমুহূর্ত্তে দূর হইল, দেখিলাম ফুটবল-খেলা শুধু যে মাটিতেই সম্ভব তাহা নহে, মাসিকেও সম্ভব। সেদিন দেখি ঘোর বৃষ্টির মধ্যে একদল প্রৌঢ় এবং যুবক ন্যাকড়ার বল দিয়া ফুটপাথের উপর ফুটবল খেলিতেছে। দেখিয়াই বুঝিয়াছিলাম—এবারে আর রক্ষা নাই; ফলেও তাহাই হইয়াছে।

—

সাহিত্য রচনাই হউক, তথ্য আবিষ্কারই হউক, অথবা ফুটবল খেলাই হউক, কিছুতেই আমাদিগকে দমাইতে পারে না। গোপাল যেদিন স্কুল হইতে মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব শিখিয়া আসিল সেদিন তাহার পক্ষে একটি স্মরণীয় দিন। সে হঠাৎ এক গ্লাস জল মাটিতে ঢালিয়া তাহার মাকে বুঝাইতে লাগিল—এই যে জল, আকাশে না উঠিয়া মাটিতে পড়িল কেন? মাধ্যাকর্ষণ, মা, মাধ্যাকর্ষণ! সেদিন পাড়ার যাবতীয় লোক গোপালের নিকট মাধ্যাকর্ষণের তত্ত্ব শিখিয়া ধন্য হইয়াছিল।

—

এ জগতের অধিকাংশ বস্তুই অকারণ-সম্ভূত। ইহারই মধ্যে মাঝে মাঝে মাধ্যাকর্ষণ অথবা ইংলণ্ডের কাব্যাদর্শের পরিবর্ত্তন জাতীয় দুই একটি বস্তুর কারণের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। লেখক বলিতেছেন,

> জর্জ্জিয়ান যুগ আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া একেবারে গেল বদলে আশ্চর্য্যভাবে। জর্জ্জিয়ান যুগ একেবারে নিজের বৈশিষ্ট্যে সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দিলে। ব্যাপারটা যতটা মনে হয় তত বিস্ময়কর নয় মোটেও। কাব্যধারার এ পরিবর্ত্তন ছিল

> অবশ্যম্ভাবী। নিঃশব্দে অনেকদিন ধরে খাত খনন করা চলছিল। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ঘটনার ভেতর ছিল এ পরিবর্ত্তনের নির্ভুল নির্দ্দেশ। কাব্যের স্রোত অকস্মাৎ নিজের খেয়ালে নূতন পথ নেয়নি।

আমরা যে অকারণ দুঃখ করি সেটা ঠিক নহে। দুই একটি কার্য্যের কারণও যে অতি আশ্চর্য্যভাবে কাহারও কাহারও দৃষ্টিতে ধরা পড়ে ইহা আমাদের সৌভাগ্য বলিতে হইবে। লেখক আমাদিগকে বিস্মিত হইতে নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু কোনো মানুষ বিস্মিত না হইয়া পারে? মানুষ কি পাষাণ? দেশের কোনো একটা আদর্শের পরিবর্ত্তন ইহার পশ্চাতে যে আবার একটা সুনির্দ্দিষ্ট কারণ থাকিতে পারে ইহা কি আমরা স্বপ্নেও ভাবিতে পারিয়াছিলাম?

—

কিন্তু "বিস্ময়" "মজা" এ সব না থাকিলে ইতিহাসে মজা অনুভূত হয় না। তাই লেখক বলিতেছেন—

> এ যুগ সম্বন্ধে একটি মজার কথা এই যে যে-দুজনের কাছ থেকে জর্জ্জিয়ান কাব্য প্রথম প্রেরণা পেয়েছে তাঁদের কাউকেই যথাযথ ভাবে শ্রেষ্ঠ জর্জ্জিয়ান কবিদের তালিকায় ফেলা যায় না।

এরূপ মজা আমাদের নরেন্দাও দেখাইতে পারেন নাই। যে লোক মাকড়শার নিকট হইতে তিতীক্ষার প্রেরণা লাভ করিয়াছিল সেও মাকড়শাকে সমসাময়িক মহামানবশ্রেণীভুক্ত করিতে না পারিয়া হয়ত এমনই মজা অনুভব করিয়াছিল।

—

খেলার সঙ্গে সাহিত্য মিশাইয়া যে আলোচনাটি করা গেল তলাইয়া দেখিলে ইহারও হয়ত একটা কারণ মিলিতে পারে। হয়ত ইহা অবশ্যম্ভাবী ছিল। কিন্তু ব্যাপারটা যতটা মনে হয় ততটা বিস্ময়কর নয় মোটেও, কারণ বাংলাদেশে খেলা ও লেখার মধ্যে বর্ণগত কোনো বৈষম্য নাই। যাহা খেলা তাহাই লেখা এবং vice versa.

—

সেকালে পতিব্রতা স্ত্রী স্বামীর দাসীমাত্র ছিল—এবং তাহাতে তাহার গৌরব ছিল না। একালে স্ত্রী স্বামীর দাসীমাত্র নহে, একালে তাহার গৌরব বাড়িয়াছে। রুগ্ন স্বামীকে বারাঙ্গনা গৃহে পৌঁছাইয়া দেওয়া একালের স্ত্রী কল্পনা করে না। অতিথি সেবায় স্ত্রী-উৎসর্গ করিবার প্রথাও লুপ্ত। একালের স্ত্রী মোটের উপর কবি। একালের স্ত্রী স্বামীকে বলিতেছে—

চৌধুরীদের খগেন বাবুকে ধরে—
চৌরাস্তার মোড়ে একখানা ঘর
ভাড়া নাও তুমি। আমি দেবো তারপর
আস্‌বাব আর মাল কিনবার টাকা।

মাল কিনিবার টাকা দেওয়ায় গৌরব আছে।

—

আষাঢ়ের ভারতবর্ষে "ফিনিশিং টাচ্" নামক একখানি চিত্র (খুব সম্ভব ব্যঙ্গ চিত্র) বাহির হইয়াছে। ছবিখানি চিত্রশিল্পকে ব্যঙ্গ করিয়া অঙ্কিত। এরূপ অপরূপ চিত্র আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখি নাই। ফিনিশিং টাচ্ পায় নাই এরূপ একটি কাঠের পুতুল (খুব সম্ভব চিত্রকরের মডেল) চিত্রকরের বামহস্তধৃত রঙের পেলেটের উপর এক পা তুলিয়া খাড়া হইয়া আছে। কিন্তু ফিনিশিং টাচ্ নামক চিত্রের যিনি চিত্রকর তিনি

নিজে এখনও ফিনিশিং টাচ্ পান নাই। শুনিয়াছি, পুলিন দাসের ব্যায়াম সমিতি আছে; অশোক চট্টোপাধ্যায়ের কুস্তি শিখিবার স্কুল আছে; শান্তি পাল বক্সিং শিখাইয়া থাকেন। শুনিয়াছি, দেখি নাই। ইঁহাদের স্কুলের কেহ না কেহ অগ্রণী হইলে এই ধরণের চিত্রকর ফিনিশিং টাচ্ প্রাপ্ত হইতে পারেন। কিন্তু হায়রে দুরাশা!

—

শেষ কথার কবির ইহাই যদি শেষ কথা হয় তাহা হইলে তাঁহাকে ধন্যবাদ। ইংরেজীতে Swan Song বলিয়া একটা কথা আছে, ইহারই ভাবানুবাদ বোধ করি "শেষ কথা"। ইহা song নহে ইহা ভুল ছন্দের (শেষ অবস্থায় সমস্তই ভুল হইয়া যায়) শেষ ক্রন্দন।

ছিনু তব অতি কাছাকাছি
প্রাণপণে যাচি
পাইনি তো তবু হায়, প্রবেশের অধিকার সেথা
সিংহাসন তব যেথায় বিরাজে।

কবিতা লিখিবারও ন্যূনতম যোগ্যতা বোধকরি একখানা হাত। ইহারই জোরে অনেক সময় অধিকার মেলে!

—

শেষের কবিতার লাবণ্য যে-কবিতায় বিদায় লইয়াছিল, সেই কবিতার মোহে আকৃষ্ট হইয়া ছোঁক্ ছোঁক করিতে করিতে নবীন কবি মাসিকপত্রের পাতার আবির্ভূত হইয়াছে। সুর নাই, কথা আছে, কিন্তু কথাও শেষ পর্য্যন্ত বাউণ্ডারি ছাড়াইয়াছে।

আজি আমি তোমা হতে চলিলাম দূরে
অজানিত কোন এক পুরে—
নাহি জানি আছে সেথা কী যে।
উল্লসিত, উচ্ছ্বসিত, মুখরিত নিকুঞ্জে তোমার

রেখে গেনু একখানি স্মরণ আমার
মোর তপ্ত আঁখি জলে ভিজে
ক্ষণকাল তরে
রাখিয়ো তাহার পরে
স্নেহ মাখা পরশন তব ;
মুকুল উঠিবে যাহে বাসনার বৃন্ত পরে
থরে থরে
অতি অভিনব
গুচ্ছ গুচ্ছ সুরভিত বেদনার ফুল।

"মুকুল উঠা" ব্যাপারটা ভাল লাগিতেছে না। Secondary অবস্থায় এরূপ হয় বটে, কিন্তু তাহা সাধারণত সর্ব্বাঙ্গেই হইয়া থাকে।

—

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র যাবতীয় ইংরেজি কবিতা অনুবাদ করিয়া আমাদের কাব্য-দারিদ্র্য ঘুচাইবেন বলিয়া পণ করিয়াছেন। তাঁহার অনূদিত এক একটি ছত্রে খাঁটি বাংলাদেশের স্বাদগন্ধ পাওয়া যায়! উদাহরণস্বরূপ বলা যায় Yeatsএর "Down by the Sally Gardens" নামক কবিতার অনুবাদের প্রথম ছত্রে মৈত্র মহাশয় বলিতেছেন—

ঝোপের আড়ালে যারে ভালবাসি দেখা হ'ল তার সনে

ঝোপের আড়ালে দয়িতের দেখা পাওয়া কিংবা ঝোপের আড়ালে ভালবাসা এ দুইটিই খাঁটি বঙ্গীয় ভালবাসার ফল। অনুবাদককে ধন্যবাদ দিতেছি।

—

উত্তরার একটি বিজ্ঞাপন বিষয়ে উত্তরা সম্পাদকের দৃষ্টি আকর্ষণ

করিতেছি। মলাটের তৃতীয় পৃষ্ঠায় "দিলীপকুমারের জলাতঙ্ক" দেখিয়া আমরা ব্যাকুল হইয়াছি। সম্পাদক মহাশয় প্রকৃত তথ্য জানাইয়া বাধিত করিবেন।

—

"বঙ্গলক্ষ্মী"র কিমিতির চরম বিকাশ নামক প্রবন্ধের লেখক বলিতেছেন—

> জ্ঞান-লিপ্সার কি কোন দিন নির্ব্বাণ হয়। গোপনীয় বস্তুর সন্ধান জানিবার জন্য শতসহস্র রাসায়নিক প্রাণপাত করিতেছেন এবং আশা করি, একদিন তাঁহারা protoplasm বা প্রাণ-পদার্থ তৈয়ার করিতে সমর্থ হইবেন...

আমরা জানিতাম গোপন বস্তুর স্বরূপ প্রকাশই সকল বৈজ্ঞানিকের উদ্দেশ্য। কিন্তু রাসায়নিক বিশেষ করিয়া গোপনীয় বস্তু সন্ধানের জন্য প্রাণপাত করিতেছেন ইহা জানিয়া আমরা যুগপৎ আনন্দিত এবং বিস্মিত হইলাম।

—

"ভবিষ্যৎ" এই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন যে সাহিত্য সমালোচকগণ সমালোচনা করিবার সময় নায়কের কথাকে লেখকের নিজেরই মনের কথা বলিয়া ভুল করেন। "এডিটোরিয়াল" বলিতেছেন—

> এঁদের ধারণা চিত্রিত চরিত্রের সঙ্গে লেখকের ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে আর লেখকের চিত্রিত নায়কের মুখনিঃসৃত সব কথাই নিজের জীবনের কথা; অর্থাৎ যদি কোন লেখক একটা খুনীর চিত্র এঁকে তার মুখ দিয়ে হত্যার খুন-চাপা প্রলাপ শোনেন তবে নিশ্চয়ই লেখকও একদিন কারুকে হত্যা করেছেন অথবা করে বসবেন।

অর্থাৎ "এডিটোরিয়াল" এমন সমালোচকের সাক্ষাৎও পাইয়াছেন যিনি প্রেম করেন নাই বলিয়া প্রেমের গল্প লিখিতে পারেন নাই,

ডিটেকটিভের চাকুরী করেন নাই বলিয়া ডিটেকটিভ গল্প লিখিতে পারেন নাই। অথবা রাজা হন নাই বলিয়া রাজার গল্প লিখেন নাই। ভবিষ্যতের আবিষ্কৃত এই সমালোচকের ধারণা, যাহারা ঐতিহাসিক গল্প লেখে তাহারা ইতিহাস প্রসিদ্ধ লোক, যাহারা এরোপ্লেন সম্পর্কিত গল্প লেখে তাহারা এরোপ্লেনের পাইলট, যাহারা কুলী মজুরের সম্বন্ধে গল্পলেখে তাহারা কুলী মজুর। অথচ 'ভবিষ্যতে' অভাব কিছুরই নাই!

—

এডিটোরিয়ালের খুব সৌভাগ্য বলিতে হইবে। কিন্তু তিনি কথা গুলি এরূপ ভাবে বলিয়াছেন যাহাতে প্রায় বুঝা যায় যে যাহার যাহা নিজের কথা নয় সেই সম্বন্ধেই তাহার লিখিবার অধিকার এবং তাহাই সাহিত্য। আমরা এক মাতালকে জানিতাম। সে সামান্য মদ খাইলেই তাহার স্ত্রীকে প্রহার করিত। কেহ কেহ বলিত যে ঐ লোকটার জীবনের সহিত প্রহারের কোনো ঘনিষ্ঠ যোগ নাই, মদের প্রভাবে সে এরূপ দুষ্কার্য্য করিতেছে। কথাটা তখন বিশ্বাস করি নাই। এখন বুঝিতেছি ঐ মাতালটাই প্রকৃত সাহিত্যিক।

—

আষাঢ় সংখ্যা প্রবাসীর ৩৬৭ পৃষ্ঠায় দেশের মেয়েদের প্রতি একটি উপদেশ আছে। বলা হইয়াছে "দেশের মেয়ে শ্রী সাধনা কর।" ইহা অন্যায় উপদেশ কেননা মেয়েদের শ্রী সাধনা করিবাব দরকার হয় না; সামান্য দুই এক টাকা খরচ করিয়া স্নো, ক্রীম, প্রভৃতি মাখিলেই যাহা লাভ হয় তাহার জন্য সাধনা কেন? তবে ঐ দুই-একটাকার জন্য স্বামীকে অনেক সময় সাধ্য-সাধনা করিতে হয় ইহাই যা অসুবিধা।

—

দিলীপকুমারের যে হিউমারের একটা দিক আছে তাহা জন-সাধারণের নিকট এতকাল অপ্রকাশ্য ছিল। উহা প্রকাশ পাইয়াছে জয়শ্রীর একটি প্রবন্ধে। উহা ঠিক প্রবন্ধ নহে, হিউমার। লেখাটির

নাম কাব্যী ছন্দী হাস্যী তর্কী। হাসিতেই হইবে। লেখা আরম্ভ না হইতেই এরূপ হাসাইবার ক্ষমতা আর কাহার আছে? আমরাও ইহার অনুসরণে "পণ্ডী চৈর্য্যী পণ্নী জগ্গী" জাতীয় কিছু লিখিয়া হিউমার প্রস্তুত করিতে পারিতাম, কিন্তু তাহা করিয়া দিলীপকুমারের মৌলিকত্ব নষ্ট করিতে চাহি না।

—

"কাব্যী ছন্দী হাস্যী তর্কী"র কাব্যী ছন্দী হাস্যী তর্কীটাই "হিউমার" বাকীটা "মার"। দিলীপকুমারের "সখী" বলিতেছে—

সখী। ট্রোকের দৃষ্টান্তটি বেশ হয়েছে ঠাকুর পো। কিন্তু এ ধারণের ছন্দ কি একটু শক্ত হবে না সাধার—অনেকের কাছে? —অর্থাৎ ইংরিজি ছন্দের ঝোক—

রসিক। খুব সহজ বৌদি, খুবই সহজ। কারণ ট্রোকের ঝোঁক পড়ে যে পর্ব্বের প্রথমেই।

বৌদি-ঠাকুরপোর ভিতর অনেক রকম রসিকতা দেখিয়াছি কিন্তু Trochee লইয়া রসিকতা খুব সম্ভব এই প্রথম। ইহাই দিলীপকুমারের মার।

—

কিন্তু এই কাব্যী ছন্দী শেষ হইলে উক্ত বৌদি এবং ঠাকুর পো কি করিবেন? অর্থী পূর্ত্তী রাষ্ট্রী অঙ্কী লইয়া কিছুদিন চালাইতে পারিবেন কি? বৌদি বলিবেন, ঠাকুর পো, Potential markets আর actual markets এর ভিতর কি সম্বন্ধ? ব্রাজিল গবর্ণমেণ্ট কফি এবং ঈজিপশিয়ান গবর্ণমেণ্ট তুলা মজুত করিয়া কি লাভ করিয়াছিল? ঠাকুর পো উত্তর দিবেন, বৌদি আমি এখন জিহ্বায় এবং ঘাড়ে electrode লাগাইয়া পরীক্ষা করিতেছি—এখন বিরক্ত করিও না। বা এই জাতীয় কিছু। উহা অন্তত trochee হইতে উৎকৃষ্ট হইবে বলিয়া মনে হয়।

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে—

দিব্যি মনে পড়িতেছে সেই কোন এক মুসলমান বাদশার গুড় খাওয়ার কথা। আমি একটা নূতন ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কার করিয়াছি ভাবিয়া কেহই চমকাইয়া উঠিবেন না। কথাটা বিশেষ কিছুই নয়—সেই পুরাতন ইয়ে…। অর্থাৎ কিনা সেই বাদশাহের নিজে গুড় না খাইয়া বুড়ীর ছেলেকে গুড় খাইতে বারণ করার গল্পটি। আসল কথাটি এই—সেকালের লোকগুলি ছিল মূর্খ। আরে বাপু বুড়ীর ছেলেকে গুড় খাইতে বারণ করবি ত করনা—তোর গুড় খাইতে মানা কি। পরকে খদ্দর পরিতে বলিলেই যদি নিজেকে খদ্দর পরিতে হয় তাহা হইলে তো আর দেশসেবা চলে না।

কথাটি মনে পড়িল বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত দৈনিক সংবাদ পত্রটির কয়েকদিন পূর্ব্বেকার সম্পাদকীয়টি পড়িয়া। (বারে বারে সর্ব্বাপেক্ষা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ না বলিয়া মনে করুন কাগজটির নাম 'আনন্দ হাট'। সাবধান কেহ আনন্দ বাজার নামটি খুঁজিয়া বাহির করিবেন না)। পড়িতেছি আর রক্ত গরম হইতেছে। হইতে হইতে যখন রক্ত একেবারে টগবগ করিয়া ফুটিতে আরম্ভ করিল তখন সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিলাম, না আর আমেরিকান বা যে কোন বিদেশী ছবি দেখা নয়। দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইবার জন্য মনে মনে একবার বন্দেমাতরম্ আওড়াইয়া লইলাম। একবার দেওয়ালে প্রলম্বিত ডাইং ক্লীনিংএর ক্যালেণ্ডার হইতে মহাত্মা গান্ধীর ছবিও দেখিয়া লইলাম। আর মারে কে। আরও ভাবিয়া দেখিলাম বিদেশী ছবি যখন দেখা বন্ধই করিয়াছি তখন তো বেশী করিয়া দেশী ছবি দেখা উচিত। নূতন বাংলা ছবির সন্ধানে পাতা উল্টাইতেই দেখিলাম Tarzan and His Mate! মনটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। 'দি

ট্রপিকাল রেভ্যু! মাথাটা ভীষণ বেগে চুলকাইয়া উঠিল। না না বিদেশী ছবি আর নয়। বড় বড় অক্ষরে চোখের সামনে নাচিয়া উঠিল "ছুপী"। হৃদয়টা রি রি করিয়া উঠিল। মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলাইতে বুলাইতে ভাবিলাম সম্পাদক মহাশয় তো আমেরিকান ছবি বয়কটের প্রস্তাব করিয়াছেন মাত্র—বর্জ্জন যখন আরম্ভ হয় নাই তখন বর্ত্তমান-আমি ভবিষ্যতের জন্য প্রতিজ্ঞা করিলেও এখন দেখিলে কীই বা ক্ষতি? আর আমি একলা গেলেই আর কতই বা পয়সা যাইবে? দেশসুদ্ধ লোক তো নিশ্চয়ই ঘরে বসিয়া থাকিবে।

—

কিছু দিন পূর্ব্বে সেই যে দুর্নীতি নিবারক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হইয়া গেল সে কথা বোধ হয় অনেকেরই মনে আছে (না থাকে আমার তো আছে)। কোনো প্রবীণ সম্পাদক ঘন ঘন দাড়িতে হাত বুলাইয়া গোটাকতক সম্পাদকীয় লিখিয়া ফেলিলেন এবং 'স্বাধীনতা' নামক ইংরেজী দৈনিকটি ঐ সঙ্ঘের প্রতি কটাক্ষপাত করাতে কিঞ্চিৎ হুঙ্কার ছাড়িয়া উঠিলেন। নীতিবাগীশগণ নিশ্চিন্ত হইলেন—যাক্ এইবার নিশ্চিন্তে, নির্ব্বিঘ্নে নাকে সরিষার তৈল দিয়া ঘুমান যাইবে। বদ্‌মাইস গুলি (আরও দু একটা বিশেষণ দিতে ইচ্ছা করিতেছে, কিন্তু চলন্তিকায় সুবিধা মত খিস্তিগুলি একত্রিত করিয়া দেওয়া নাই—ইহাতে বড়ই অসুবিধা হয়।) মুখ গোমড়া করিয়া বসিয়া থাকল—বিশেষতঃ ঐ তরুণ লেখকগুলি; তাহাদের অন্ন বুঝি মাঠে মারা যায়। সরেশবাবু লাফাইয়া উঠিলেন, না এইবার বইয়ের সেল বাড়িল নিশ্চয়—প্রত্যেক পুস্তকের শেষে এমন পাপের পরাজয় দেখাইতে আর কে পারিয়াছে? ব্যাপারটি গড়াইল অন্যদিকে বেশ ভালই। প্রবীণ সম্পাদকের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখিয়া একটী নীতিবাগীশ ভদ্রলোক একটি Correspondence

Clubএর prospectus চাহিয়া পাঠাইলেন—বিদেশে তদ্রূপ নীতি-পরায়ণ কোনও বন্ধু যোগাড় করিয়া কিঞ্চিৎ ধর্ম্মচর্চ্চা করিবেন এই আশায়। Prospectus আসিল ; প্রথমেই বেশ ভাল করিয়া জানান হইয়াছে Lady Friends are a speciality of this Club। Beautiful, আর আমাদের কবি রত্নার ভাষায় real ladies, অর্থাৎ যাকে বলে একেবারে 'খাঁটি' তরুণী। পত্রাপত্রির (চিঠি লেখালেখির সাধু সংস্করণ) দুএকটা item—যথা nudity, sex ইত্যাদি। ভদ্রলোক মূর্চ্ছা গিয়াছিলেন না সে ক্লাবের সভ্য হইয়াছিলেন জানি না। তবে আমরা হইয়াছি। আর সম্পাদক মহাশয়কে এমন একটা সুযোগ জুটাইয়া দিবার জন্য ধন্যবাদ দিতেছি।

—

পুনর্জ্জীবিত সাপ্তাহিকটির সম্পাদক মহাশয়ের বাংলা দেশের প্রতি দরদ বিশেষ প্রশংসনীয় ও অন্যান্য সম্পাদক মহাশয়দের পক্ষে অবশ্য অনুকরণীয়। (অনুকরণ যে তাঁহারা করেন নাই এমন নহে)। বাংলা দেশের লোক রোগা হইয়া যাইতেছে, এই সময় যদি টনিক না খাওয়ান যায় তবে আর খাওয়াইব কবে ? সুতরাং প্রবন্ধের আকারে বিজ্ঞাপন। টনিকে তিনশো পঁয়ত্রিশটি রোগ সারে। (বিভিন্ন বিজ্ঞাপন ও প্রবন্ধ আমরা গুনিয়া দেখিয়াছি, ইহার বেশী হইতে পারে, কিন্তু কম হইবে না—ইহা আমাদের accountant হলপ করিয়া বলিয়া থাকে), ঝালে, ঝোলে, অম্বলে সব জিনিসেই চলে সুতরাং ইহাতে যদি নূতন শক্তি না আসে তো আসিবে কিসে ? দুষ্ট লোকে বলে সম্পাদক মহাশয়ের বা পত্রিকার পরিচালকবর্গের পকেট ভারী হইয়াছিল। সম্পাদক মহাশয় বা পরিচালকমণ্ডলী নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন—আমরা নিন্দুকের কথা একেবারেই বিশ্বাস করি না।

—

শুনিয়াছিলাম বাংলাদেশের * কারু শিল্পের ও ফোটোগ্রাফচিত্র সম্বন্ধীয় একটিই ত্রিমাসিক পত্রিকা আছে। তাহাতেও যখন টনিকের উপর প্রবন্ধ দেখিলাম তখন মনটা একটু সন্দেহের দোলায় (তা বলিয়া দিলীপ রায়ের নয়) দুলিয়াছিল। কিন্তু আমাদের গো'লদা (সেই পুরাতন গোপালদা নহেন, আমাদের খাঁটি অকৃত্রিম নিজস্ব গো'লদা) কহিলেন, বৎস, শৃণু অর্থাৎ শ্রবণ কর—বাংলা দেশে ওরিয়েণ্টাল আর্টের কল্যাণে আর্টিষ্ট ও তাহার সৃষ্টি উভয়েই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া পড়িয়াছে—কিছুদিন পরে আর মস্তকের ভার সহ্য করিতে পারিবে কিনা সন্দেহ। সম্পাদক মহাশয় টনিক দিয়া সকলকে একটু মোটা (কথাটায় আর্ট নষ্ট হইল কি ?) স্বাস্থ্যশালী করিতে চেষ্টা করিতেছেন। আমরা কহিলাম, সাধু, সাধু। আর নিশ্চিন্ত হইলাম।

মাসিকপত্রে রঙীন ছবি না হইলে কি চলে ? শত্রুপক্ষ বলিবেন, কেন শনিবারের চিঠিতে তো রঙীন ছবি থাকে না।

কিন্তু সে কথা থাক, আসলে রঙীন ছবি দরকার—তা সে যে ছবিই হউক না। এসব বিষয়ে বসুমতীর সম্পাদক মহাশয়ের চৈত্রিক নিষ্ঠা আমাদের একেবারে মুগ্ধ করিয়াছে। বাঙ্গালী পাঠকের কলা জ্ঞান সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিন্ত, সুতরাং মিঃ টমাসের ছবি একখানা করিয়া দিলেই তাহারা বিশেষ সন্তুষ্ট থাকিবে ও বৎসরারম্ভে বার্ষিক চাঁদাটা ঠিকই পাঠাইয়া দিবে। ছবিগুলির অন্যদিকও আছে। উহাতে প্রায়ই হিন্দু-ধর্ম্মের উন্নতি কল্পে, নীতি বজায় রাখিবার জন্য, আধুনিক প্রগতির কুফল দেখাইবার জন্য, বড় বড় প্রবন্ধ বাহির হয়। ছবিগুলি ঐগুলির complementary বা supplementary। কবিরাজ মহাশয় থাকিলে বলিতেন সেবনের পূর্ব্ব অবস্থা। (ভবিষ্যৎ কি পরের অবস্থা ?)। সাধে কি রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন :—ছবি, তুমি কি ছবি ? (আমরা রবীন্দ্রনাথের ভক্ত সুতরাং তাঁহার কবিতা বদল করিবার birth right আমাদের আছে।) আরও দুএকখানি পত্রিকা আমাদের ভাল লাগিয়াছে কারণ সেগুলি Oriental Artএর দয়ায় তাহাদের সচিত্রত্ব, জার্ণালত্ব, মাসিকত্ব বজায় রাখিতেছে। তাহাদিগকে ধন্যবাদ।

—ম. চ. স.

সমালোচনা

স্পর্শের প্রভাব—উপন্যাস, শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় প্রণীত ও ৫নং কার্ত্তিক বসুর লেন হইতে শ্রীউমাচরণ চট্টোপাধ্যায়, এম-এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা।

গ্রন্থকার বর্ত্তমান যুগের লেখক হইলেও গত রোমান্টিক যুগের ছাপ এই গ্রন্থখানিতে এমন ভাবে পড়িয়াছে যে গল্পাংশ পড়িতে পড়িতে প্রায় আত্মবিস্মৃত হইতে হয়। কিছুকাল পূর্ব্বে বাংলার সমাজ-জীবনে জাতিশক্রতার মূর্ত্তি কি ভীষণ ছিল এই পুস্তকে তাহার আভাস আছে। চরিত্র হিসাবে রণেন্দ্র ও কালীনাথ যথাক্রমে ভালমন্দের চরম সমাবেশে গঠিত হইয়াছে। পাকা দুর্ব্বৃত্তের (villain) চরিত্র হিসাবে কালীনাথ সার্থক সৃষ্টি। রণেন্দ্রের জীবনের ঘাতপ্রতিঘাত সুন্দর ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। তবে বাংলার নিজস্ব নারীচরিত্র চিত্রণে গ্রন্থকার অধিক শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। জ্যোৎস্নার মনের দ্বন্দ্ব পাঠককে ব্যাকুল করিয়া তোলে। এই গ্রন্থখানিই ইতিমধ্যে 'পতিব্রতা' নামে নাটকে রূপান্তরিত হইয়া রঙ্গমঞ্চে আদৃত হইয়াছে।

লেখকের ভাষা সাবলীল এবং প্রাচীনপন্থী। ভাষা ও প্লটের গুণে গ্রন্থটি প্রায় ডিটেকটিভ কাহিনীর মত চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিয়াছে।

গ্রন্থের সমাপ্তিভাগে একটু আধুনিকতার স্পর্শ লাগিয়াছে, গ্রন্থের প্রথমাংশের সহিত তাহাতে সামঞ্জস্যের কিঞ্চিৎ অভাব লক্ষিত হয়। এই উপন্যাসটি আরও স্পষ্ট ভাবে মিলনান্তক হওয়া উচিত ছিল।

শ্রীসজনীকান্ত দাস

শ্রীপরিমল গোস্বামী এম এ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ২৫।২, মোহনবাগান রো, শনিরঞ্জন প্রেস হইতে শ্রীপ্রবোধ নান কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শনিবারের চিঠি

৮ম বর্ষ] কার্ত্তিক, ১৩৪২ [১ম সংখ্যা

নব বর্ষ

পাঠকগণ আমাদের নববর্ষের অভিবাদন গ্রহণ করুন। এই মাস হইতে শনিবারের চিঠির নববর্ষ এবং অষ্টম বর্ষ আরম্ভ হইল, এবং সৌভাগ্যবশত পূজার অব্যবহিত পরেই হইল, কাজেই বিজয়ার অভিবাদনও এই সঙ্গে জানাইতে পারিয়া বড় আরাম বোধ করিতেছি। বিজয়ার পরে বহু বন্ধুকে আলিঙ্গন করিয়াছি; বহুজনকে আলিঙ্গন করিয়াছি যাহারা বন্ধু নহে; বহু অপরিচিত লোককে আলিঙ্গন করিয়াছি যাহাদিগকে আলিঙ্গন করা যায় না; এবং পত্রদ্বারা এমন লোককে আলিঙ্গন জানাইয়াছি যাহাদিগের সঙ্গে দেখা হইবার পর দৈহিক আলিঙ্গন করিতে পরে সঙ্কোচ বোধ করিয়াছি।

* * *

অথচ বিজয়ার পরে প্রীতিভালবাসা শ্রদ্ধাভক্তি জানাইবার যতগুলি

লৌকিক রীতি আছে তাহা পালন করিতেই হইবে, এবং হিংসাদ্বেষ প্রকাশের যে সব চিরাচরিত পদ্ধতি আছে তাহা চাপিয়া রাখিতেই হইবে। যাহাকে মারিবার জন্য তাড়া করিয়া ফিরিতেছিলাম, তাহাকে ধরিবামাত্র দেখা গেল বিজয়া আসিয়া পড়িয়াছে; তৎক্ষণাৎ লাঠিটি ফেলিয়া দিয়া তাহাকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিলাম। হেঁ হেঁ করিয়া একটু হাসিতেও হইল। অর্থাৎ শত্রু হাতে পাইয়াও ছাড়িয়া দিতে হইল—আবার ধরিতে পারিব কি না কে জানে! আমাদের পাঠকদের সহিত আমাদের কোনো শত্রুতা নাই; বরঞ্চ পরম মিত্রতা আছে বলিয়াই তাঁহারা আমাদের পাঠক। এবং মনে হয় যাঁহারাই পাঠক তাঁহারাই মিত্র।

* * *

জানি, আমাদের বার্ষিক গ্রাহকদের মধ্যে কেহ কেহ ভি. পি. ফেরৎ দিয়া আমাদের সম্বলে আঘাত দিবেন; কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমরা তাঁহাদিগকে ভুলিব না। উপরন্তু তাঁহাদের জন্য আমাদের মমত্ব-বোধ বেশিই হইবে। আত্মীয়ের বিচ্ছেদে মর্ম্মে যে বেদনা অনুভূত হয়, তাঁহাদের বিচ্ছেদে আমরা সেই বেদনা অনুভব করিব। অর্থের বন্ধন ছিন্ন করিয়া বিদায় লইলে সময়ে জীবনটাকেই অর্থহীন বলিয়া বোধ হইবে। অতএব হে ভি. পি. ফেরৎদাতা নিষ্ঠুর, তোমাকেও আজ অভিবাদন জানাইতেছি; গ্রহণে যত বিলম্ব ঘটুক, গ্রহণ করিও।

* * *

এই উপলক্ষে আমাদের ভূতপূর্ব্ব এক বন্ধুকে মনে পড়িতেছে। আমরা কোনো সময়ে মহাত্মা গান্ধীর হরিজন আন্দোলন সমর্থন করিতে গিয়া বলিয়াছিলাম, এই আন্দোলনে আমাদের কোনো সহানুভূতি নাই। মহাত্মাজী যদি বলিতেন জাতিভেদ তুলিয়া দাও, তাহা হইলে

সে কথায় যত মতভেদই হউক তাহাতে তাঁহার মাহাত্ম্য প্রকট হইত বেশি ; কিন্তু অস্পৃশ্য মানুষকে স্পর্শমাত্র করিবার বহুমূল্য আয়োজনের মধ্যে আমরা কোনো অর্থ খুঁজিয়া পাই নাই। আমরা তাঁহার আন্দোলনকে প্রাণপণে মান্য করিতে গিয়া বলিয়াছিলাম, ইহা মানা যায় না। ইহার মহত্ব প্রচার করিতে গিয়া বলিয়াছিলাম, ইহাতে আর যাহাই থাকুক, মহত্ব নাই। কিন্তু হায় আমাদের অদৃষ্ট !

*   *   *

হঠাৎ আমাদের এক গ্রাহকের নিকট হইতে সংবাদ পাইলাম, তিনি আমাদের এই মতবাদে ধৈর্য্য হারাইয়াছেন। একখানি সহিংস পত্রদ্বারা তিনি আমাদিগকে জানাইলেন, তাঁহাকে আমরা যেন আর কাগজ না পাঠাই। অর্থাৎ নন-কো-অপারেশনের সুযোগটি তিনি নানারূপ অসুবিধায় নিজে গ্রহণ না করিয়া আমাদিগকেই দান করিয়াছিলেন। সেদিন আমরা অসহায়ভাবে তাঁহার সহিত নন-কো-অপারেশন করিয়াছিলাম।—আজ তাঁহাকেও অভিবাদন জানাইতেছি।

*   *   *

পূজার পূর্ব্বে মনে করিয়াছিলাম, পূজা শেষ হইলে জীবনে একটা নূতন প্রেরণা আসিবে। পূজা বা বড়দিন বা অন্য যে কোন একটা উৎসব আসিলেই এইরূপ মনে হয়। মনে হয়, সমস্ত দিকে একটা নূতন দৃষ্টি খুলিয়া যাইবে ; পূর্ব্বের অভিজ্ঞতায় যাহা ভুল মনে হইয়াছে এবারে তাহার সংশোধন করিব ; পূর্ব্বে যাহা ভাল মনে হইয়াছে এবারে তাহাকে আরো ভাল করিব ; কিন্তু পূজা উত্তীর্ণ হইয়া গেল, কিছুই করিলাম না। ইহার কারণ এই যে সদিচ্ছা মনের একটা ঋতুবিশেষ। বর্ষাঋতু বলিলেই বোধ হয় ঠিক হইবে। বর্ষার ক্ষণস্থায়ী স্ফীতি বেশিক্ষণ থাকে না।

*   *   *

সুতরাং ইহা লইয়া দুঃখ করিব না। কারণ এই ত্রুটি শুধু আমাদের নহে, বিশ্বপ্রকৃতির মজ্জাগত। গোলাপ গাছ হয়ত ফুল ফুটাইবার পূর্ব্বে সর্ব্বদা প্রতিজ্ঞা করিতেছে, এবারে পূর্ব্বাপেক্ষা ফুলের উৎকর্ষ বাড়াইব, আমগাছ বৎসরান্তে প্রতিজ্ঞা করিতেছে আগামী বৎসর উৎকৃষ্টতর ফল ফলাইব—কিন্তু প্রতিবারেই সেই একই ফুল-ফলের পুনরাবৃত্তি। বরঞ্চ ইহাই ব্যবহারিক জগতের পক্ষে সুশোভন। আমের মিষ্টত্ব যদি প্রতিবৎসর বৃদ্ধি হইতে থাকিত, কিংবা তেঁতুলের অম্লত্ব প্রতিবৎসর উৎকর্ষপ্রাপ্ত হইত, তাহা হইলে তাহা মানুষের ব্যবহারে লাগিত কিনা সন্দেহ। সুতরাং উৎকর্ষ বৃদ্ধির সদিচ্ছাটাই আসল—বৃদ্ধিটা অবান্তর।

* * *

সাময়িক পত্রিকাদিরও এইরূপ আরো ভাল হইবার একটি সদিচ্ছা বৎসরান্তে মনে জাগে। কিন্তু উহা আমজাম কিংবা তেঁতুলগোলাপের ইচ্ছার মতই সীমাবদ্ধ। পাঠকদিগকে এইরূপ একটি কথার দ্বারা উৎসাহিত করিবার ইহা একটি উপায় মাত্র। সংবাদপত্র যদি বলিত প্রতিদিন আমরা আরো ভাল সংবাদ দিব, তাহা হইলেও পাঠকেরা তাহা বিশ্বাস করিতেন। সংবাদের নূতনত্বই তাহার ভাল হইবার একটা প্রধান উপায়; কিন্তু ইহা ভালও নহে, মন্দও নহে, ইহা সংবাদ মাত্র। ইহার উপরে সম্পাদকের কোনো হাত নাই। কিন্তু মাসিকপত্রে যাহা বাহির হয় তাহা সংবাদ নহে, তাহা রচনা। ইহার অন্য প্রধান প্রয়োজন কৌশল বা ভঙ্গি। এই রচনা-কৌশল সারবান বিষয়বস্তুকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হয়। অন্য কথায় রচনা-কৌশল সুন্দর হইলেই তাহার বিষয়বস্তু সারবান হইয়া উঠে। সুতরাং ইহার উৎকর্ষসাধন সম্ভব। কিন্তু প্রতিবৎসর ইহার নিয়মিত এবং ইচ্ছাকৃত উন্নতি সম্ভব নহে। উন্নতি করিতে অনেক সময় যুগ কাটিয়া যায়।

* * *

কিন্তু উন্নতির আর একটা দিক আছে, যাহা এক পক্ষের তহবিলের অবনতির দ্বারা ঘটিতে পারে। আমরা এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া আমাদের কাগজের সৌষ্ঠব বাড়াইতে পারি—অর্থাৎ খরচ করিয়া যাহা যাহা সম্ভব তাহা সবই করিতে পারি। কিন্তু একটি জিনিস ইচ্ছা করিলেই করিতে পারি না। ইচ্ছা করিলেই নিজের আর্থিক উন্নতি করিতে পারি না। যাঁহাদের তহবিলের দিকে আমাদের লক্ষ্য তাঁহাদের সম্বন্ধেও একই কথা। সুতরাং আমরা টানিতে চাহিলেই যে তাঁহারা ছাড়িতে চাহিবেন এরূপ মনে হয় না; কাজেই ধ্রুবকে পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না। কাগজ যেরূপ ছিল সেই রূপই রহিয়া গেল, আশা করি পাঠকের সংখ্যাও ঠিকই রহিয়া যাইবে।

* * *

অবশ্য অনেকে এমন আছেন যাঁহারা বেশি মূল্য দিতে না পারিলে কোনো কিছুই পছন্দ করেন না। তাঁহাদের বিষয়েও আমরা চিন্তা করিতেছি। আমরা এই দুই দলের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া শীঘ্রই একটা কিছু পরিবর্ত্তন সাধন করিব। বৎসরের প্রথমে এই আর একটি সদিচ্ছা করিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই সদিচ্ছাই আমাদের সম্বল, ইহাই আমাদের সহিত আমাদের পাঠকদের সম্বন্ধ মধুময় করে।

* * *

পূজা উপলক্ষে প্রতিদিন অপর্য্যাপ্ত মাংস খাইয়া মাংসের উপর তথা পাঁঠার উপর প্রায় বিতৃষ্ণা ধরিয়া আসিতেছিল, এমন সময় সংবাদ পাওয়া গেল এবারে পূজায় জীবহত্যার পরিমাণ অর্থাৎ হত জীবের সংখ্যা অন্যান্য বৎসর হইতে একটু অতিরিক্ত হইয়াছে। ষ্টেট্স্ম্যানের সংবাদ, কাজেই পুনরায় মাংস বিষয়ে চাঙ্গা হইয়া উঠিলাম। ঠিক এই

মুহূর্ত্তে আবিসীনিয়ার যুদ্ধের সংবাদও প্রায় প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছে অর্থাৎ যুদ্ধ আছে কিন্তু প্রাণীহত্যা নাই—যেটুকু প্রাণের সাড়া পাওয়া যায় তাহা আবিসীনিয়াতে নহে—জেনিভাতে এবং তাহা মারণ অস্ত্রের বৈজ্ঞানিক যুদ্ধ নহে, শব্দযন্ত্র-জাত বাগযুদ্ধ।

* * *

অতএব পাঁঠা লইয়াই আরম্ভ করিলাম। আমরা ছাগ-সাহিত্য এবং সেই সাহিত্যের জনকদের লইয়া ইতিপূর্ব্বে বহু আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু তাহাদের মৃত্যুকামনা করি নাই। সরস্বতীপূজায় যদি ছাগহত্যার রীতি প্রচলিত থাকিত তাহা হইলেও হয়ত বলির বিরুদ্ধেই আন্দোলন করিতাম—কারণ সরস্বতীর শ্বেত অঙ্গ কাহারো রক্তে রঞ্জিত হউক ইহা আমরা কখনো কামনা করি নাই, এখনো করিনা। আপাতত ষ্টেটস্‌ম্যানের সংবাদটির দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

* * *

সংবাদে দেখিতেছি—গিরিডি সাবডিভিশনে পূজা উপলক্ষে ১৩০০০ ছাগবলি হইয়াছে। এই সংখ্যা অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা অনেক বেশি। আমরা পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছিলাম, পূজায় জীব বলির বিরুদ্ধে যে আন্দোলন সুরু হইল, তাহাতে ছাগ সম্বন্ধে সকলেরই দুশ্চিন্তা বাড়িবে। একটিমাত্র সাবডিভিশনে তেরো হাজার ছাগ বলি! ইহার বীভৎসতা হঠাৎ মনকে পীড়িত করে, মনুষ্যত্বের উপর আস্থা রাখা দায় হইয়া উঠে; মনে হয় মানুষ এত নির্ম্মমও হইতে পারে! যেদেশে বুদ্ধকে অবতার বলিয়া পূজা করা হয়, চৈতন্যদেব যে দেশের হৃদয়ে প্রেমের সৌধ গড়িয়া গিয়াছেন—সেই দেশে এই নিষ্করুণ অপ্রেমের ব্যাপার পূজার নামে বা ধর্ম্মের নামে অনুষ্ঠিত হয় কি করিয়া! পাঠক ভাবিয়া দেখুন।

* * *

আমাদের মনে হয়, এই নিষ্ঠুরতার জন্য, অন্তত এই নিষ্ঠুরতার দ্বারা ভালো মানুষের মনে আঘাত দিবার জন্য দায়ী রামশর্ম্মা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। ইঁহারা কেহ অনশনে থাকিয়া, কেহ কবিতা লিখিয়া এবং কেহ মন্তব্য লিখিয়া এই দুষ্কার্য্যটি করিয়াছেন। হত জীবের সংখ্যা তেত্রিশ হাজার কিংবা তেরো হাজার ইহা আমরা কদাপি গণনা করি নাই। সমগ্র বঙ্গদেশে ইহার সংখ্যা এককোটি বা একলক্ষ তাহা লইয়াও কখনো চিন্তা করি নাই। মহাযুদ্ধে দেশপ্রেমের নামে কোটি লোক নিহত হইল সেবিষয়েও—"কি ভয়ঙ্কর" "কি ভীষণ", বা "কি বিরাট", এইরূপ একটি কথা উচ্চারণ করিয়া আপন কর্ত্তব্যে মন দিয়াছি। আমরা জানি, আমাদের দেশের সমস্যা ইহার চেয়েও ব্যাপক এবং জটিল। নিরক্ষরতার সমস্যা, কৃষি সমস্যা, শিল্পবাণিজ্য সমস্যা—এক কথায় অন্নবস্ত্র সমস্যাই আমাদের একমাত্র তীব্র সমস্যা। দিনের পর দিন, পাঁঠার সংখ্যা না গুণিয়া, মাছের সংখ্যা না গুণিয়া কেবল ঐ বিষয়ই চিন্তা করিয়াছি। এমন কি নিরাকার উপাসনা ভাল, কি মূর্ত্তিপূজা ভাল, কি খৃষ্টপূজা ভাল ইহাও চিন্তা করিবার অবসর নাই। যাহার যাহা খুসী করিতেছি, ইহা লইয়া কাহারো সঙ্গে কাহারো শত্রুতা হয় নাই; হিন্দু হইয়া সর্ব্বজাতীয় লোকের হাতে খাইতেছি, সমুদ্রযাত্রা করিতেছি, জাতিভেদ ভুলিয়া বিবাহ করিতেছি, ইহা লইয়াও কোনো আন্দোলন হইতেছে না। অর্থাৎ ইহা এখন আর সমস্যাই নহে। এমন কি পণ্ডিত রামশর্ম্মার অনশনও সমস্যা ছিলনা। দিব্য আরামে ছিলাম, কিন্তু কিসে কি হইয়া গেল!

* * *

রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখিয়া এবং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সম্পাদকীয় লিখিয়া সমস্ত ব্যাপারটির অঙ্গে সমস্যার রং লেপিয়া

দিলেন। কাজেই গিরিডির তেরোহাজার পাঁঠার মুক্ত প্রেতাত্মা বাঙালীকে আজ ভয় দেখাইতেছে। ষ্টেট্সম্যানও আজ ঐ তেরো হাজারের ব্যাপারটা একটা বিশেষ সংবাদ হিসাবে ছাপিয়া বাঙালীর মুখে কালি মাখাইতে সাহস করিল। ইংলণ্ডের রাজকবি যদি উদর পূজা উপলক্ষে সমগ্র য়ুরোপে দৈনিক যত গোহত্যা হয় তাহার বিরুদ্ধে কবিতা লিখিতেন তাহা হইলে এরূপ সংখ্যাগণনা ওদেশে চলিত কিনা জানি না।

* * *

জীবহত্যা না করিয়া বাঁচিয়া থাকা যায় কিনা, অর্থাৎ বাঁচিয়া থাকিতে হইলে জীবহত্যা অনিবার্য্য কিনা ইহা লইয়া অনেকে চিন্তা করিয়াছেন। কিন্তু এই ধরণের চিন্তার মধ্যে কিঞ্চিৎ ফাঁকি আছে। অর্থাৎ আমরা যেন দায়ে পড়িয়া জীবনরক্ষার জন্য জীবহত্যা করিতেছি। যেন হিংসা একটি বাহ্য ধর্ম্ম, আমরা হিংসাকে নোটিস দিয়া যে কোনো মুহূর্ত্তে মন হইতে বিদায় করিয়া দিতে পারি। যেন হিংসা না করিলে কিছুতেই বাঁচা যায় না বলিয়া নিতান্ত অসহায়ভাবে হিংসার আশ্রয় লইয়াছি। কিন্তু এরূপ যুক্তি ঠিক বলিয়া মনে হয় না। তবে যাঁহারা নিরামিষ খাইয়া মনে করেন হিংসা করিতেছি না, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহাদের সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে কিছু বলিয়া লাভ নাই। যাঁহারা গাছকাটা এবং পাঁঠাকাটা উভয়কেই হিংসা বলিয়া মানেন তাঁহারা চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন, হিংসা (অবশ্য পরিমিত হিংসা) মানুষের একটি সহজ ধর্ম্ম। মাছ মারিয়া কিংবা ছাগ হত্যা করিয়া কিংবা গাছ কাটিয়া হিংসা করিতেছি বলিয়া অবশ্যই বহুযুগ ধরিয়া মানুষ কাঁদিয়াছে। প্রতিপদক্ষেপে অসংখ্য জীবহত্যা করিতেছি কল্পনা করিয়াও মানুষ বহুযুগ কাঁদিয়াছে। এরূপ হিংসার একমাত্র সমাধান, এই বোধটি জাগিবামাত্র আত্মহত্যা করা। আমি অসহায়, আমি দায়ে

পড়িয়া হিংসা করিতেছি, আমি বাঁচিয়া থাকিবার জন্য এই দুষ্কার্য্য করিতেছি, ক্রমাগত ইহা না ভাবিয়া আত্মহত্যা করা উত্তম। বাঁচিয়া থাকিবার জন্য তোমাকে জীবহত্যা করিতে কে অনুরোধ করিতেছে? বরঞ্চ জীবগণ যাহাতে বাঁচিয়া থাকে তুমি মরিয়া তাহার সুবিধা করিয়া দিলেই হয়! না, তাহা তুমি পার না। নিজে বাঁচিবার আকাঙ্ক্ষা ষোল আনা—অথচ পশুর জন্য কাঁদিতেও হইবে। ভণ্ডামি আর কাহাকে বলে!

* * *

আমরা যাহারা বৈষ্ণবও নহি শাক্তও নহি—অর্থাৎ যাহারা মগজে কোনো সম্প্রদায়ের ছাপ লাগাই নাই—আমাদের নিকট পশুহত্যা একটা সমস্যা নহে (পশুর মূল্য বাড়িলে সমস্যা হইতে পারে বটে)। পশুর মাংস খাইব এবং পশুর জন্য কাঁদিব, দেহ ধারণ করিব এবং দৈহিক ভোগকে পাপ বলিয়া জানিব, পশুর মাংসে দেহ পুষ্ট করিয়া সভ্যতার যুগ প্রবর্ত্তন করিব এবং পশুহত্যাকে বর্ব্বর অনুষ্ঠান বলিয়া গালি দিব—এই বর্ব্বর মনোবৃত্তি যেন আমাদের না হয়।

* * *

অর্থাৎ আমরা যেন আগামী বৎসর অধিক পরিতৃপ্তির সহিত মাংসাহার করিতে পারি, এবং গত বৎসরের হত পশুর জন্য যেন বৃথা অশ্রুপাত না করি। পূজায় পশুবলি দিলে পাপ হয় কিনা, এবং পূজার নামে হিংসা বর্ব্বরতার নামান্তর কিনা, ইহা পূজারী এবং সমালোচকদের উপর ছাড়িয়া দিয়া আমরা যেন আমাদের দৃষ্টি থিওলজি হইতে ইকনমিক্স-এর দিকে ফিরাইতে পারি। ইহা ছাড়া অন্য কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্প্রতি আমাদের নাই।

শ্রীমতী কুঞ্জ দেবী

নেবু বাগানের কুঞ্জ, অধুনা কুঞ্জি সে বাড়ী-উলি,
বিশ বছরের ব্যবসার শেষে হঠাৎ সেদিন প্রাতে
দেবতার কাছে পাইল প্রত্যাদেশ !
ক্যাঙারুর মত ঠ্যাং ফেলে ফেলে অশুচি বাঁচায়ে পথে—
পরণে গরদ—কানা খোঁড়াদের মুঠো মুঠো চাল দিয়ে
ফিরিতেছিল সে গঙ্গা-সিনান সারি।
বাঁশবেড়ে থেকে নয়া-আমদানি পটুলিও ছিল সাথে,
বয়স এগার তার—
কুঞ্জ তাহারে বাঁচাইয়া চলে 'ডানে'র নজর থেকে
ডান সে পুলিস এবং—এবং থাক্ !
আসিতেছিল সে বউবাজারের পথে—
বাঁয়ে ফুটপাথে ফিরিঙ্গি কালীবাড়ী,
প্রণাম সারিয়া ভীষণা কালীরে হঠাৎ তুলিতে মাথা,
বহু-মাথা-খাওয়া মাথা তার গেল ঘুরে !
স্পষ্ট শুনিল, শুনিল কুঞ্জবালা—
বের হওয়া জিভ্ ভিতরে না টেনে মা কালী বলিল তারে
পরম আদরে অতি স্নেহময় স্বরে,
"ক্ষ্যামা দে কুঞ্জ, বহু পাপ তুই করিলি বছর বিশ,
বহু ঘর ভেঙে জমালি অনেক টাকা ;
এখনও সময় আছে,

কথা শোন মোর, সব পাপ যাবে ধুয়ে,
সতী-গৌরবে মাথা তুলে ফের দাঁড়াবি ধরার বুকে—"

সেদিন প্রভাতে গুরু গুরু বুকে শুনিল কুঞ্জবালা,
মূর্চ্ছা বাঁচায়ে শুনিল সে ভীত প্রাণে—
মায়ের প্রত্যাদেশ—
শুনিল না কেহ আর !
ট্রাম বাস আর উড়েদের দল তেমনি চলিল পথে
প্রতিদিন প্রাতে যেমন চলিয়া থাকে।
ঝাঁকা মুটে চলে, ছুলিত চামড়া পাঁঠা ও খাসীর দল
সমানে ঝুলিয়া রহে ;
পটলি কিছুই বুঝিতে না পেরে মা কালীরে গড় করে।
পড়িতে পড়িতে প্রত্যাদেশের সামলিয়ে নিয়ে টাল,
রিক্সায় চেপে পটলির সাথে কুঞ্জ ফিরিল ঘরে,
নেবু বাগানের দেড়তলা সেই পুরাতন বাড়ী খানি।

দশ-বারো দিন পরে,
বাড়ী বেচে দিয়ে নেবু বাগানের প্রবীণা কুঞ্জবালা,
শীতের প্রভাতে কুয়াশার মত হঠাৎ উধাও হ'ল—
হাওয়া হয়ে গেল, ঠিকানা কোনো না রেখে,
পৌষের শেষে পটলের মত পটলি লোপাট হ'ল।

শ্যাম স্কয়ারের ঠিক উত্তর দিকে—
চোখ রগড়িয়ে একদিন ভোরে প্রতিবেশী সব দেখে,
বহুকাল-খালি নবীন ঘোষের রঙচঙে বাড়ীখানা

নড়িয়া চড়িয়া বসে যেন পাশ ফিরে !
ঘোর লাল পাড় গরদের শাড়ী কার্নিশ ধ'রে ঝোলে,
চাকর বামুন ঝির কোলাহল মাঝে,
অতি সংযত নারী-কণ্ঠের আদেশ ভাসিয়া আসে।
পাশের বাড়ীর কুতূহলী কোনো রসিক ছোকরা দেখে,
আলিসার পথে চেয়ে দেখে উঁকি মেরে,
আসন পাতিয়া দখিন বারান্দাতে
পট্টবসন পরিহিতা নারী করিছে চণ্ডী পাঠ—
নেবু বাগানের বাড়ীউলি নয়—শ্রীমতী কুঞ্জ দেবী।

শ্রীমতী কুঞ্জ পেয়েছে প্রত্যাদেশ—
ঋতুমান যত পুরুষ বাংলা দেশে
বিবাহধর্ম্মে পতিত হইয়া কুমার রহিয়া গেল,
বিয়ে না করিয়া রয়ে গেল আইবুড়ো—
তাদের কাহারো ধর্ম্মরক্ষা করিতে সে নারে যদি,
এক নারী হয়ে একটি পুরুষে গৃহী না করিতে পারে,
নারীর ধর্ম্মে, কুমারী ধর্ম্মে পতিত হইবে সে যে,
সতীর মহিমা হারাবে যে চিরতরে।
মা কালী তাহারে স্বয়ং গেছেন বলি—
বাছা বাছা যত পাকা আইবুড়ো তাদের কারেও ধরি,
বিবাহ-ধর্ম্মে দীক্ষিত করি, ধর্ম্ম রাখিতে হবে,
নতুবা বিগত বিশ বছরের বহুজন-ঘাঁটা পাপ
অনন্ত কাল চাপিবে তাহার শিরে।
সহজে এ ব্রত না হলে উদ্‌যাপন,

সাধিতে হইবে ছলে বলে কৌশলে,
তাতেও না হলে শেষ পথ অনশন !

চণ্ডীপাঠের অবকাশে বসি শ্রীমতী কুঞ্জবালা—
যত্নে-রচিত তালিকাটি লয়ে হাতে
বাছিতে লাগিল মনোমত পতি বহু বিবেচনা করি।

আচার্য্য পি. সি. রায়—
পূজ্য অতীব, না হবে যোগ্য পতি।
পত্নীসুলভ চপলতা তাঁর সনে
কিছুতে চলিবে না যে !
বিবাহ-ধর্ম্ম ঠেকিবে আসিয়া খদ্দরে, বন্যায় ;
যদিবা না ঠেকে রসায়ন-বিজ্ঞানে।

কথার শিল্পী শরৎচন্দ্র, তিনি
অতি লোভনীয় পাত্র যদিও তবু
কঠিন হইবে ঘরকরা তাঁর সাথে।
গৃহস্থ-প্রেম-নমুনা যা আছে তাঁহার উপন্যাসে
সতী রমণীরা যেভাবে তাদের পতিদের সম্ভাষে
এবয়সে অতি কঠিন হইবে সে ভাষা কবলে আনা,
লজ্জা করিবে তার !

দরদী বিধান রায়,
দরদী হলেও ডাক্তারি ক'রে ঘাঁটা পড়িয়াছে মনে ;
রাতদিন তাঁর 'কল'—
মনখানি তাঁর জুড়িয়া রয়েছে শিলং ও পলিটিক্স।

তাঁর চেয়ে ভাল শ্রীযুক্ত কচি বোস,
চৌদ্দবর্ষ বিবাহ-ধর্ম্মে দাগা বুলালেন তিনি,
তবুও হয়নি অক্ষর পরিচয়!
হঠাৎ-কুমার শ্রীমান সুবোধ বসু—
ঝুঁকিল কুঞ্জ তবু শেষ কালে অনেক চিন্তা করি,
মামলায়-পড়া পতিরে ভজিতে সাহস হ'ল না মনে।

সুভাষচন্দ্র, দূরদেশে তিনি, আসিবেন অচিরাৎ
কাগজে দেখি না কোনই সম্ভাবনা।
নির্দ্দয় ইংরাজ
একটি নারীর পরম ধর্ম্মে অন্ততঃ সাধে বাদ।
বাদ সাধে যথা মিশন অনেকগুলি—
পুরুষ-ধর্ম্ম ভুলায়ে পুরুষে করিয়া অন্তব্রতী।

এরই মাঝখানে রহিয়া রহিয়া জাগে কুঞ্জের মনে,
শ্রেষ্ঠপাত্রে ছোঁয়াইয়া বুড়ি, বিধি করে বরবাদ,
কবিগুরু আর শ্রীনলিনী আর গৃহী দুই চারি জনে,
অতি অকারণে বেহাত করিল, বিধাতা সে বেদরদী।

ভাবিতে লাগিল তালিকা হস্তে শ্রীমতী কুঞ্জবালা
পণ্ডিচারীর দিলীপ রায়ের কথা।
তার মাথাখানি কবে খেয়ে গেছে যত রাগ-রাগিণীরা
বাকী যাহা আছে তাও খেলো কবিতায়
পণ্ডিচারী সে অনেক যোজন দূর!

শ্রীউদয় শঙ্কর
নাচ ছাড়া আরো রয়েছে অনেক বাধা ;
বারীন দাদাও সেদিন মাত্র দেছেন ধর্ম্মে মতি।

একে একে একে সবে ক্যান্‌সেল করি'
রয়ে গেল বাকী একটি মাত্র নাম।
সেই নাম হ'ল কুঞ্জের জপমালা
ঝুনো আইবুড়ো সম্পাদক সে দৈনিক কাগজের
বহু-পরিচিত সত্যেন 'জুমদার।
অনেক ভাবিয়া লিখিল কুঞ্জ তাঁরে পরিণয়-লিপি ;
লিখিল, তোমার লাগি
নারী-চিত্তের শতদল মোর ফুটেছে অকস্মাৎ
তুমি তারে লও তুলি
সার্থক কর তোমার নামের মর্য্যাদা তারে দিয়ে।

ক্ষেপিল মজুমদার !
লিখিল জবাব অতীব রূঢ় সে ভাষা
অতীব স্পষ্ট এবং অতীব প্লেন
ছাপার যোগ্য নহে।

শ্রীমতী কুঞ্জবালা
বার দুই আরো চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইল যবে
ব্যর্থ হইল পাঠায়ে দালাল নামজাদা কয়জনে,
মানিয়া প্রত্যাদেশ,
বর্ম্মন ষ্ট্রীটে অনশন করে সুরু।

অটল রহিল তবুও মজুমদার
হোটেল, গল্প, লীডার লেখায় মেতে !
নাহিক খেয়াল কে কোথায় তার লাগি করে অনশন
কার তপস্যা তাহারে কামনা করি'।
অনশন করে শ্রীমতী কুঞ্জ কেটে যায় একদিন
দরদীজনের সহসা টনক নড়ে ;
খবর ক্রমেই রটিয়া গেল যে খবরদারীর চোটে
শ্রীবোলপুরেতে পহুঁছিল সংবাদ
কবি রবীন্দ্র বসিলেন ধ্যানাসনে।
মজুমদারের ধৃষ্টতা স্মরি' রাগেতে গেলেন জ্বলে,
স্বস্তি কবিতা ফেলিলেন লিখি শ্রীমতী কুঞ্জে নমি'
লিখিলেন যাহা এই—

সাধ্বী কুঞ্জবালা দেবী

আত্মঘাতী কৌমার্য্যেরে করিতে ধিকার
হে সাধ্বী জীবন দিতে চাহ আপনার।
তোমারে জানাই নমস্কার।

রিরংসাতে দগ্ধ হয়ে সংযমের নামে,
কাটে চিমটি ছোঁড়ে কিল দক্ষিণে ও বামে,
কামের বিলাস মুখে হোটেলে যাহার—।
তার পাপ লবে তুলি বক্ষেতে তোমার
তোমারে জানাই নমস্কার।

অকারণ পথভ্রষ্ট জীবের ক্রন্দন,
মুখরিত করে নিত্য পথ ঘাট বন ;
অবলের হত্যা অর্ঘে পূজা উপচার
ঘুচাও কলঙ্ক সাধ্বী কাম দেবতার।
তোমারে জানাই নমস্কার।

এতখানি লিখে মনোবেদনায় ক্ষান্ত দিলেন কবি
পরদিন প্রাতে আর এক ষ্ট্যাঞ্জা করিলেন তাতে যোগ।

আত্মঘাতী হয় তবু বোঝনা যে নিজে,
শীত গ্রীষ্ম বরষায় মরে ভিজে ভিজে,
অযাচিত তুমি তার নিতে চাহ ভার
কৌমার্য্য-নরক হতে করিয়া উদ্ধার।
তোমারে জানাই নমস্কার।

কবিতা লিখিয়া, অ্যাসোশিয়েটেড প্রেসে
খবর দিলেন, যে করেই হোক কুঞ্জে বাঁচাতে হবে।
মাসিক সম্পাদক
প্রবীণ এবং পুরাতন প্রবাসীর
খবর পেলেন নূতন কবিতা লিখেছেন কবিগুরু
কুঞ্জবালার নামে।
যারি নামে হোক, কবির কবিতা বটে;
এতদ্ব্যতীত নারী-প্রগতির যুগে
নারীর পক্ষে কলম ধরাটা রীতি।
বিবিধ-'সঙ্গে লিখিয়া দিলেন তিনি:
"কাড়িয়া যদিও লইতে চাহি না ব্যক্তির স্বাধীনতা
তথাপি কুঞ্জবালা
যে-পণ করিয়া করিছেন অনশন
সেপণ অতীব সাধু;
বিবাহ এবং সতীধর্ম্মের মর্য্যাদা তিনি চান,
সত্য মজুমদার
বিবাহ তাঁহারে করিলে হতেম খুশী।

২

মুখে মুখে আর কাগজে কাগজে রটিল বার্ত্তা ক্রমে,
অনশনে কাটে কুঞ্জবালার দিন ;
দলে দলে লোক আসে বর্ম্মন ষ্ট্রীটে।
নেতারা লিখিল বাণী ও আশীর্ব্বাদ ;
উঠিতে বসিতে সত্য মজুমদার
এর ওর তার পাইতে লাগিল পত্র ও টেলিফোন।
মোটরে চড়িয়া বড় বড় সব লোক
ধনুর্ভঙ্গ পণ কুঞ্জের ভাঙিতে আসিল সবে।
ভলান্টিয়ার দল
বর্ম্মণ ষ্ট্রীটে ভিড় করে শেষে চলে প্রসেশন করি।
উঠিতে লাগিল চাঁদা
লেক রোডে আরো দুই চারখানি গৃহ পত্তন হবে,
বাহির হইল দৈনিক দুইখানা—
"কৌমার্য্যের কুম্ভীপাক" ও "বিবাহ ধর্ম্ম" নামে।
চারিদিক হতে হায় হায় করে লোক,
পার্কে পার্কে বসিতে লাগিল সভা,
কুঞ্জবালার জয় সবে গাহে উচ্চ কণ্ঠ তুলি :
চিরজীবী হোক সাধ্বী কুঞ্জবালা।
মজুমদারের নামে
ছি ছি করে লোক নির্ম্মম সে যে জোর করে দাও বিয়ে ;
তথাপি অটল সত্য মজুমদার।

নিরম্বু অনশনেতে কুঞ্জ বেহুঁসে পড়িয়া আছে ;
বর্ম্মন ষ্ট্রীট লোকে অরণ্য প্রায়।

বন্ধ হইল লরী গাড়ি আর মোটর মোটর-বাস্
রোটারির রোল ঢোকে না অফিসে, বাহির হয় না ভ্যান ;
হকারের দল কাগজ না পেয়ে ফেরে !
সহসা প্রমাদ গণিল মাখন সেন,
গড়গড়া আর নল হাতে তিনি উঠিলেন দোতালায়
চক্ষু পাকলি' কহেন মজুমদারে—
তিনিও চেঁচান জোরে !
হাতা হাতি আর মারামারি প্রায় সুরু
বিবাহ তোমারে করিতে হইবে কহিল মাখন সেন
নতুবা কাগজ ওঠে !
তার চেয়ে আমি হইব বিরাগী কহিল মজুমদার
বেলুড়ে যাইব নন্দগোপালে লয়ে—
বিষম ক্রোধেতে অ্যাশ-ট্রে লইয়া ছুঁড়িল মাখন সেন !

* * *

ধড় মড় ক'রে দিবা-ঘুম থেকে জাগিল বিবেক মুখো,
টুলে হাত লেগে অ্যাশ-ট্রে পড়েছে নীচে।
সে দিনের ছেঁড়া "শক্তি-পূজা"টা উড়ে পড়ে গেছে ভুঁয়ে !
কুঞ্জের কথা স্মরি'
লজ্জায় উঠি লীডার লিখিতে বসে।

———

পুনশ্চ

একটা গল্প লিখিতে হইবে। কিন্তু লিখি কাহাকে লইয়া! কিরণময়ী রাঁচিতে আশ্রয় লইয়াছে—অন্নদাদিদি সেই যে গা-ঢাকা দিয়াছে আর কোন পাত্তা নাই—কমল মেডিক্যাল স্কুলে ভেনিরিয়াল পপার ওয়ার্ডে ভর্ত্তি হইয়াছে। চাটুজ্জে পাড়ায় আর কেহ নাই। একবার নতুন পাড়াটা উঁকি মারিলাম—কিন্তু খেঁদিরও নাক খসিয়া গিয়াছে—বীভৎসতায় কাছে যাওয়া যায় না—বিনি-পানওয়ালীর সামনের চুল উঠিয়া কপালটা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত হইয়াছে। এদিকে হিমি মেছুনীর একটা চোখ নষ্ট হইয়া গিয়াছে—অন্য চোখটা দিয়া সে ঘন ঘন চারিদিকে নয়নবান মারিতেছে, কিন্তু একটা পঙ্গু ভিক্ষুক ছাড়া তাহার ত্রিসীমানায় আর কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। বুঝিলাম এ পাড়া লইয়া ডাক্তারীর গবেষণা চলিতে পারে কিন্তু গল্প চলিবেনা। একবার চট করিয়া তরুণ পাড়াটা ঘুরিয়া আসিলাম। লটী চাটুজ্জের গালের হাড়, পাউডার ও স্নো ছাপাইয়া উঁচু হইয়া উঠিয়াছে—হেনা রায়ের বসা-চোখে বত্রিশ বৎসরের অস্বাস্থ্যকর দূষিত দৃষ্টি, লেখক হলধর ঘোষালের চেহারায় পাঁঠার ছাপ ফুটিয়া উঠিয়াছে—আর্টিষ্ট মুরলী সেন কুকুরের মত হেনা রায়ের পা চাটিতেছে—বুঝিলাম এ পাড়ার অন্তত দশ মাইলের মধ্যে গল্প ঘেঁষিতে পারে না—প্রবীণদের উদ্যত খড়্গের হাত হইতে অন্তত হলধরকে বাঁচাইবার জন্য পণ্ডিত রামশর্ম্মাকে পাঠাইয়া দিতে মনস্থ করিয়া সরিয়া পড়িলাম। এলোমেলো ঘুরিয়া লাভ হইবে না, তাহার চেয়ে একবার সদা-মামার কাছে গিয়া পড়িতে পারিলে হয়ত একটা ভাল গল্পের প্লট জুটিয়া যাইতে পারে।

আমাদের সদা মামা—সমস্ত দিন যাহা পায় তাহাই পড়ে, সন্ধ্যার পর আফিং খাইয়া ঝিমায়। মামার পাঠ্য পুস্তকের কোন বাছ বিচার নাই। একদিন গিয়া দেখি গভীর মনোযোগ দিয়া একখান "ইউক্লিডের" জ্যামিতি পড়িতেছে। বলিলাম, মামা একি পড়ছ? মামা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, জ্যামিতিখানা দেখছিলাম—বিউটিফুল লেখা—আমি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম, মাতুল! এই বয়সে জ্যামিতি ভাল লাগে?—কেন লাগবে না ভায়া? পড়তে যদি জান আর ভাবতে যদি শেখ তাহলে সবই ভাল লাগবে। এই ধর টু সাইডস অব এ ট্রায়েঙ্গল—ভাল করে ভেবে দেখ টু সাইডস—আমি বলিলাম—খুব হয়েছে মামা—আর নয়; বুঝেছি জ্যামিতি ছাড়া আমাদের গতি নেই। সেদিন কোনরকমে মামার হাত ছাড়াইয়া সরিয়া পড়িলাম। আর একদিন গিয়া দেখি মামা তন্ময় হইয়া গুপ্তপ্রেস পাঁজি অধ্যয়ন করিতেছে। আমাকে দেখিয়াই বলিল—দেখ ভাগ্নে তোমাদের রবিবাবু যা বলে, পাঁজিতেও ঠিক তাই লেখা আছে।—এই দেখ লেখা আছে "রাশীনামুদায়া লগ্নঃ" অর্থাৎ কিনা জন্মের ঠিক মুহূর্ত্তে যে রাশি পূর্ব্ব দিগন্তে উঠছে—সেইটিই লগ্ন—এখন এই লগ্ন যদি গোলমাল হয়ে যায় তাহাকে জ্যোতিষের মতে সমস্ত জীবনটা গোলমাল হয়ে গেল। ওদিকে আবার রবিবাবুর "ভ্রষ্ট লগ্ন" মনে আছে ত—যেই ঠিক লগ্নটি ভ্রষ্ট হল অমনি সমস্ত জীবনটি মাটি হয়ে গেল। রবিবাবু শুধু কেতাবে নয়, রেকর্ডে পর্য্যন্ত "সে কোথায় সে কোথায়" ব'লে চেঁচিয়ে উঠলেন। আবার ধর—হাত জোড় করিয়া বলিলাম রক্ষে কর মামা—আর ধরে কাজ নেই—সমস্ত জলের মত বুঝতে পেরেছি। তবু আজ যখন কোন পাড়াতেই গল্পের কোন কিনারা করিতে পারিলাম না—তখন সন্ধ্যার পর মামার

ঘরেই আসিয়া বসিলাম। জানতাম, সুযোগ মত ধরিতে পারিলে গল্প নির্ঘাৎ পাওয়া যাইবে। দেখিলাম মামা ঘাড় গুঁজিয়া চোখ বুজিয়া বসিয়া আছে, হাতে একখানা "গল্পগুচ্ছ"। কার্ত্তিক মাসের সন্ধ্যা বেশ একটু মিঠে রকম ঠাণ্ডা পড়িয়াছে—চাপিয়া বসিলাম। মামার আর ধ্যানভঙ্গ হয় না। বলিলাম, মাতুল কি ধ্যান কচ্ছ?

কে ভোলানাথ, এস বাবা বস—অতি কষ্টে চোখ খুলিয়া মামা একবার আমাকে দেখিয়া লইলেন তাহার পর আবার ধ্যানস্থ হইয়া পড়িলেন—ডাকিলাম, মামা! মামা আবার মিট্ মিট্ করিয়া চাহিয়া বলিল, গল্প ত? শোন একটা বলছি। মামা একটু উঠিয়া বসিয়া জড়াইয়া জড়াইয়া ডাক দিলেন বাবা—নন্দলাল! নন্দলাল নিঃশব্দে আসিয়া গুড়গুড়ির মাথায় জ্বলন্ত কলিকাটি বসাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। মামা ফুড়ুক্ ফুড়ুক্ করিয়া দুই চারিটি টান মারিয়া বলিতে লাগিলেন, ঠিক ভর সন্ধ্যে হয়ে এসেছে গঙ্গার পাশ দিয়ে যে নির্জ্জন রাস্তাটা গ্যাছে তাতেই বেড়িয়ে বেড়াচ্ছি—দূরে দেখি একটা দুরন্ত ঘোড়া হাঁকিয়ে কে চলে আস্‌ছে—একটু কাছাকাছি হতে চিন্‌তে পাল্লাম আমাদের সিতু! সিতু কে? সিতুকে চেন না? সিতাংশু মৌলি? পয়লা নম্বরের বাড়ীতে থাকত? সামনে রাখা গল্পগুচ্ছটার উপর নজর পড়িল। বাধা না দিয়া বলিলাম—বুঝতে পেরেছি—আপনি বলুন। মামা বলিতে লাগিল—আমাকে দেখে সিতু একটু কাঁচুমাচু হয়ে রাশটা টেনে ধরলে। আমি বল্লাম কে সিতু নাকি? তারপর কি মনে করে? মসুরি পাহাড় থেকে নাম্‌লে কবে?

অনেক দিন হল।

জানত আমি চিরকাল স্পষ্টবাদী। বল্‌লাম বাবা সিতু, ছুঁড়ীটাকে সরিয়ে কোথায় রাখলে বলত?

সিতাংশু একটু চম্‌কে একটা ঢোঁক গিলে বল্লে—কার কথা বল্‌ছেন ?

—অনিলা গো অনিলা।

সিতাংশু ঘোড়া থেকে নেমে পকেট থেকে একটি ছোট এনামেল্‌ করা কার্ড কেস বার কল্লে।

আমি বল্লাম—আমাকে আর দেখাতে হবে না—সেই নীলরঙের চিঠির কাগজের আধটুক্‌রা ত ? ওতে অনিলার স্বামী ভুলবে—আমি ভুল্‌ছি না বাবা। ঠিক করে বলো দেখি মেয়ে মানুষটিকে কোথায় সরিয়ে রেখেছো ? ঐ নীল কাগজে যেটুকু লেখা আছে সেটুকু ত সবাই জানি, কিন্তু পুনশ্চ যেটুকু লিখেছে—সেটুকু কোথায় বাবা ?

সিতাংশু কোন কথা না বলে—ঘোড়াটাকে একটা গাছের গুঁড়িতে বেঁধে আমার কাছে এসে বল্লে—চল মামা গঙ্গার ধারে বসা যাক্‌। দুজনে গিয়ে গঙ্গার ধারে বস্‌লাম। একটু চুপ করে থেকে সিতাংশু বল্লে—মামা তুমি ত আমাকে আজ থেকে জান না—বহুকাল থেকে জান—সেই কোন মান্ধাতার আমল থেকে। মেয়ে মানুষ নিয়ে কারবার আমার আজ নয়—আর এই মেয়ে মানুষের দালালি করে নাম করেছে টাকা করেছে অনেকে। হীরার কথা মনে আছে ত। হীরা কিন্তু পাগল হল। রোহিণীর কথা ভোলনি বোধ হয়, সে খুন হল, আমি সন্ন্যাসী হয়ে ফেরার হলাম। মাঝ থেকে বঙ্কিম চাটুজ্জে দালালী করে নামও কল্লে—টাকাও কল্লে। তার পরের কথা ধর বিনোদিনী! ভাবলাম—এমন মাল বুঝি দেখিনি—কিন্তু কাছে গিয়ে দেখলাম—ওমা সেই হীরেই ভোল বদলেছে। তারপর এইত হালের কথা—কিরণময়ী এলো, দেখলাম সেই আদিম হীরে—এও পাগল হল। তারপর কত এলো কত গেলো—তারপর বিনোদিনী গিয়ে এল

অনিলা। সত্যি বলছি মামা—আমাকে ধাঁধা লাগিয়ে দিলে। মাইরি এই নীল রঙের চিঠির কাগজের অর্দ্ধেকটুকু ছাড়া আমার কাছে আর কিছু নেই।—এর সঙ্গে আমার পূর্ব্বে জানা শোনা ছিল কিনা কেউ জানে না—আমিও জানি না—এর সঙ্গে আমার চোখা চোখির ইতিহাস সকলের চোখেরি আড়ালে রয়ে গেল—এর পালানর মধ্যে প্রেম ছিল কি ভয় ছিল—আমি জানি না। তবে তোমায় ছুঁয়ে দিব্যি কচ্ছি—এই দুলাইন চিঠি ছাড়া আর কোন পুনশ্চ নেই।

বুঝলাম, সিতু ফাঁকি দিচ্ছে। বাবা, আমার কাছে চালাকি!—প্রশ্ন করলাম, আচ্ছা সিতু ঘোড়ায় তোমার পিছনে বসে ও কে?

সিতু কোনো জবাব দিলনা। আমি কাছে গিয়ে বল্‌লাম, কে মা তুমি?

ঘোড়ার উপর থেকে আরোহিণী বল্‌লেন—আমার নাম অনিলা।

অনিলা—অনিলা—পয়লা নম্বর—সিতাংশু মৌলি—পয়লা নম্বর—

বুঝিলাম মামার নেশা জমিয়া আসিয়াছে—গল্প এখানেই শেষ হইল, অর্থাৎ মাটি হইল।

শ্রীভোলানাথ মুখোপাধ্যায়।

WHY NOT ?

নীরব রজনী,
খুলিয়া-স্বপন দ্বার, আসে,
কল্পনার মায়াপুরী হইতে নির্গত,
যুগে যুগে দলে দলে সহস্রে লক্ষেতে,
ছায়ামূর্ত্তি অবাস্তব তাজ্জব অদ্ভুত,
শোভাযাত্রা ঘুমন্ত মগজ পথে।
সত্যমিথ্যা মিলিত মিছিল,
অতৃপ্ত বাসনা যত মিলিয়া মিশিয়া
অপরূপ স্বপ্নরস করি' আস্বাদন
করে আস্ফালন যতেক নাসিকা।

* * *

ইন্দ্রদেব ত্যজি শয্যাপরে স্বপ্নমগ্না ইন্দ্রাণীকে
চলিল নিশিথে পেট্রল চালিত ঐরাবতে
নন্দন কানন পথে,
পরি' বিদ্যুতের কণ্ঠহার মেঘিনীরা হাসে বক্রহাসি,
নক্ষত্ররা করিছে ইসারা মিটি মিটি নয়ন ভঙ্গিতে,
হারাইয়া অল্প-কয় কলা. চন্দ্রমা বঙ্কিম, শোকে।
কুপথ পথিক যুবাজনে দিবে শিক্ষা, উগ্রচণ্ড ধূমকেতু
উদিত আকাশ পথে সমাজ সংস্কার লোভে।
উর্ব্বশী, মেনকা, আদি ঘোমটা খুলিয়া
খেমটা নর্ত্তনে রত।

* * *

—যদিও বাজার মন্দা অতিরিক্ত সপ্লাই বশতঃ।
ভীষণ বিপদ ; গেলাসে ঘটিতে
কুম্ভীর হাঙ্গর আদি বাঁধিয়াছে বাসা,
কাৎলা টেঙ্গরা যত করিয়াছে সত্যাগ্রহ
পটলের প্রাণ রক্ষা হেতু।

* * *

মুসোলিনী করেছে হুকুম
টেকো লোকে না কাটিলে টেরী
দিবে ট্যাক্স ; নয় কারাবাস।
মঙ্কি-গ্ল্যাণ্ড করিতেছে গ্রাফ্‌ট ল্যাম্প পোষ্ট পরে ;
করপরেশন লভিয়া স্যাংশন ;
ক্যাণ্ডেল পাওয়ার তাহে বাড়িবে বলিয়া।

* * *

আজি স্বপ্নলোকে দুনিয়া হইল হলিউড
মার্লেনের সাদি হ'ল সৈয়দের সাথে
মৌলভির ভেঙে যায় ঘুম
ক্রকোর্ডের জোয়ানিতে,
"দাড়িতে বিনুনি কর" কে যেন বলেছে।

* * *

খাইয়া বালিস, ভাতের থালায় মাথা দিয়া
ঘুমন্ত পেটুক
ঘন ঘন কেঁপে ওঠে রোমাঞ্চ তাড়নে।
করিয়া রিসার্চ প্রমাণ হয়েছে

অবশ্য ক্যাঙারু ছিল ;
নতুবা ল্যাজের পরে, কেমনে বসিল ?

* * *

রবীন্দ্রীয় জীব জন্তু যত
নিষ্ক্রমিল ময়দানে ভ্রমণ ইচ্ছায়
বিকট বকের সারি পদব্রজে গঠিল বলাকা।
চতুষ্পদ অণ্ড ধায় জননীর পশ্চাতে সঘনে ;
হাসিতেছে বুলবুল চেয়ারে বসিয়া
স্বপ্ন লজেঞ্জুস চুষি' আকুলিত খোকা
কবিও আকুল হ'ল হেরিয়া খোকারে।

শ্রীমধুকরকুমার কাঞ্জিলাল

"Which of your works of fiction do you consider the best, Mr. Penwright ?"

"Oh, my last income-tax return."

"Mother says she nearly died laughing over those stories you told her."

"Where is she ? I know some funnier ones."

চিঠি

সম্পাদক মহাশয়,

কাগজের একটি নির্দ্দিষ্ট পরিসরের ভিতর যত ইংরেজী শব্দ ছাপা যায়, বাংলা তত ছাপা যায় না। ইহার কারণ এই যে ইংরেজী অক্ষর যত ছোট তৈয়ারী হয় বাংলা অক্ষর সেরূপ ছোট তৈয়ারী করা সম্ভব নহে। * অথচ বাংলা অক্ষর ত্যাগ করিয়া রোমান অক্ষর প্রচলন করাও অবিলম্বে হইবে বলিয়া বোধ হইতেছে না। কিন্তু তাহা না হওয়া পর্য্যন্ত কি আমরা ক্রমাগতই ঠকিতে থাকিব? একই পৃষ্ঠা-সংখ্যা সমন্বিত একই মূল্যের বাংলা এবং ইংরেজী বই কিনিতেছি কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখুন, সমান মাল পাইতেছি না। তিন টাকায় শেলী বা কীট্‌স-এর যতগুলি কবিতা পাওয়া যায়, রবীন্দ্রনাথের কবিতা তত পাওয়া যায় না। একটাকা ছয় আনায় যত শব্দ বিশিষ্ট স্কটের নভেল পাওয়া যায়, ঐ মূল্যে তত শব্দ বিশিষ্ট বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থ পাওয়া যায় না। অবশ্য যদি বলেন শূন্য কুম্ভে শব্দ বেশি, এবং কুম্ভ পূর্ণ থাকিলে শব্দ কম; তাহা হইলে উত্তরে ইহাই বলিতে চাহি যে কুম্ভ ক্রয় করা আমার উদ্দেশ্য নহে, আমি পুস্তক কিনিতে ইচ্ছা করি। এবং আমি বিশ্বাস করি তাহাতে শব্দ যত বেশি ততই তাহা পূর্ণ। যদি বলেন, শব্দই যদি চাও, তাহা হইলে পি. এম. বাগচীর পঞ্জিকা কিনিলেই হয়। তাহার উত্তরে বলিব, আমি প্রতিবৎসর নিয়মিত উহা কিনিয়া থাকি, কিন্তু আজীবন কেবল পঞ্জিকা কিনিয়াই সুখী থাকিব, গল্প-

---

* সম্প্রতি বাংলায় লাইনোটাইপ আবিষ্কৃত হওয়ায় অক্ষরের আকার পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু কমিয়াছে—কিন্তু তবু এ লেখার মূল্য কমিবে না।—লেখক

উপন্যাস কিনিব না, এ কেমন কথা? পয়সা হাতে হইলেই কিনিব, এবং ঠকিব। কিন্তু আর ঠকিতে ইচ্ছা করি না। একটা কিছু উপায় বাহির করিতে হইবে। বাংলা ভাষায় আমি বই লিখি না বটে (কোনো ভাষাতেই লিখি না) কিন্তু বাংলা ভাষায় কথা বলি, সুতরাং এ সম্বন্ধে আমারও কিছু বলিবার অধিকার আছে। অন্তত আমার বিশ্বাস তাহাই।

আপনারা সাধু ভাষার অধিক পক্ষপাতী বলিয়া মনে হয়। লোক ঠকাইবার ইহা একটি সাধু রীতি সন্দেহ নাই। আমিও সাধু ভাষাতেই লিখিতেছি, কেননা আমার প্রাণের ভাষায় লিখিলে আপনারা সে লেখা নাও ছাপিতে পারেন। কিন্তু সাধু ভাষা পছন্দ করিনা বলিয়া আমি নিজে অসাধু নহি। প্রাণের কথা খুলিয়াই বলিতেছি, ইহাই সাধুতার একটি প্রমাণ।

আমি আপনাদিগকে একটি অনুরোধ করিতেছি। কিন্তু তৎপূর্ব্বে সাধু ভাষা লোকঠকানো ভাষা কেন তাহা বলিতেছি। এবিষয়ে আমি একটি উদাহরণ দিলাম। ইহাতে দেখিবেন, সাধুভাষায় অনাবশ্যক অক্ষর বৃদ্ধি হয় কিন্তু শব্দ বৃদ্ধি হয় না। এবং অক্ষর বৃদ্ধিতে নির্দ্দিষ্ট পরিসর কাগজে শব্দ সংখ্যা কম ধরে। অপর পক্ষে কথ্য ভাষায় ঠিক যত গুলি অক্ষর শব্দের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজন তাহার বেশি অক্ষর থাকিতে পারে না। ইহাতে একই স্থানে বেশি শব্দ ছাপা যায়। যথা:

(কথ্যভাষা) "শিকাগো থেকে কাল রচেষ্টারে এসেছি।... অয়কেনের সঙ্গে আমার আলাপ হ'ল। তিনি দু হাতে আমার হাত ধরে আমাকে খুব সমাদর ক'রে গ্রহণ করলেন—বললেন ইণ্ডিয়া ও জর্ম্মনি আমরা এক রাস্তায় চলছি। এই বৃদ্ধকে দেখে আমার খুব আনন্দ বোধ হ'ল।"

এই প্যারাগ্রাফটি সাধু ভাষায় পরিবর্ত্তন করিলে দাঁড়ায়,—"শিকাগো হইতে কাল রচেষ্টারে আসিয়াছি।...অয়কেনের সঙ্গে আমার আলাপ হইল। তিনি দুই হাতে আমার হাত ধরিয়া আমাকে খুব সমাদর করিয়া গ্রহণ করিলেন—বলিলেন ইণ্ডিয়া ও জর্ম্মনি আমরা এক রাস্তায় চলিতেছি। এই বৃদ্ধকে দেখিয়া আমার খুব আনন্দ বোধ হইল।"

উপরের দুইটি প্যারায় দেখিবেন মূল কথ্যভাষার অক্ষরের সংখ্যা ১০০ এবং পরিবর্ত্তিত সাধুভাষার অক্ষর সংখ্যা ১০৯। অথচ শব্দ সংখ্যা এক। এইরূপে যদি দুইশত পৃষ্ঠার কথ্যভাষায় লিখিত একখানি বাংলা পুস্তকে একলক্ষ অক্ষর থাকে তাহা হইলে সেই পুস্তক সাধু ভাষায় পরিবর্ত্তিত করিলে অক্ষর সংখ্যা বাড়িয়া প্রায় একলক্ষ দশহাজার হইবে। এই দশ হাজার অক্ষরকে স্থান দিতে গেলে আরো কুড়ি পৃষ্ঠা বাড়াইতে হইবে। ইহার জন্য বহু টাকা অতিরিক্ত খরচ এবং ফলে পুস্তকের অযথা আকার এবং মূল্য বৃদ্ধি। কথ্যভাষায় পুস্তক লিখিত হইলে এই সমস্যা, গ্লানি এবং কুকর্ম্মের দায় হইতে আপনারা মুক্ত হইতে পারেন।

আমার আরো একটি উপদেশ আছে। যে সমস্ত শব্দ একাধিকবার লিখিত হয় তাহার জন্য একটি সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করিলে অর্থ-সঙ্গতি কিছুমাত্র নষ্ট না করিয়া শব্দ সংখ্যাও কমাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। এই দরিদ্র দেশে ইহার চেয়ে সারবান উপদেশ আর কি হইতে পারে! যাহারা বই পড়িতে যথার্থ ভালবাসে নিতান্ত দুর্ভাগ্যবশত ভগবান তাহাদিগকে ধনী করেন নাই। সুতরাং পাঠকশ্রেণী সঙ্ঘবদ্ধ-ভাবে আমার এই আন্দোলনে যোগ দিবেন ইহাই আকাঙ্ক্ষা। কবিতা পুস্তকেও আমরা এই 'ছাটাই' প্রক্রিয়া প্রচলন করিয়া কিরূপে লাভবান হইতে পারি তাহা উদাহরণ দিয়া দেখাইয়া দিতেছি। এই লাভ

আর্থিক লাভ নহে। ইহা শুধুই লাভ—পরে হয়ত ইহা হইতে আর্থিক লাভের রাস্তা খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে। মূল অর্থ ও ভাব অক্ষত রাখিয়া অর্থাৎ লেশমাত্র নষ্ট না করিয়া আমরা শব্দসংখ্যা (শুধু অক্ষর সংখ্যা নহে) কমাইবার উপায় বাহির করিয়াছি। যথা—

প্রিয়তম আমি তোমারে যে ভালোবেসেছি
দয়া ক'রে কোরো মার্জ্জনা, কোরো মার্জ্জনা।
ভীরু পাখী আমি তব পিঞ্জরে এসেছি
তাই বলে দ্বার কোরোনা রুদ্ধ কোরোনা।
যাহা কিছু মোর কিছুই পারিনি রাখিতে
উতলা হৃদয় তিলেক পারিনি ঢাকিতে,
তুমি রাখো ঢাকি, তুমি করো মোরে করুণা
আপনার গুণে অবলারে কোর মার্জ্জনা কোরো মার্জ্জনা।

এই কবিতার পূর্ব্বে কয়েকটি সাঙ্কেতিক চিহ্ন বসাইতে হইবে।

কোরো—[ক]
মার্জ্জনা—[খ]

এই দুইটি মাত্র সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহৃত হইল, কারণ উদ্ধৃত ছত্রগুলিতে এই দুইটি শব্দই পুনঃপুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে। এইবার নূতন রীতিতে পড়া যাক—

প্রিয়তম আমি তোমারে যে ভালোবেসেছি
দয়া করে [ক] [খ] [ক] [খ]
ভীরু পাখী আমি তব পিঞ্জরে এসেছি
তাই বলে দ্বার [ক] না রুদ্ধ [ক] না।
যাহা কিছু মোর কিছুই পারিনি রাখিতে
উতলা হৃদয় তিলেক পারিনি ঢাকিতে,

তুমি রাখো ঢাকি, তুমি করো মোরে করুণা
আপনার গুণে অবলারে [ক] [খ] [ক] [খ]

এইরূপ সঙ্কেতচিহ্ন অবশ্য কবিতার বেলায় বিশেষ উপকারে আসে না। কারণ কবিতার ছত্রসংখ্যা ইহাতে কমে না আর ছত্রসংখ্যা না কমিলে মুদ্রণের বেলায় পত্র-সংখ্যাও কমাইবার উপায় নাই।

সুতরাং এই সঙ্কেতচিহ্নের ব্যবহার একমাত্র গদ্যেই সুফল প্রদান করিবে। ধরুন যদি রবীন্দ্রনাথের সমগ্র গদ্যগ্রন্থ হইতে "বিশ্ব" "বাঁশি" ও "অসীম" এই তিনটি শব্দ উড়াইয়া দিয়া তৎস্থলে ১, ২, ৩, কিংবা অ, আ, ই, এই তুইটি সঙ্কেত ব্যবহার করা যায় তাহা হইলে তাঁহার গদ্য-গ্রন্থের আকার একতৃতীয়াংশ কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা। বীরবলের লেখা হইতে "কেননা" এবং "আর" এই তুইটি শব্দ উড়াইয়া দিয়া সঙ্কেতচিহ্ন বসান, দেখিবেন, একই ফল ফলিয়াছে। শরৎচন্দ্রের নাম করিলাম না, কারণ তিনি যে শব্দটি পুনঃপুনঃ ব্যবহার করিয়াছেন, এবং যাহার উপর তাঁহার বই বিক্রয় নির্ভর করে—সে শব্দটি সৌভাগ্য-বশতঃ একটি অক্ষর দ্বারা গঠিত। শব্দটি "ত"। শরৎ বাবুকে "ত" অক্ষরটি শব্দ হিসাবে ব্যবহার করিতে না দিলে তাঁহার mass appeal আর চলিবে না। আরো একটি শব্দ আছে, সেটি "কিন্তু"। কিন্তু এটা ধর্তব্য নহে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, আমার কথাগুলি ভাবিয়া দেখিবেন। ইতি—

শ্রীপরাশর শর্ম্মা

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সুরদাসবাবুর বাটী সংলগ্ন উদ্যান

হর্ষনাথ। দেখুন, সনতের নামে নালিশটা ঠুকে দিয়েছি।

সুরদাস। কোন্ নালিশ?

হর্ষনাথ। সেই মঞ্জরীর টাকার।

সুরদাস। বেশ করেছ, কিন্তু আদায় হবে কি?

হর্ষনাথ। বডি-ওয়ারেণ্ট করবার ভয় দেখালেই হবে!

ছদ্মবেশী সনতের প্রবেশ

সনৎ। কি কথা হচ্ছিল, হর্ষনাথবাবু?

হর্ষ। আপনার কাছে আর গোপন করবো কেন, সনতের নামে পাওনা টাকার বাবদ নালিশ ক'রে দিয়েছি।

সনৎ। বেশ ক'রেছেন, কিন্তু সেই বাড়ীখানার কথা যেন মনে থাকে।

হর্ষ। সে এখন আপনার বলেই মনে করুন না। কিন্তু দেখবেন, সনৎ যেন কথাটা জানতে না পায়।

সনৎ। বিলক্ষণ! আপনি যদি তাকে না বলেন, আমি বলছি না।

হর্ষ। আমি বলবো! কিন্তু আমার কথা যেন আপনার মনে থাকে।

সুর। মাষ্টার মশায়, আপনার ছাত্রী গান শিখছে কেমন?

সনৎ। এমন মনোযোগ দেখিনি।

সুর। মাষ্টার মশায়, আপনি বৃদ্ধ হলেও আপনার মধ্যে একটি যুবক

লুকিয়ে আছে, নইলে এরই মধ্যে আমার নাতনিকে বশ করলেন কি করে ?

সনৎ। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ, টের পেয়েছে নাকি ? (প্রকাশ্যে) আপনার আশীর্ব্বাদ আর সঙ্গীতের মাহাত্ম্যে সবই সম্ভব !

সুর। তা বেশ হয়েছে। এবার আমার নিখিলভারত ছাগপালন সম্বন্ধে বক্তৃতাটা শুনিয়ে দিই।

সনৎ। এর চেয়ে আর আনন্দের কি হ'তে পারে ? কিন্তু যে জন্য আমাকে বেতন দেন, সে কাজ তো অবহেলা করতে পারি না।

হর্ষ। আপনার কর্ত্তব্য জ্ঞান দেখে অত্যন্ত প্রীত হলাম।

সনৎ। কর্ত্তব্য জ্ঞান না থাক্‌লে আর দুবেলা গান শেখাতে আসি ! বেতন তো পাই শুধু এক বেলার জন্য।

সুর। আপনারা তাহলে থাকুন, দেখি আমি পথের মোড়ে কাউকে পাই কি না। আজকাল ভাল কথা শোনবার লোকের একান্ত অভাব। অথচ মনে কর—

যাইতে যাইতে

এই দেশে খনা লীলাবতী দময়ন্তী সীতা সাবিত্রী গার্গী মৈত্রেয়ী।

প্রস্থান

হর্ষ। তার পরে মাষ্টার মশাই, আমার কাজ কতদূর এগলো, মঞ্জরীকে আমার কথা-টথা ব'লছেন তো ?

সনৎ। বললে বিশ্বাস করবেন না, আপনার কথা শুনলে তিনি লাল হ'য়ে ওঠেন।

হর্ষ। লজ্জায় ?

সনৎ। না, রাগে।

হর্ষ। রাগে? কি সর্ব্বনাশ!

সনৎ। ভয় পান কেন? রাগ শব্দের তো নানা অর্থ আছে।

হর্ষ। যাক্ বাঁচলাম। কিছু বলেন?

সনৎ। একেবারে কিছু না!

হর্ষ। কি বিপদ্!

সনৎ। ভীত হবেন না। যে সব কথা তার মনে হয়, তা কি এই বুড়ো মাষ্টারকে বলবার মত?

হর্ষ। ওঃ বুঝেছি! তা হ'লে সনৎটার আর কোন আশা নেই।

সনৎ। আমি আসবার আগে যেটুকু ছিল তার বেশি নেই!

হর্ষ। তা হলেই হ'ল! আপনি আমার প্রকৃত উপকারী, আপনাকে ভুলছি না! আচ্ছা, কি-জাতীয় গান আপনি শিখিয়ে থাকেন?

সনৎ। যাতে সংসারের প্রতি বৈরাগ্য জন্মায়। যেমন ধরুন, শ্যামা-সঙ্গীত, রামপ্রসাদী গান, বাউলের গান, কিম্বা, "মনে কর শেষের সে দিন কি ভয়ঙ্কর" জাতীয় গান!

হর্ষ। আচ্ছা, "শেষের সে ভয়ঙ্কর দিনটা" বোধ হয় মৃত্যু?

সনৎ। ধরুন, ভগবান্ না করুন, সনতের সঙ্গে মঞ্জরী দেবীর বিবাহ হ'ল, সেটা কি আপনার পক্ষে ভয়ঙ্কর নয়?

হর্ষ। নাঃ! তার আর উপায় নেই। আর কিছুদিনের মধ্যেই সনতের বিষয় সম্পত্তি কিছুই থাকবে না, সবই মঞ্জরীর হয়ে যাবে।

সনৎ। এবং তারপরে কি ভাবছেন, সে সব হর্ষনাথবাবুর হবে?

হর্ষ। মাষ্টার মশাই কি যে বলছেন! চলুন, মঞ্জরীর কাছে যাওয়া যাক্।

সনৎ আমার সঙ্গে গেলে আপনার লাভ নেই আমার সম্মুখে তো

আর কথাবার্ত্তা হ'তে পারবে না। তার চেয়ে আমি গিয়ে আপনার জন্তে জমি তৈরী করে রাখি গে—

হর্ষ। তবে আর দেরী করবেন না, এক্ষুনি যান, আমারও কয়েকজন মক্কেল বসে আছে। আমি দেখা করে আসি।

উভয়ের প্রস্থান

মেজর গুপ্ত ও মিস্ পুনর্ণবার প্রবেশ

গুপ্ত। দেখুন, আপনি জীবনবীমার এজেণ্ট, তৎসত্ত্বেও আপনাকে ভালবাসি, এর চেয়ে ভালবাসার বড় প্রমাণ কি আর থাকতে পারে?

পুনর্ণবা। জীবনবীমার এজেণ্টদের ভয়ের কি আছে?

গুপ্ত। না, তেমন কিছু না, শুধু জীবনবীমার এজেণ্টদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্ম এক জীবনবীমা কম্পানি খোলা দরকার। দেখুন, আমাদের মিলনের মধ্যে ভগবানের হাত আছে, আমি ডাক্তার, আপনি জীবনবীমার এজেণ্ট!

পুনর্ণবা। মিলনটা সন্দেহজনক।

গুপ্ত। সন্দেহ-হীন প্রেম মেঘহীন সূর্য্যাস্তের মত। তাতে রঙ নেই, মোহ নেই। কিন্তু আমার ভালবাসায় আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না কেন? সত্যি বলছি আপনার আগে আমি কোন মেয়েকে ভালবাসিনি—

পুনর্ণবা। আমিও সত্যি বলছি, আমিও এর আগে কোন পুরুষকে ভালবাসিনি।

গুপ্ত। তবে?

পুনর্ণবা। আপনি এর আগে কোন মেয়েকে ভালবাসলে বুঝতে পারতেন মেয়ের ভালবাসা ও আমার ভালবাসায় কি প্রভেদ।

শুপ্ত। পড়ে মরুকগে প্রভেদ! আমার ভালবাসার আর একটা প্রমাণ দিচ্ছি। আমার সব চেয়ে গোপনীয় কথা আপনাকে আজ বলবো!

পুনর্ণবা। কি সে কথা?

শুপ্ত। সে শুধু আমার নয়, আমাদের সমস্ত জাতের।

পুনর্ণবা। মানবজাতির কথা?

শুপ্ত। না, ডাক্তারজাতির কথা।

পুনর্ণবা। ডাক্তার কি মানুষ নয়? তাদের আলাদা করে' দেখছেন কেন?

শুপ্ত। শুনলে, আপনিও আলাদা করে দেখবেন।

পুনর্ণবা। কি কথা? কোনো নূতন ওষুধের কথা নিশ্চয়!

শুপ্ত। ঠিক তার উল্টো!

পুনর্ণবা। ওঃ বুঝেছি! পুরাণো ওষুধের নূতন প্রয়োগ?

শুপ্ত। উঁহুঃ! হ'ল না!

পুনর্ণবা। এবার বুঝেছি! নূতন ওষুধের পুরানো প্রয়োগ!

শুপ্ত। না, না, সে আপনি কিছুতেই ভাবতে পারবেন না। ডাক্তারি শিখবার আগে আমারও স্বপ্নের অগোচর ছিল। দেখুন, একথা এর পূর্ব্বে কোন ডাক্তার কোনো অব্যবসায়ীকে বলেনি। এ যদি আপনি প্রকাশ করে দেন, তবে আমার জাত-ভায়েরা সকলে মিলে আমাকে একঘরে ক'রবে। এ রহস্য আপনাকে বলবার অর্থ আমার জীবন আপনার হাতে তুলে দেওয়া।

পুনর্ণবা। বলুন, বলুন, আমি প্রকাশ করবো না।

শুপ্ত। ঠিক, তিন সত্যি?

পুনর্ণবা। হাঁ, তিন সত্যি!

গুপ্ত। আমাদের ডাক্তারিতে কোন ওষুধ নেই।

পুনর্ণবা। ওষুধ নেই! বলেন কি?

গুপ্ত। না, একটাও ওষুধ নেই।

পুনর্ণবা। তবে এত যে লাল কালো নীল হলদে কত ওষুধ দেখি!

গুপ্ত। স্রেফ জল!

পুনর্ণবা। শুধু জল! তবে এত রঙের ওষুধ হয় কি রকমে?

গুপ্ত। ওই সাদা জল হতভাগ্য রোগীর অসহায় অজ্ঞতার প্রিজ্‌মে লেগে বিচ্ছুরিত হয়ে লাল নীল হলদে সবুজ বেগনী নানা রঙের ওষুধের সৃষ্টি করেছে।

পুনর্ণবা। তবে আপনারা ইনজেক্‌শন দেন, কি?

গুপ্ত। বিশুদ্ধ জল!

পুনর্ণবা। তাই বা পান কোথায়? সব তো ক্লোরিন।

গুপ্ত। দেখুন আর সব ব্যবসায়ে জিনিষ খারাপ হ'লে কারিগরের দোষ হয়। কিন্তু ডাক্তারিতে সব দোষ রোগীর। আগেকার আমলের রাজাদের মত ডাক্তারদেরও 'ডিভাইন রাইট' আছে।

পুনর্ণবা। যা বলেছেন, একজনকে ছোরা দিয়ে খুন করুন, হবে ফাঁসি; মোটর চাপা দিয়ে মারুন, হবে বড় জোর পঞ্চাশ টাকা জরিমানা।

গুপ্ত। আর ইন্‌জেকশন দিয়ে মারুন, পাবেন ফীস বাবদ পঞ্চাশ টাকা;

পুনর্ণবা। তবে ডাক্তারেরা অসুখ সারায় কি ক'রে?

গুপ্ত। হিপ্‌নটাইজ ক'রে!

পুনর্ণবা। হিপ্‌নটাইজ করে কাকে? রোগীকে?

গুপ্ত। না, রোগীর অভিভাবককে।

পুনর্ণবা। আপনি যাই বলুন, আমি একটি রোগীকে চিকিৎসকদের শুধু প্রেসক্রিপশনের জোরে সারাতে দেখেছি।

গুপ্ত। কি রকম?

পুনর্ণবা। একটি ছেলের খুব অসুখ হয়েছিল, মরে আর কি? তার বাপ তাকে দেখাবার জন্য ডেকে আনলো একজন অ্যালোপ্যাথ, একজন হোমিওপ্যাথ, একজন কবিরাজ, আর একজন সন্ন্যাসী। বাপ বল্‌ল, আপনারা পরামর্শ ক'রে ওষুধ দিন। তখন একজন বলে ইন্‌জেকশন দিই, একজন বলে নাস্য ভমিকা, একজন বলে মকরধ্বজ, আর একজন দিতে চায় জল পড়া। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, কোনটাই দিতে হ'ল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই রোগীর জ্ঞান ফিরে এল, রোগী সেরে উঠল।

গুপ্ত। আপনি ভাবছেন সেটা চিকিৎসকদের গুণে?

পুনর্ণবা। তা নয়?

গুপ্ত। নিশ্চয়ই নয়। সেটা ওই পরামর্শ শুনে।

পুনর্ণবা। কি রকম?

গুপ্ত। রোগীর অবশ্য একটু জ্ঞান ছিল। তার কানে যেমনি ওই অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক পরামর্শ গেল, অমনি সে আত্মরক্ষার স্বাভাবিক ইচ্ছার বলে শক্তি সঞ্চয় করে' উঠে বস্‌ল। কারণ সে বুঝতে পেরেছিল ওই পরামর্শ অনুসারে ওষুধ পড়লে রোগের সঙ্গে সঙ্গে নিজের দফাও একেবারে সেরে যাবে।

পুনর্ণবা। জান্‌লেন কেমন করে?

গুপ্ত। অনেক দিন থেকে ডাক্তারি ব্যবসা করছি কি না! যাক্,

কথায় কথায় ব্যবসার অনেক গূঢ় রহস্য বলে ফেল্লাম! এখন আমি আপনার হাতে।

পুনর্ণবা। আপনার কথা ভুলবো না। এখন যাই, বিকেলে আবার দেখা হবে। নমস্কার।

প্রস্থান

গুপ্ত। নমস্কার। পুনর্ণবা, পুনর্ণবা! আহা, কি সুন্দর নামটি!

ললিতের প্রবেশ

ললিত। কি মেজর গুপ্ত, এখানে দাঁড়িয়ে কি ভাবছেন?

গুপ্ত। এই যে ললিতবাবু, আপনার কথাই ভাবছিলাম!

ললিত। আমিও আপনার কাছেই আসছিলাম।

গুপ্ত। বটে! মণিকা দেবীর খবর কি?

ললিত। কে জানে। অনেকদিন তার খোঁজ রাখি না। দেখুন, মেজর গুপ্ত, জীবনে আমি এখন এক নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করেছি।

গুপ্ত। আর আমি জীবনে পুরাতন অভিজ্ঞতার এক নূতন রূপ দেখতে পেয়েছি —অর্থাৎ প্রেম জিনিষটা যে ঠিক কি তা আমি আজ বুঝতে পারছি। এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ বুঝি জগতে আর কিছু নেই।

ললিত। মেজর গুপ্ত, এ কথা খুবই সত্য। তাইতো প্রেমের অপর এক নাম আদি রস।

গুপ্ত। ও কথা একেবারে মিথ্যে ললিতবাবু। প্রেমের নাম অনাদি রস, কারণ তার আরম্ভ নেই।

ললিত। এবং শেষ নেই।

গুপ্ত। জীবনের সে যে সিংহদ্বার।

ললিত। তার চেয়ে বলুন, খিড়কি দ্বার।

গুপ্ত। তার চেয়ে বলুন, বাতায়ন, যার ভিতর দিয়ে মন চলে যায়, কিন্তু দেহ যেতে পারে না।

ললিত। ঠিক। সেই বাতায়নিকার স্পর্শ পেতে হলে নীচে থেকে রসি বেয়ে উঠতে হয়—

গুপ্ত। রসি নয় ললিত বাবু, রস।

ললিত। ঠিক!

গুপ্ত। থামবেন না ললিত বাবু, এ সম্বন্ধে আরও দুচার কথা বলুন!

ললিত। প্রেম, সমুদ্রের মত প্রতিপদ থেকে প্রতিপদক্ষেপে জোয়ারের বাহু বাড়িয়ে বাড়তে বাড়তে যায়—

গুপ্ত। এবং সমুদ্রের মতই চির পূর্ণ, তার ক্ষয় বৃদ্ধি নেই—

ললিত। এবং চিরদিন যার জন্য পাগল, সেই চন্দ্রকে কখনো পায়না। প্রেম, সমুদ্রের মতই প্রিয়তমের জন্য সর্ব্বত্যাগী। তার অন্তরে যে সুধা ছিল, তা রেখেছে সে চাঁদের হৃদয়ে, তাইতো চাঁদ সুধাকর—

গুপ্ত। এবং সমুদ্রের মতই প্রেম লবণাক্ত, যেন অশ্রুজলে ভরা।

ললিত। বাঃ বাঃ বেশ বলেছেন, মেজর গুপ্ত। প্রেম আর অশ্রু এক পদার্থেরই অবস্থান্তর, যেমন বরফ আর জল। কিন্তু সমস্যা এই—জল থেকে বরফ, না বরফ থেকে জল? প্রেমের আগে অশ্রু, না অশ্রুর আগে প্রেম?

গুপ্ত। এ প্রশ্নের মীমাংসা আজো তো কেউ করতে পারল না। শুধু এইটুকু জানি, প্রেমের সমাধি বিবাহে!

ললিত। ঠিক্! পঞ্চশরের পঞ্চত্ব বিবাহে! মেজর গুপ্ত, বিষয়টা বেশ জমেছে আর একটু চালান।

গুপ্ত। অবিবাহিত প্রেম ধূমকেতুর মত, পৃথিবীর কাছে আসে কিন্তু

ধরা দেয় না, উত্তাপ দেয় কিন্তু আলো দেয় না, প্রসারিত বাহু দিয়ে পৃথিবীকে একবার মাত্র আলিঙ্গন ক'রে অসীম শূন্যে আবার ছুটে চলে যায়—

ললিত। আর বিবাহিত প্রেম রাশি রাশি জলন্ত উল্কার মত পৃথিবীতে পড়ে, পড়তে পড়তে ভস্ম হয়, ভস্ম হয়ে কোন চিহ্ন রাখে না, দিনের আলোয় কলঙ্কিত মুখ মাটির নীচে ঢাকে।

গুপ্ত। ঠিক বলেছেন! তবু আমি তাকেই বিবাহ করবো।

ললিত। আমিও তাকে বিবাহ করবো।

গুপ্ত। কে সে?

ললিত। কে সে?

গুপ্ত। এই দেখুন তার ছবি।

ললিত। এই যে তার ছবি।

পরস্পরের চিত্র বিনিময়

উভয়ে।

বিস্মিতভাবে চীৎকার

পুনর্ণবা! এযে পুনর্ণবা!

ললিত। এ ছবি পেলেন কোথায়?

গুপ্ত। ছবি ছাড়ুন, এ মানুষ পেলেন কোথায়?

ললিত। (ক্রুদ্ধ ভাবে) সাবধান। নারীর সম্মান রেখে কথা বলবেন, ইনি মানুষ নন, নারী!

গুপ্ত। আমি ডাক্তার। নর কি নারী তা আমি জানি, কিন্তু এ ফোটো আপনাকে কে দিলে?

ললিত। আমিও ঠিক ঐ কথা জিজ্ঞাসা করছি। শিগগির এর কৈফিয়ৎ দিন।

গুপ্ত। কৈফিয়ৎ দোব তোমায় ? লোফার !

ললিত। ভাগ্যবন্ত !

গুপ্ত। রাস্কেল !

ললিত। ঈডিয়ট !

গুপ্ত। এমনি করে নারীকে প্রতারণা ?

ললিত। এ ভাবে পুরুষকে প্রতারণা চলবে না !

গুপ্ত। এ অপমানের প্রতিশোধ দোব !

ললিত। পুনর্ণবা, তোমার অপমান আমি দূর করবো !

গুপ্ত। পুনর্ণবা, কোন ভয় নেই ! You Lalit, তোমাকে আমি দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে, যাকে বলে ডুয়েলে আহ্বান করছি !

ললিত। আমি এ আহ্বান গ্রহণ করলাম। পুনর্ণবা ! তোমার চোখের চাহনির অমৃতে—

গুপ্ত। মুখ সামলে ! অনাত্মীয়া অপরে-প্রাণসমর্পিতা যুবতীকে সম্বোধন করবার প্রথা ও নয়—

ললিত। তোমার পক্ষেও ঠিক একথা খাটে।

গুপ্ত। বাজে কথা যাক, কোন অস্ত্রে আপনি দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করবেন ? তরোয়াল, বন্দুক, ছোরা, না কি ? মনে রাখবেন আমি যুদ্ধে গিয়েছিলাম—

ললিত। সে ছড়ি নাচানো দেখেই বুঝতে পারা যায়। যুদ্ধে গিয়ে তো শুধু ট্রেঞ্চ খুঁড়েছিলেন, অতএব আপনার পক্ষে কোদালই ভাল।

গুপ্ত। ফের অপমান ! রাস্কেল, ষ্টুপিড ! পুনর্ণবা, তোমার কৃপায়—

ললিত। সাবধান ও নাম আর মুখে এনোনা।

গুপ্ত। বটে ! কাল কখন কোথায় লড়তে রাজী ?

ললিত। তোমার যখন যেখানে ইচ্ছে।

গুপ্ত। বেশ, কথা রইল। কাল বিকেলে, আমার বাড়ীতে। আর, অস্ত্র?

ললিত। কোদাল কিম্বা ডাক্তারি ছুরি।

গুপ্ত। আমাকে অপমান কর ক্ষতি নেই, কিন্তু আমার ব্যবসায়কে অপমান করোনা। আমি তোমাকে খুন, খুন করবো; 'ডুয়েলে' যেটুকু বাকি থাকবে সেটুকু ডাক্তারি ক'রে সাবড়ে দেবো! পুনর্ণবাকে অপমান, আমার পুনর্ণবা। ওঃ—

প্রস্থান

ললিত। আমার পক্ষে বন্দুক, ছুরি, ছোরা, তলোয়ার সবই সমান, কেবল ভরসা তোমার উপরে পুনর্ণবা! তোমার চোখের দীপ্তি আমার অস্ত্র শাণিত করে তুলুক। বাঙালীর ঘর-কুনো জীবনের মরবার এর চেয়ে মহত্তর সুযোগ আর জুটবে না। কিন্তু ঈডিয়টটাকে আমি দেখাবো! পুনর্ণবা! পুনর্ণবা!

প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

মঞ্জরীর কক্ষ

মঞ্জরী গান গাহিতেছিল

গীত

গান শেষ হইলে ছদ্মবেশে সনৎ প্রবেশ করিল

সনৎ। আচ্ছা মঞ্জরী, পুনর্ণবা কে?

মঞ্জরী। কি জানি কে!

সনৎ। একবার দেখতে হচ্ছে।

মঞ্জরী। আর দেখে কাজ নেই। যে দেখ্ছে, সেই মজছে।

সনৎ। কিন্তু ললিতকে তো বাঁচাতে হবে। ওটা যে এত বোকা!

মঞ্জরী। দু'জনে মারামারি করবে, শুনে অবধি মণিকা কান্নাকাটি সুরু করে দিয়েছে। ডাক্তার গুপ্ত যে জোয়ান!

সনৎ। তাই তো কি করা যায়? মণিকা গিয়ে ললিতকে ধরুক না!

মঞ্জরী। সে লজ্জার মাথা খেয়ে ললিতের কাছে গিয়েছিল। সে যে কি মাথামুণ্ডু বলল, মণিকা কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এল।

সনৎ। তবে?

মঞ্জরী। আমি হর্ষনাথবাবুকে দিয়ে পুনর্ণবাকে একবার ডেকে পাঠিয়েছি, সে এখনি আসবে, তুমি তাকে বুঝিয়ে বল।

সনৎ। বেশ, তাই বলবো।

মঞ্জরী। ওই শোন সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ, কে যেন আসছে, বোধ হয় হর্ষনাথ বাবু, চুপ করে থাকা ভাল নয়, একটা গান আরম্ভ কর।

সনৎ। গান করুন—

'মনে কর শেষের সে দিন কি ভয়ঙ্কর
সেদিন সবাই কইবে কথা, তুমি রইবে নিরুত্তর'

হ'ল না হ'ল না! আর একটু চড়িয়ে; হাঁ এইবার হয়েছে।

মঞ্জরী। (নেপথ্যের দিকে কান পাতিয়া) যাক্ চলে গিয়েছে।

(নেপথ্যে পুনর্ণবা। মঞ্জরী দেবী আছেন?)

মঞ্জরী। ওই বোধ হয় পুনর্ণবা এসেছে, আমি দরজা খুলে দিচ্ছি, তুমি আবার না মজলে বাঁচি।

দ্বার মোচন, পুনর্ণবার প্রবেশ

এই যে আসুন, নমস্কার; এইখানে বসুন। ইনি আমার সঙ্গীত শিক্ষক।

পুনর্ণবা। নমস্কার! আমায় কি জন্য ডেকেছেন মঞ্জরী দেবী?

সনৎ। দেখুন, মণিকা মঞ্জরী দেবীর বন্ধু। তিনি দ্বন্দ্বযুদ্ধের কথা শুনে একেবারে ভেঙে পড়েছেন। এখন একমাত্র আপনিই তাঁকে রক্ষা করতে পারেন। আমি মঞ্জরী দেবী, মণিকা, এমন কি সমস্ত মানুষজাতির নামে আপনাকে অনুরোধ করছি, দুজন পুরুষকে অপঘাত থেকে এবং একটি নারীকে অপমৃত্যু থেকে আপনি রক্ষা করুন!

পুনর্ণবা। দেখুন, আপনি বৃদ্ধ, প্রেমের মহিমা বুঝতে পারছেন না; প্রেমের জন্য মানুষ কি না করে!

মঞ্জরী। (রাগত ভাবে) একজন বৃদ্ধকে বয়স তুলে অপমান করা কি আপনার উচিত?

সনৎ। (বাধা দিয়া) আহা আপনি চুপ করুন না, বয়সের কথা তুললে বৃদ্ধের অপমান হবে কেন?

মঞ্জরী। আপনার মত এমন কঠিন হৃদয় দেখিনি। মনে রাখবেন, বাইরেটা মেয়ে মানুষের মত হলেই সবাই মেয়ে মানুষ হয় না।

সনৎ। এবং কিছু যদি মনে না করেন, তবে বলি, বাহিরে বৃদ্ধ হ'লেই লোকে ভেতরে ভেতরে হয় তো সত্য বৃদ্ধ হয় না।

পুনর্ণবা। আমি প্রতি মূহুর্ত্তেই তা বুঝছি, আপনারা বরঞ্চ কথাটা স্মরণ রাখবেন।

সনৎ। কেমন করে স্মরণ রাখবো বলুন; এর আগে তো আপনার মত দৃষ্টান্ত আর দেখিনি!

পুনর্ণবা। এবং আমি নিশ্চয় বলছি, এর পরও, আমার মত দৃষ্টান্ত আর দেখতে পাবেন না।

সনৎ। ভগবান কি একা আপনাকেই এমন অদ্ভুত ক'রে সৃষ্টি করেছেন?

পুনর্ণবা। কক্‌খনো না। আমাকে এমন অদ্ভুত করে' তুলেছে মানুষ।

সনৎ। সে কথা সত্যি মানুষই যত গোল বাধায়। তা না হ'লে আজ আপনি সামান্য খেয়ালের জন্য দু'জন যুবককে মৃত্যুর মুখে দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন?

পুনর্ণবা। সামান্য খেয়াল! হয়েছেন বৃদ্ধ, আপনি কি বুঝবেন? পড়েন নি, ইউরোপে প্রণয়িণীর জন্য বীরেরা পরস্পরকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করতো?

মঞ্জরী। ভারতবর্ষে কখনই এমন হ'তে পারত না। আপনি ভারতীয় নারী নন।

পুনর্ণবা। একথা আমি একশ বার স্বীকার করবো।

মঞ্জরী। শুধু তাই নয়, বাইরে থেকেই আপনি স্ত্রীলোক, ভিতরটা আপনার পুরুষের মতই কঠিন।

পুনর্ণবা। এ কথাও আমি স্বীকার করছি।

মঞ্জরী। কিন্তু জানবেন আমার বন্ধু সাধারণ মেয়ের মত নয়।

পুনর্ণবা। তাঁকে বলবেন, আমিও অসাধারণ মেয়ে।

সনৎ। তা না হ'লে আর দুজন পুরুষকে এমন অপ্রস্তুত করতে পারেন!

পুনর্ণবা। কেন তাঁদের তো প্রস্তুত হবার সময় দিয়েছি।

মঞ্জরী। আপনাকে জোড় হাত করে অনুরোধ করছি, আপনি এ মারাত্মক খেলা থেকে তাদের নিরস্ত করুন।

পুনর্ণবা। আপনারা তাঁদের বলুন না!

মঞ্জরী। বলেছি, বলেছি, একশবার বলেছি, কিন্তু এ ক্ষেত্রে নারী আপনি, আপনি রক্ষা না করলে আর উপায় নেই।

পুনর্ণবা। তবে আমার দ্বারাও সম্ভব নয়।

মঞ্জরী। কেন? আপনি কি নারী নন? কন্যা নন, ভাবী বধূ, মাতা কিছুই নন? সীতা সাবিত্রী শকুন্তলা দময়ন্তী-দ্রৌপদীর উত্তরাধিকারী নন?

পুনর্ণবা। বললে বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু সত্যি ওসব আমি কিচ্ছু নই।

মঞ্জরী। (ক্রুদ্ধভাবে) তবে দুটো লোককে যমের দুয়োরে এগিয়ে দিয়ে ক্ষান্ত হোন!

পুনর্ণবা। কিন্তু আমিই বা কি করতে পারি। তাঁরা দুজনেই যে আমাকে ভালবাসেন।

মঞ্জরী। মণিকা বলে পাঠিয়েছেন, আপনি ললিতবাবুকে যদি বিয়ে করেন, তাতে তাঁর আপত্তি নেই। কিন্তু দ্বন্দ্বযুদ্ধের মধ্যে যাবেন না।

সনৎ। কিম্বা ইচ্ছা করলে মেজর গুপ্তকেও বিবাহ করতে পারেন।

পুনর্ণবা। এই তো আবার মুস্কিল বাধলো! যে দুজন সেই দুজনই রইল। এখন কি করি?

মঞ্জরী। আপনি যাকে খুসী করুন।

পুনর্ণবা। আমার কাউকেই ইচ্ছা করে না। আমার বিশ্বাস আমি কখনো কোন পুরুষকে বিয়ে করতে পারবো না।

মঞ্জরী। আপনার ভেতরের পরিচয় পেয়ে আমাদেরও সেই সন্দেহ হচ্ছে।

পুনর্ণবা। আমার ভিতরের প্রকৃত পরিচয় পেলে সন্দেহ দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হ'ত।

মঞ্জরী। আপনার প্রকৃত পরিচয় যেন কখনই পেতে না হয়।

পুনর্ণবা। হয়ত শীঘ্রই পাবেন।

সনৎ। আপনার কাছে অনুরোধে কিছু হবেনা দেখছি। কিন্তু মনে রাখবেন, আপনি দু'জন মেয়ে আর একজন বৃদ্ধের মনে যে কষ্ট আজ দিলেন তেমন কষ্ট কখনো কোন মেয়ে দিতে পারতো না।

পুনর্ণবা। এ কথা মিথ্যা নয়। কিন্তু আমিও একটি কথা বলি, আপনার চুল দাড়ি পেকেছে বটে, বয়সে বৃদ্ধ হলেও বার্দ্ধক্যের গভীরতা আপনার মধ্যে নেই। থাকলে নারীর অন্তরের ব্যথা বুঝতে পারতেন।

সনৎ। এতবড় অপমান আপনার কাছ থেকে আশা করিনি। আমাকে নির্ব্বোধ বলুন, মূর্খ বলুন, সহ্য করবো। কিন্তু বৃদ্ধ নই প্রকারান্তরে একথা কেন বলবেন? যদি আমি বৃদ্ধ না হই, তবে জানবেন, আপনিও নারী নন!

পুনর্ণবা। আপনার কথা আপনি জানেন, কিন্তু আমায় পুরুষে নারী বলে মনে করলেও আমি নারী নই।

সনৎ। আপনার সঙ্গে তর্কে লাভ নেই। যিনি আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন তাঁর সঙ্গে বোঝাপড়া করুন।

সনতের প্রস্থান

মঞ্জরী। দেখুন মেয়েমানুষের রূপ ভালো, কিন্তু তার অহঙ্কার ভালো নয়, কিন্তু যার রূপ নেই, শুধু সাজসজ্জা দিয়ে মন ভোলানো ব্যবসা, তার সেই সাজসজ্জাগুলো গেলেই মন ভোলাবার ক্ষমতা যাবে। একথা নিশ্চয় জানবেন।

পুনর্ণবা। সেটা নিশ্চয় জেনেছি বলেইতো ভরসা করে' দু'জন পুরুষকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করতে পেরেছি।

মঞ্জরী। মনে রাখবেন, এ সাজসজ্জা বেশিদিন স্থায়ী না হ'তেও পারে।

পুনর্ণবা। সত্যি বলছি এই পোষাকগুলোর ভার আমিও আর বইতে পারছি না।

মঞ্জরী। বলেন কি, এত সাধের সাজপোষাকগুলো খুলবেন, তা হলে যে সব ফাঁক হয়ে যাবে!

পুনর্ণবা। আমিও এখন তাই চাই।

মঞ্জরী। ধিক্ আপনার নারী জন্মে!

পুনর্ণবা। প্রার্থনা করুন, শীঘ্রই যেন এ নারীজন্ম ঘুচে যায়।

প্রস্থান

মঞ্জরী। উঃ! একি আশ্চর্য্য মেয়ে! এর সঙ্গে কথা কইলে মনে হয় যেন একটা পুরুষমানুষের সঙ্গে কথা বলছি।

মণিকার প্রবেশ

মণিকা। মঞ্জরী!

মঞ্জরী। পারলাম না ভাই মণিকা।

মণিকা। পাশের ঘর থেকে সব শুনেছি ভাই। আমার অদৃষ্ট মন্দ, শুধু দুঃখ এই তাঁকে বাঁচাতে পারলাম না। আর যে-ভাগ্য নিয়ে জন্মেছি, জ্ঞান না হতেই মা বাপ গেল, বড় হ'য়ে যখন ললিতবাবুর সঙ্গে পরিচয় হ'ল, তখনই বোঝা উচিত ছিল এত সুখ আমার অদৃষ্টে সহ্য হবেনা।

কাঁদিতে কাঁদিতে সোফার উপরে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল

মঞ্জরী। কাঁদিনি ভাই। দাঁড়া, আমি একখানা পাখা নিয়ে আসি।

প্রস্থান

হর্ষনাথের প্রবেশ

হর্ষনাথ। (গদগদ ভাবে) এত দুঃখ কিসের ? না হয় সে গিয়েছে, কিন্তু তার চেয়েও তো ভাল লোক আছে !

মণিকা। (হর্ষনাথের দিকে চাহিয়া) ভালো লোকের কথা হচ্ছেনা উকিলবাবু, সে আপনি বুঝবেন না।

দ্রুত প্রস্থান

হর্ষনাথ। (চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া) ওরে সর্ব্বনাশ ! আমি ভেবেছিলাম মঞ্জরী ! নাম ধ'রে ডাকলে কি বিপদই না হ'ত। অনেক ঠেকে ঠেকে নাম বলা ছেড়েছি। এখন কেবল সর্ব্বনামের উপর দিয়েই কারবার করি। ভগবান পাণিনি ভাষাতত্ত্বের কি বাহারই ক'রে রেখেছ ! 'সর্ব্বনামে'র মহিমা তোমার কৃপাতেই বুঝেছি। দেখি আবার গেল কোথায়।

প্রস্থান

মঞ্জরীর প্রবেশ

মঞ্জরী। মণিকা ! একি ! মণিকা চলে গেছে ? (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) যাক ! ভালই হয়েছে। কি ব'লে যে ওকে সান্ত্বনা দেব। ওর যে কি দুঃখ তা ভাবতে গিয়ে আমার নিজেরই কান্না আসছে। ভগবান্ কেন এমন ক'রলে, কেন এমন ক'রলে ?

সোফায় বসিয়া মুখ গুঁজিয়া পড়িল

হর্ষনাথের ধীরে ধীরে প্রবেশ

হর্ষনাথ। (খানিকটা দাঁড়াইয়া থাকিয়া) এত কাঁদলে কি ক'রে চলে ! সংসারে দুঃখ আছে—কিন্তু সান্ত্বনা দেবার লোকও তো আছে !

মঞ্জরী। (হর্ষনাথের দিকে চাহিয়া) এখন যান, বিরক্ত করবেন না।

দ্রুত প্রস্থান

হর্ষনাথ। ওরে বাবা! এ আবার এল কখন? ভাগ্যিস্ মণিকা ভেবে নাম ধরে ডাকিনি। আমার যেমন সর্ব্বনাম এদের দেখছি তেমনি সর্ব্বশাড়ী, সর্ব্বব্লাউজ, সর্ব্বধরণধারণ একই রকম। আর এখানে থাকা সুবিধার নয়। যাই আইনের বই ফেলে রেখে ব্যাকরণ কৌমুদী থেকে সর্ব্বনামের অধ্যায়টা আর একবার ভাল ক'রে ঝালিয়ে নিইগে!

প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সুরদাসবাবুর বাটীর অলিন্দ

সকালবেলা

সুরদাস। নাঃ আর আমি পারি না। এখন মঞ্জরীর জন্য পাত্র পাই কোথায়? ছিল সনৎ, ভালো ছিল। তাকেও বিদেয় করলাম। এক আছেন হর্ষনাথ, অবস্থা মন্দ নয়, স্বভাব চরিত্রও ভাল। তিনি আবার রাজি হলে হয়, যাই তাঁর কাছে। বিকেল বেলা আবার আছে পতিতা সমস্যার সভা। ভালো কথা, বক্তৃতাটা তৈরী করে নিতে হবে। যেদেশে সীতা, সাবিত্রী, কুন্তী, দময়ন্তী, মৈত্রেয়ী, গার্গী—

দুধের পাত্র লইয়া পুঁটির প্রবেশ

পুঁটি। আচ্ছা দাদাবাবু, তোমার বাড়ীতে তো একমাত্র ঝি এই আমি, তুমি এতগুলো নাম ধরে ডাক কেন? লোককে দেখাও তোমার অনেক গুলো ঝি? কিন্তু কই আমার নাম তো একবারও কর না?

সুরদাস। তুই বুঝবিনি, তুই এদের দেখিস্‌নি।

পুঁটি। কি সর্ব্বনাশ! তুমি এতগুলো ঝি তাড়িয়েছ, তবে তো আমাকেও কবে তাড়াবে!

সুরদাস। তুই বুঝবিনি রে, বুঝবিনি।

প্রস্থান

ভজুয়ার প্রবেশ

ভজুয়া। বলি পুঁটিরাণী, বুড়োর সঙ্গে কি কথা হচ্ছিল? তুই শেষে এই রকম?

পুঁটি। আর তোমার ওটা কি হচ্ছিল গো? পথের মোড়ে দাঁড়িয়ে মেয়ে-ইস্কুলের মোটর গাড়ীর পানে তাকিয়ে ছিলে যে! আমার কি চোখ নেই!

ভজুয়া। পুঁটি, তুই কেবল গাড়ীই দেখিস, ভেতরের খবর তো রাখিস না।

পুঁটি। হাঁগো, কথাই তো হচ্ছে সেই। মেয়ে-ইস্কুলের গাড়ীর ভেতরে কি খবর পেলে? বলি, দেখলে কি?

ভজুয়া। মিষ্টি রে, মিষ্টি!

পুঁটি। মেয়েদের তোমার মিষ্টি লাগবেই!

ভজুয়া। আরে না, না, ওতে করে মিষ্টি যাচ্ছিল, একেবারে খাস মনোহারি ময়রার মিষ্টি!

পুঁটি। বটেই ত!

ভজুয়া। মাইরি, তোর গা ছুঁয়ে বলছি!

পুঁটি। গা ছুঁয়ো না বলছি!

ভজুয়া। শোন, রাগ করিসনে। মেয়ে-ইস্কুলে সভা আছে তাই গাড়ীতে করে মিষ্টি নিয়ে যাচ্ছিল।

পুঁটি। সত্যি! তা হবে, পূজোর সময় ওদের সভা হয়, সেবার দিদি-মণির সঙ্গে গিয়ে দেখেছি কিনা!

ভজুয়া। পুঁটি, বড় তেষ্টা!

পুঁটি। তেষ্টা তো আমি কি করবো! জল খাও।

ভজুয়া। পুঁটি, তুধের তেষ্টা কি জলে যায় রে? তোর ভাঁড়ে কি?

পুঁটি। ভাঁড়ে যা খুসি থাক তোর তাতে কি?

ভজুয়া। পুঁটু বড় ভাল।

পুঁটি। ভালো নয় তো কি? আমার তুধে কখনো জল থাকে না।

ভজুয়া। তোর তুধ নয়, তুই বড় ভালো।

পুঁটি। যাও। ইয়ার্কি করো না।

ভজুয়া। সত্যি রে, বড় ভালোবাসি!

পুঁটি। তুধ সকলেই ভালোবাসে।

ভজুয়া। তুধ নয় রে, তোকে পুঁটিরাণী!

পুঁটি। কত যে ঢং শিখেছ!

ভজুয়া। ওরে তোকে রাণী করে তোর দৌলতে আমি রাজা রে!

পুঁটি। দেখ, ভালো হবেনা বলছি!

ভজুয়া। দে দে রাগ করে তুই একবার নথ নাড়া দে!

পুঁটু। চুপ কর!

ভজুয়া। দে রে দে, এখনো স্যাকরার ধার শোধ করতে পারিনি,

সে কত মুখনাড়া দেয়। তার চেয়ে তোর নথনাড়া অনেক ভাল।

পুঁটি। তোমার বড় বাড় হয়েছে, চললাম আমি।

প্রস্থান

ভজুয়া। আহা! রাগ করিস কেন, শোন, শোন!

পিছন পিছন প্রস্থান

২য় দৃশ্য

হর্ষনাথবাবুর বৈঠকখানা

টেবিল, চেয়ার, আলমারী যথাযথ ভাবে সংরক্ষিত, পাশে একটি জায়গায় পর্দ্দাটানা রহিয়াছে

চন্দ্রনাথ। (পুরুষবেশে) আপনার সব কাজ আমি উদ্ধার ক'রে দিয়েছি। কিন্তু আজ বিকেলে দুজনে সত্যি না মারামারি করে বসে।

হর্ষনাথ। সে জন্য ভয় নেই। একটা উপায় করা যাবে। তুমি আর একটা দিন কষ্ট ক'রে ছদ্মবেশে থাকো।

চন্দ্রনাথ। আর ভাল কথা, আপনার সে কাজটাও হয়েছে। ললিত-বাবু সমস্ত সম্পত্তি কালকে মণিকার নামে দানপত্র করে দিয়েছে। এবার চটুপটু মণিকাকে বিয়ে করে ফেলুন।

হর্ষনাথ। আচ্ছা, ওকে দিয়ে দানপত্র করালে কি করে?

চন্দ্রনাথ। আমি বললুম, ললিতবাবু, প্রেমের জন্য আপনি প্রাণ দিতে যাচ্ছেন, কিন্তু আরও কঠিন সর্ত্ত আমি চাই। তিনি বললেন, কি চাই? আমি বললাম, যাকে আপনি এখন

মোটে দেখতে পারেন না, সেই মণিকাকে আপনার সম্পত্তি দান করতে হবে, তবে বুঝবো প্রেম সর্ব্বত্যাগী। তিনি তখনই তাঁর সম্পত্তি মণিকার নামে দানপত্র করে দিলেন।

হর্ষনাথ। তোমাকে একশ ধন্যবাদ! এবার মণিকাকে আয়ত্ত ক'রে ফেলতে হবে।

চন্দ্রনাথ। কিন্তু আর দেরী করবেন না। সব ফাঁস হয়ে যেতে কতক্ষণ! আমি বাসায় চললাম।

প্রস্থান

হর্ষনাথ। যাক, জালে দুটো মাছই পড়েছে, এবার টেনে তুললেই হয়।

মণিকার প্রবেশ

হর্ষনাথ। একি আপনি! বসুন, বসুন, আপনার কথাই ভাবছিলাম।

মণিকা। দেখুন, আমাকে দেখে আপনি আশ্চর্য্য হয়েছেন! আমি কুমারী, আপনার কাছে আমার একাকী আসা উচিত নয়, কিন্তু যে বিপদে পড়লে মানুষের বুদ্ধি নাশ হয়, আমি সেই বিপদে পড়েছি।

হর্ষনাথ। আপনার জন্য আমি সব করতে পারি।

মণিকা। সেই জন্যই এসেছি। আপনি ললিতবাবুর বন্ধু, আমাকেও স্নেহ করেন।

হর্ষনাথ। নিশ্চয়। নিশ্চয়।

মণিকা। তাঁকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করুন! তিনি সংসারের কিছু জানেন না, তাঁকে অপঘাতের মধ্যে যাওয়াবেন না। আমি নিজে পুনর্ণবা দেবীকে বলেছিলাম, তিনি রাজি হলেন না।

হর্ষনাথ। বেশ তো!

মণিকা। আপনাকে এ কাজটা করতেই হবে। আমি জোড় হাতে আপনাকে অনুরোধ করছি!

হর্ষনাথ। কিন্তু ললিতের শিক্ষা হওয়া উচিত, সে আপনাকে যেমন কষ্ট দিয়েছে—

মণিকা। দেখুন, এখন সে সব মনে করবার সময় নয়। মেয়েমানুষ হলে বুঝতেন, আমার কি বিপদ। ললিতবাবুর যা কর্ত্তব্য তিনি তা ক'রবেন, আমার কর্ত্তব্য আমি ক'রবো।

হর্ষনাথ। বেশ, আমি প্রাণপণে চেষ্টা ক'রবো।

মণিকা। যাক, নিশ্চিন্ত হলাম। আপনার কাছে আমি চিরঋণী থাকবো।

হর্ষনাথ। থাক, থাক।

ভৃত্য রামচরণের প্রবেশ

রামচরণ। বাবু, ললিতবাবু আসছেন।

প্রস্থান

মণিকা। ললিতবাবু! কি সর্ব্বনাশ, আমি এখন যাই কোথায়?

হর্ষনাথ। যাবেন কেন, থাকুন না।

মণিকা। না, না, তাঁর জন্যে যে আমি অনুরোধ করতে এসেছি তা জানাতে চাই না। ওই যে তিনি এসে পড়লেন!

হর্ষনাথ। তবে এক কাজ করুন। এই পর্দ্দাটার আড়ালে গিয়ে একটু অপেক্ষা করুন।

মণিকা। আমি যে এসেছি, তা বলবেন না।

মণিকা ঘরের এক কোণে পর্দ্দার আড়ালে লুকাইল

ললিতের প্রবেশ

হর্ষনাথ। এই যে ললিতবাবু, আসুন।

ললিত। হর্ষনাথবাবু, আমি চললাম।

হর্ষনাথ। কোথায় যাচ্ছেন ?

ললিত। সেই দেশে যেখান থেকে আজ পর্য্যন্ত কেউ ফেরেনি।

হর্ষনাথ। আহা, ওসব কি কথা ?

ললিত। যাই আর না যাই মেজর গুপ্তকে শিক্ষা দেব। প্রেমের অপমান সহ্য করা আমার অভ্যাস নয়।

হর্ষনাথ। হাতে ওটা কি ?

ললিত। এই জন্যেই তো এসেছি। একখানা দানপত্র। পুনর্ব্বার অনুরোধে সব একজনকে দানপত্র করে দিয়েছি, আপনাকে করে দিয়েছি তার এক্সিকিউটার। আপনার কাছেই এটা রাখুন। শুধু বলতে এলাম আপনার মত বন্ধুকে এ কাজের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে কঠোর কর্ত্তব্যের পথে শান্তিতে যাত্রা করেছি।

হর্ষনাথ। সেজন্য ভাববেন না। ওখানা দিন আমাকে। আমি সব ঠিক করে দেবো।

দানপত্র গ্রহণ ও টেবিলের উপরে স্থাপন

রামচরণের প্রবেশ

রামচরণ। বাবু, লোকেনবাবু আসছেন।

প্রস্থান

হর্ষনাথ। সর্ব্বনাশ !

ললিত। কি হয়েছে ? কে সে ?

হর্ষনাথ। আপনার কাছে আর লজ্জা কি ? আমার একজন পাওনাদার তাগাদায় আসছে। আপনার সম্মুখে অপমান করে যাবে, এই ভয়।

ললিত। তবে আমি একটু আড়ালে যাই।

হর্ষনাথ। তা হ'লে তো ভালই হয়।

ললিত। এই পর্দাটার আড়ালে যাই।

হর্ষনাথ। (বাধা দিয়া) না, না, ওখানে নয়।

ললিত। (হর্ষনাথকে চুপি চুপি বলিল) ওখানে কাকে লুকিয়ে রেখেছেন ? যেন কার শাড়ী দেখা যাচ্ছে।

হর্ষনাথ। (নিম্নস্বরে) আপনার কাছে আর লজ্জা কি। আমার একটি মহিলা বন্ধু।

ললিত। তাই বলুন। আপনি বেশ আছেন হর্ষনাথবাবু। কিন্তু আমি লুকোই কোথা ?

হর্ষনাথ। একটু কষ্ট করে, এইখানে এই টেবিলের তলায় ঢুকুন।

ললিত। বেশ তো। তাতে আমার আপত্তি নেই।

ঘরের অন্তপ্রান্তে একটি টেবিলের তলায় ললিতের উপবেশন ; টেবিলের উপরের আস্তরণ ঝুলিয়া পড়িয়াছে

মণিকা। (মুখ বাহির করিয়া চাপা স্বরে হর্ষনাথকে) আমি যে এখানে আছি, তা যেন বলবেন না।

ললিত। (মুখ বাহির করিয়া চাপা স্বরে হর্ষনাথকে) আমি যে এখানে আছি তা যেন কিছুতে প্রকাশ করবেন না।

লোকেনের প্রবেশ

লোকেন। ওহে হর্ষনাথ, চন্দ্রনাথ আর কতদিন এই বেশে—

হর্ষনাথ। (বাধা দিয়া, নিম্নস্বরে ও ব্যস্তভাবে) আহা চুপ চুপ !

লোকেন। মণিকা নাকি ললিতের জন্ত অনুরোধ করতে—

হর্ষনাথ। (বাধা দিয়া, নিম্নস্বরে) আহা থামো ! থামো ! (সহজ ভাবে) দেখুন, খতটা আবার বদলে নিন, টাকা এখন আমি দিতে পারবো না।

লোকেন। (বিস্মিতভাবে) খত! টাকা! সে আবার কি?

হর্ষনাথ। হাঁ, শুনে আপনি বিস্মিত হচ্ছেন, কিন্তু যা অসম্ভব—

লোকেন। ব্যাপার কি?

হর্ষনাথ। চলুন, ওঘরে গিয়ে সব ঠিক করা যাক।

হর্ষনাথ লোকেনকে একরকম জোর করিয়া টানিয়া লইয়া গেল

মণিকা। (মুখ বাহির করিয়া) বোধ হয় উনি জেনে ফেলেছেন, আমি এসেছি!

ললিত। (মুখ বাহির করিয়া) ওঃ, সেদিন যুদ্ধ থেকে ক্ষান্ত হবার জন্য মণিকার কী সকাতর অনুরোধ! বোধ হয় জেনেছে সম্পত্তি তাকে দিয়েছি। মেয়েমানুষ কেবল সম্পত্তিই চেনে!

মণিকা। (চাপা কণ্ঠে, মুখ বাহির করিয়া) পোড়া কপাল আমার! সম্পত্তিই চিনি বটে!

ললিত। (টেবিলের তলে বসিয়া) বাঃ পর্দ্দার আড়ালে পা দুখানি কি সুন্দর! একটি শাড়ীর লাল পাড় দিয়ে ঘের দেওয়া দুইখানি নীরব চরণপল্লব! যাই বল, পূর্ণিমার পা কিন্তু এমন সুন্দর নয়। কবি ওই রকম দু'খানি চরণপল্লব দেখেই লিখেছিলেন,

"যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণ চলি যাতা
তাঁহা তাঁহা ধরণী হই মঝু গাতা।"

মনে হ'চ্চে ওই চরণ যেখান দিয়ে চলে যাবে সেখান দিয়ে প্রেমের রাজপথ সৃষ্টি হবে; পৃথিবীর শ্যামলতার কোমলতার মছলন্দখানা ওর সামনে দিয়ে খুলে যেতে থাকবে। ওই লাল শাড়ীর আঁচড় কেটে দিয়ে বিধাতা বুঝিয়ে দিয়েছেন যে চরণ দেখে মরণকে বরণ করবার ইচ্ছে কেন জাগে! আজ এই চটী

ফাল্গুনে ৮২ নম্বর বাড়ীতে টেবিলের তলায় ব'সে বেশ বুঝতে পারছি শুধু চরণপল্লব দেখে মুগ্ধ হ'য়ে কেন প্রেমিককবি ব'লেছিলেন "শীতল বলিয়া ও দুটি চরণে শরণ লইনু আমি !"

মণিকা। (চাপা কণ্ঠে, মুখ বাহির করিয়া) ছিঃ ছিঃ মানুষ এমন করেও বলে। ভারি লজ্জা ক'রছে।

ললিত। পুনর্ণবার পা কিন্তু এমন সুন্দর নয়!

মণিকা। (চাপা কণ্ঠে, মুখ বাহির করিয়া) যত দোষই ওঁর থাক, উনি কিন্তু সত্যবাদী। দেখিতো দলিলখানায় পুনর্ণবাকে কি দিলেন।

দলিলখানি লইবার জন্য মণিকা পর্দ্দার বাহিরে আসিতেছিল, কিন্তু ললিতের কথা শুনিয়া আর বাহির হইল না

ললিত। হে নিস্তব্ধ চরণপল্লব, যেপথে আজো তোমার চলাচল আরম্ভ হয়নি, আমি সেই পথের পথিক, তোমাকে বেষ্টন ক'রে আমি নূপুরের মত গুঞ্জরণ করবো। ওই চরণ রূপের আমি দাসত্ব স্বীকার করছি।

পুরুষবেশে চন্দ্রনাথের প্রবেশ

চন্দ্রনাথ। কেউ নেই দেখছি. গেল কোথায় ?

ললিত। (টেবিলের তল হইতে বাহির হইয়া) আপনি বুঝি তার ভাই ?

চন্দ্রনাথ। (বিস্মিত হইয়া) একি ! ললিতবাবু যে!

ললিত। ঠিক চিনেছেন। আমিও চেহারা দেখে বুঝেছি, তিনি আপনার দিদি।

চন্দ্রনাথ। (কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া) হাঁ।

ললিত। যমজ ভাই বোন, না? আপনার নামটি কি?

চন্দ্রনাথ। চন্দ্রনাথ।

ললিত। গলার স্বর পর্য্যন্ত এক রকম! আপনারা যমজ? কি বলেন?

চন্দ্রনাথ। হাঁ প্রায় একসঙ্গে জন্মেছি।

ললিত। দেখুন ঠিক ধরেছি। এই যে নাকের কাছে তিলটি পর্য্যন্ত এক রকম! বাস্তবিক যমজ ভাই বোন যেন এক বৃন্তে দুটি ফুল।

চন্দ্রনাথ। আজ্ঞে হাঁ।

ললিত। দাঁতগুলো পর্য্যন্ত এক ধরণের। চন্দ্রনাথবাবু জানেন বোধ করি আপনার দিদির সঙ্গে আমার—

চন্দ্রনাথ। হাঁ, সব শুনেছি, চলুন ওপরে যাওয়া যাক।

ললিত। আপনার দিদি পুনর্ণবা দেবী ওখানে আছেন বুঝি?

চন্দ্রনাথ। হাঁ হাঁ, চলুন। পুনর্ণবা, পুনর্ণবা! নামটিই তাঁর সর্ব্বস্ব!

উভয়ের প্রস্থান

মণিকা। ঠিক কথাই ব'লেছে ঐ নামটিই তাঁর সর্ব্বস্ব।

পর্দার বাহির হইয়া টেবিলের উপর হইতে দলিলটা লইয়া পড়িল

কিন্তু এ কি, তিনি ভালবাসেন পুনর্ণবাকে অথচ সম্পত্তি দিলেন আমাকে, এর কারণ কি? কিছু তো বুঝতে পারছি না। আর কতক্ষণ এভাবে থাকবো? হর্ষনাথবাবু না এলে যেতেও পারি না, কার-না-কার সুমুখে গিয়ে প'ড়বো। কিন্তু চরণ-পল্লব সম্বন্ধে উনি বেশ ব'লছিলেন। লোকে বলে উনি কল্পনাবিলাসী, কিন্তু আমার মনে হয় সত্য কথা বলাই ওঁর

স্বভাব। ওমা, ললিতবাবু আবার এই দিকে আসছেন যে!

পর্দার আড়ালে লুকাইল

কিংকর্তব্যবিমূঢ় ললিতের দ্রুত প্রবেশ

ললিত। অ্যাঁ, শেষে মিশরের পিরামিড, এর পরে লোকে বলবে তুমিও নেই! এতদিন দেখলাম, আলাপ করলাম, যার জন্যে প্রাণ দিতে যাচ্ছিলাম, এখন শুনি সে মোটে মেয়েই নয়! আগ্রার তাজমহল, কবে শুনবো তুমি কবর নও, খানা খাবার হোটেল! উঃ কি ভুল! আমার মত বস্তুতান্ত্রিক যখন এমন ভুল করে স্বপ্নবিলাসীদের না জানি কি দুর্দ্দশা হয়! পুনর্ণবা আর চন্দ্রনাথ একই ব্যক্তি! পুনর্ণবার ছদ্মবেশ চন্দ্রনাথ নয়, চন্দ্র-নাথের ছদ্মবেশ পুনর্ণবা! হায় হায় মরীচিকার জন্যে মণিকাকে কি কষ্টই না দিয়েছি! আর কি সে আমার সঙ্গে কথা বলবে? পুনর্ণবাকে ভালবাসতাম কিন্তু মনে যেন একটা অস্বস্তি ছিল, আজ বুঝতে পারছি তা মণিকার প্রেমের ফল্গুধারা। মণিকা যদি ক্ষমা না করে, তবেই আমার উচিত শাস্তি হয়। কি স্নিগ্ধ কোমল স্বভাব! আমার উচিত দণ্ড হয়েছে। তার কাছে গিয়ে কি করে আবার কথা পাড়বো! ভগবান যদি কোন রকমে আমার মনের কথা তাকে জানিয়ে দিতেন। নাঃ এখন আর তার কাছে যাবো না। শিলং চলে যাই, মাস দুই পরে ফিরবো। সেখান থেকে তাকে চিঠি লেখা যাবে। বোধ হয় আর ক্ষমা করবে না। সেই দলিলটা নিয়ে যাওয়া যাক। আরে দলিলটা কই! দলিল কে নিলে! এই তো এখানেই ছিল। তবে নিশ্চয় এই মহিলাটির কাজ। কি মুস্কিল! কি বলেই বা সম্বোধন করি। (গলা খাঁকার দিয়া) অয়ি যবনিকান্তরালবর্ত্তিনী

অদৃশ্যা রহস্যময়ী, আমার দলিলখানা ফিরিয়া দিন। সাড়া নেই! অয়ি শাড়ীর রক্তপাড় বেষ্টিতা চরণপল্লবের অধিকারিণী, আমার জরুরি দলিল খানা দিন। এও তো মজা! নিজে তিনি দেখা দেবেন না, কিন্তু অন্যের গোপনীয় দলিল পাঠ করবেন। দেখুন, সোজা ভাষায় বলছি, দলিল দিন নতুবা পর্দ্দা টেনে ফেলবো। আরে, নড়ে চড়ে কিন্তু সাড়া দেয় না! আপনি যেই হোন আমি পর্দ্দা টানলাম। আবার! পর্দ্দা চেপে ধরে! নাঃ, জোর করতে হচ্ছে।

জোর করিয়া পর্দ্দা অপসারণ; মণিকা বাহির হইল

ললিত। এ আবার কি? আপনি, তুমি, মণিকা! নাঃ, আজ কাউকে বিশ্বাস নেই। পর্দ্দার আড়ালে তুমি, টেবিলের তলায় আমি! তুমি এখানে এলে কি করে?

মণিকা। হর্ষনাথবাবুকে আপনার জন্যে একটা বিষয়ে অনুরোধ করতে এসেছিলুম।

ললিত। আমার জন্যে অনুরোধ করতে? কেন? যাতে ডুয়েল না হয়?

মণিকা। জানি না, হ'তে পারে।

ললিত। আড়ালে থেকে তো মনের কথা শুনে নিয়েছ? মাপ করবে, না শিলং যাব?

মণিকা। ছিঃ, আমি কি তোমাকে মাপ করতে পারি! তুমি আমাকে কর।

ললিত। (মণিকাকে জড়াইয়া ধরিয়া) তাই করছি।

মণিকা! লক্ষ্মীটি—ছাড়ো।

ললিত ছাড়িয়া দিতে মণিকা দলিল ছিঁড়িয়া ফেলিল

ললিত। দলিল ছিঁড়ে ফেললে যে?

মণিকা। তোমার মত সত্যবাদীর কাছে আবার দলিলের দরকার কি ?

ললিত। সত্যি কথা কোথায় শুনলে ?

মণিকা। ওই যে টেবিলের তলায় বসে কি সব বলছিলে।

ললিত। সব শুনেছ ?

মণিকা। স—ব।

ললিত। কি দুষ্ট। চল যাই।

উভয়ের প্রস্থান

চন্দ্রনাথ লোকেন ও হর্ষনাথের প্রবেশ

হর্ষনাথ। সব ফস্‌কে গেল ! দেখ, একেই বলে অদৃষ্ট ! উঃ, শেষকালে আমারই বৈঠকখানায় বসে দু'জনে বেশ প্রেম করে গেল ! আর আমি যে তিমিরে, সেই তিমিরে।

চন্দ্রনাথ। মন্দ কি ? আড়ালে বসে বেশ থিয়েটার দেখা গেল !

হর্ষনাথ। সব তোমার দোষ ! কেন যে ছদ্মবেশ না পরে এখানে এলে !

চন্দ্রনাথ। সারাদিন কি সং সেজে থাকা যায় মশাই ?

হর্ষনাথ। যাক এক কাজ কর। তুমি মেয়ে সেজে এস, তোমাকে যেতে হবে মেজর গুপ্তর কাছে। মোচড় দিয়ে চট করে কিছু টাকা আদায় ক'রে আন্‌তে পার কিনা দেখ। তারপরে বিকেলের গাড়ীতে তুমি দেশে রওনা হও। আর আমি যাচ্ছি মঞ্জরীর কাছে। ওকে ফস্কালে চলবে না। দেখ, হাতে দুটো-বাণ থাকবার কি সুবিধে।

চন্দ্রনাথ। চললাম।

প্রস্থান

হর্ষনাথ ও লোকেন কিছুক্ষণ গালে হাত দিয়া বসিয়া রহিল

লোকেন। শেষে তীরে এসে তরী ডুবলো হে ?

হর্ষনাথ। সেই জন্তেই তো লাফিয়ে ঘাটে উঠতে পারলাম, কিন্তু মাঝগাঙে ডুবলে কি কাণ্ড হ'ত বলতো ?

লোকেন। দেখ, এখন মঞ্জরীকে আয়ত্ত ক'রতে পার কিনা।

হর্ষনাথ। সেটা অবশ্য হাতছাড়া হবে না।

লোকেন। তা নইলে মুস্কিলে পড়বে। ওর সম্পত্তি যদি শীগগির না পাও, তবে পাওনাদারের তাড়ায় বিপদ হবে। সবাই থেমে আছে এই জন্তে যে মঞ্জরীর সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে।

হর্ষনাথ। তুমি যাওনা ভাই, মোহনলাল মাড়োয়ারীকে একবার সান্ত্বনা দিয়ে এস। বল বাবুর বে' লাগলো ব'লে।

লোকেন। বেশ, চললাম। তুমি চন্দ্রনাথকে দিয়ে মেজর গুপ্তর কাছ থেকে কিছু যদি বাগাতে পার দেখ।

প্রস্থান

নারীবেশে চন্দ্রনাথের প্রবেশ

হর্ষনাথ। বাঃ, কার সাধ্য তোমাকে পুরুষ ভাবে। এইবার এস দেখি। আমার কাছে বোস। মেজর গুপ্তর কাছে গিয়ে এইরকম ভাবে গলায় হাত দিয়ে একখানা ছবি তুলবে। সবাই ভাববে এরা প্রণয়ীযুগল।

গলায় হাত দিয়া উপবেশন

দ্রুত সুরদাসবাবুর প্রবেশ

সুরদাস। হর্ষনাথ, অ্যাঁ একি ! ছিঃ ছিঃ ছিঃ !

হর্ষনাথ। (উঠিয়া) সুরদাসবাবু, বসুন।

সুরদাস। বসুন ! ছিঃ ছিঃ ! কি দেখলাম, এতো স্বপ্নেও ভাবিনি ! যুবতী স্ত্রীলোক নিয়ে তুমি—ওঃ !

হর্ষনাথ। সুরদাসবাবু, ইনি স্ত্রীলোক ন'ন।

সুরদাস। (রাগিয়া) দেখ, আর মিথ্যা কথা বলে পাপ বাড়িও না। একে অনাচার, তাতে মিথ্যা কথা। আমি জানি হর্ষনাথের স্বভাবচরিত্র ভালো, শেষে সেও—নাঃ আর কাউকে বিশ্বাস করবার উপায় নেই।

হর্ষনাথ। ইনি স্ত্রীলোক ন'ন।

সুরদাস। আবার মিথ্যা কথা! বুড়ো হ'য়েছি ব'লে কি মেয়ে-পুরুষের ভেদ চিন্‌তে পারবো না? হরি হরি, এরি সঙ্গে মঞ্জরীর বিয়ে দিতে যাচ্ছিলাম!

হর্ষনাথ। সুরদাসবাবু, কথা শুনুন।

সুরদাস। নাঃ, আর এখানে নয়। আর মেয়েগুলোই বা কি? ছি ছি ছি! এ দেশের কি হ'ল? যেদেশে সীতা সাবিত্রী শকুন্তলা মৈত্রেয়ী গার্গী—সেই দেশে হায় হায় হায়!

মাথা চাপড়াইতে চাপড়াইতে প্রস্থান

চন্দ্রনাথ। দেখুন, আমি পুরুষ সাজলেও বিপদ, নারী সাজলেও বিপদ, এখন করি কি?

হর্ষনাথ। আর আমার বিপদ দেখছ না? মণিকা তো ফস্কে গেছেই, এবার বুঝি মঞ্জরীও যায়। আমি একবার সুরদাসবাবুর বাসায় যাই।

মেজর গুপ্তর প্রবেশ

গুপ্ত। হর্ষনাথবাবু! এ কি আপনি এখানে? আপনি জানেন হর্ষনাথ বাবু, পুনর্ণবা একজনের বাগদত্তা, তাকে নিয়ে একাকী কি করা হচ্ছে? (আস্তিন গুটাইয়া) এক্সপ্লেন ইওর কনডাক্ট।

হর্ষনাথ। বসুন বলছি। আপনি আমার বন্ধু হয়ে—

গুপ্ত। না। আমি আর আপনার বন্ধু নই; আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী।
আই চ্যালেঞ্জ ইউ, কি নেবেন? ছোরা না পিস্তল?

হর্ষনাথ। কিছুই নয়।

গুপ্ত। ইউ মাষ্ট।

হর্ষনাথ। (হতভম্ব হইয়া) ইনি একটা কাজে—

গুপ্ত। কোন কথা শুনতে চাইনা। ছোরা-পিস্তলে অভ্যাস না থাকে আসুন, মুষ্টি যুদ্ধ করুন।

হর্ষনাথ। আমি কিছুই করবো না। ও আবার কি কথা!

গুপ্ত। (রাগিয়া) ইউ মাষ্ট। আপনি আমার বন্ধু ব'লে পরিচয় দিতেন! স্কাউণ্ড্রেল, রাস্কেল, ঈডিয়ট্‌!

হর্ষনাথের হাত ধরিয়া টানিয়া

নিন, আরম্ভ করুন। এই নিন্‌ ষ্ট্রেট লেফ্‌ট্‌।

ঘুষি মারিলেন

হর্ষনাথ। কি বিপদ! মেজর গুপ্ত, ইনি স্ত্রীলোক নন।

গুপ্ত। আমি বিয়ে করিনি বলে কি স্ত্রীলোকও চিনি না। এই নিন রাইট আউট।

আর এক ঘুষি

হর্ষনাথ। (কাঁদ কাঁদ ভাবে) চন্দ্রনাথ, প্রাণ তো যায়, তুমি এক কাজ কর। নিজের মূর্ত্তিতে এঁকে একবার দেখা দাও।

চন্দ্রনাথের প্রস্থান

গুপ্ত। নন্সেন্স! আর এক ঘুষি দেব নাকি?

হর্ষনাথ। আর কিছু দরকার হবে না। যথেষ্ট হয়েছে। মশাই, পুনর্ণবা ওর নাম নয়। ও পুরুষ মানুষ, নাম চন্দ্রনাথ।

গুপ্ত। এগেন্? আমি আপনাকে উচিত শিক্ষা দেব। উঠুন শীগগির।

হর্ষনাথ শুইয়া পড়িল

চন্দ্রনাথের স্ববেশে প্রবেশ

হর্ষনাথ। (উঠিয়া বসিয়া) এবার বিশ্বাস হল যে ইনি মেয়ে নন?

গুপ্ত। একি! তাইত! তা, এটাই যে এর ছদ্মবেশ নয়, তা বুঝবো কি করে?

হর্ষনাথ। এবার আমি নাচার। বিশ্বাস না হয় ডাক্তারি মতে পরীক্ষা করে দেখুন।

চন্দ্রনাথ। গুপ্ত সাহেব সত্যিই আমি পুরুষ!

গুপ্ত। মাই গড্! হুঁ, অ্যানাটমিতো সেই রকমই দেখছি। পৃথিবীটা অদ্ভুত স্থান! আই বেগ ইওর পার্ডন। হর্ষনাথবাবু, এতে আর একবার প্রমাণ হয়ে গেল মানুষকে ভালবাসবার জন্য আমার জন্ম হয়নি। মাই গড্! মানুষ জাতটাকে গলষ্টোনের মত অপারেশন করে ফেলে দিলে তবে যদি পৃথিবীর উপকার হয়। মাই গড্! বেগ ইওর পার্ডন, জেণ্টল মেন, বেগ ইওর পার্ডন।

ছড়ি নাচাইতে নাচাইতে প্রস্থান

চন্দ্রনাথ। ঘুষিগুলো খুব লেগেছে নাকি?

হর্ষনাথ। তুমি থাম। পড়ে মরুকগে ঘুষি। তুমি থাকো, আমি চল্লাম সুরদাসবাবুর বাসায়। সেটা ফস্কে গেলেই গেছি।

প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

মঞ্জরীর কক্ষ, মঞ্জরী গান গাহিতেছিল

গান

গান শেষ হইলে ছদ্মবেশে সনতের প্রবেশ

সনৎ। মঞ্জরী, মণিকার আর খবর পেলে ?

মঞ্জরী। আজ সে আসেনি। ললিতবাবুকে থামাতে পারলে না ?

সনৎ। নাঃ. সে একেবারে মরীয়া হ'য়ে উঠেছে। দাঁড়াও, এগুলো খুলে পাশের ঘরে রেখে আসি আমি। দরজাটা বন্ধ কর।

উভয়ের বিপরীত দিকে প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ

মঞ্জরী। কিন্তু গুপ্ত সাহেব যে ক্ষেপে উঠলেন তাই ভাবি। আমিতো ওই দাম্ভিক মেয়েটার মধ্যে কোন রূপ দেখতে পাইনা।

সনৎ। মেয়েমানুষ কখনো দর্পণ ছাড়া আর কোথাও রূপ দেখতে পায় না।

মঞ্জরী। তোমাকেও কি পুনর্ণবার ছোঁয়াচ লেগেছে নাকি ?

সনৎ। আশ্চর্য্য কি ?

মঞ্জরী। তবে একখানা লাঠি এনে দিই, লেগে যাও। মেয়ে দেখলে তোমরা যে সব ভুলে যাও।

সনৎ। এত অহঙ্কার! কবি আর সাহিত্যিকরা মিলে তোমাদের মাথা খারাপ করে দিয়েছে।

মঞ্জরী। নিশ্চয়ই। কুরুক্ষেত্র বল, লঙ্কাকাণ্ড বল, সকলেরই মূলে একজন স্ত্রীলোক।

সনৎ। একে বল বুঝি প্রশংসা ? রূপক ভেঙে ওর সরল অর্থ হচ্ছে এই যে—ঝগড়া বাধাতে একটি মেয়ে দরকার।

মঞ্জরী। বা! তুমিই তো বললে কবিরা আমাদের মাথা খারাপ করে দিয়েছে।

সনৎ। দিয়েছে বইকি। তবে সেটা প্রশংসা করে নয়, ঝগড়া করতে উৎসাহ দিয়ে।

মঞ্জরী। কিন্তু আর কতদিন এমন ভাবে চলবে। আমার সর্ব্বদা ভয় হয় কখন যে ধরা পড়ো।

সনৎ। ধরা তো পড়তেই হবে। নালিশ করেছে, দরকার হলে বডি ওয়ারেন্ট করবে, সব শুনেছ তো?

মঞ্জরী। ইস্, আমি হুকুম দিলে তো করবে। আমি একদিন সুবিধে পেলে দাদা মশাইয়ের কাছে কথা পাড়বো।

সনৎ। তিনি শুনবেন?

মঞ্জরী। তুমি জানোনা, তিনি আমাকে কত ভালবাসেন। কেবল ঐ লোকটার পরামর্শে।

সনৎ। আমাকেও তো ভালবাসতেন।

মঞ্জরী। একদিন ধর না তাঁকে। সাদা মন, ধরলেই রাজি হবেন।

সনৎ। সুযোগ খুঁজছি। এত ব্যস্ততা কি? নালিশ করে আমার বাড়ী ঘর নেবে, তার আগে না হয় লোকটাকে নিলে—

মঞ্জরী। যাও, কিযে বল!

সনৎ। বাজে কথা যাক্, যে-জন্য আমাকে মাইনে দাও তাই করি। একটা গান শেখো।

মঞ্জরী। তোমার ও শ্মশান-বৈরাগ্যের গান করতে পারবো না।

সনৎ। বেশ তো একটা রংদার গান শেখো।

মঞ্জরী। বেশি জোরে নয় কিন্তু।

সনৎ চাপা সুরে গান ধরিল এবং মঞ্জরী তাহার স্বরে স্বর মিলাইয়া গাহিতে লাগিল।
গান শেষ হইলে সনৎ বলিল

সনৎ। কি রকম লাগলো?

মঞ্জরী। মন্দ নয়, কিন্তু সে রকম হল না।

সনৎ। কোন রকম?

মঞ্জরী। সেই যে সেদিন শুনিয়েছিলে, পাখীর গান, জংলা পাখী।

সনৎ। না, না, সেটাতো আধ্যাত্মিক গান নয়, তোমার দাদামশায় শুনলে কি ভাববেন?

মঞ্জরী। তিনি বাড়ী নেই। গাও না লক্ষীটি!

সনৎ। বেশ, তুমি যখন মনিব, আদেশ অমান্য করি কেমন করে?

সনৎ গান গাহিতে লাগিল

"জংলা পাখী পোষ না মানে
জংলা পোষা হল দায়"

মঞ্জরী। ওই শোন কে যেন আসছে! শীগগির অন্য একটা গান ধর।

সনৎ। কিছু তো মনে আসছে না।

মঞ্জরী। শীগগির, শীগগির, ওই যে এসে পড়ল।

'জংলা পাখী' গানটি খাঁটি রামপ্রসাদী সুরে গাহিয়া গেল, কেবল
মাঝে মাঝে 'মা' 'শ্যামা' প্রভৃতি বসাইয়া দিল
বাহিরে সুরদাসবাবু

সুরদাস। মঞ্জরী, দরজাটা খোল তো।

সনৎ। (চাপা গলায়) আমার পরচুলা? দাড়ি? শীগগির ও ঘর থেকে আনো।

মঞ্জরীর প্রস্থান, সনতের জোরে জোরে গান ও
মঞ্জরীর পুনঃ প্রবেশ

মঞ্জরী। তাইতো? সেগুলো গেল কোথায়?

সুরদাস। মঞ্জরী, মাষ্টার মশাই, দরজা খুলুন।

সনৎ। (রামপ্রসাদী সুরে) পরচুলা কই ? মা, ওমা শ্যামা রে!

মঞ্জরী। বোধ হয় টম নিয়ে পালিয়েছে।

সনৎ। (করুণতর রামপ্রসাদীতে) ওমা শ্যামা, আমার সব নিলি তুই, এখন এই বিপদে রক্ষা কর!

সুরদাস। এত দেরী কেন ? দরজা খুলুন।

সনৎ। আজ্ঞে দাঁড়ান। ছিটকিনিটা বেজায় আটকে গেছে।

মঞ্জরী। (ব্যাকুল ভাবে) টম, টম, আয়। লক্ষ্মী টম, শীগগির আয়।

সুরদাস। দরজা এত আটকে গেল কেন ?

সনৎ। কেমন করে বলবো বলুন। আধ্যাত্মিক গানেই বোধ হয়। (চাপা গলায়) টম এল ?

মঞ্জরী। না।

দরজা ধরিয়া টানাটানিতে ছিটকিনি খুলিয়া গেল। সুরদাসবাবু প্রবেশ করিলেন

সুরদাস। একি! তুমি, সনৎ ? মাষ্টার কই ?

সনৎ। তাইতো!

সুরদাস। [বিস্মিত ভাবে] তুমি এলে কি করে ?

সনৎ। তাইতো, আমি এলাম কি করে!

সুরদাস। মঞ্জরী, সনৎ এলো কেমন করে ?

মঞ্জরী। কি জানি, আমি তো বুঝতে পারছি না!

সুরদাস। তোমরা তো ছেলেমানুষ, তোমরা বুঝবে কেমন করে ? আমিই যে বুঝতে পারছি না!

ললিত ও মণিকার প্রবেশ

মণিকা। এ কী, সনৎবাবু যে!

মঞ্জরী। এ কী, ললিতবাবু যে!

সুরদাস। আরে তোমাদের আবার মিল হয়েছে? শুনলাম ঝগড়া করেছ!

ললিত। আজ্ঞে, সে একটা বোঝবার ভুল হ'য়ে গিয়েছিল; মাষ্টার গেলেন কোথায়?

সুরদাস। আমি তো বুঝতে পারছি না।

সনৎ। আমিও না।

মঞ্জরী। আমিও না।

মণিকা। আমিও না।

ললিত। আমিও না।

সুরদাস। (চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া) দাঁড়াও, একটু ঠাউরে দেখি। সবই যে গোলমাল লাগছে! সনৎকে বাড়ী আসতে দিই না। অথচ দেখি কিনা মঞ্জরী আর সে দিব্যি ঘরের ভেতর গান করছে!

সনৎ। আজ্ঞে আধ্যাত্মিক গান।

সুরদাস। ললিত আর মণিকার বিয়ে ভেঙে গেল, দেখি তারা মনের আনন্দে এক সঙ্গে আছে! বুড়ো দেখে এক মাষ্টার আনলাম—তার দাড়ির একটা চুলও দেখতে পাচ্ছি না। সব ধোঁয়াটে লাগছে। দেখতো, দেখতো ললিত, নাড়িটা ঠিক আছে কিনা?

চাণক্যের ভঙ্গী করিলেন

পুঁটির চুল দাড়ি লইয়া প্রবেশ

পুঁটি। দিদিমণি, তোমার কুকুরটা এই দেখ কি সব নিয়ে পালাচ্ছিল।

সুরদাস। আরে এই যে চুল দাড়ি, কিন্তু মানুষটা গেল কোথায়?

মঞ্জরী। (সুরদাসবাবুর কোলের কাছে পড়িয়া) দাদামশায় মাপ কর। টম্—

সুরদাস। কি সর্ব্বনাশ! তোর টম্ শেষকালে মাষ্টারকে খেয়ে ফেললে না কি? আমি বরাবর বলি ওরকম বাঘা কুকুর বাড়ীতে রাখিস না।

মণিকা। আমি বুঝতে পেরেছি। দাদামশায় মাপ করেন তো বলি।

সুরদাস। মাষ্টারকে পেলে যে এখন সকলকেই মাপ করি। সে যে বড় ভাল লোক ছিল, আজ সন্ধ্যায় আমার বক্তৃতা শুনবে বলেছিল।

মণিকা। আপনি ঠকেছেন দাদামশায়। এই সনৎবাবুই মাষ্টার।

সুরদাস। সনৎ মাষ্টার!

মণিকা। হাঁ, সেজে আসতো।

সনৎ। আমাকে মাপ করুন।

সুরদাস। এঃ, আমার যে সব ঘুলিয়ে যাচ্ছে! তা' ওরকম ক'রে সং সাজতে কেন?

সনৎ। আজ্ঞে আসতে নিষেধ করেছিলেন, তাই—

সুরদাস। আরে আমি নিষেধ ক'রব কেন? হর্ষনাথ যে নিষেধ ক'রতে ব'লত। যাহোক্, আচ্ছা ঠকিয়েছ দেখছি। আরে ভায়া, দরজা বন্ধ করে কি পঞ্চশরের পথ বন্ধ করা যায়? যাক ভাই, তোমার উপর অন্যের কুপরামর্শে অনেক অবিচার করেছি, মনে কিছু করোনা। তোমার আরজিই বাহাল। এই মঞ্জরী নিয়ে মালা গেঁথে তুমিই গলায় পরো। শীগগিরই একটা দিন ঠিক ক'রতে হচ্ছে। আর হর্ষনাথের চরিত্র যে এমন খারাপ তা

জানতাম না, তার বাড়ীতে হঠাৎ গিয়েছি, দেখি এক সোমত্ত মেয়ে নিয়ে গলা ধ'রে বসে আছে! যাক্, তোমরা ব'সো। একসঙ্গে দুটো বিয়ের দিন ঠিক করতে হবে। কিন্তু মঞ্জরী দিদি, এ চুল দাড়িটা ফেলছি না, তুলে রাখবো; বিয়ের সময় এইটি প'রে নাত জামাইকে পিঁড়িতে ব'সতে হবে। আচ্ছা তোমরা বস। আমি জানি কিনা এ যার যা তা হবেই। যে দেশে মনে কর খনা, গার্গী, মৈত্রেয়ী, লীলাবতী জন্মগ্রহণ ক'রেছেন সে দেশেরই তো মেয়ে এরা।

প্রস্থান

চারিজনের উপবেশন

মঞ্জরী। মণিকা, তোর হারানিধি পেলি কি করে ভাই?

মণিকা। ওই যে সোমত্ত মেয়েটির কথা শুনলিনা—ওরই কৃপায়।

মঞ্জরী। কিছু যে বুঝছিনা স্পষ্ট করে বল।

মণিকা। স্পষ্ট ক'রে পরে বলবো। এখন এইটুকু শুনে রাখ যে সেই মেয়েটি মেয়েই নয়।

মঞ্জরী। পুরুষ। সেই যে কি নাম? কি শাক যেন—

মণিকা। বলুন না ললিতবাবু।

ললিত। আর এঁর কথা কেন বলেন? ইনি পর্দ্দার আড়ালে লুকিয়ে থেকে পরের কথা শুনে নিয়েছেন।

মঞ্জরী। সে আবার কি?

মণিকা। পরে হবে এখন। ব্যাপার মন্দনয়, কেউ দাড়ির আড়ালে, কেউ পর্দ্দার আড়ালে, কেউ শাড়ীর আড়ালে—

সনৎ। আর ওই যে আসছেন, সর্ব্বনামের আড়ালে।

হর্ষনাথের প্রবেশ

হর্ষনাথ কোন কথা বলিল না। কেবলি দেখিল জুড়ি মিলিয়া গিয়াছে, তাহার স্থান এখানে নহে, সে একবার চারিদিকে দেখিয়া গমনোন্মুখ হইল

সনৎ। আসুন, আসুন হর্ষনাথবাবু। আমার সেই ঋণের কথাটা মনে করিয়ে দিতে এসেছেন বুঝি ? তা সেটা শোধ করে ফেলেছি। বিশ্বাস না হয় আপনি আপনার এই দু'টি ক্লায়েণ্টকেই জিজ্ঞাসা ক'রতে পারেন।

মঞ্জরী ও মণিকাকে দেখাইয়া দিল

হর্ষনাথ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া একবার সকলকে দেখিল

ললিত। আর হর্ষনাথবাবু, আপনি তো আমার দানপত্রের কথা সবই জানেন। মণিকা আর আমি দু'জনেই দু'জনকে..............

হাত নাড়িয়া সমর্পণের ভঙ্গী করিল

হর্ষনাথ। হুঁঃ। আচ্ছা।

হর্ষনাথ হন হন করিয়া চলিয়া গেল

সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল

ভজুয়ার প্রবেশ

ভজুয়া। বাবু, আপনি এখানে ? আমি মাসখানেকের ছুটি নিতে এসেছি।

সনৎ। কেন ?

ভজুয়া। আজ্ঞে আমার সেই স্যাকরার ধারটা শোধ ক'রতে হবে।

সনৎ। সে আমি শুধে দোবখ'ন।

ভজুয়া। আজ্ঞে, সে আপনি শুধতে গেলে হবে না।

সনৎ। কি রকম ?

ভজুয়া। আজ্ঞে, পুঁটিকে বিয়ে ক'রতে হবে। পুঁটি স্যাকরার মাসতুতো বোন কি না, ওকে বিয়ে ক'রলেই সব গোল মিটবে।

সকলের হাস্য

সনৎ। দেনা শোধের ভাল উপায় বের করেছিস।

ভজুয়া। আজ্ঞে বাবু, এক বাড়ীতে দু নিয়ম কি ভাল দেখায়?

সনৎ। যা যা, ফাজিল কোথাকার! এখন বাড়ী যা।

ভজুয়া 'যে আজ্ঞে' বলিয়া প্রস্থান করিল।

ললিত। তোমার চাকরটি তো বেশ!

মঞ্জরী। বাবুটি কি রকম!

সকলের হাস্য

ললিত। যাক ভাই, আজ এই পরম সুখের সময় তোমরা একটা বেশ রোম্যান্টিক্ গান গাও। আমি একটা গান রচনা ক'রে এনেছি।

সনৎ। তা বেশ, আমিও সুর দিয়ে ফেলছি; কিন্তু সকলকে গাইতে হবে।

মণিকা। কিন্তু আমরা যে বেসুরো।

মঞ্জরী। সুরপতি যখন এতটা দয়া ক'রেছেন তখন তুচ্ছ গানের সুরও কি আজ মিলবে না?

সনৎ। আরে না মেলে পরস্পরের কণ্ঠ পাকড়ে ধ'রলেই চ'লবে। দাও হে ললিত গানটা দাও—আরে তুমি যে চারখানা কাপি ক'রে এনেছ!

ললিত। ভাই, আমি বস্তুতান্ত্রিক, হিসেব ক'রে কাজ করি, তোমাদের মত তো আর কল্পনাবিলাসী নই। নাও আরম্ভ কর।

সকলের গান

মণিকা ও ললিত পরস্পরের কাঁধ ধরিয়া দাঁড়াইল, তাহার পার্শ্বে সনৎ ও মঞ্জরী পরস্পরের কাঁধে হাত দিয়া গাহিতে লাগিল।

রূপে ও রূপায়
এই দু' উপায়
প্রেম দেবতার আনাগোনা।

খনির সোনায়
হায় সে মানায়
তনু দেহে যবে আনে সোনা।
প্রেম আর রূপে
চলে চুপে চুপে
বিশ্ব জুড়িয়া জাল বোনা।
ও গো মন্মথ
শোভে তব পথ
অশ্রু হাসির আলপনা!

গান শেষ হইলে হাসিতে হাসিতে ললিত মণিকার দিকে ঘুরিয়া গিয়া তাহার আর একটি হাত ধরিল, মঞ্জরী সনতের দিকে ঘুরিয়া তাহার হাত ধরিল। পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে এমন সময় ঝড়ের মত সুরদাসবাবু প্রবেশ করিলেন।

সুরদাস। দেখ ললিত, সনৎ

তখনও উহারা ঐ ভাবে দাঁড়াইয়া। সুরদাসবাবু
অপ্রস্তুত ভাবে চলিয়া যাইতে যাইতে
বলিলেন

ও! আচ্ছা থাক্। তোমরা বড় ব্যস্ত, সে পরে ব'লবো।

যবনিকা

কেন

গৃহিণীর আজ পেয়েছি সকালে চিঠি
পুনশ্চ দিয়ে "চুমু নিও" আছে তা'তে ;
ছাতের মেয়েটি হাসিয়া চেয়েছে মিঠি,
জুতোর পেরেক ঠুকিয়ে নিয়েছি প্রাতে।
তবু আজ মোর মন কেন খিটি মিটি
—এমন শারদ রাতে !

বিগলিত স্নেহে শরতের চাঁদিনীটি
খোঁচা-গোঁফে মোর আপনা হারায়ে লোটে,
পরমেশ মুদী ভালই দিয়েছে ঘিটি
একটিও চোঁয়া ঢেঁকুর ওঠেনি মোটে !
হায় তবু মোর মন কেন খিটিমিটি
—রয়েছি কেন যে চটে' !

যে শালীটি মোর গৃহিণীর পিঠোপিঠি
তন্বী তরুণী হাবভাবে ঠারেঠোরে
অচিরাৎ যিনি হইবেন এম. এ. বি. টি.
তাঁরও চিঠি আজ পেয়েছি কপাল জোরে !
অথচ আমার মন কেন খিটি মিটি
—কে কহিয়া দেবে মোরে !

শরৎ বাবুর 'সাবিত্রী' নামে ঝিটি
আসে যদি মোরে ভাবিবে না খুব হেয় ;

কারণ আজিকে আসিয়াছে ধোপানীটি
ফরসা কাপড়ে সেজেছি কার্ত্তিকেয়!
অথচ আমার মন কেন খিটিমিটি
—বলিয়া দেবে কি কেহ?

সহসা দুয়ারে দেখা দিল কাবুলীটি
প্রকাণ্ড দেহ, হস্তে বিশাল ছড়ি!
পোস্ত ভাষায় চোস্ত সে কাকলীটি,
শুনিয়া বুঝিনু!—উঠিলাম ধড়মড়ি'
নিরুপায় হয়ে চাহিতেছি মিটিমিটি
—হাতে নাই কানা কড়ি!

"বনফুল"

মামা

বাংলা দেশে দুইটি প্রবচন চলিত আছে:—(১) "বাপকো বেটা", আর (২) "নরাণাং মাতুলক্রমঃ"। বাবার বেলায় নিজস্ব মাতৃ-ভাষায় * হইল বাপকো বেটা, আর বাবার সম্বন্ধী—মামার বেলায় বিশুদ্ধ দেবভাষা সংস্কৃতে অর্থাৎ ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ও Dr. Sir George Grierson I. C. S. (Retd.) এর মতানুষায়ী আমাদের 'দিদিমা'-ভাষা দেবনাগরীতে

* বোধ হয় "মা" "বাবার" নিতান্ত আপনার বলিয়া।

হইল নরাণাং মাতুলক্রমঃ। বাবা ও মামার মধ্যে এরূপ পার্থক্যের কারণ কি? এই প্রশ্ন ছেলেবেলা হইতে এ পর্য্যন্ত অনেক বার মনে উদয় হইয়াছে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কখনই তাহার সুচারু সমাধা করিতে পারি নাই, ভবিষ্যতে পারিব কিনা জানি না। কেহ কেহ বলেন যে মামা বাবার আদরের সামগ্রী, সম্মানের পাত্র (বিশেষ করিয়া যদি তিনি ভগিনী অপেক্ষা বয়সে বড় হয়েন), সেই জন্য বাবার "বড় কুটুম্ব" হিসাবে "মামার" এই মান বা "প্রগতি"। আবার কেহ কেহ বলেন যে পুত্র পিতার সদগুণের ওয়ারিষ-সূত্রে উত্তরাধিকারী হয়েন এবং সেই কারণে "বাপকো বেটা" আখ্যা লাভ করিয়া থাকেন; আর মাতুলের অ-গুণের বা অপকীর্ত্তির গুণে ভাগিনেয় বিভূষিত হয়েন, সে কারণ ভাগিনেয় হয়েন "নরাণাং মাতুলক্রমঃ"। পিতার গুণাবলি ভাষার পারিপাট্যে ঢাকিবার চেষ্টার আবশ্যকতা নাই; কিন্তু মামার দোষ, (যেহেতু কেহ কষ্ট করিয়া স্পষ্ট ভাষায় দোষ দেখাইবেন না; কানাকে কানা বা খোঁড়াকে খোঁড়া বলিবে না ইত্যাদি মহাজনদের উপদেশ) ভাষার, বিশেষ করিয়া "দিদিমা-ভাষার" অঞ্চলে ঢাকা থাকিয়া পরিপুষ্টি পাইয়া সম্পূর্ণ হকদার হইয়াছে। আবার কেহ কেহ ইহার ঠিক উল্টা ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন বাপের দোষ ছেলেতে পায় সে কারণ নিতান্ত আটপৌরে চলতি ভাষায় "বাপকো বেটা"; আর মাতুলের যাবতীয় গুণ ভাগিনেয়তে সংক্রামিত হয় বলিয়া শুদ্ধ সংস্কৃতে "নরাণাং মাতুলক্রমঃ"। কোন অভিমতটি সঠিক বা বেঠিক তাহা নির্দ্ধারণের ভার পাঠকগণের উপর দিলাম।

—লেখক

এইবারে আমরা "মামা" শব্দের উচ্চারণগত ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু বলিব। ছেলে ভূমিষ্ঠ হইবার পর "মা" বলিয়া কাঁদিয়া

উঠে ; প্রথমেই "মা" "মা" শব্দ উচ্চারণ করিতে শিখে। "বাবা" বলিবার পূর্ব্বে শিশু "মামা" বলিতে শিখে দুইটি বিশেষ কারণে—প্রথম কারণ, "মামা" "মা"র নিকট সম্বন্ধীয় ; দ্বিতীয় কারণ শিশুর মাতুলালয়ে (বিশেষ করিয়া যদি সেটি কুলীন সন্তান হয়েন) বা "মামাবাড়ীতে" জন্ম গ্রহণ। কিন্তু তাই বলিয়া পাঠকগণের মধ্যে কেহ যেন ভুলিয়াও মনে না করেন যে "মামা" "মা"র চেয়ে আপনার বা মিষ্টি সম্বন্ধ। শব্দের দ্বিত্ব হইলেই যে মিষ্টত্ব বাড়ে না তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হইতেছে মা সরস্বতীর "বর পুত্রে" ও সেই মার "বর বর" (লাইনোর বানান) বা "বর্ব্বর" (সাবেক বানান) পুত্রের পার্থক্যে।

"মামা" কিন্তু ভাগিনেয়র বড় আপনার ; অন্ততঃ হিন্দুমতে মামা মরিলে ত্রি-রাত্র অশৌচ। অপর দিকে ভাগিনেয় কিন্তু মামার তত আপনার নহে। মামার যদি ছেলে মেয়ে না থাকে ত মামী মরিতে না মরিতেই ভাগিনেয় মামার বাড়ীর বিষয় পায়। দায়ভাগের মতে ভাগিনেয় মামার ১২নং ওয়ারিষ। কিন্তু মামার বেলায় তিনি হইতেছেন ভাগিনেয়ের ২৬নং ওয়ারিষ। ইহাই হইতেছে খাঁটি দায়ভাগের মত। কিন্তু বর্ত্তমানে কলিকাতা হাইকোর্টের সর্ব্ব প্রথম বাঙালী জজ "কালো দোয়ারী"র নজিরের বেলায় ৩৪নং ওয়ারিষ। এইখানে আমরা আত্মবিস্মৃত বাঙালী জাতির স্মরণার্থ "কালো দোয়ারী"র সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। কালো দোয়ারীর ভাল নাম দ্বারিকানাথ মিত্র। বর্ত্তমানেও কলিকাতা হাইকোর্টের একজন জজের নামদ্বারিকানাথ মিত্র। ইনি ডি. এল্. পাস বলিয়া ডঃ দ্বারিকানাথ বলিয়া সুপরিচিত। ইনি দেখিতে

খুব সুপুরুষ ; রং সাহেবদের চেয়েও ফরসা। কিন্তু "কালো দোয়ারী" দেখিতে খুব কালো ছিলেন। কিরূপ কালো ছিলেন তাহা আমাদের ধারণা হয় না। একদা কালো দোয়ারী ও কৃষ্ণ দাস পাল দু জনেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বৈঠকখানায় উপস্থিত ছিলেন। একজন আধ-পাগলা লোক জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া উঁহাদের দুই জনকে দেখিতেছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ পাগলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি দেখিতেছ? পাগলা জবাব দিল, জজ দেখিতেছি। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রশ্ন করিলেন, তুমি কি জজকে চেন? সে উত্তর দিল, না। তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন যে এই দুইটি ভদ্রলোকের মধ্যে (অর্থাৎ কৃষ্ণদাস পাল ও দ্বারিকানাথ মিত্রের মধ্যে যিনি বেশী কালো তিনিই জজ। আর কৃষ্ণদাস পাল কিরূপ কালো ছিলেন তাহার সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। তাঁহার মৃত্যুর পর কলেজ ষ্ট্রীটের কোণে তাঁহার মূরদ স্থাপিত হইবার পর, মহারাজা স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে প্রশ্ন করা হয়, মুরদটি কি কৃষ্ণদাসের অনুরূপ দেখিতে হইয়াছে? মহারাজা উত্তর করেন যে দেখিতে ঠিক হইয়াছে, তবে কালো কষ্টীপাথরের করিলেই রং অবধি দেখিতে পাইতাম।

এই কালো দোয়ারীই সর্ব্ব প্রথম বাঙালী জজ। ইঁহাকে সর্ব্ব প্রথম বাঙালী জজ বলাতে হয়ত জনৈক লেখক আপত্তি তুলিবেন। সেই লেখকের অবগতির জন্য জানাইতেছি যে ভারতবাসী হইয়া সর্ব্বপ্রথম জজের গদীতে বসেন শম্ভুনাথ পণ্ডিত—তারিখ ২রা ফেব্রুয়ারি ১৮৬৩ খৃঃ অব্দে। ইনি স্যর মহম্মদ ইক্‌বাল ও স্যর তেজবাহাদুর সাপ্রুর জাতিভাই, অর্থাৎ কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ, বাঙালী নহেন। আর উক্ত লেখকের গুরু সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম ব্রজেন বাঁড়ুয্যের অবগতির

জন্ম জানাইতেছি যে তাঁহার সুপরিচিত রাজা রামমোহন রায়ের সুযোগ্য পুত্র রমাপ্রসাদ রায় হাইকোর্টের সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় জজ হইবেন বলিয়া সব ঠিকঠাক হয় বটে, কিন্তু তিনি জজের গদীতে বসিবার পূর্ব্বেই পরলোক গমন করেন। সুতরাং দ্বারিকানাথ মিত্রই সর্ব্ব প্রথম বাঙালী জজ। ইনি ইংরেজী ১৮৬৭ সালের ১৬ই জুলাই হইতে ১৮৭৪ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত জজের গদী অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ইঁহার মামাকে ২৬শের পর্য্যায় হইতে ৩৪শের পর্য্যায়ে নামাইবার হেতু আমরা এই ৬০ বৎসর পরে যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি তাহাতে লিখিতেছি যে তিনি বাল্যে সংস্কৃতের পড়া করিতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহার মামা তাঁহাকে মারিয়াছিলেন।

যাঁহারা কংগ্রেসী আইন-অমান্যের দলে তাঁহারা হয়ত হাইকোর্টের নজীর মানিবেন না। তাঁহারা হয়ত বলিবেন যে ভাগিনেয় যদি মামার আপনার হয় ত মামাও ভাগিনেয়ের সমান আপনার হইবে। তাঁহাদের বুঝিবার জন্য আমরা কেবলমাত্র একটি উদাহরণ দিব। ভায়রাভাইয়ের ভাই আর ভাইয়ের ভায়রাভাই কি সমান আপনার? উভয় সম্পর্কের মধ্যে যে কতখানি প্রভেদ তাহা বোধকরি কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না।

মামাভাগিনেয়র সম্পর্ক চিরকালই যে এক রকম ছিল, আছে বা থাকিবে তাহা নহে। যুগে যুগে বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে এবং করিবে। সত্যযুগে শনি মামা দেখিবামাত্র গণেশের মুণ্ড উড়িয়া গেল; গণেশকে সারা জীবন হস্তীমুণ্ড হইয়া থাকিতে হইল। ত্রেতাযুগে রাবণের মামা কালনেমী শতপুত্রশোককাতর রাবণের ঐ বিপদের সময় হনুমানের সহিত যোগদান করিয়া 'লঙ্কাভাগ' করিতে বসিল। দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণের কংসমামার কথা কে না জানে? ভাগিনেয়কে

একবার করতলগত করিতে পারিলে পাথরে আছড়াইয়া শেষ করিতেন। দৈবকীর অপরাপর পুত্রদেরও ঐরূপে শেষ করিয়াছিলেন। একারণ শ্রীকৃষ্ণের জন্মাবধি anti-মামা complex ছিল। এবং পালিত-(যেহেতু not a blood-relation) মামা আয়ান ঘোষের শ্রীরাধিকায় ভাগ বসাইয়া "ভাগ-নে" নাম সার্থক করিয়াছিলেন। পালিত-মামার অপর এক variety—গৃহ-পালিত শকুনিমামা দুর্য্যোধনের জন্য কি না করিয়াছেন! যিনি মহাভারত একবার পাঠ করিয়াছেন তিনি শকুনির কীর্ত্তিকথা ভুলিতে পারিবেন না; আর যিনি মহাভারত পাঠ করেন নাই, তাঁহাকে আমরা উহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

বর্ত্তমান কলিযুগে ক্রম-বিবর্ত্তনের ফলে মামার অনেক প্রকার variety হইয়াছে। সব রকম variety আমরা জানিনা। দুই এক-প্রকার common variety সকলেই দেখিয়াছেন ও জানেন। "মামার দোকান" বাংলায় বিশেষতঃ কলিকাতায় সুবিখ্যাত। সন্ধ্যার পর মামার ওখানে কি ভীড়! পূর্ব্বে সারারাত্রি ধরিয়া মামার আদর অভ্যর্থনা চলিত; কিন্তু হালে পুলিসআইনের কড়াকড়িতে মামাকে রাত্রি ৯॥ টার মধ্যে দোকান বন্ধ করিতে হয়। মামার একটি ব্যাঙ্কও ছিল—আমরা তখন স্কুল কলেজের ছাত্র, লোকমুখে, কাগজে Mama's Bankএর কথা দিন কতক খুব শুনিতাম। তাহার পর কথাটা কিছুদিন চাপা পড়ে। এখন শুনিতেছি নাকি যে মামার ব্যাঙ্ক লালবাতি জ্বালাইয়াছে। মামার ব্যাঙ্কের ঠিকানাটা জানিয়া রাখিলে ভবিষ্যতের গবেষণাকারীদের সুবিধা হইত। কলিকাতা কর্পোরেশন স্বদেশী হইবার পর হইতে শুনিতেছি নাকি উহার একটি মামা হইয়াছে। সি, আর, দাশের মৃত্যুর পর তৎসম্বন্ধী এম্, এন্, হালদার যখন "মামাবাবু" হইলেন তখনই তিনি ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের এ্যাসেসার নির্ব্বাচিত হয়েন

বর্ত্তমানেও নাকি কর্পোরেশনে কি ছোট কি বড় চাকুরী কিংবা কনট্রাক্ট পাইতে হইলে কর্পোরেশনের মামাকে বরণ করিতে হইবে, এবং মামার বরণদত্ত ছাপ লইয়া আসিতে হইবে। তবে এই মামাকে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়না—তাই বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন তিনি অশরীরী বা ভূতপূর্ব্ব। * বঙ্গের বাহিরেও মামার প্রভাব কম নহে—মুঙ্গেরে যদি কোন বাঙালী যায়েন, 'মামা' অবিলম্বে তাঁহার ফোটো লইবেন। আর মামার সহিত ব্রতচারী নাচের কিরূপ নিকট ও অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ তাহা আমরা কালীঘাট অঞ্চলের একটি ছড়া উদ্ধার করিয়া দেখাইব। মা, দিদিমা কালীঘাটে মাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন, খোকাকে একটি কাঠের পুতুল কিনিয়া দিলেন (কালিঘাটের পটের ন্যায় ইহাও শীঘ্র অদূর ভবিষ্যতে extinct হইয়া যাইবে) অজিত ঘোষের পট-সংগ্রহের ন্যায় পাঠকগণের মধ্যে যাঁহারা artist-anthropologist তাঁহারা গোটাকয়েক পুতুল লইয়া গান ধরিল—

"মামা! ধামা বাজাবে?
কাঠের পুতুল কিনে দিব—
মামী নাচাবে?"

ও সঙ্গে নাচিতে আরম্ভ কবিল। গুরুসদয় দত্ত মহাশয় বিলাত হইতে ফেরৎ আসিলে তাঁহাকে এই বিষয়ে অবহিত হইতে বলিব।

শ্রীশচীন্দ্রকুমার বসু

---

* প্রবাসীর মামাবাবুকে লেখক বাদ দিয়াছেন—শ. চি. স.

সংক্ষিপ্ত-সার

সাধ এবং সাধ্য এই দুইটি বস্তুর সমন্বয় ঘটিলে মানুষ সাধারণত যাহা যাহা করিয়া থাকে সাময়িক-পত্র বাহির করা তাহাদের মধ্যে অন্যতম। আমি একদা একখানি সাপ্তাহিক পত্র বাহির করিয়াছিলাম। এটা আমি নিঃসন্দেহে বুঝিয়াছিলাম যে ইহার ভিতর সাধ ও সাধ্যের অংশ যতটুকুই থাক, সাধনার অংশ না থাকিলেও চলে।

কাগজখানি জনপ্রিয় করিবার জন্য চেষ্টার ক্রটি করি নাই। তাহাতে একটা প্রশ্নোত্তর বিভাগ খুলিয়াছিলাম। এই অধ্যায়ের মুখ-বন্ধে লিখিয়া দিয়াছিলাম—শুধু বহির্জ্জগতের সংবাদ নহে, কোন বিষয়ে বিপদে পড়িলেও যথাসাধ্য সদুপদেশ দেওয়া হয়। ষোল পৃষ্ঠার কাগজের আট পৃষ্ঠাই এই অধ্যায়টি অধিকার করিত—এবং বিক্রির দিক দিয়া ইহাতে সুফল ফলিয়াছিল।

প্রশ্নোত্তর বিভাগে একদিন একখানি চিঠি ছাপি। একটি মেয়ে জানিতে চায় তাহার কি করা উচিত। তাহার মাতা তাহাকে বিবাহ দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি যে পাত্রটিকে ঠিক করিয়াছেন—তাহাকে সে চেনে; তাহার সম্বন্ধে যেটুকু জানে তাহাতে সে বুঝিতে পারিয়াছে এ বিবাহে সে সুখী হইতে পারিবে না। এখন তাহার কি করা উচিত। মায়ের কথা রাখা উচিত কি নিজের বুদ্ধিতে চলা উচিত।

কাগজে তাহার উত্তরে লিখিলাম—মায়ের মনে কষ্ট দিয়া নিজের বুদ্ধিতে চলা খারাপ হইলেও—এ ক্ষেত্রে বিবাহ না করাই ভাল।

ইহার পর তাহার নিকট হইতে ব্যক্তিগতভাবে চিঠি পাই। লিখিয়াছে, আমার বুদ্ধিই যে অভ্রান্ত তাহা কেমন করিয়া বুঝিব?

উত্তরে লিখিলাম—বিবাহ দৈব ঘটনা—মানুষের উহাতে কোন হাত নাই। সুতরাং তাহার সঙ্গে আপনার বিবাহ যদি দেবতার অভিপ্রেত হয় তাহা হইলে কেহ তাহা রোধ করিতে পারিবে না—সুতরাং নিজের বুদ্ধিতে চলায় আপত্তি কি ?

সে লিখিল, মায়ের ইচ্ছায় চলি বা নিজের ইচ্ছায় চলি, বিবাহ দৈব-নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকিলে তাহা যখন রোধ করা যাইবে না তখন মায়ের ইচ্ছায় চলিলে আপত্তি কি ?

আমি প্রশ্নটার একটিদিকমাত্র দেখিয়াছিলাম, অন্যদিকটা শ্রীমতী পরিতৃপ্তি দেখিল। আসলে সে উভয় দিকই দেখিল। বুঝিলাম মেয়েটি বুদ্ধিমতী।

তাহার সঙ্গে যে সব চিঠির আদানপ্রদান হইয়াছিল তাহার কতগুলির সারাংশ উদ্ধৃত করিলাম।

আমার চিঠি—আপনি একটি সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছেন।—বাস্তবিক ব্যাপারটা দুইদিক হইতেই বিবেচনা করা যাইতে পারে। কিন্তু কোন্ দিকটা ঠিক তাহা কিছু দিন ভাবিয়া আপনাকে জানাইব।

তাহার চিঠি—ইহা সমস্যা নহে। দেখিতে হইবে এই যে আমাদের মধ্যে ভালবাসা হইতে পারে কিনা।

আমার চিঠি—সেটা পূর্ব্বেই কেহ গণনা করিয়া বলিতে পারে না। এমন ত দেখা যায় যাহারা পরস্পর পরিচিত নয় তাহাদের বিবাহ হয় এবং সে বিবাহ বেশ সুখের হয়।

দুই সপ্তাহ চিঠি আদানপ্রদানের পর আমাদের দেখা হয় এবং মুখে তাহাকে সমস্ত বুঝাইয়া দিই। সে আমার কথা সমস্তই মানিয়া লয়। পুরুষের বুদ্ধির কাছে উহারা চিরদিনই হার মানিয়া আসিয়াছে। ইহার পর এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। পরিতৃপ্তির বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে

সম্পন্ন হইয়াছে। সে খুব সুখেই আছে। অল্প কয়েকদিন হইল আমাদের মধ্যে যে চিঠি চলিয়াছে তাহার সারাংশ এই—

তাহার চিঠি—খোকা ভাল আছে, মা তোমাকে একবার দেখিতে চায়, অবিলম্বে চলিয়া আসিবে। আমার চিঠি—কালই যাইতেছি।

* * * *

আর সবই ঠিক আছে কেবল কাগজ চালাইয়া যে টাকাটা নষ্ট করিতে চাহিয়াছিলাম, কাগজ বন্ধ করিয়া দিয়া সে টাকায় এখন সংসার চালাইতেছি।

পৃথিবীর পাগলামি

তিমি মাছের মত এত বিরাট জন্তু আজ পর্য্যন্ত জন্মায়নি। পাথরের যুগের বিরাটকায় দিনোসর, যার দৈর্ঘ্য বাইশ মিটার (বা চুয়াল্লিশ হাত), তার কঙ্কাল দেখে ধারণা হয় যে, আধুনিক জীবজন্তু সব অতি ক্ষুদ্রাকার। কঙ্কালের গঠনের ভিত্তি ধরে অনেকটা নিশ্চয়তার সঙ্গে ঠিক করা হয়েছে যে, এই প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর ওজন ছিল পঁয়ত্রিশ হাজার কিলোগ্রাম, * অর্থাৎ পঁয়ত্রিশটা হৃষ্টপুষ্ট বলদের ওজন।

আধুনিক খুব মোটাসোটা ধরণের একটা তিমি মাছ দৈর্ঘ্যে প্রায়ই একত্রিশ মিটার (বাষট্টি হাত) হয়। তার মাংস কাজে লাগান হয় বলে তার ওজন অতি সহজেই ঠিক করা যায়। এর ওজন একলক্ষ

* যত কিলো, প্রায় তত সের। এক কিলোগ্রাম=২·২ পাউণ্ড।

পঞ্চাশ হাজার কিলোগ্রাম পর্য্যন্ত উঠতে পারে। অর্থাৎ হৃষ্টপুষ্ট দেড়শটা বলদের বা দুহাজার লোকের ওজন। এই হচ্ছে সেই জন্তুর বিবরণ।

এই সমস্ত জীবন্ত সম্পদ ধরবার জন্যে মেরুদেশে নানারকম expeditions অর্গানাইজ করা হয়। এবং এজন্যই উত্তর মেরুর চির-তুষারাচ্ছাদিত দ্বীপসমূহে শীতের বিরুদ্ধে সর্ব্বদাই সংগ্রাম চলে। তিমি মাছের সঙ্গে যে লড়াই করা হয়, তার সমস্ত ব্যাপারই আধুনিক। এই বিরাটকায় মৎস্যজাতিকে সম্পূর্ণরূপে লোপ করবার অহরহ চেষ্টা চলছে, যদিও এটা ঠিক করা হয়েছে যে একবছর শিকার করা বন্ধ থাকবে।

এযুগে তিমি শিকার করা হয় এরোপ্লেনে চড়ে। অন্যান্য যতপ্রকারের ক্রীড়াকৌতুক আছে, এ শিকার তাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তেজনাপ্রদ। তবে এটা বলতে হবে যে, এ কাজের জন্য যে সব সরঞ্জামের ব্যবহার হয়, তা প্রায় খুঁতহীন অবস্থায় এসে পড়েছে।

আগে আগে একজন vigie (lookout man) আকাশের সীমান্ত-রেখার দিকে সর্ব্বদাই দৃষ্টি রেখে থাকত এবং যে মুহূর্ত্তেই সে একটা তিমি দেখতে পেত, অমনি চীৎকার করে জানাত, "Blow ah blo-o-o-ow"। একমিনিট পরেই জাহাজ থেকে তিমি শিকারের সব নৌকা জলে নামান হোত এবং লোকে তাতে চড়ে তিমির কাছে এগিয়ে যেত। বল্লমধারী তখন তার দড়ি দিয়ে বাঁধা বল্লম (harpoon) ছুঁড়ে তাকে বিঁধত ; কিছুদিন আগেও হাতে করে বল্লম ছোঁড়ার বদলে কামানের সাহায্যে একাজ করা হোত।

যাই হোক, এর পরই ভীষণ কাণ্ড ঘটত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তিমি নৌকাটিকে তার পিছু পিছু টেনে নিয়ে বেড়াত। তখনকার

ব্যাপার বাস্তবিকই রোমাঞ্চকর ছিল। প্রায়ই তিমি তার লেজের বাড়ী দিয়ে নৌকাখানা চুরমার করে দিত, অথবা কখনও কখনও দড়ির অল্পতাহেতু তিমির টানের চোটে নৌকা উল্টে যেত। এ সংগ্রাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা, কখনও বা দিনের পর দিন চলত; সর্ব্বদাই ভয় থাকত, দড়ি বুঝি ছিঁড়ে যায়, তিমি বুঝি পালায়।

বেশী দিনের কথা নয়, গত বৎসরেই আমেরিকার উত্তর উপকূলে একটা তিমি শিকার করা হয়েছিল, যার গায়ে পঞ্চাশ বছর আগেকার Montezuma বলে এক জাহাজের নাম লেখা এক হার্পুন গাঁথা ছিল। এ ঘটনা থেকে বোঝা যায় তিমি কতদিন বাঁচতে পারে; আরো বোঝা যায় যে, তিমি শিকারের প্রাচীন পদ্ধতি এই বিরাট জানোয়ারের কাছে কতই অকেজো ছিল।

আর আজ? যে স্থানে তিমি সন্ধান করা হয়, তার উপর এরোপ্লেনে উড়ে বেড়ান হয়। এরোপ্লেনে থেকে অনেক দূরের সীমারেখা দৃষ্ট হয়। এরোপ্লেনের স্পীড্ খুব দ্রুতগামী জাহাজের অন্ততঃ দশগুণ। তিমির সন্ধানের জন্য আগে যেমন সময়, তথা অর্থের দরকার হোত, এখনকার কালে সে সব কোন হাঙ্গামাই নেই। একজন পাইলট, একজন রেডিও টেলিগ্রাফিষ্ট ও একজন অবজারভার, এই তিনজন নিয়েই সাধারণতঃ একটা এরোপ্লেনের সাজ। পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সহজেই তিমি খুঁজে বের করা যায়, কারণ উঁচু থেকে ডুব-মেরে-থাকা তিমিও বেশ দৃষ্টিগোচর হয়।

একটা তিমি মাছ তার বিরাট ফুস্‌ফুস্ পূর্ণ করে ত্রিশ থেকে ষাট মিনিট পর্য্যন্ত নিশ্বাস না নিয়ে জলের তলায় ডুবে থাকতে পারে। কাজেই, আগেকারের look-out-man কর্ত্তৃক তিমির তল্লাস অনেকটা দৈবের উপরই নির্ভর করত।

এভিয়েটার বেতারের সাহায্যে জানিয়ে দেয় তিমি কোন স্থানে আছে এবং জাহাজকে সেইদিকে পরিচালিত করে। তিমি ধরার নৌকাও এই এভিয়েটার কর্ত্তৃক কার্য্যস্থানে নীত হয়।

আধুনিক পদ্ধতিতে ক্রমাগত হত হয়ে হয়ে তিমিরা এখন একটু সন্দিগ্ধ হয়ে পড়েছে; তাদের এখন খুব কমই দেখা যায়। এখন কৌশল ও দ্রুতগামিতার সাহায্য ভিন্ন তাদের হঠাৎ ধরে ফেলার অন্য কোন পন্থাই নেই। এজন্য জাহাজের সব নৌকায় যে সব মোটর বসান থাকে, সবই অতি দ্রুতগামী, অথচ তা থেকে কোন শব্দই হয় না। তাছাড়া হার্পুন ছোঁড়ারও বিভিন্নতা হয়েছে। এখন হার্পুনের মধ্যে হয় কোন explosive না হয় electricity চার্জ্জ করা হয়, এবং তিমিও এই কায়দায় বল্লমিত হয়ে তৎক্ষণাৎ কাবু হয়।

কিন্তু কখনও কখনও এসব উপায়েও কোন ফল হয় না। হয়ত বোমা ঠিক মত ফাটল না, বা যে বৈদ্যুতিক শক্তি পাঠান হোল তার অল্পতাহেতু দৈত্যাকার জানোয়ার মরল না। তখন?—তখন আবার আকাশে উড়ে তিমির দিকে নজর রাখার জন্য ক্রমাগত বৃত্তাকারে ঘোরা হয়, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না দৈত্য আবার জলের উপর ভেসে ওঠে। অবজারভার তৎক্ষণাৎ ককপিট থেকে বিরাট ব্যাসের ছুঁচোলওয়ালা মেশিনগান সেদিকে ঠিক করে। এর সমস্ত গুলি খুব বেশী রকম explosive। যে মুহূর্ত্তে তিমি নিঃশ্বাসের জন্য উপরে ভেসে ওঠে, অমনি তাকে অভ্যর্থনা করা হয় এই গুলি দিয়ে, যার ব্যবহার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, এমনকি দৈত্যের পক্ষেও অতিশয় সঙ্গীন। চারিদিকে রক্তের বন্যা ছুটতে থাকে। সমুদ্র রক্তাকার ধারণ করে; তারপরেই দৈত্য চিৎ হয়ে ভাসতে থাকে। কুড়ি মিনিট যন্ত্রণার পরই সব শেষ।

একটা লোক তারপর দক্ষ হস্তে এই cetaceaর পেট চিরে ফেলে এক বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে, এবং সেই গর্ত্তের মধ্যে একটা ধাতব flexible টিউব বসান হয়। তারপরেই পাম্পের কাজ আরম্ভ হয়ে তিমির পেট বাতাসে পূর্ণ করা হয়, কারণ এ করলে আর তিমির জলের মধ্যে ডুবে যাবার কোন ভয় থাকেনা। বড় বড় মোটা মোটা ইস্পাতের তারের সাহায্যে এটাকে তখন জাহাজের কাছে টেনে আনা হয় এবং টুকরো করে কাটা হয়। এই হচ্ছে আধুনিক কালের তিমি শিকার পদ্ধতি।

প্রতি বৎসর চল্লিশ হাজার তিমি হার্পুনে করে শিকার করা হয়। নরওয়ে একাই বাৎসরিক আট লক্ষ পিপে তিমির তেল উৎপাদন করে। সমস্ত পৃথিবীর উৎপাদন হচ্ছে মাত্র পনের লক্ষ। প্রতি পিপেতে দুশো লিটার * তেল ধরে। তেল ছাড়াও অন্যান্য অনেক কাজই তিমির দ্বারা পাওয়া যায়। সে সব ধ'রে একটা তিমির মূল্য হয় প্রায় চুয়ান্ন হাজার ফ্র্যাঙ্ক (প্রায় সাড়ে সাত হাজার টাকা)। কাজেই, একাজ এবং সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞ শিকারীর মাইনেও উত্তরোত্তর অদ্ভুতরকমেই বেড়ে চলেছে। এবং এই সমুদয় তিমিময় স্থান হাতে রাখবার জন্য যে সংগ্রামের আবশ্যক, তারও কোন অভাব নেই।

এ বছর তিমি শিকার বন্ধ থাকবে, কারণ এই সময়টা নূতন নূতন স্থানের সন্ধানে এবং নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবনে ব্যয়িত হবে, যাতে তিমিমৎস্য আরও দ্রুত এবং আরও নিশ্চিতভাবে মারা যায় অতএব, কয়েক বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর বৃহত্তম জন্তু আর ধরাধামে থাকবে না। এ যুগের অদ্ভুতরকমের ইণ্ডাষ্ট্রীর সম্বন্ধে এই হচ্ছে কয়েকটি বিশেষ কথা।

* এক লিটার প্রায় পৌনে দু পাঁইট।

লেখক যে জাহাজে ছিলেন, তার তিমি ধরা নৌকার দল ও দুটো এরোপ্লেন নিয়ে, সেটায় দুশো তেইশ জন লোকলস্কর ছিল। জাহাজের তৈলচালিত বয়লার এত বড় ছিল যে, তার মধ্যে একটা গোটা তিমি পর্য্যন্ত রান্না করা যায়। হাড়ের mill, একরকম খুব চটচটে আঠা তৈরী করার এবং whale boneএর ফ্যাক্টরি প্রভৃতির অভাব নেই সেই জাহাজের উপর। জাহাজের নাম Goeta III। তার পিছনটা ফেরীবোটের মত খোলা এবং সেই খোলাস্থানের উপর সব ধাতব তক্তা এমনভাবে সাজান যে, সেগুলো বক্রভাবে জল পর্য্যন্ত নেমে গেছে। এখানে সব মোটা মোটা শিকল, হার্পুন, হাতের মত পুরু তার প্রভৃতি সাজান; এই সব তারের সাহায্যে তক্তার উপর দিয়ে মৃত তিমিটাকে ব্রিজ পর্য্যন্ত হিঁচড়ে টেনে তোলা হয়। সেখানে ঘূর্ণায়মান করাতের সাহায্যে তার মাথা, হাড়গোড় প্রভৃতি কাটা হয়। লম্বা লম্বা ছুরির সাহায্যে চর্ব্বি কেটে rolling carpetএর উপর ফেলা হয় এবং এই কার্পেটই কলচালিত হয়ে আপনা আপনি সেই চর্ব্বিগুলো বয়লারের মধ্যে নিয়ে আসে। এক কথায় বলতে গেলে জাহাজখানি একরকম সত্যিকারের ভাসমান ওয়ার্কশপ।

ব্রিজের উপর বিশেষ রকমের ক্রেন দেখা যায়, যার সাহায্যে এরোপ্লেনকে আকাশে চড়বার সুবিধে দেওয়া হয়। আবার ক্যাটাপুল্টও আছে, যার ব্যবহার হয় ঝড়বৃষ্টিতে, যখন ক্রেনের দ্বারা কাজ হয় না। পরিষ্কার ঝকঝকে সব ক্যাবিন, খাদ্য সামগ্রী সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তনশীল, অর্থাৎ একঘেয়ে রকমের খাওয়া নয়, 'যত পার খাও' এই নীতির অনুসরণ এবং উঁচু মাইনের সব চাকরী। তবুও, প্রথম কয়েক সপ্তাহ সেই ভারী তেলের বদ গন্ধে প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

এই সব জাহাজ, অর্থাৎ যাতে তিমি মাছ শিকারের সব সরঞ্জাম বহন করা হয়, তারা এ সব সমুদ্রে এক বছর তো অভিযান করেই, কখনো কখনো বা তার বেশীও। যতদিন না সমস্ত পিপেগুলো তিমির তেলে পূর্ণ হয়, ততদিন থাকাই নিয়ম।

* * *

শিকার স্থানের তল্লাসে যারা এরোপ্লেনে চড়ল, লেখকও তাদের সঙ্গে চললেন। এই হচ্ছে তাঁর প্রথম তিমি শিকার। নিম্নে চিরতুষার-ময় গ্রীন্‌ল্যাণ্ড বিস্তৃত। আর্কটিক ওশানের কালো জলের উপর আইস্‌বার্গ সব ভাসছে এবং নীল আর শাদা রং তাদের গা থেকে প্রতিফলিত হচ্ছে। যতদূর দৃষ্টি চলে কেবল শূন্য, কেবল নিস্তব্ধতা; মনে বেশ একটা অপরূপ অনুভূতি জাগে। কিছুদিন আগে, এখানেই Professor Wegenerএর জমা মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যায়। ফেনিল উচ্ছ্বাসে তরঙ্গ সকল বরফের ভাসমান পাহাড়ের গায়ে ক্রমাগত সজোরে আঘাত করছে।

রেডিওটেলিগ্রাফিষ্ট Klekerso তার স্পাইগ্লাসের মধ্যে দিয়ে সমুদ্র জল পরীক্ষা করতে লাগল। এরোপ্লেনকে আরও একটু নীচে নামান হোল। এই ভাবে ঘণ্টাখানেক কেটে গেল।

দূরে দেখা গেল, ঘোর ধূসর রঙের একটা কি যেন জল কেটে জলের উপর ঢেউ তুলে ভেসে চলেছে। এরোপ্লেন সেই দিকে পরিচালিত করা হোল। সেটা একটা তিমি। উচু থেকে ছোটই মনে হয় বটে, কিন্তু কাছ থেকে দেখলে সে ধারণা বদলে যায়। একটা ফোয়ারা ছুটল, তিমি নিশ্বাস নিচ্ছে।

আরো নিকটে নামা হোল। জলের গতি ও জানোয়ারের পরিষ্কার পার্শ্বদেশ দেখা গেল। Klekerso জন্তুর অবস্থান ও তার দ্রুত-

পামিতার খবর দিয়ে জাহাজে জানালে, এটা একটা বৃহৎ তিমিই বটে, অন্ততঃ ত্রিশ মিটার লম্বা। সকলের দৃষ্টি শিকারের দিকেই আবদ্ধ রইল। হঠাৎ তিমি ডুব মারল। কিছুক্ষণের মত আর নড়নচড়ন নেই। পিছনে জাহাজের ফানেল দেখা গেল এবং তার সঙ্গে তিমিধরা ছোট মোটর বোটটিও।

এ বোটে পাঁচজন লোক—যে হার্পুন ছোঁড়ে সে, একজন পাইলট, একজন টেলিগ্রাফিষ্ট ও দুজন সাধারণ নাবিক। এরোপ্লেন থেকে বোটে সংবাদ পাঠিয়ে তাকে চালনা করা হোল। এ বোটের স্পীড তিমির ছোটার শক্তির প্রায় দ্বিগুণ। শিকার এখনও অদৃশ্য।

এটাকে কি শিকার বলা চলে? না, হত্যা বলা হবে আধুনিক এই সব সাজসরঞ্জামের কাছে?

ইতিমধ্যে সকলেই তৈরী। তিমি ভেসে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গেই মুহূর্ত্তের মধ্যে সেই বোট তার গায়ে ভিড়ল। একাজটা এত সত্বরই সমাধা হোল যে লেখক উপর থেকে বোঝবার পর্য্যন্ত সময় পেলেন না। বোট ভেড়ার পরেই বোঝা গেল যে এ জানোয়ার কত বিরাট এবং এর তুলনায় মানুষ কতই ক্ষুদ্র। কেবলযুক্ত হার্পুন এবার সরল পথে তিমির দিকে ছুটল। Harpoon man, যে এ কাজের চ্যাম্পিয়ন একজন, উপযুক্ত অবসর ও স্পীড বোঝার ষ্টার একজন, তার ছোট কামানের সাহায্যে হার্পুন ইতিমধ্যেই ছুঁড়ে বসে আছে। হার্পুন ছোঁড়ার যে ভীষণ কামান গর্জ্জন হোল, উপর থেকে তা শোনা গেল না। উপর থেকে খালি দেখা গেল, কেমন করে হার্পুন জন্তুর মাংসের মধ্যে গেঁথে গেল এবং তার মধ্যে একটা বোমা ফাটিয়ে দিলে। এই বোমা জন্তুর vital partএ আঘাত করল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা আবার ডুব মারল এবং তার পিছনে রক্তের দাগ রেখে

ছুটে পালাতে লাগল। ব্যাক করার জন্যে মোটর বোটের এঞ্জিন পূর্ণজোরে চালান সত্ত্বেও তিমি সেটাকে এত দ্রুত টেনে নিয়ে চলল যে, সেটা না দেখলে বিশ্বাসই হয় না। এরোপ্লেন আরও নীচে নামিল। এবং যেখানে তিমির জলে ভেসে ওঠার সম্ভাবনা, সেই স্থানের উপর উড়তে লাগল। কুড়ি মিনিট বাদে সেই কৃষ্ণকায় বিরাট জন্তুটি জলে ভেসে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গেই তার মাথার মধ্যে চার হাজার মেশিন গানের গুলি প্রবেশ করল। তিন মিনিটের মধ্যেই তিমিটা মরে গেল। আগে যেমন পূরো একটা দিন এ জানোয়ারকে যন্ত্রণা সহ্য করতে হোত, এখন তার কিছুই নেই, পনের মিনিটের মধ্যে সব শেষ। উন্নতির পরাকাষ্ঠাই বটে!

প্রথম বার যাঁরা এই হত্যাকার্য্য দেখেন তাঁদের পক্ষে এ ব্যাপার অতি ভয়ঙ্করই মনে হয়।

* * *

(ক্রমশ)

বল হরি হরি বোল

"বল হরি হরি বোল"

নৈশ গগন মুখরিত করিয়া আমরা কয়জন প্রাণী চলিয়াছি। হঠাৎ রমেশবাবু আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আপনার নিশ্চয় খুব রাগ হচ্ছে আমার উপর!"

আমি বলিলাম—"না,—কিছুমাত্র না!"

রমেশবাবু বলিতে লাগিলেন—"না হওয়াটাই আশ্চর্য্য। আজ

বিকেলে আপনি আমার বাড়ীতে অতিথি হলেন। রাত্রে আপনাকে মড়া বইতে নিয়ে যাওয়াটা ভদ্রোচিত নয়। কিন্তু লোক জুটল না—কি করি বলুন।"

আমি বলিলাম—"আহা, ওর জন্যে আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? কলেজে পড়ার সময় মড়া পোড়ানটাও আমাদের কোর্সের মধ্যেই ছিল প্রায়। প্রায়ই এ কার্য্য করতে হত।" হরেন্দ্রবাবু তখন বলিয়া উঠিলেন, "ওসব বাজে ভদ্রতা ছেড়ে এখন কেউ একটা মিঠে গোছের প্রেমের গল্প বলুন দেখি—সময়টা যাতে কাটে। এখনও বেশ কিছু দূরে হেঁটে যেতে হবে। শ্যামবাবু, আপনি বলুন।"

শ্যামবাবু আমাদের মধ্যে একটু বয়স্থ লোক। তিনি বলিলেন—"আরে বাপু—দু একটা প্রেম যা জীবনে করেছি তা' কি আর এখন মনে আছে? আমাকে এখন অ্যালজাব্রার ফর্ম্যুলা জিগ্যেস করাও যা প্রেমের গল্প বলতে বলাও তাই। এককালে করেছি সব। কিন্তু কিছুই ভাল মনে নেই। এখন আমার প্রধান চিন্তা, তোমাদের পাল্লায় পড়ে এলাম ত—বাতটা না বাড়ে।"

"বল হরি হরি বোল—"

হরেন্দ্র তখন শ্যামবাবুকে ছাড়িয়া চন্দ্রবাবুকে ধরিয়া পড়িলেন। "আপনি ত চন্দর দা এককালে খুব উড়েছিলেন। বলুন না দু একটা গল্প—সময়টা কাটুক।

"বল হরি হরি বোল"

চন্দ্রবাবু বলিলেন—"উড়েছিলাম বটে। কিন্তু ঠিক যে প্রেম করেছিলাম তাতো বলতে পারি না। কারণ each time, I had to pay for my love either in coins or in kinds। সুতরাং তার সম্বন্ধে বিশেষ কোন কবিত্ব নেই মনের মধ্যে। রাণী, হাবি, বিনোদিনী,

নয়নতারা সব একাকার হয়ে গেছে। Distinguish করা শক্ত।”

“বল হরি হরি বোল।”

হরেন্দ্রবাবু রমেশবাবুকে তখন বলিলেন—“আপনার ষ্টকে কিছু আছে নাকি রমেশ দা? বলুন না।”

রমেশবাবু হাসিয়া উঠিলেন—“আমি ভাই ইস্কুলে পড়ামুখস্থ করে একজামিন পাস করাটাই পরমার্থ মনে করতাম। সুতরাং ছাত্রজীবনে পরীক্ষা পাস করা ছাড়া আর কিছু করি নি। বিয়ে করে স্ত্রীর প্রেমে পড়েছিলাম। ফলে চারটি মেয়ে হয়েছে দেখতে পাচ্ছ।”

“বল হরি হরি বোল”

একটু থামিয়া রমেশবাবু আবার বলিলেন—“এইবার একটা প্রেম করব মনে করছি। কিন্তু ফুর্সৎ কই? সকাল থেকে উঠে আপিস খাওয়ার তাড়া। সন্ধে বেলা ফিরে এসে মনে হয় চাট্টি খেয়ে শুতে পারলে বাঁচি। তোমার নিজের কিছু থাকে ত বল না ভায়া। অপরকে জ্বালাতন কর কেন?”

“বল হরি হরি বোল”

হরেন্দ্রবাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন—“ডাক্তারেরা যেদিন থেকে আশঙ্কা করলেন যে আমার বুকের দোষ আছে—সেদিন থেকে নিজের জীবনকে আর কারুর সঙ্গে জড়াতে সাহস পাই না। তা ছাড়া আমার মত মুখে বসন্তের দাগ—একচোখকানা লোককে কোন্ মেয়ে ভালবাসবে বলুন! কিন্তু প্রেমের গল্প শুনতে আমার ভারি ইচ্ছে। বলুন না আপনারা কেউ একটা।”

“বল হরি হরি বোল”

তারপর হঠাৎ আমার দিকে ফিরিয়া হরেন্দ্রবাবু বলিলেন, “কিছু

মনে করবেন না মশাই। আপনি অপরিচিত লোক। জীবনে যদি ঘটে থাকে কিছু, বলুন না। এ সময়ে বেশ লাগবে।”

“বল হরি হরি বোল”

আমার জীবনে-যে রমণীর আবির্ভাব ঘটে নাই তাহা নয়। কিন্তু তাহা বলিতে লজ্জা করে। সুতরাং কথাটা ঘুরাইয়া বলিলাম, “এখন কি ওসব ভাল লাগবে? তার চেয়ে বরং ভূতের গল্প বলুন কেউ।”

বয়স্থ শ্যামবাবু বলিলেন—“প্রেমের গল্প আর ভূতের গল্প ও আমার কাছে দুইই সমান। আপনি প্রেমের গল্পই বলুন।”

“বল হরি হরি বোল”

বলিতে লাগিলাম।

“তখন সবে আমি এম. এ. পাস করেছি। এই বছরখানেক আগেকার কথা। মামার বাড়ী বেড়াতে গেলাম। হঠাৎ সেখানে এক অশিক্ষিতা চাকরাণীকে ভাল লেগে গেল। বয়স কম। কিন্তু ভারি সুন্দর। খোঁজ করে শুনলাম মেয়েটি বিধবা। কিন্তু অমন নিষ্পাপ মূর্ত্তি আমি কখনো দেখিনি।”

“বল হরি হরি বোল”

“তারপর ক্রমশঃ যেমন হয়। একদিন আড়ালে পেয়ে তাকে প্রেম নিবেদন করলাম। মেয়েটি শুধু বললে—‘তা কি হয়?’

আমি তাকে বুঝিয়ে দিলাম “খুব হয়”। বলে’ একটা আধুলি বার করে তার হাতে দিতে গেলাম। সে কিছুতে নিলে না।”

“বল হরি হরি বোল”

“এমনি করে কিছুদিন যায়। যতদিন মামার বাড়ীতে ছিলাম তার আশেপাশে ঘুরেছি। কিন্তু কিছুই সুবিধা করে উঠতে পারি নি। মামা, মামী, বাড়ীসুদ্ধ লোকজন। একদিন লুবিয়ে তার বাড়ী

গেলাম। সেখানেও দেখি এক খাণ্ডার মাসী রয়েছে।—কি করি ভাবছি। হঠাৎ একদিন সুযোগ পেয়ে গেলাম। মুকুজ্জেদের বাড়ী মামামামী বাড়ীসুদ্ধ লোকের নেমন্তন্ন হল। ফাঁকা বাড়ী। কুসুমকে সেদিন একা পেলাম।"

হরেন্দ্রবাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন— "বল হরি হরি বোল"

"সেই দিনই বুঝলাম, কুসুমও আমাকে ভালবাসে। সেইদিন তার সেই চকিত চাহনি আর ঠোঁটের কাপন দেখে আমি বুঝেছিলাম যে আমার স্বপ্ন সফল হয়েছে। সেদিন তাকে আমি যা-ইচ্ছা তাই করতে পারতাম। কিন্তু কেন জানি না কিছু করতে পারলাম না। শুধু একটু চুম খেলাম।"

"বল হরি হরি বোল"

আমার আর কিছু বলিবার ছিল না।

হরেন্দ্রবাবু বলিলেন, "তারপর ?"

"তারপর ? তারপর আর কিছু নেই। জানাজানি হয়ে যাওয়ার ভয়ে আমি পালিয়ে এলাম। কুসুমের আর দেখা পাই নি, শুনেছিলাম আমি চলে আসার পর সে মামার বাড়ীর চাকুরি ছেড়ে দিয়েছে।"

"বল হরি হরি বোল"

শ্মশানে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। শব নামান হইল। চিতা সাজান হইল। শবের দেহাবরণ খুলিয়া তাহাকে চিতায় তুলিবার সময় বলিয়া উঠিলাম—

"থামুন—থামুন—থামুন—এ আপনার বাসায় কি করে এলো রমেশবাবু ?"

রমেশবাবু বলিলেন—"অসুস্থ হয়ে এই মেয়েটি দুদিন আগে আমাদের গোয়ালঘরে আশ্রয় নিয়েছিল। বলেছিল কাকে খুঁজতে সে বেরিয়েছে। তাছাড়া অত প্রশ্ন করার অবসর ছিল কোথা ? বেচারী মারাই গেল। কেন বলুনত ?"

স্তব্ধ হইয়া রহিলাম।

"বনফুল"

"বিজ্ঞান সার সংগ্রহ"

বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের ইতিহাস লইয়া অনেকে অনেকস্থলে অল্প-বিস্তর আলোচনা করিয়াছেন; এক খানি বৃহৎ গ্রন্থও মুদ্রিত হইয়াছে। অধুনা শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস সঙ্কলনে চেষ্টা পাইতেছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় এই সম্বন্ধে তাঁহার কয়েকটি ধারাবাহিক প্রবন্ধও মুদ্রিত হইয়াছে।

এক জনের পক্ষে এই ইতিহাস নিখুঁত ভাবে সঙ্কলন করা সম্ভবপর নহে। পুরাতন সংবাদপত্রের ফাইল যাঁহাদের সংগ্রহে আছে তাঁহারা তাঁহাদের সংগৃহীত সংবাদপত্রাদির পরিচয় সাধারণকে জানাইলে ইতিহাস সঙ্কলনের পক্ষে সুবিধা হইবে।

বর্ত্তমান সংক্ষিপ্ত আলোচনায় "বিজ্ঞান সার সংগ্রহ" নামক একখানি সাময়িক পত্রের পরিচয় দিতে প্রয়াস পাইব। * ইহা ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম পক্ষে প্রকাশিত হয়। প্রথম এই পত্রিকাখানি পাক্ষিক রূপেই প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু পরবৎসর ইহা মাসিকে পরিণত হয়। আলোচ্য পত্রিকার ১ম বর্ষের ৫ম সংখ্যা [নবেম্বর, ১৮৩৩ ইং] ও দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম ও তৃতীয় সংখ্যা [নবপর্য্যায় জানুয়ারী ও মার্চ্চ, ১৮৩৪,] শোভাবাজার রাজবাড়ীর

---

* শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য পরিষদের প্রবন্ধে "বিজ্ঞান সার সংগ্রহের" উল্লেখ করিয়াছেন। [১৩৩৮। ৪র্থ সংখ্যা, পৃঃ ২৮৭ দ্রষ্টব্য] কিন্তু ইহার সঠিক প্রকাশ কাল উল্লেখ করিতে পারেন নাই। তাঁহার অনুমান "১৮৩৩ সনের আগষ্ট (?) মাসে ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়।"

শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ দেব মহাশয়ের সৌজন্যে তাঁহাদের গ্রন্থাগারে দেখিবার সুযোগ হইয়াছে। ১ম বর্ষের ৬ষ্ঠ সংখ্যা শ্রীহট্টের জমিদার সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের সংগ্রহে আছে।

বিজ্ঞান সার সংগ্রহ দ্বিভাষিক পত্রিকা। ইহা ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষায় প্রকাশিত হইত। প্রতিপৃষ্ঠায় প্রথমার্দ্ধ ইংরাজী ও দ্বিতীয়ার্দ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় মুদ্রিত হইত। প্রথম বৎসরের প্রতি সংখ্যায় ১৬ পৃষ্ঠা ও দ্বিতীয় বৎসরের প্রতি সংখ্যায় ৩২ পৃষ্ঠা থাকিত।

১৮৩৪ খ্রীঃ জানুয়ারীর নবপর্য্যায় প্রথম সংখ্যার বিজ্ঞাপনে তিন জন সম্পাদকের নাম আছে—(১) উলষ্টন (২) গঙ্গাচরণ সেন, (৩) নবকুমার চক্রবর্ত্তী। উক্ত সংখ্যার আখ্যাপত্রে—"References to be made to M. W. Woollaston, Hindu College" বলিয়া উল্লেখ রহিয়াছে।

বিজ্ঞান সার সংগ্রহের ইংরাজী নাম Manual of Literature and Science." নবপর্য্যায়ের আখ্যাপত্রে ইহাতে "Hindu Manual of Literature and Science." বলিয়া বিশেষিত করা হইয়াছে। আলোচ্য পত্রিকায় কি কি প্রবন্ধ থাকিত জানা মন্দ নহে। শোভাবাজারে রক্ষিত ২ সংখ্যার প্রবন্ধ তালিকা দেওয়া হইল।

৩০। 1. November 1833. No. 5.

1. Life of Galileo—গেলিলিও সাহেবের উপাখ্যান

2. Constitution, Government, and Laws of the Ancient Britons—ইতিহাস পূর্ব্বকালীন ইঙ্গলণ্ডীয় পুরোহিতদের রাজ্য শাসন ও তাহার রীতি এবং ব্যবস্থাদির বিবরণ। * New-Series, January, 1834, No, 1,

1. First Discourse on the Worship of God, delivered

at the Brumha Sobha; by Ramchunder Surma, Expounder of the Vedas, প্রথম প্রকরণ, পরমাত্মার উপাসনা ব্রাহ্মসমাজ কলিকাতা বুধবার ৬ ভাদ্র শকাব্দাঃ ১৭৫০ শ্রীযুৎ রামচন্দ্র শর্ম্মার কৃত।

2. Second Discourse on Do, দ্বিতীয় প্রকরণ। ব্রাহ্মসমাজ কলিকাতা বুধবার ১৩ ভাদ্র শকাব্দাঃ ১৭৫০ শ্রীযুৎ রামচন্দ্র শর্ম্মার কৃত।

3. Extracts from the life of Henry Martyn, হেনরি মার্টিন সাহেবের জীবনোপাখ্যান হইতে সংক্ষেপে গৃহীত।

4. On the Advantages of having Free Communication, between Man and Man, ভিন্ন ২ জাতীয় লোকদিগের পর পর সারল্য রূপে সহজ কথোপকথনের যে লাভ তাহার বিষয়।

5. Adversity, দরিদ্রতা

6. of Parents and Children, মাতা পিতা ও পুত্র।

No. 3,—March, 1834, New Series,

Third Discourse on the Spiritual Worship of God, delivered by Sree Ramchundra Surma, Expounder of the Vedas at the Brumha Sobha,—পরমেশ্বরের উপাসনা বিষয়ে তৃতীয় ব্যাখ্যান শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মা কর্তৃক ব্রাহ্ম সমাজ কলিকাতা বুধবার ২০ ভাদ্র শকাব্দাঃ ১৭৫০।

2, Prejudices—পক্ষপাত।

3, Constitution, Government, and Laws of the Ancient Britons, ইতিহাস পূর্ব্বকালীন ইঙ্গলণ্ডীয় পুরোহিতদের রাজ্যশাসন ও তাহার রীতি এবং ব্যবস্থাদির অবশিষ্ট বিবরণ।

4. Science—বিজ্ঞানশাস্ত্র।

5. Anecdote of Frederick the Great, ফ্রেড্রিক দি গ্রেট নামক রাজার উপাখ্যান।

6. Solon and Croesus—সোলন এবং ক্রিশসের জীবনোপাখ্যান।

7. Commerce বাণিজ্য।

আলোচ্য পত্রিকাখানি মূলতঃ য়ুরোপীয় সাহিত্যে ও বিজ্ঞান এদেশবাসীদের মধ্যে প্রচারের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বর্ষ হইতে ইহার উদ্দেশ্যের কিঞ্চিৎ সংস্কার সাধন করা হয়। য়ুরোপীয় গ্রাহকদের নিকট ইহা অধিকতর গ্রহণযোগ্য করিবার উদ্দেশ্যে ইহাতে নানা উপাদেয় সংস্কৃত ও বাঙ্গালা প্রবন্ধাদির অনুবাদ থাকিত। উপরোক্ত নবপর্য্যায়ের ১ম সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধটিই তাহার নিদর্শন।

আলোচ্য পত্রিকায় "To be continued" এর স্থলে "ইহার অবশিষ্ট পশ্চাৎ হইবে"—বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

পাদরি লং তাঁহার তালিকায় ইহাকে ভ্রমবশতঃ "বিদ্যাসাগর সংগ্রহ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ইহা ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তিনি Periodicals শাখাকে Almanacs, Encyclopaedias ও Magazines, Newspapers প্রভৃতি ৪ শাখায় বিভক্ত করিয়া আলোচ্য পত্রিকাখানি Magazine শাখাতে উল্লেখ করিয়াছেন। Magazine শাখাতে প্রধানতঃ মাসিক পত্রিকারই উল্লেখ রহিয়াছে। বিজ্ঞান সার সংগ্রহ ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে প্রথম পাক্ষিক রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল সত্য; কিন্তু ইহার নবপর্য্যায় ১৩৮৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস হইতে মাসিক রূপেই প্রকাশিত হয়।

এই হিসাবে আমরা তাঁহার "১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত", মন্তব্যটিকে সমর্থন করিতে পারি।

আলোচ্য পত্রিকা হইতে ভাষার নমুনা স্বরূপ অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হইল :—

Of Parents and Chidren.

The joys of parents are secret, and so are their griefs and fears; they cannot utter the one, and they will not utter the other. Children sweeten labours, but they make misfortunes more bitter; they increase the cares of life, but they mitigate the remembrance of death.

The difference in affection of parents towards their several children is many times unequal, and sometimes unworthy, especially in the mother; as Solomon saith, a wise son rejoiceth the father, but an ungracious son shames the mother,

মাতা পিতা ও পুত্র।

মাতা পিতার আহ্লাদ সর্ব্বদাই গোপনীয় থাকে, এবং দুঃখ ও ভয় ও এইরূপ তাঁহারা ইহাও প্রকাশ করিতে পারেন না, উহাও প্রকাশ করিতে পারেন না, মাতাপিতার পরিশ্রমেতে পুত্রকে সুখজনক করে এবং তাহাদের দুঃখকে অভিষিক্ত করে পুত্র সত্বে পিতা মাতার জীবিকার চিন্তা অধিক হয় কিন্তু মৃত্যু সংস্কারকে অতি ক্ষীণ করে।

পিতামাতার স্নেহ সকল পুত্রের প্রতি সর্ব্বদা সমান থাকে না, কখনও অনুপযুক্ত পুত্রের প্রতি অধিক স্নেহ হয়, বিশেষত মাতার,

যেমন সোলমন নামক কোন ব্যক্তি কহেন যে, পণ্ডিত পুত্র পিতাকে আহ্লাদিত করে, আর মূর্খ পুত্র মাতাকে লজ্জিতা করে।

New Series, Jan. 1834, pp, 32.

পত্রিকাখানি ব্যাপ্টিষ্ট মিশন প্রেসে মুদ্রিত হইত।

—শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য

সম্পাদকীয় মন্তব্য। একজনের পক্ষে দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস সঙ্কলন করা সম্ভবপর নহে ইহা সত্য কিন্তু শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অন্ততঃ 'বিজ্ঞানসার সংগ্রহ' সঙ্কলন বিষয়ে প্রবন্ধ লেখক অপেক্ষা একটু বেশী সংগ্রহ করিয়াছেন। পাদটীকায় লেখক যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা ব্রজেন্দ্রবাবুর ১৩৩৮ সালে প্রকাশিত প্রবন্ধের উপর, তাহার পর ৪ বৎসর অতীত হইয়াছে। ইতিমধ্যে বিজ্ঞানসার সংগ্রহ সম্বন্ধে ব্রজেন্দ্রবাবুও অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন ও তাহা তাঁহার 'সাময়িক পত্রের ইতিহাস' নামক পুস্তকে ছাপা হইয়া গিয়াছে। পুস্তকখানি শীঘ্রই রঞ্জন প্রকাশালয় হইতে প্রকাশিত হইবে।

সংবাদ-সাহিত্য

শরৎচন্দ্র সম্প্রতি গণনাকার্য্যে মন দিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এতকাল পরে 'সেদিন' হঠাৎ গুনিলেন কেন? এতদিন কি দৃষ্টি নিজেকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে নাই? আমাদের ত মনে হয় যাঁহারা সাহিত্যে নাম (যেরূপেই হউক) করিয়াছেন তাঁহাদের উচিত প্রতি সপ্তাহে একবার করিয়া অন্যান্য সাহিত্যিকদের সংখ্যা গণনা করা।

কিন্তু শরৎবাবুর সেরূপ সময় হাতে ছিল না। "দেশের জন্য যাঁহারা প্রাণপণ" করিয়া বসিয়াছেন, তাঁহাদের শুনিবার সময় কই? তাই বয়স যখন ষাটের কোঠায়, মন যখন বিষয়কর্ম্ম হইতে ছুটি লইতে প্রায় চাহিতেছে, এমন সময় কোথা হইতে দক্ষিণা হাওয়ার একটা আচমকা আন্দোলনে মনের ভিতর পাটীগণিতের সুর খেলিয়া গেল।

—

তাই শরৎবাবু 'সেদিন' শুনিয়া দেখিলেন—

> সতিকারের সাহিত্য সাধনা যাহারা করেন, সাহিত্য যাঁদের শুধু বিলাস নয়, সাহিত্য যাঁদের জীবনের একমাত্র ব্রত, বাংলাদেশে তাঁরা কজনই বা, সংখ্যা তাঁদের আঙুলে গোনা যায়।

শুনিয়া আশ্বস্ত হওয়া গেল। সাহিত্য যাঁহাদের বিলাস নয়, অর্থাৎ ব্যবসা তাঁহাদের সংখ্যা বাংলাদেশে কম। আমাদেরও মত ঠিক ইহাই। বিলাস ও ব্যবসা দুইটি শব্দ ইংরেজিতে যথাক্রমে hobby ও profession। বাংলাদেশ সাহিত্য-hobbyর দেশ—hobby-ওয়ালাদের সংখ্যা অগণিত, গুনিতে চাহিলে শরৎচন্দ্রের একার আঙুলে কুলাইত না। কাজেই তিনি বিলাসীদের ছাড়িয়া প্রফেশনালদের গুনিয়াছেন। এই সাহিত্যব্রতী সাহিত্যব্যবসায়ী, যাঁহারা বই বেচিয়া বাড়ি গাড়ি করিয়াছেন, সত্যই ত তাঁহাদের সংখ্যা আর কতই হইবে?

—

কিন্তু সাহিত্যব্যবসায়ীগণ মাড়োয়ারী নহেন। মাড়োয়ারীদের মধ্যে ব্যবসাগত যত প্রতিযোগিতাই থাকুক, কেহ যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে অন্য মাড়োয়ারীগণ টাকা দিয়া তাহার ব্যবসায়ে সাহায্য করে। কিন্তু আমাদের দেশের সাহিত্যব্যবসায়ীর সে-প্রবৃত্তি

নাই। যিনি এই ব্যবসায়ে ধনী হইয়াছেন, দরিদ্র সাহিত্যিকের জন্য তাঁহার দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত হয় না। যদি হয়, সে হস্তে পঁচিশ টাকা মূল্যের একটি ফাউন্টেন পেন থাকে এবং তাহারই সাহায্যে তিনি কাঁদিয়া আকুল হন।

—

শরৎচন্দ্র সাহিত্যবিলাসী। তিনিও চিরদরিদ্র, তাঁহার ললাটও কলঙ্কলাঞ্ছিত। তিনি "প্রভূত ধনসম্পত্তি অর্জ্জন করে বিত্তশালী ধনবান হ'তে চান না"—এমন কি বৈরাগ্য চান। তাই তাঁহার কথা আমরা উড়াইয়া দিতে পারিতেছি না। তিনি বলিতেছেন—

> এই যে সব সাহিত্যিক দেশের জন্য প্রাণপণ করেছেন, তাঁদের হয়েছে শুধু লাঞ্ছনা আর দারিদ্র্য।

শরৎচন্দ্রের লাঞ্ছনার অভিজ্ঞতা ইহাই নূতন নহে। তিনি অন্য ব্যাপারেও একবার সত্যই দেশের জন্য প্রাণপণ করিয়াছিলেন—এমন কি কংগ্রেসের কাজও করিয়াছিলেন, কিন্তু সেখানেও ঐ লাঞ্ছনা আর দারিদ্র্য। পোড়া দেশে কোনো দিকে পা ফেলিবার উপায় নাই।

—

শরৎচন্দ্র বাড়ি করিতে যে খরচ করিয়াছেন, শুনিয়াছি তাহার ষোল আনাই বিদেশ হইতে আসিয়াছে। যুক্ত রাজ্যের প্রেসিডেণ্ট কিছু, জাপান সম্রাট কিছু, মুসোলিনি কিছু এবং বাদবাকী আবিসীনিয়ার সম্রাট মনিঅর্ডার যোগে পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাই বড় দুঃখে শরৎচন্দ্র বলিতেছেন—

> দেশের লোক তাদের (সাহিত্যিকদের) দেয় না কিছু, অথচ তাদের কাছ থেকে চায় অনেক।

শরৎচন্দ্রের অশ্রু যে সব দরিদ্র সাহিত্যিকের উপর বর্ষিত হইয়াছে

তাহারা প্রকাশ্যে ভাল না লিখিলেও গোপনে সত্যই খুব ভাল লিখিতে পারে—কেবল বিনিময়ে তাহারা কিছু টাকা চায়। পৃথিবীর বড় বড় সাহিত্যসৃষ্টির মূলে রহিয়াছে টাকা। দরিদ্র হইয়া জন্মিয়াছিলেন বলিয়া ইংরেজি সাহিত্যে ডিকেন্স খারাপ লেখা লিখিলেন, বায়রন যতদিন গৃহে ছিলেন সুপাঠ্য কাব্য লিখিয়াছিলেন, কিন্তু গৃহত্যাগী নিঃস্ব হইয়া আর কিছুই লিখিতে পারেন নাই। শেলী ইটালীতে ব্যবসা করিয়া কোটিপতি হইয়া তবে ভাল লিখিলেন। গোল্ডস্মিথ রবার্ট বার্ণস্ প্রভৃতি ছিলেন কয়লার খনির মালিক। ব্রণ্টে ভগিনীগণ গভর্ণমেণ্ট হইতে জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শেক্সপীয়ারের কথা বলা হয় নাই। তিনি এক এক খানা বই বেচিয়া এক একটি বড় ফ্যাক্টরি গড়িয়া গিয়াছেন। রুশিয়ার ডষ্টয়েভস্কি, জারের সম্পত্তির অর্দ্ধেক পাইয়াছিলেন—গার্কি তো বিখ্যাত ধনী বলিয়াই ধনীদের চরিত্র তাঁহার লেখার বেশি ফুটিয়াছে—দরিদ্রের চরিত্র আঁকিতে পারেন নাই।

—

শরৎচন্দ্রের প্রিয় সাহিত্যিকগণও টাকা না পাওয়াতে খারাপ লিখিতেছে। তিনি বলিতেছেন—

> সম্প্রতি একটা কথা শুনছি, ভাললেখা তাঁরা (লেখ-করা) লিখছেন না। কেন লিখছেন না আমাকে যদি কেউ প্রশ্ন করেন ত আমি বলব—শক্তি যাঁদের আছে অর্থের অভাবে দারিদ্র্যের তাড়নায় আজ তাঁরা এমনি নিষ্পেষিত যে ভাল কিছু লিখবার ইচ্ছা থাকলেও অবসর বা স্পৃহা তাঁদের নেই।

বিশ্লেষণের কি আশ্চর্য্য কৌশল! সাহিত্যিকেরা হাতে থাকিল, অথচ তাহাদিগকে একটি পয়সাও ভিক্ষা দিতে হইল না। সাহিত্যে

যাহারা আমাদের দেশে কিছু নাম করিয়াছেন, তাঁহাদের ধারণা এই যে সাহিত্যনামধারী একটা সম্প্রদায়কে হাতে রাখিতে পারিলে পাওয়া-খ্যাতিটা আজীবন অক্ষত রাখা চলে। কারণ, খ্যাতির বিপদ উপস্থিত হইলে তখন এই সাহিত্যনামধারীগণ লাঠিয়ালের কাজ করিয়া থাকে। ইহাতে খ্যাত ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত নিরাপদে থাকেন।

—

এই বুদ্ধির জন্য আমরা শরৎচন্দ্রকে তারিফ করিতেছি। কারণ শরৎচন্দ্রও জানেন, আমরাও জানি, আমাদের দেশে যাহারা খারাপ লেখে তাহারা লিখিতে জানেনা বলিয়াই খারাপ লেখে, খারাপ লেখার অন্য কোনো কারণ নাই। আর বাংলাদেশে সাহিত্যিক নামধারী কোনোব্যক্তির এমন দারিদ্র্য নাই যাহাতে সে নিষ্পেষিত হইতেছে। শরৎচন্দ্র যে বলিয়াছেন, "আগেকার দিনে বড় বড় রাজরাজড়ারা সভাকবি রেখে কবি সাহিত্যিকের বৃত্তির ব্যবস্থা করে অনেকরকমে দেশের সাহিত্যকে বড় হবার সুযোগ দিতেন। আজকাল তাও নাই।" ইহা সত্য কথা। কিন্তু ইহা দুঃখের নহে। তা নাই বটে কিন্তু অবস্থা পূর্ব্বের চেয়ে অনেক ভাল। রাজরাজড়ারা কোনো কবিকেই মোটর-অ্যালাউয়েন্স দিতেন না, ফার্ষ্টক্লাস রিজার্ভ করিয়া দেশভ্রমণ করিবার সুযোগ দিতেন না, দশপনরটাকা বোতল ব্র্যাণ্ডি বা হুইস্কির খরচ জোগাইতেন না, শুধু অন্ন এবং বস্ত্র দিতেন। কিন্তু এ যুগের কোন্ সাহিত্যিক শুদ্ধমাত্র অন্ন এবং বস্ত্র পাইয়া ভাল সাহিত্য রচনা করিতে প্রস্তুত হইবে?

—

"দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ" ইহা এমন একটি সেন্টিমেন্টাল কথা যাহা দ্বারা অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, সাহিত্য, চিকিৎসাব্যবসায়,

ফ্যাক্টরি, কর্পোরেশন, কৃষি, এঞ্জিনীয়ারিং, শিল্প, সিনেমা, থিয়েটার সকল বিভাগের শ্রোতাকেই অভিভূত করা যায়। বাঙালী শ্রোতা এই জাতীয় কথা শুনিলেই কাঁদিয়া ভাসাইয়া দেয়। যদি বলা যায় "বাঙালী, তুমি হতভাগা, স্বাস্থ্যহীন, পরাধীন; বাঙালী, তুমি শ্মশানে বাস করিতেছ, তোমার গৃহ নাই, তোমার সম্মান নাই, তোমার অন্ন নাই, বস্ত্র নাই", অমনি বাঙালী ভাবে গদগদ হইয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে থাকিবে। এই কাঁদাই তাহার সাহিত্য—ইহাই তাহার স্বদেশ-প্রেম এবং ইহাই তাহার আধ্যাত্মিকতা।

—

অথচ কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায় বাঙালী আর সকলেরই মত সবই করিতেছে। ফুটবল খেলিতেছে, ক্রিকেট খেলিতেছে, তাস, পাশা, দাবা খেলিতেছে, জলে সাঁতারের পাল্লা দিতেছে, থিয়েটার-বায়োস্কোপ করিতেছে এবং দেখিতেছে, ট্রামে-বাসে চড়িতেছে, ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেছে, মাসে পঞ্চাশটাকা খরচ করিয়া কলেজে পড়িতেছে, প্রসেশন করিতেছে, সহস্র সহস্র টাকার বাজী পুড়াইতেছে, মোটকথা পৃথিবীর অন্য দেশের লোক যাহা করিতেছে বাঙালীও তাহা করিতেছে—দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত হইল কি উপায়ে? অন্নবস্ত্র-সমস্যা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এক। সর্ব্বত্রই পরিশ্রম করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে হয়—ইহা একমাত্র বাঙালীর নিজস্ব নহে।

—

কিন্তু তবু সাহিত্যে তাহাকে কাঁদিতেই হইবে। শরৎবাবু সাহিত্যিকের জন্য যে ক্রন্দন করিয়াছেন তাহাও ক্রন্দন-সাহিত্য। ইহা না হইলে আসর জমে না। 'দেশ' নামক সাপ্তাহিকের ৪৮শ সংখ্যায় ইহারই অন্য একটা সংস্করণ দেখিতেছি। ভাবে গদগদ হইয়া খানিকটা বকিতে হইবে—এবং পাঠক তাহা পড়িবে; কিছু শিক্ষার

জন্য নহে, কিছু জানিবার জন্য নহে, চিত্তরঞ্জনের জন্য নহে—ভাবোন্মত্ত হইবার জন্য পড়িবে। ধর্ম্মের অনুষ্ঠানের সহিত সাহিত্য, রাজনীতি, দেহতত্ত্ব প্রভৃতি মিলাইয়া সাধারণ বাংলা সংবাদপত্রে যে সমস্ত উচ্ছ্বাস দেখিতে পাই তাহা অন্য কোনো দেশে বা ভাষায় সম্ভব নহে।

> কালি, কালি, মহাকালি—মহাঘোরা রজনীর মধ্যযামে সাধক এই মহামন্ত্র উচ্চারণ করিলেন, বলিলেন তমোময়ী হে রজনী, নিদ্রাময়ী, মৃত্যুময়ী তোমার রহস্যের যবনিকা একবার এই মহা অমাবশ্যার অবসরে উন্মোচন কর—* • মা দয়াময়ী, স্নেহময়ী এবং দয়াময়ী-স্নেহময়ী বলিয়াই ভৈরবী এবং ভয়ঙ্করী—অতি বিস্তার বদনা, জিহ্বাললন ভীষণা...... কাল-দণ্ডের চর্ব্বণে সকলকে গ্রাস করিতেছেন......মা নাচিতেছেন......তাথৈ তাথৈ দ্রিমি দ্রিমি দ্রং দ্রং...এ ভয় ভাঙ্গিতে হইবে মা—প্রতিপদে এই যে মৃত্যুর তাড়না—এ ভয় ভাঙ্গিতে হইবে মা এসো মা এলোকেশী, মুক্ত অসি লইয়া জাগ্রত হও, আমার সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া দাও, তোমার নৃত্য তালে আমার হৃদয় নাচিয়া উঠুক। মহাকাল দেবতার অন্তরের ধন মা তোমার ঐ যে রাঙ্গা পা দুখানি ও পায়ের নূপুরধ্বনি যার কানে গিয়াছে, সে কি আর মরণের ভয় করে মা! * *

এই জাতীয় ক্রন্দনেই বাঙালী কোনো দিকে উন্নতি করিতে পারিতেছে না। কাহারো জীবনী লিখিতেই বসুক বা ঐতিহাসিক গবেষণাই করুক বাঙালী স্পর্শযোগ্য স্পষ্ট কিছুই দেখিতে পায় না, কাহাকে দেখাইতেও পারে না। কার্য্যক্ষেত্রেও কোনো স্পষ্ট নির্দ্দেশ নাই, আছে শুধু মা-মা-মা!

—

কালি-মন্দিরে যাহা শোভা পায়, সাধারণ সাপ্তাহিক পত্রে তাহার কোনো সার্থকতাই থাকিতে পারে না; কেননা সাপ্তাহিক পত্র কালিমন্দির নহে। ইহা যদি কাহারো ব্যক্তিগত প্রার্থনা হয় তাহা হইলে তাহা ব্যক্তিতেই নিবদ্ধ থাকা উচিত। বাঙালী-জাতির ইহা প্রার্থনা হইতে পারে না: "এসো মা এলোকেশী, মুক্ত অসি লইয়া জাগ্রতা হও, আমার সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া দাও"। এ প্রার্থনা তিনিই করিতে পারেন যাঁহার বয়স সত্তর পার হইয়াছে—যিনি বাতব্যাধিতে কষ্ট পাইতেছেন এবং যিনি যথাসম্ভব শীঘ্র সকল বন্ধন হইতে মুক্তি লাভের জন্য ছটফট করিতেছেন।

—

কিন্তু বাঙালী-জাতি এরূপ মুক্তি চাহেনা। সে ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে চায়, লিমিটেড কম্পানি করিয়া সাময়িক পত্র বাহির করিয়া লাভ করিতে চায়, ব্যাঙ্কে কিছু টাকা জমাইতে চায় ইত্যাদি ইত্যাদি। মৃত্যুভয় হইতে মানুষ যেন কোনো দিনই মুক্ত না হয়। মৃত্যুভয় আছে বলিয়াই মানুষের নানা অসুবিধা সত্বেও জীবন এত মধুর হইয়া উঠিয়াছে—মৃত্যুভয় না থাকিলে সব খুনী কিংবা ডাকাত হইত।

—

জনৈক 'আধুনিক' কবির ভাবাবিষয়ে আধুনিকতা সত্বেও আমাদের মনে একটি দুঃখ রহিয়া গেল। কবি বলিতেছেন—

তোমারে বাসিয়া ভালো স্বপ্ন দেখি বৃহৎ পৃথিবী
মেরুর সোনালি সন্ধ্যা ট্রপিকালে উজ্জ্বল আকাশ
বসন্তের বর্ণ দীপ দৃষ্টি হতে যায় নাক নিভি
তোমার শাড়ীর মতো নভোব্যাপ্ত সুনীল আকাশ,
* * তোমার ভুরুর মতো দিগন্তের বাঁকা চাঁদ জাগে
সমুদ্রের ঢেউ গুলি। * *

দুঃখ বাঁকা চাঁদের জন্য নহে, ভ্রূর জন্য। ভ্রূও বোধ করি চাঁদের মতই শাদা। ইহাই দুঃখ।

—

উপায়ান্তরহীন হইয়া আমরা একটি গল্পের পূরাটা উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না—সারাংশ দিতেছি; লেখকের ভাষায় হস্তক্ষেপ করা হয় নাই।

> শেষরাত্রে সীতেশ বাড়ী ফিরিল। পরিশ্রান্ত দেহটিকে কোন রকমে খাটের উপর মেলিয়া দিয়া গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হইল। (ভোর হইল—পাখীর কাকুলী (sic) আরম্ভ হইয়াছে) রাতের কথাটা এখন বড় বেসুরো বাজে। তার ভীষণ অধঃপতন······শিক্ষিত সমাজে তাহার মর্য্যাদা আছে, কিন্তু····· (চিঠি আসিল)।
>
> পূজনীয় সীতেশদা—তোমার কি হয়েছে বলত? আজ একমাস কোন খবর নেই।······কবে আসবে? প্রণাম নিও। ইতি রেখা—(সীতেশের হিল্লোল প্রভৃতি। সে ভাবিতে লাগিল ইচ্ছা করিয়াই সে রেখার সহিত দেখা করিতে যায় নাই। অভাগী রেখা...অর্থাৎ রেখা বিধবা)
>
> বিকেলে সীতেশ রেখার ওখানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে এমন সময় অনুপম আসিল। অনুপম তাহার ছাত্র। প্রিয় ছাত্র মেধাবী উদীয়মান।
>
> সীতেশ বলিল, চল অনুপম তোমার সঙ্গে একজনের আলাপ করিয়ে দেব। সাহিত্য দর্শন নিয়ে কত পার তর্ক করতে আজ দেখব।
>
> (দেখা হইবার পর)—আচ্ছা সীতেশদা এই ভবঘুরে হয়ে আর কতদিন কাটাবে বলতো? (সীতেশ হাসিয়া)

এ দুর্ভাবনা তোমার কবে থেকে হল রেখা? রেখা বলে—অনেকদিন! (সীতেশ বিদেশে যাইবে, বলিবার পর) সস্নেহে সীতেশ তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিল—ছিঃ রেখা কাঁদছ কেন?……মাসখানেক পরে আবার ফিরব……লক্ষ্মী—ইত্যাদি। (রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় সীতেশ রেখার বই ফিরাইয়া দিতে গেল—সীতেশ ডাবলিন হইতে ডাক্তার হইয়া ফিরিয়াছে—সে রেখার বই ধার করিয়া পড়িত। রেখার জানালার ধারে লুকাইয়া দেখিতে চাহিল রেখা রাত্রি ৯॥০ টার সময় কি করে।)

এমন সময় ঘরের ভিতর হইতে একটা স্বর কানে আসিল. শোন রেখা………

না রেখার মা তো নয়। তবে এত রাত্রে রেখার ঘরে কে? (বুঝিল অনুপম—অর্থাৎ প্রিয় ছাত্র)……

তাহার শিষ্য অনুপম, তাহার বন্ধু অনুপম আজ বিশ্বাসঘাতক!

গল্পের মর্‍্যাল: গুরু স্বয়ং যে-বিধবার প্রতি মনোযোগ দিয়াছেন, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোনো শিষ্যকে তিনি যেন তাহার সহিত আলাপ করাইয়া না দেন।

—

যে-সংখ্যা দেশ হইতে কিছুপূর্ব্বে "কালি কালি মহাকালি"—উদ্ধৃত হইয়াছে সেই সংখ্যাতেই "মাভৈঃ" নামক আর একটি দেহতত্ত্ব বিষয়ক লেখা দেখিয়া আমরা খুশী হইলাম। কিন্তু এদিকে দেশে যে পরিমাণ বে-আইনি মদ সরবরাহ হইয়াছে বলিয়া শুনিতেছি তাহাতে কিছু সন্দেহ এবং আশঙ্কাও যে না হইয়াছে তাহা নহে। মাভৈঃ—

নেশায় বুঁদ হইলে খুসী মন। একেরই ভাবনা তখন
ঝলমল আর সব পাতালের অথৈ জলে।

> ঐ অমনই ঘটে—খেলার নেশায় শৈশবে, পাঠের তাড়নায় বাল্যে, যৌবনে তরুণীর বিদ্যুৎবাণে, প্রৌঢ়ত্বে বাৎসল্যের টানে, আর ধনের কামনায় ও মানের কান্নায় বার্দ্ধক্যে। নেশা—নিছক জবর নেশা।

বিন্দুমাত্র সন্দেহ করিয়াছি কি?

প্রবন্ধটির আর একদিকে—

> দাঁড়ারে মূর্খ দাঁড়া একটু—ততক্ষণ মধু পান করিয়া লই।……ঢলে গা, টলে পা, কণ্ঠের হয় আংশিক রোধ, বদখেয়ালী পিছু হাঁকে—'মাতাল'। কিন্তু মন যে করে মাতামাতি ধারণাধ্যানে নিদিধ্যাসনে, মন মাতাল বেতালের সাজে মাতাইয়া দেয় দুনিয়া ছুটে বে-পরোয়া………সত্যই খাইব কি? স্থূল বুদ্ধিতে খুব ভাল লাগে যাহা খাইতে চাই তাহাই, পরিচয় চুম্বনে। কিন্তু প্রকৃতই কি ভক্ষণ করিতে সাধ ব্রহ্মময়ীকে?……কিন্তু আছে বাধা ও বিঘ্ন ত্রুটি ও বিচ্যুতি অশেষ। প্রধান কথা—ঘরের মোহপাশ ছেদন।… কিসের প্রলোভন? রূপ-রসাদির ভোগস্পৃহা। কুঠারের আঘাত যেন পারি দিতে তাহাতে—ইত্যাদি।

ঐ একই কথা। ভোগস্পৃহায় কুঠারাঘাত করিতে বাসনা। কিন্তু প্যারালিসিস আসন্ন কি না, বয়স নব্বুইএর কোঠায় কি না, অথবা বে-আইনির কৃপা কি না, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

সমস্ত দেশটা আখড়ায় পরিণত হইতে চলিল! সকলেরই মুখে দেহতত্ত্ব। সাময়িক কাগজগুলি এই সব আখড়ার মুখপত্র। কিন্তু ইহারই মধ্যে একখানি নবপ্রকাশিত মাসিক বলিতেছেন—

প্রতিবৎসর মাতৃর্গার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ আনন্দে মেতে উঠে এবং তাঁর অন্তর্দ্ধানে হ'য়ে পড়ে বিষাদিত। মহিষ মর্দ্দিনি! আমাদের বাহুতে শক্তি দাও—মনে বল দাও, প্রাণে দিপ্তী দাও।

—

কিন্তু মাতার নিকট হইতে কিরূপ শক্তি লাভ করিলেন তাহার নমুনা দুই পৃষ্ঠা পরেই পাওয়া যাইবে—

"আমি যে কুমারী যার তার সামনে আবরণ উন্মোচন করলে যে আমার কৌমার্য্য ভঙ্গ হবে।"…"নারীত্ব—সতীত্ব?"—ও একটা বাহ্যিক আবরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। কথাগুলো একেবারে বাজে ধার করা সাদা চোখকে ধাঁধা লাগাবার একটা ভীষণ অস্ত্র! আচ্ছা…তোমাদের বাঁধা নিয়ম অনুসারে—দেহ দিয়ে স্পৃষ্ট হলেই নারীত্ব সতীত্ব সব জাহান্নমে যায়—নয়? কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে পারি কি যে মন দিয়ে অন্যের (পুরুষের) দেহ ও মন দুটোকেই মনে মনে স্পর্শ করলে কি তোমাদের 'সতীত্ব' 'নারীত্ব' বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না?

তরুণদিগের নিকট হইতে এই যুক্তি কয়েক বৎসর ধরিয়া শুনা যাইতেছে। কিন্তু তবুও অবস্থার কিছু উন্নতি হয় নাই। কিন্তু এই-জাতীয় লেখকদিগের পৃষ্ঠদেশে যাঁহারা মনে মনে গো-ত্বক নির্ম্মিত বস্তুবিশেষ ছিন্ন করিয়া থাকেন তাঁহারা সত্যসত্যই যদি হাতেকলমে উক্ত কার্য্যটি করিতেন তাহা হইলে কিছু পার্থক্য হইত বৈকি! এই লেখকদিগকে কি মনেমনের ও হাতেকলমের পার্থক্যটি আজ পর্য্যন্ত কেহ বুঝাইয়া দিতে পারিল না?

—

দেশের যুবকদের মধ্যে কল্পনাশক্তি একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে—যেটুকু অবশিষ্ট আছে তাহা অতি লজ্জাকর। তাহা দ্বারা তাহারা কিছুর অনুকরণও করিতে পারে না। ইহারা যখন সাহিত্য রচনা করিতে যায় তখন এই দীনতা ধরা পড়ে। বিদেশী শত শত সাময়িক-পত্র এবং তাহাতে শত শত গল্প রহিয়াছে, এইগুলি চুরি করিলেও

শিক্ষানবিশী চলিতে পারিত। চুরি করিতে করিতে হয়ত গল্পের টেকনিকও আয়ত্ত হওয়া অসম্ভব ছিল না—অন্তত যেটা সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়—অর্থাৎ ছাপার অক্ষরে নাম দেখা—সেটা ভদ্রভাবে চলিতে পারিত, কিন্তু এ কি? একটি গল্পে দেখিতেছি—

> শিপ্রার বেশের বর্ণনা করতে যাওয়া বৃথা। এর গায়ে হাতা-কাটা ব্লাউস সম্মুখের দিকের প্রায় সবটাই দেখা যায়। কাঁধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত; ভঙ্গীভরে হাত উঠাইলেই বগল দেখা যায়।

এই-জাতীয় বগল-দেখা তরুণেরাই শেষ পর্য্যন্ত ডুবিয়া বা বিষ খাইয়া মরে। ভালই করে!

—

কেহ যদি খবরের কাগজে এই মর্ম্মে বিজ্ঞাপন দেয় যে তাহার নিকট এক বোতল হুইস্কি আছে, কোনো উপযুক্ত লোক খাইতে চাহিলে তাহাকে বিনামূল্যে উহা দেওয়া যাইবে, এবং তাহার উত্তরে যদি মহাত্মা গান্ধী লেখেন যে আমি সম্প্রতি মদ ধরিয়াছি, আমাকে পাঠাইতে পার; তাহা হইলে ব্যাপারটি সংবাদহিসাবে কাহারো কাহারো নিকট কৌতুককর অথবা আশঙ্কাজনক বোধ হইতে পারে। কিন্তু যদি কেহ কন্যা বিবাহ দিবেন বলিয়া পাত্র-প্রার্থী হইয়া বিজ্ঞাপন দেন, এবং কোনো ভদ্রলোক যদি বিবাহেচ্ছু হইয়া আবেদন পাঠান (ভদ্রলোক আবেদন করিবেন আশা করিয়াই সম্ভবত বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়) তাহা হইলে তাহাও যে কৌতুককর সংবাদ হিসাবে কোনো দলবিশেষের দন্তবিকাশের সাহায্য করিতে পারে তাহা এত দিনে বুঝিতে পারিলাম।

—

সম্প্রতি এইরূপ একটি ঘটনা ঘটিয়াছে। এক গ্র্যাজুয়েট-কন্যার জন্য কোনো প্রভিনশিয়াল এক্সিকিউটিভ অফিসার কায়স্থ-পাত্র চাহিয়া বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে জনৈক শিক্ষিত ভদ্রলোক (বয়স ৪২ : পূর্ব্বে বিবাহ হয় নাই : বিজ্ঞাপনে মেয়ের বয়সের উল্লেখ নাই) আবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু যেহেতু উক্ত ভদ্রলোক

গান্ধীজির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত এবং অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির বেতনভোগী সেক্রেটারী, সেইহেতু ঐ আবেদনপত্রখানা বিজ্ঞাপনদাতার হস্তচ্যুত হইয়া একেবারে সাপ্তাহিক কাগজের আড্ডায় আসিয়া পড়িল, তাহা হইতে ব্লক প্রস্তুত হইল (পাছে কেহ সন্দেহ করে যে সংবাদটি বানানো) এবং সেই চিঠির ব্লক ছাপাইয়া গদ্যে পদ্যে রসিকতার ফোয়ারা ছুটিল।

—

মনে হয় যেন এই কাগজ বিজ্ঞাপনদাতার অত্যন্ত পরিচিত। সেই সুযোগ গ্রহণ করিয়াই ইহারা একবার আবেদনকারীকে শিক্ষা-দিবেন বলিয়া কোমর বাঁধিয়াছেন। ইহাদের কেন যেন মনে হইয়াছে (বাংলা দেশের মেয়েদের ভাগ্য!) বিজ্ঞাপিত মেয়েটি, এক বোতল হুইস্কি; এবং আবেদনকারী, মহাত্মা গান্ধী। শুধু তাহাই নয়, আবেদনকারীর আরো অপরাধ প্রমাণিত হইয়াছে। অর্থাৎ তিনি "৩২ বৎসর কৌমার্য্যব্রত পালন" করিয়াছেন। ইহা বাঙালী গ্র্যাজুয়েট-মেয়েকে বিবাহ করিবার পক্ষে কম অপরাধ নহে। কন্যার প্রতি কন্যার অভিভাবকের কি অসীম শ্রদ্ধা!

—

কতকগুলি অর্দ্ধশিক্ষিতের মুখে হাসির লহর তুলিয়া কাগজ পপুলার করিবার জন্য যে সমস্ত শিক্ষিত বর্ব্বর এই জঘন্য হীনতার আশ্রয় লইতে পারে তাহাদেব দ্বারাই যুগে যুগে দেশের অকল্যাণ হইয়া আসিতেছে। কিন্তু আবেদনকারীর চিঠিখানার ফোটো ছাপাইয়া রসিকগণ তাঁহার উপকারই করিয়াছেন। এই চিঠিখানা না দেখিলে সমালোচকদের কথা অনেকে বিশ্বাস করিতেন। ভদ্রভাষায় লিখিত, বিজ্ঞাপনদ্বারা আহূত কোনো ভদ্রলোকের চিঠি লইয়া যে রসিকতা করা যায় না তাহার প্রমাণ ঐ চিঠি খানি। কিন্তু নোংরামিরও একটা সীমা থাকা উচিত।

—

জগন্নাথের মন্দির ও আগ্রার তাজমহল ইত্যাদি দেখিয়া জনৈক দর্শক খুব একটা আশ্চর্য্য কৌশলে তাঁহার দর্শনাভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

> ভুবনেশ্বরের অথবা জগন্নাথের মন্দির শক্তির প্রাচুর্য্য আর সৌন্দর্য্যের গাম্ভীর্য্য দিয়ে আমাদের চিত্তকে অভিভূত করে, যেন নায়াগ্রার জলপ্রপাত ; তাজমহল অথবা মতি মসজিদ আমাদের চিত্তকে মাধুর্য্য দিয়ে মুগ্ধ করে—রূপের প্রভায় বিস্মিত করে—যেন বনের মধ্যে প্রশান্ত নদীর অপূর্ব্ব কান্তি। ভুবনেশ্বরের মন্দিরের সম্মুখে যখন দাঁড়িয়েছি তখন মনে হয়েছে রামায়ণের কথা, মহাভারতের কথা ; তাজমহলের সম্মুখে যখন দাঁড়িয়েছি তখন মনে হয়েছে চণ্ডীদাসের কবিতার কথা ; জগন্নাথের মন্দিরের সম্মুখে যখন দাঁড়িয়েছি তখন মনে হয়েছে সেক্সপীয়রের নাটক পড়ছি ; মতি মসজিদের সামনে গিয়ে মনে হয়েছে—কীট্‌সের গীতি কবিতা পড়ছি।

কিন্তু যাহারা কেবল উপমেয়গুলি অর্থাৎ ভুবনেশ্বর বা জগন্নাথের মন্দির এবং তাজমহল ইত্যাদি দেখিয়াছে অথচ নায়াগ্রা প্রপাত দেখে নাই, রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডীদাসের কবিতা, সেক্সপীয়ারের নাটক, কীট্‌সের কাব্য পাঠ করে নাই, তাহাদিগকে অনায়াসে এই কৌশল দ্বারা ঐ ঐ বস্তুবিষয়ে ধারণা জন্মাইয়া দেওয়া যায়।

—

তখন ব্যাপারটি হইবে এইরূপ :—নায়াগ্রা প্রপাত দেখিয়া মনে হইল জগন্নাথের মন্দির দেখিতেছি ; বনের মধ্যে প্রশান্ত নদীর অপূর্ব্ব কান্তি দেখিয়া মনে হইল যেন মতি মসজিদ দেখিতেছি ; মহাভারত পড়িয়া মনে হইল যেন ভুবনেশ্বরের মন্দির দেখিতেছি, চণ্ডীদাসের কাব্য পড়িয়া মনে হইল তাজমহল দেখিতেছি, সেক্সপীয়ারের নাটক পড়িয়া মনে হইল জগন্নাথের মন্দির দেখিতেছি ইত্যাদি।

—

কিন্তু লেখক অন্যত্র আমাদিগকে ভাবাইয়া তুলিয়াছেন—

> ভুবনেশ্বরের অথবা জগন্নাথের মন্দিরের সৌন্দর্য্যকে ঠিক ঠিক উপলব্ধি করতে হ'লে হিন্দুর চোখ দিয়ে সবটাকে দেখতে হবে। বিদেশী কালচারের ছাঁচে ঢালা মন নিয়ে

> হিন্দু মন্দিরের আর্টকে আমরা ঠিকমত উপলব্ধি করতে পারবো না। যুক্তির কষ্টিপাথরে হিন্দু আর্টের মূল্য যাচাই করতে গেলে ভুল হবে...দুর্গাপূজার আরতির সময় যিনি দেবমন্দিরে সকলের মধ্যে আসন নিয়েছেন—তিনি জানেন, সমস্ত হিন্দুজাতির মন একসুরে বাঁধা। সেই সুর হচ্ছে ভক্তি আর বিশ্বাসের সুর—যা আর সকল সুরকে ডুবিয়ে দিয়েছে।

ভুবনেশ্বরের মন্দির যদি নায়াগ্রা প্রপাতের অনুরূপ হয় তাহা হইলে সেই মন্দিরকে শুদ্ধমাত্র হিন্দুর চোখ দিয়া দেখিতে হইবে কেন? ভক্তি ও বিশ্বাসের চোখে না দেখিলে যাহার সৌন্দর্য্য দেখা যায় না তাহার সৌন্দর্য্য নায়াগ্রার সৌন্দর্য্যের সঙ্গে কি করিয়া মিলিল? বিদেশী কালচারের ছাঁচে-ঢালা মন অন্তত লেখকের যে নহে একথা লেখক নিজেই প্রমাণ করিয়াছেন। কেননা জগন্নাথের মন্দিরকে সেক্স-পীয়ারের নাটক মনে হইয়াছে। বিশুদ্ধ ভক্তি ও হিন্দু দৃষ্টিতে ইহা সম্ভব হইয়াছে। আর্ট বুঝাইবার চমৎকার পদ্ধতি! জয় মা কালী!

—

ইটালি-আবিসীনিয়ার যুদ্ধ উপলক্ষে বাংলা সাময়িক পত্রে একটি নূতন ধরণের যুদ্ধ-সহিত্য গড়িয়া উঠিতেছে। ইটালির উপর রাগ এবং আবিসীনিয়ার প্রতি অনুরাগবশত বাঙালী লেখকগণ কেহ বিচারক, কেহ ভবিষ্যদ্বক্তা, কেহ বা বিশ্লেষক সাজিয়া বসিয়াছেন। ইহাতে আপত্তির কিছু নাই, কিন্তু তাঁহারা সত্যসত্যই কি বলিতে চাহেন, তাহা আমাদের জানা দরকার। যুদ্ধের সংবাদে সহজ ভাষার বর্ণনা বাংলা ভাষায় পাওয়া দুর্ঘট হইয়া পড়িয়াছে। কেহ লিখিতেছেন, নটরাজের লীলা; কেহ লিখিতেছেন, নাচো কালী নাচো; আবার কেহ লিখিতেছেন, তাণ্ডব নৃত্য। ইংরেজি কোনো কাগজে Devil Dance বা Divine Manifestation-জাতীয় কোনো হেডলাইন পড়িয়াছি বলিয়া মনে পড়েনা। যুদ্ধকে Frolic বা Sportও কেহ বলে নাই, কিন্তু বাংলাদেশে সহজ কথায় কেহ কিছু বলিতেও পারেনা, বলিলেও তাহা কাহারো মনে ধরে না।

—

যুদ্ধের সংবাদ লেখা বা এ সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য করা অত্যন্ত কঠিন। বিশেষত, দুই একখানি কাগজের সংবাদের উপর মাত্র নির্ভর করিয়া যুদ্ধ ব্যাপারে মন্তব্য প্রকাশ করিতে গেলে তাহার প্রমাদ ঘটিবার সম্ভাবনাই বেশি। সুতরাং বক্তব্যটুকু সাদা ভাষায়, সরল ভঙ্গিতে অত্যন্ত সংযমের সহিত বলা উচিত। ইহা করিতে না পারিলে, চুপ করিয়া থাকাই শোভনীয়। কিন্তু বাঙালী লেখক চুপ করিয়া থাকিবে কেন? তাহার প্রাণের মধ্যে মহাকালী নৃত্য করিতেছে—সে কি শুধু ভুল হইবার ভয়ে থামিয়া থাকিবে? তাহার লেখা পড়িয়া সাধারণ পাঠক ভুল শিখিবে, সাধারণ বুদ্ধিদ্বারা কোনো জিনিস যে বুঝা যাইতে পারে এ ধারণা তাহার মন হইতে ক্রমশঃ লোপ পাইবে, কিন্তু তবুও লেখা থামান যাইবে না। নটরাজ যে তাণ্ডব সুরু করিয়াছেন, মহাকালী যে নৃত্য করিতেছেন, দানবীয় লীলা যে অনুষ্ঠিত হইতেছে—চুপ করিয়া কি থাকা যায়?

—

চট্ করিয়া বাঙালী লেখক লিখিল—

> হাবসীরা আদোয়া হারাইয়াছে, আকসাম হারাইয়াছে, যেরূপ মনে হইতেছে রাজধানী আদিস আবাবাও সম্ভবত সত্বরই ইটালীর দ্বারা অধিকৃত হইবে।

অর্থাৎ <u>এই লেখকের যেরূপ মনে হইতেছে</u> তাহাতে! অথচ মজা এই, যে-সকল ইংরেজি সংবাদ পত্র পড়িয়া ইহা লেখা—তথায় এরূপ দায়িত্বহীন উন্মাদের প্রলাপ কেহ কখনো উচ্চারণ করে নাই।

—

একদিন-না-একদিন ইংরেজ রাজ্যের পতন হইবে এবং ভারত স্বাধীন হইবে, এই সান্ত্বনাবাক্য ক্রমাগত প্রতিবেশীকে শুনাইয়া শুনাইয়া বাঙালী ভবিষ্যৎ সফলতা-সম্বন্ধে (যত শতাব্দী পরেই হউক) এরূপ অপ্টিমিষ্ট হইয়াছে যে এই সান্ত্বনাবাক্য সে যে-কোনো উপলক্ষেই উচ্চারণ করিতেছে। যথা—

> আজ হউক, কিংবা কিছুদিন বিলম্বে হউক আদ্দিস আবাবারও পতন হইবে, ইহা অসম্ভব নহে—[নিজের

মতবাদে কি অসীম বিশ্বাস!] কিন্তু হাবসীরা যদি স্বাধীনতার মর্য্যাদা রক্ষার জন্য মরণকে বরণ করিতে ভীত না হয়, তাহা হইলে পার্থিব এই ক্ষণিকের পরাজয় তাহাদের আদর্শকে পরিম্লান করিতে সক্ষম হইবে না—সে আদর্শ তাহাদের মাতৃভূমিকে মহত্তর মর্য্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিবে।

পরস্বাপহারীর মদগর্ব্ব কিংবা মিথ্যাময়ী বাণী স্বদেশ-প্রেমিকের শোণিত নিষেক্‌কে ব্যর্থ করিতে সক্ষম হইবে না। [আমরা ভৌতিক সীমা বহুক্ষণ ছাড়িয়া আসিয়াছি—শ. চি. স] ত্যাগীর একবিন্দু রুধির হইতে শত শত স্বার্থত্যাগীবীরের উদ্ভব হইবে [রূপকথার রাজ্যে প্রবেশ করিলাম—শ. চি. স] সভ্য রাষ্ট্রনীতিকদের সমস্ত বাকবিভূতিকে অভিভূত করিয়া তাহাদের প্রচণ্ড শৌর্য্য প্রাচীর ললাটতট প্রদীপ্ত করিয়া তুলিবে। আদোয়ার আত্মদান ব্যর্থ হইবে না।

লেখক ইহকালের সমস্ত নিকাষ করিয়া আবিসীনিয়াকে একেবারে পরলোকে লইয়া হাজির করাইয়াছেন। তদুপরি আধ্যাত্মিক Good wishes!—নাচো কালী নাচো।

চিত্রশিল্প আমাদের দেশে যে কত উন্নত হইয়াছে তাহা দেখিতে হইলে কার্ত্তিকের ভারতবর্ষের প্রথম চিত্র গণেশজননী দেখা আবশ্যক। শিল্পের নামে এরূপ জঘন্য রুচি এবং ক্লীবত্বের পরিচয় ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশেও পাওয়া যায় না। যিনি ড্রইং জানেন না তিনি আধ্যাত্মিক শিল্পী। যিনি অল্প ড্রইং শিখিয়াছেন তিনি কাঠের মিস্ত্রী না হইয়া তুলি লইয়া বসিয়াছেন। শিল্পী হইতে হইলে কিঞ্চিৎ সাধনা আবশ্যক। দাড়ি-কামানো পেশোয়ারীর মাথার সহিত চিৎপুরের কোনো বারবনিতার অর্দ্ধ উলঙ্গ দেহ সংযুক্ত করিয়া দিলেই যদি গণেশজননী হইত তাহা হইলে শ্রীযুক্ত পূর্ণ চক্রবর্ত্তীও শিল্পী হইতেন।

শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর 'মাটির দেবতা'ও শেষ পর্য্যন্ত হেঁয়ালী হইয়া উঠিল! ইহা ভাবার অধঃপতনে ঘটিল না সৈকতের

অধঃপতনে ঘটিল তাহা আমরা কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। ঘটনাটি এই—

> অধঃপতন কথাটা যত সোজা বাস্তবিক কাজে তা না হলে মানুষ অধঃপতনের পথে নামলে আর তাকে টেনে তোলা মুস্কিল। মেরুদণ্ড যার নেই, তাকে যতই সোজা কর সে গুটিয়ে যায়। সৈকতেরও সেই অবস্থা।

সৈকতের পক্ষে দাঁড়াইয়া থাকা ভাল কি গুটাইয়া যাওয়া ভাল তাহাই কে বলিয়া দিবে?

—

কার্ত্তিকের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় অনেক "উদীয়মান চিত্র শিল্পীর" প্রচারের ভার গ্রহণ করিয়া কথা-প্রসঙ্গে বলিতেছেন—

> আধুনিকতার অতি প্রগতির দাপে, অনেক শিক্ষানবীশ শিল্পীরা মনে করেন, যে, সাধারণ ভাবে বাঙালী হিন্দুরা প্রাচীন পৌরাণিক ভাবধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পাশ্চাত্য ভাবের প্রভাবে ভারতের প্রাচীন পুরাণে বর্ণিত কৃষ্টির জগতে আমরা (?) সম্পূর্ণ ভাবে বিশ্বাস হারিয়েছি।

ইহা হয়ত 'পৌরাণিক' ভাবধারা সম্পর্কে দুঃখের, কিন্তু 'পুরাতন' শিল্প-সমালোচকের উপর লোকে যদি এই ভাবে বিশ্বাস হারাইত তাহা হইলে হয়ত তাহা অনুতাপযোগ্য হইত না। (ভাষার জন্যও বটে।)

—

এরূপ অনুমান করিবার কারণ উক্ত প্রবন্ধেই নিহিত রহিয়াছে। অর্দ্ধেন্দ্রবাবু বলিতেছেন—

> নন্দলালের পর পৌরাণিক চিত্রে নূতন ভাব ও রসের প্রবর্ত্তনা করা বোধ হয় অসাধ্য সাধন। তথাপি, আমার মনে হয় রামেশ্বরের প্রচেষ্টার মধ্যে অনেকটা আশার বীজ নিহিত আছে। তাহার অন্তরের মধ্যে পৌরাণিক বস্তু-সাধনার উপযোগী একটা স্বাভাবিক প্রেরণা আছে কি না তা অনুসন্ধান করবার সুযোগ আমার ঘটে নি।

শিল্পসমালোচনা ছাড়িয়া "উদীয়মান শিল্পী"বিষয়ে ব্যক্তিগত টেষ্টিমোনিয়াল দেওয়া অস্বাভাবিক নহে, কিন্তু প্রবাসী-পত্রে এরূপ বস্তু ছাপা হয় ইহাই অস্বাভাবিক। (কিংবা স্বাভাবিক।)

—

বহু জিনিসে আমরা আশার বীজ নিহিত দেখি, উপযুক্ত পরিবেশও দেখি কিন্তু পরে অঙ্কুর দেখি না। সুতরাং বীজ দেখিয়া উল্লসিত হই না। শ্রীযুত রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায় হয়ত ভবিষ্যতে খ্যাতনামা শিল্পী হইবেন, ইহাতে আমাদের বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই, কিন্তু শিল্পীর স্বাভাবিক প্রেরণা আছে কি না শিল্পকার্য্য হইতে যিনি তাহা ধরিতে পারেন নাই, আছে কি না, তাহা অনুসন্ধান করিবার সুযোগও যাঁহার হয় নাই, এবং যিনি শেষে এমন কথাও বলিয়াছেন—

> নবীন শিল্পী এমন একটু শক্তির পরিচয় দিয়েছেন যাতে ক'রে মনে হয়, যে তাঁর নিজস্ব সাধনা তাঁকে জয়যাত্রার পথে চালিত করেছে।...অনেক সময় মনে হয় সিদ্ধির প্রচেষ্টা সিদ্ধিলাভ হ'তে বড়।

তাঁহাকে কি বলিব? অর্থাৎ ঘুরাইয়া ফিরাইয়া লেখক ইহাই বলিতে চাহেন যে ভবিষ্যতে কি হইবে তাহা মা গঙ্গা জানেন; বর্ত্তমানে আশার বীজ দেখা যায় কিন্তু শিল্পীর স্বাভাবিক প্রেরণা আছে কি না তাহা অনুসন্ধান করিয়া সময় নষ্ট করি নাই; তবে সিদ্ধিলাভ সন্দেহজনক হইলেও সিদ্ধির চেষ্টাই আসল।

—

কিন্তু অর্দ্ধেন্দ্রবাবু এরূপ রসিকতা করিলেন কেন? (প্রবাসীতে ছাপা হইল কেন সে প্রশ্ন আর করিব না।) ইহার কারণ আছে, লেখক নিজেই তাহা বলিয়াছেন—

> যে পরিবারে এই যুবক-শিল্পী জন্ম নিয়েছেন সেই

পরিবারে আতিথ্য গ্রহণ করবার সৌভাগ্য আমার ঘটেছিল।

বুঝিয়াছি, আর বলিতে হইবে না।

—

তাহার পূর্ব্বাচল যে বাংলাদেশকে জীরাণ্ডে দীক্ষিত করিবে বলিয়া মনস্থ করিয়াছে তাহা নিতান্ত অসম্ভব নহে। প্রমাণ—

তার নাচুনী ছন্দের হাঁটন আর চোখখিচুনী চাওন বেশ চমক লাগায়।

চোখ খিঁচুনী চাওন! অদ্ভুত। এখন ওষ্ঠ খিঁচুনী হাসি, কণ্ঠ খিঁচুনী গান এবং দন্ত খিঁচুনী কথার অপেক্ষায় রহিলাম।

———

বর্ত্তমান সংখ্যার 'বিজ্ঞান সার সংগ্রহ' নামক লেখার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত উত্তর আগামী বারে প্রকাশিত হইবে।

——

প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন

গত বৎসর কলিকাতায় প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের দ্বাদশ অধিবেশনে স্থির হইয়াছিল যে ১৩৪২ সালের ত্রয়োদশ অধিবেশন বড়দিনের ছুটির সময় কাশীধামে অনুষ্ঠিত হইবে। কিন্তু কয়েকটী অপ্রত্যাশিত কারণ বশত এ বৎসরের অধিবেশন সেখানে সম্ভবপর হইল না।

এক্ষণে স্থির হইয়াছে যে উক্ত অধিবেশন আগামী বড়দিনের ছুটির সময় নিউদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হইবে।

শ্রীপরিমল গোস্বামী এম-এ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ২৫।২, মোহনবাগান রো, শনিরঞ্জন প্রেস হইতে শ্রীপ্রবোধ নান কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শনিবারের চিঠি

৮ম বর্ষ] পৌষ, ১৩৪২ [৩য় সংখ্যা

লক্ষ্য ও উপায়

প্রায়ই দেখা যায়, মানুষ কোনো একটা লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য যে উপায় অবলম্বন করে, কিছুকাল পরে সেই উপায়টিই প্রধান লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায় এবং আদি লক্ষ্যটি দৃষ্টিপথ হইতে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যায় তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। কিন্তু যাহাতে মানুষ এরূপ ভ্রম না করে, যাহাতে সে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়, যাহাতে সে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া দিশাহারা হইয়া না পড়ে, সে-জন্য চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই মানুষকে সতর্ক করিয়া দিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ মানুষের পক্ষে লক্ষ্য বিস্মৃত হওয়া এবং লক্ষ্যচ্যুত হওয়া এতই স্বাভাবিক, এবং লক্ষ্যের উপায়টিও সর্ব্বদা লক্ষ্যে রূপান্তরিত হইবার পক্ষে এতই উপযোগী যে অনেক সময় ইহারই প্রতিবিধানকল্পে এক-একটি মিথ্যা লক্ষ্য কল্পনা করিয়া লইতে হয়। সুখে থাকিবার জন্য, বাঁচিয়া থাকিবার

জন্য, আমরা অর্থ উপার্জ্জন করি। সুখে থাকা অথবা সুখে বাঁচিয়া থাকাটা লক্ষ্য, অর্থটি উপায়। এখানে লক্ষ্যটি মিথ্যা নহে। এমন নহে যে ইহা দ্বারা বাঁচিয়া-থাকারূপ একটা কাল্পনিক লক্ষ্য সৃষ্টি করিয়া যাহাতে আমরা অর্থ-উপার্জ্জনে মনোযোগ রাখিতে পারি সেই ফন্দী করা হইয়াছে। কারণ, এমন দেখা গিয়াছে যে অর্থ-উপার্জ্জন না করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার সুবিধা থাকিলে মানুষ অর্থ-উপার্জ্জন করিতে চাহে না।

কিন্তু ফুটবলের মরশুমে আমরা ইহার বিপরীত জিনিসটি লক্ষ্য করি। গোলদেওয়াটা খেলার প্রকৃত লক্ষ্য কখনই হইতে পারে না, খেলার দ্বারা স্বাস্থ্যরক্ষাই লক্ষ্য। কিন্তু গোলদেওয়া-রূপ একটি মিথ্যা লক্ষ্য খাড়া না করিলে কেহই ফুটবল খেলাদ্বারা স্বাস্থ্যচর্চ্চায় মনোযোগী হয় না। এখানে স্বাস্থ্যচর্চ্চাই লক্ষ্য, খেলা এবং গোলদেওয়াটা অর্থাৎ খেলায় জয়লাভ করাটা তাহার একটি উপায়। উপায়টি অত্যন্ত লোভনীয় এবং সেইজন্য ইহাকে লক্ষ্যরূপে ধরিয়া লওয়া সহজ হইয়াছে।

অর্থ-উপার্জ্জনের খেলা খেলিতে যদি এইরূপ বাঁচিয়া থাকার বিদ্যাটাও চর্চ্চা করা যাইত তবে অর্থ আমাদের লক্ষ্য হইলে ক্ষতি ছিল না, কিন্তু অর্থ বাঁচিয়া থাকিবার উপায় বলিয়াই মানুষের অনিচ্ছাসত্ত্বেও অর্থ লক্ষ্যে রূপান্তরিত হইয়া যায়। ইহার কোনো প্রতিকার নাই। সকল ক্ষেত্রেই এই রূপান্তর—উপায়ের লক্ষ্যে রূপান্তর—ঘটিতেছে। তাই আমাদের মনে হয়, এই রূপান্তর-ঘটার ক্রিয়াটি বিজ্ঞানসম্মত। ইহার জন্য মানুষকে সতর্ক করিয়া লাভ নাই। উপায় একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা পর্য্যন্ত উপায় থাকে, তাহার পরেই লক্ষ্যে পরিণত হয়। বৈজ্ঞানিকগণ হয়ত এই সত্যটি উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

ইথার-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য যেমন একটা বিশেষ মাত্রা পর্য্যন্ত আমাদের চোখে বর্ণ বলিয়া প্রতিভাত হয় এবং সেই মাত্রা ছাড়াইয়া গেলেই অবর্ণনীয় হইয়া উঠে, উপায়ও সেইরূপ। উপায়েরও ঠিক তেমনি একটা মাত্রা আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাঁচিবার উপায় অর্থ। জীবনের উপর যতদিন লোভ থাকে ততদিন বাঁচিয়া থাকাটাই যে লক্ষ্য এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি একবার প্রাণের মায়া ত্যাগ করিতে পারি, তাহা হইলে কোনোরূপ ব্যতিক্রম না হইয়া টাকাটাই আমার লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইবে। অন্য কথায়, টাকাটাই লক্ষ্য হইলে বাঁচাটা সেই টাকা-উপার্জ্জনের উপায় হইতে বাধ্য।

যাঁহারা বেতনের নির্দ্দিষ্ট টাকাকে অগ্রাহ্য করিয়া অনির্দ্দিষ্ট-পরিমাণ টাকা উপার্জ্জনের পথ আবিষ্কার করিয়াছেন, তাঁহারা যে টাকা-উপার্জ্জনকেই লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এ কথা বলাই বাহুল্য। দালালি করিয়া বা রেস খেলিয়া যাঁহারা একবার অতি-উপার্জ্জনের স্বাদ পাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে পার্থিব কোন শক্তিই আর উক্ত পথ হইতে ফিরাইয়া আনিতে পারিবে না। বহু লোককে দেখিয়াছি, যাঁহারা টাকার মায়ায় জীবনের মায়া বিসর্জ্জন দিয়াছেন।

বহুদিন পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, স্বরাজলাভ আমাদের জাতীয় জীবনের একটা উদ্দেশ্য। স্বরাজরূপ লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য বাঙালী নানারূপ উপায়ও অবলম্বন করিয়াছিল, কিন্তু আজ দেখিতেছি, উপায়গুলিই লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফলে স্বরাজও দৃষ্টিপথ হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে। ইহার জন্য যতগুলি উপায় উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশই উপযুক্ততার পরীক্ষায় বাতিল হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তথাপি সেই বাতিল-হওয়া উপায়গুলিকে আমরা আর কোনক্রমেই ত্যাগ করিতে পারিতেছি না। কি উপায়ে দ্রুত স্বরাজ লাভ হয় ইহা লইয়া

বঙ্গদেশে একবার দুই দলে বিবাদ হইয়াছিল, এখন সেই বিবাদটিই স্থায়ী লক্ষ্যে রূপান্তরিত হইয়াছে। এবং যদিও লোকে এখন বুঝিয়াছে, চরকায় স্বরাজ হইবে না (কথা ছিল, চরকায় স্বরাজ হইবে) কিন্তু স্বরাজ হয় নাই, তবুও চরকাটি রহিয়া গিয়াছে।

সাহিত্য-সৃষ্টি, মত-প্রচার, সমাজ-সেবা, বা অন্য একটা-কোনো উদ্দেশ্য লইয়া এককালে সাময়িক পত্রাদি বাহির হইত। ইহারা ছিল উপায়স্বরূপ, লক্ষ্য ছিল পৃথক। কিন্তু বহুদিন হইল লোকে লক্ষ্যটি ভুলিয়া গিয়াছে, সেইজন্য এদেশে কেবল কাগজই বাহির হইতেছে, এবং নিত্য নূতন কাগজ বাহির করাই বাঙালীর একমাত্র লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কাহারই কোন মত নাই, কেন কাগজ বাহির করিতেছে তাহাও অনেকে জানে না, অথচ দিনের পর দিন কাগজ বাহির করিয়া চলিয়াছে।

অন্যান্য জাতির মত বাঙালীদের মধ্যেও, যাহারা চাকরি করে, তাহারা বৎসরে কতকগুলি ছুটি পায়। কার্য্যস্থান হইতে বাহিরে গেলে অনেক সময় ছুটির আনন্দ উপভোগ করিবার বেশি সুবিধা হয়। এখানে আনন্দটাই লক্ষ্য, বাহিরে যাওয়াটা তাহার উপায়। কিন্তু এই উপায়টিও লক্ষ্যে রূপান্তরিত হইয়াছে। এখন ছুটি হইলেই বাঙালী ট্রেনে চাপিয়া বসে। গাড়ীতে ভিড়ের পর ভিড় জমিতে থাকে, শেষে দাঁড়াইবারও জায়গা পাওয়া যায় না। লটবহর, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা প্রভৃতি লইয়া চরমতম দুঃখ ভোগ করিতে করিতে বাঙালী বাহিরে যায়। মান-সম্ভ্রম বিসর্জ্জন দিয়া, পশুর মত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া, অনাহারে, অনিদ্রায়, জামা-কাপড় ছিঁড়িয়া, টাকাকড়ি হারাইয়া, বাঙালী বাহিরে যায়! আমাদের জীবনের যেটি চরম লক্ষ্য, অর্থাৎ ধর্ম্ম, তাহাও আমরা উপার্জ্জন করিতে বিদেশে যাই। সমগ্র বাঙালীর জাতীয় জীবনে ইহার চেয়ে লজ্জাকর আর কিছুই নাই। কিন্তু অনিবার্য্যকে কে নিবারণ করিবে?

শিল্পে, সাহিত্যে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে, ব্যবসায়, বাণিজ্যে, শিক্ষায়, দীক্ষায়, সমাজে, রাষ্ট্রে, উৎসবে, ব্যসনে, সর্ব্বত্র আমরা লক্ষ্যটাকে দূর করিয়া দিয়াছি। এবং দূর করিয়া দিয়া তাহার স্থানে উপায়গুলিকে লক্ষ্য হিসাবে বসাইয়াছি। লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলে মৃত্যু অনিবার্য্য জানিয়াও আমরা নিশ্চিন্ত আরামেই ত দিন কাটাইতেছি! কোনো লক্ষ্যই যখন আমাদের নাই, তখন উপায়গুলিকেই লক্ষ্য মনে করিয়া যদি দুইটি দিনও আরামে কাটাইতে পারি তবে আর গোলমাল করিয়া লাভ কি? মৃত্যু যদি আসে তবে তাহাকে রোধ করিবে কে? মৃত্যু কি কাহাকেও খাতির করে?

এক কলম

ঘোড়ার আগে গাড়ী

ইংরেজী প্রবাদে, ঘোড়ার আগে গাড়ী জুড়িবার অপবাদ আছে। কিন্তু ঘোড়ার আগে গাড়ীই আদর্শ, সব দর্শনশাস্ত্রেই বলে। বই-এর আগে ভূমিকা। ভূমিকা লেখা হয় সকলের শেষে, বসে সকলের আগে। বইয়ে যাহা ভাবিত, ভূমিকায় তাহার আভাস। বইয়ে প্রমাণলব্ধ তথ্য, আর ভূমিকায় অনুমানলব্ধ সত্য। তথ্যের আগে সত্য; সত্য আসে পরে কিন্তু বসে আগে।

রামের সত্যের নাম রামায়ণ; তাই লোকের কল্পনা, রামায়ণ-রচনার কাল-নির্দ্দেশ করিয়াছে রামের জন্মের আগে। মানুষের জন্মের পরে

দেওয়া হয় নামটা, মৃত্যুর পরেও সেটা থাকিয়া যায়, কারণ নামটাই সত্য। এই নামরূপ শব্দ; এই শব্দসত্তা বস্তুর চেয়ে বড়, তাই সকল সৃষ্টির প্রারম্ভে ছিল শব্দ, যার অপর নাম ব্রহ্ম।

বিজ্ঞাপন মারিও

প্রাচীরের গায়ে প্রায়ই দেখি, মোটা কালির অক্ষরে ভ্রূকুটি করিয়া আছে 'বিজ্ঞাপন মারিও না।' ইচ্ছা করে, আমার বাড়ীর দেয়ালে (বর্ত্তমানে বাড়ী নাই) লিখিয়া রাখি, 'বিজ্ঞাপন মারিও।' ইহার প্রধান অন্তরায় একখানি বাড়ী তোলা; তাই মনে হয়, রাতারাতি শাদা চূণের পোঁচে 'না'-অক্ষরগুলির নেতি-জন্মের ব্যর্থতা ঘুচাইয়া দিই।

বিজ্ঞাপন মারিও; কেবল একটি অনুরোধ, বিজ্ঞাপনের কাগজগুলি সোজাভাবে মারিও না। যে ভাবেই দেখ, ইহাতে বিজ্ঞাপনের সার্থকতা। যে-লেখা দেখামাত্র পড়া যায়, তাহা কেহ পড়ে না। মিশরের চিত্রাক্ষর-বর্ণমালাকে তখনকার লোকে নিশ্চয়ই দেখিয়াও দেখিত না; আর আমাদের তাহা দেখিয়াও আশা মেটে না; ইহার প্রধান কারণ, আমরা সে ভাষা ভুলিয়া গিয়াছি; সত্য কথা বলিতে কি, ওই অক্ষরগুলি আজ আর শুধু অক্ষর নয়, চিত্রাক্ষর। এবং ইহাও নিশ্চয় জানি, আমাদের এই বর্ণ-বৈচিত্র্যহীন বর্ণমালার প্রতি, পাঁচহাজার-বছর পরের মানুষ বিস্মিত ঔৎসুক্যের সঙ্গে তাকাইয়া কত-কি প্রাগৈতিহাসিক জন্তু-জানোয়ারের ছবি দেখিতে থাকিবে। কাজেই বিজ্ঞাপন যদি উল্টা করিয়া মারা হয়, তবে উৎসুক পথিক-পাঠককে 'সরিষার তৈলে'র তৈল পর্য্যন্ত পৌছাইতেই হইবে, কারণ তখন আরম্ভ হইবে তৈল দিয়া।

আর যদি প্রয়োজনের কথা ছাড়িয়া শিল্প-সৌন্দর্য্যের কথা ওঠে, তবে ইহার চেয়ে বড় শিল্প আর কি আছে! 'সরিষার তৈলে'র রঙীন বিজ্ঞাপন উল্টা করিয়া মারিলে তাহাতে সরিষার ক্ষেতের শোভা ধরিবে, অনবধান পাঠকের কাছে অন্ততঃ সরিষার ফুলের, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এ ভাষা বিস্মৃত হইতে অনেক দেরী; কিন্তু যাহারা এ ভাষা শেখে নাই তাহাদের প্রাচীরের বিজ্ঞাপনের চেয়ে বড় বিস্ময় কিছু আছে কি? তুমি বিদ্বান্, যেখানে সালসার বিজ্ঞাপন পড়িয়া নিরর্থক ঔষধ পান করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিতেছ, সেখানে ওই সৌভাগ্যবান মূর্খ বিনাপয়সায় কেমন সিংহে-মানুষে সার্কাসের খেলা দেখিয়া লইতেছে। হায় হতভাগ্য পণ্ডিত! ওই সহস্রবিদ্যুৎ-দীপের জ্বলা ও নেভাতে কেবল দেখিতেছ টাইগার ব্র্যাণ্ড কাগজ কিম্বা মদের বিজ্ঞাপন; আর যে পড়িতে জানে না, সে দেখিতেছে সহস্রচক্ষু-ইন্দ্র শচীর সহিত চোক ঠারিয়া না জানি কি দৈববাণী শুনাইতেছেন। এ সব যদি দেখিতে চাও, এখনো আশা আছে। বিজ্ঞাপন মারিও—কেবল তাহা উল্টা করিয়া।

ইচ্ছা আছে আমার বাড়ীটায় (এজাতীয় বাড়ী ইংলণ্ডে করা সহজ, সেখানে ইহার নাম আকাশ-প্রসাদ) দেয়ালে পয়সা দিয়া বিজ্ঞাপন মারিব। উল্টা-ভাবে জবাকুসুম তৈলের বিজ্ঞাপন, স্নানরতা মহিলাটির নিম্নমুখী চিত্র। হঠাৎ রাত্রে জাগিয়া উঠিয়া চাঁদের আলোয় ওই দৃশ্য দেখিয়া মনে হইবে একটি অসহায়া নারী গভীর জলে নিমজ্জমান। তখন আর-সব ভুলিয়া তাকে বাঁচাইবার জন্য জানালা দিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িব—ঠিক ফুটপাথের উপরে। তার পরে কি হইবে জানি। তখন জবাকুসুমের বিজ্ঞাপন ছাড়িয়া ডাক্তারের বিজ্ঞাপন খোঁজ করিব (অবশ্য যদি জ্ঞান থাকে)। কিন্তু ইহাও তো মিথ্যা নয় যে মুহূর্ত্তের জন্যও যথার্থ সুখ পাইয়াছিলাম, একটি অসহায়া নারীকে রক্ষা করিবার। তুমি বলিবে, তাহা ক্ষণিকের। আমি বলি, ক্ষণিকের বলিয়াই তাহা সুখ। হীরার টুকরা ছোটই হয়।

শ্রীঅমিত রায়

পরিচয়

আমার পিসতুত শ্বশুরের ভাইয়ের ছোট শালার মেজ ছেলেটি পল্লীগ্রাম হইতে চাকুরীর চেষ্টায় কলিকাতায় আসিয়াছে। ইচ্ছা করিলে সে কোন মেসে বা হোটেলে উঠিতে পারিত, কিন্তু একজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় কলিকাতায় থাকিতে অন্যত্র গিয়া উঠিলে, পাছে আমি অসন্তুষ্ট হই, এই আশঙ্কায় সে আমার বাসাতেই উঠিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে সে কখনও কলিকাতায় আসে নাই, সুতরাং কয়েকদিন সঙ্গে করিয়া লইয়া কিরূপে বাসে উঠিতে হয়, কিরূপে রাস্তা পার হইতে হয়, ইত্যাদি শিক্ষা দিবার পর একখানা অল্‌-সেক্‌শন মাসিক টিকিট কিনিয়া দিলাম। সে উহা লইয়া নানাস্থানে ঘুরিয়া চাকুরির সন্ধান করিতে লাগিল। কয়েকদিনের মধ্যেই লক্ষ্য করিলাম, তাহার মাফঃস্বলিক জড়তা দূর হইয়াছে এবং বেশ স্মার্ট হইয়া উঠিয়াছে। কলিকাতার পথঘাট প্রভৃতি কেমন চিনিয়াছে, তাহা একটু পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে একদিন তাহাকে কতকগুলি প্রশ্ন করি। তাহাতে যে উত্তর পাইয়াছি, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

প্র। চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ হইতে হাওড়ার পুল পর্য্যন্ত—ঐ অঞ্চলকে কি বলে?

উ। মাড়োয়ার নগর।

প্র। লালবাজার হইতে চৌরঙ্গী পর্য্যন্ত—এ স্থানটাকে কি বলে?

উ। চুচাংগঞ্জ।

প্র। ধর্ম্মতলা হইতে এলগিন রোড পর্য্যন্ত।

উ। লণ্ডনতলা।

প্র। এল্‌গিন রোড হইতে কালিঘাট পর্য্যন্ত ?

উ। এর খানিকটা আয়ারপটি এবং বাকিটা খালসাপুর।

প্র। কালিঘাট হইতে বালিগঞ্জ ষ্টেশন পর্য্যন্ত যে প্রশস্ত পথ গিয়াছে, উহার নাম কি ?

উ। পার ভেন্নু অ্যাভেনিউ।

প্র। ওখান হইতে যে ছোট গলিটা লেকের দিকে গিয়াছে, উহার নাম ?

উ। স্নব লেন।

প্র। আচ্ছা, ও অঞ্চলটা কর্পোরেশনের কোন ওয়ার্ডে, বলিতে পার ?

উ। হাঁ, ওটা মর্গেজ ওয়ার্ড ;

প্র। মধ্যবিত্ত বাঙালীদের ঝোঁক কোন দিকে বেশী ?

উ। নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট এবং কেওড়াতলা ঘাট রোড।

উত্তর শুনিয়া মনে হইল, আত্মীয়টি ফুল মার্কস পাইবার উপযুক্ত।

সেণ্টিমেণ্ট

গত অগ্রহায়ণ-সংখ্যা শনিবারের চিঠিতে দেশী ও বিদেশী নামক কাহিনীতে আপনারা মেয়েদের 'সেণ্টিমেণ্টালিটি'র উপর কটাক্ষ করিয়াছেন। কাহিনীটি আপনাদের মতে "মর্ম্মান্তিক সত্য ঘটনা" হওয়া সত্ত্বেও উহা যে আপনাদের মস্তিষ্কজাত "সত্য ঘটনা" এ বিষয়ে আমার

সন্দেহ নাই—অন্ততপক্ষে উহার সত্যতার প্রমাণ আপনারা কিছুতেই দেখাইতে পারিবেন না ইহা ঠিক। আমি য়ুনিভার্সিটিতে পড়ি না, কিন্তু দৈবক্রমে আমার নামটিও মিস্ ব্যানার্জ্জি হওয়ায় আমার সেই অচেনা বন্ধুর (আপনাদেরই কাল্পনিক মিস্ ব্যানার্জ্জির) সমস্ত গ্লানি আমি নিজের গায়ে মাখিয়া লইয়া আপনাদের সঙ্গে বিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

আমি পূর্ব্বেই ধরিয়া লইতেছি, বাঙালী মেয়েরা অত্যন্ত ভাবপ্রবণ (সেণ্টিমেণ্টালের বাংলা জানি না)। শুধু বাঙালী মেয়েরা কেন, পৃথিবীর সকল মেয়েই অল্পবিস্তর ভাবপ্রবণ একথা আপনারা অবশ্যই জানেন। স্নেহলতা যেদিন মন-কষ্টে আগুনে পুড়িয়া আত্মহত্যা করিল, সে দিন কাগজে-কাগজে যাহারা তাহার নামে কবিতা লিখিল, যাহারা উচ্ছ্বাসপূর্ণ প্রবন্ধ, সম্পাদকীয় প্রভৃতি লিখিয়া সভাসমিতি করিয়া স্নেহলতাকে আত্মত্যাগিনী দেবীর আসনে বসাইল, তাহারা অবশ্যই সেণ্টিমেণ্টাল নহে, কারণ তাহারা পুরুষ। আবার যাহারা মেয়েদের স্কুল-কলেজে পড়া উপলক্ষে তাহাদের কোমল বৃত্তি, সেণ্টিমেণ্ট প্রভৃতি নষ্ট হইয়া যাইতেছে বলিয়া চীৎকারে আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া তুলিতেছে তাহারাও সেণ্টিমেণ্টাল নহে, কারণ তাহারাও পুরুষ।

নারীকে মানবী না বলিয়া পুরুষে দেবী বলিয়া থাকে, ইহা নিশ্চয়ই সেণ্টিমেণ্ট নহে, ইহা বৈষয়িক-বুদ্ধিজাত একটি চতুর বিশেষণ মাত্র। কারণ এই দেবীকে বিবাহ করিবার সময় তাহার দাঁতের সংখ্যা, চুলের দৈর্ঘ্য, গায়ের রং প্রভৃতি তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষার ব্যবস্থাও পুরুষে করিয়াছে। দেবী নরকের দ্বার, দেবীকে এবং রাজকুলকে বিশ্বাস করিও না, দেবীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী ইত্যাদিরূপ মস্তিষ্কজাত হিতোপদেশ

পুরুষ দিতে পারে বলিয়াই মেয়েদের সেন্টিমেণ্ট লইয়া তাহারা বিদ্রূপ করে।

আমি ত বলি, বাঙালী স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে পুরুষেরাই অধিকতর উচ্ছ্বাসপ্রবণ। বাঙালী পুরুষেরা রাজনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য, শিল্প—প্রত্যেকটি বিষয়ে অত্যধিক উচ্ছ্বাসপ্রবণ বলিয়াই প্রতি মুহূর্ত্তে তাহারা ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত দোল খাইতেছে। পেণ্ডুলাম কোনো দিকে অগ্রসর হয় না, যতটা হয় ঠিক ততটাই পিছাইয়া আসে। অর্থাৎ বাঙালী পুরুষকে যে যখন যাহা বলিতেছে সে তাহাই বিশ্বাস করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রের একই স্থানে ক্রমাগত লাফাইতেছে। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে কত রূপান্তর যে তাহার দেখিলাম তাহার ইয়ত্তা নাই। দলে দলে স্কুল কলেজ ছাড়িল, আবার ফিরিয়া গেল; দলে দলে সিগারেট ছাড়িয়া বিড়ি ধরিল, আবার বিড়ি ছাড়িয়া সিগারেট ধরিয়াছে; দলে দলে বুঝিয়া ফেলিল, education may wait, but Swaraj cannot, আবার দলে দলে নির্ব্বোধ সাজিয়া এডুকেশন লাভ করিতেছে। দল বাঁধিয়া হরিজনকে স্পর্শ করিতে গেল, আবার দল বাঁধিয়া মহাত্মা গান্ধীকে নিন্দা করিতেছে! কিন্তু ইহাও ঠিক যে তাহার চরিত্র যে-ভাবে গঠিত তাহাতে ইহার বেশী সে আর কিছুই করিতে পারে না। সব চেয়ে যাহাতে তাহার কৃতিত্ব বেশি ফুটিয়াছে সেটা আর কিছুতে নহে, সাহিত্যে। সে নাকি সেন্টিমেণ্টাল নহে! সত্যই সেণ্টিমেণ্ট ইহাকে বলে না। আবেগ এবং উচ্ছ্বাস এবং কাঙালপনা কখনই সেণ্টিমেণ্ট নহে। মেয়েদের প্রতি অর্থাৎ দেবীদের প্রতি (এখন অবশ্য আর ভাবাবেগেও মেয়েদিগকে সে দেবী বলিয়া কল্পনা করে না) যে কুৎসিত মনোভাব সে ফুটাইয়া তুলিতেছে তাহা ভাবিলেও লজ্জায় শির নত হয়।

আমি গোড়াতেই বলিয়াছি, মেয়েরা যে ভাবপ্রবণ, তাহার দৃষ্টান্ত অন্যত্র মিলিলেও পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর লিখিতে ঘরকন্নার কথা লিখিয়া দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করে না। কিন্তু পুরুষে সাহিত্য রচনা করিতে গিয়া যে বৃত্তির পরিচয় দিতেছে তাহার দৃষ্টান্ত আপনাদের শনিবারের চিঠিতে গত আট বৎসর ধরিয়া আপনারাই উদ্ধৃত করিয়া আসিতেছেন। আপনারা এক বার লিখিয়াছিলেন, এই সাহিত্যের বিরুদ্ধে মেয়েদের কিছু বলা উচিত। কারণ, তাহাদের নামে এই সব ইতরজনোচিত গল্প এবং কবিতা যাহারা লেখে তাহাদের জানা উচিত যে মেয়েরা উহাতে লজ্জিত হয়।

কিন্তু মেয়েদের পক্ষ হইতে এরূপ কোনো প্রতিবাদ হওয়া সম্ভব নহে। প্রতিবাদ করিতে গেলেই অভদ্র লেখক-(নামধারী)গণ আস্কারা পাইয়া যাইবে ; মনে করিবে, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। কারণ, এই সব লেখার প্রতিবাদ করিতে হইলে এগুলি পড়া দরকার। সুতরাং শুধু এই জন্যই প্রতিবাদ করা উচিত নহে, কারণ উহা পড়া উচিত নহে।

সংসারে লঘু প্রকৃতির অনেক ছেলে আছে যাহাদের সাহিত্যিক নিষ্ঠা নাই। সাহিত্য যে সাধনার বস্তু, সাহিত্য যে সুন্দরেরই প্রকাশ তাহা তাহারা জানে না, কারণ তাহারা মূর্খ। লঘু প্রকৃতির মেয়েও সংসারে আছে ; তাহারা অবশ্য সাহিত্য রচনা করে না, কারণ তাহাদের সে দুঃসাহস নাই। ছেলেদের এই দুঃসাহস আছে। তাহারা অপেক্ষাকৃত স্বাধীন, তাই খরচ করিয়া লেখা ছাপাইতেও পারে। সুতরাং এই-প্রকৃতির মূর্খেরা যাহা লেখে তাহা যথার্থ শিক্ষিত সমাজে অচল হইলেও মূর্খ নির্বোধ শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের নিকট অচল নহে। মুদ্রাযন্ত্র এবং মুদ্রিত লেখা যাহাদের কাছে বিস্ময়ের বস্তু, তাহাদের নিকট সাহিত্য এবং

অসাহিত্যের মধ্যেকার ভেদ ধরা পড়ে না, এমনকি তাহারা কল্পনাও করিতে পারে না যে সাহিত্যের আবার জাতিভেদ থাকিতে পারে। যে মূর্খদিগকে আশ্রয় করিয়া এই সাহিত্য গড়িয়া উঠিতেছে তাহাদের একটি দল আছে এবং সে দল নিতান্ত নগণ্য নহে। ইহাদের যে মনোবৃত্তি তাহার নাম কদাপি সেন্টিমেণ্ট নহে। সেন্টিমেণ্ট মেয়েদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, উহা তাহাদের অগৌরব নহে, কিন্তু ছেলেদের মনের এই ভাবকে আপনারা কি বলিবেন? যে মনোবৃত্তিতে তাহারা তাহাদের দেশের মেয়েদিগকে অপমান করিতে প্রলুব্ধ হয় এবং যাহাদ্বারা তাহারা নিজেদিগকেই অপমান করে (মূর্খগণ যদিও ইহা বুঝিতে পারে না) সেই মনোভাবের নাম ইতরামি ছাড়া আর কিছু নহে।

মেয়েদের অনেক দোষ আছে স্বীকার করি, কিন্তু তাহারা দল বাঁধিয়া নিজেদের দোষটাকেই কাগজে ছাপাইয়া ইতর লোকের আমোদ বৃদ্ধি করিতে উৎসাহিত হয় না। যাহার জন্য তাহার লজ্জা পাওয়া উচিত, তাহা লইয়া সাহিত্য সৃষ্টি করিবার স্পর্দ্ধা করে না—অন্তত এটুকু বৈশিষ্ট্য সে শত দোষ সত্ত্বেও বজায় রাখিয়াছে। দেশের পুরুষদের চরিত্র নাই। ইহার অর্থ ইহা নহে যে তাহারা লম্পট। চরিত্র আমি সে অর্থে ব্যবহার করিতেছি না। চরিত্রের দৃঢ়তা যাহার নাই, তাহারই চরিত্র নাই। জীবনের সকল ক্ষেত্রে যে ফাঁকি-দিয়া আসিতেছে, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সে ফাঁকি দিতে প্রলুব্ধ হয়। তপস্যার দ্বারা যাহা লাভ করিব তাহারই অংশ অপরকে দিব, ফাঁকি দিয়া চাতুরীর পথে যাহা লাভ হয়, তাহা কখনই আপনার হয় না, সুতরাং তাহা অপরকে দেওয়াও যায় না। সত্য দান করিব, অসত্য দান করিব না, পুরুষের চরিত্রে এই determination নাই বলিয়াই তাহার চরিত্র নাই।

জানি, এই সব কথাতে অনেকের দন্ত বিকশিত হইবে—এবং সঙ্গে সঙ্গে নারী জাতির উপর তাহাদের যে বিদ্রূপধারাও বর্ষিত হইবে এ বিষয়েও সন্দেহ নাই। বিদ্রূপের ধারা বলিলাম এই হিসাবে যে স্বদেশীয় নারীদের শীর্ষে এই বিদ্রূপ বর্ষার বৃষ্টির মতই বর্ষিত হয়—সময়-অসময় নির্বিশেষে। আমার অভিযোগ সেই সব অক্ষম তরুণনামধারী পুরুষদের বিরুদ্ধে যাহারা শিল্প ও সাহিত্যের নামে নারীদিগকে অপমান এবং বিদ্রূপ করিয়াই জীবন কাটায়। চরিত্রের সবল প্রকাশ তাহাদের কোনো দিকেই নাই। সমাজে যে-নারীর সহায় নাই, যাহারা নির্বোধ, যাহারা মানব-পশুর হাতে নিরন্তর লাঞ্ছিত হয়; তাহাদিগকে ইহারা রক্ষা করিতে পারে না—ইহারা স্বকীয় চতুর উপায়ে তাহাদিগকে গুণ্ডাদের পদ্ধতিতেই নিপীড়িত করিতে চাহে।

পুরুষদের ভিতর দুইটি স্তর আছে। এক স্তর শিক্ষিত, ভদ্র, মার্জ্জিতরুচি, প্রকর্ষমনা; এই স্তর নিম্নস্তর হইতে বহু ঊর্দ্ধে থাকে—এবং এই স্তরের লোকসংখ্যাও খুব কম। (দুই স্তরের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান।) অন্য স্তরটির স্থূলতা যেমন বেশি, ব্যাপকতাও তেমনি বেশি। নিরক্ষর হইতে আরম্ভ করিয়া এই স্তরের মধ্যে যাহার শিক্ষার গর্ব্ব আছে সে—একই দরের লোক। রুচিগত পার্থক্য ইহাদের মধ্যে নাই বলিলেই চলে। ইহারাই ভালমন্দের বিচার করিতে পারে না, সাহিত্য অসাহিত্যের ভিতরকার পার্থক্য ধরিতে পারে না—ইহাদের নিজস্ব কোনো মত নাই, প্রবৃত্তিই ইহাদের জীবনের একমাত্র সত্য। ইহারা চারুশিল্প বুঝিতে পারে না, কাব্য বুঝিতে পারে না, ইহাদের কিছু সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা নাই, ইহাদের প্রবৃত্তিকে যাহারা উস্কাইয়া দিতে পারে তাহারাই ইহাদের চালক। ইহারা চিন্তায় পঙ্গু, শস্তা জিনিস ইহাদিগকে প্রলুব্ধ করে, উচ্চশ্রেণীর কোনো জিনিসেরই ইহারা মূল্য নিরূপণ করিতে পারে না। এই অর্দ্ধশিক্ষিত বর্ব্বরদের হাতে দেশের নারীর লাঞ্ছনা যেমন অবশ্যম্ভাবী, তেমনি অবশ্যম্ভাবী সাহিত্যের এবং শিল্পের। ইহাদের সেন্টিমেণ্ট নাই বলিয়াই ইহারা অমানুষ,

ইহারা বর্ব্বর বলিয়াই বঙ্গ-জননীকে নখ এবং দাঁত দিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া খাইতেছে।

শিল্পের নামে ইহারা নারীজাতিকে কিরূপ লাঞ্ছিত করিতেছে তাহা যে-কোনো মাসিকের পৃষ্ঠা খুলিলেই প্রমাণিত হইবে। শিল্পীর ধ্যানকে, সাধনাকে, সৃষ্টিকে আমি নমস্কার করি, কিন্তু এই সব (শিল্পী নামধারী) বর্ব্বরদিগকে আমি শ্রদ্ধা করিতে পারি না, কারণ ইহাদের মহৎ কল্পনা নাই, ধ্যান নাই, গভীর দৃষ্টি নাই, অথচ দেশের এমনি দুর্ভাগ্য যে ইহারাই শিল্পী নামে পরিচিত হইতেছে।

যিনি বাঙালীকে দিয়া 'বন্দেমাতরম্' উচ্চারণ করাইতে চাহিয়াছিলেন, তিনি জানিতেন না যে বাঙালী মাতৃরূপে দেশকে কখনও কল্পনা করিতে পারিবে না। তিনি জানিতেন না যে পূজার পাত্রকে বাঙালী পূজা করিতে কখনই শিখিবে না—তাহাকে পদাঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিয়া নিজের প্রবৃত্তি-পূজাকেই সকলের উচ্চে আসন দিবে। আন্তরিকতা না থাকিলে পূজা হয় না; বাঙালী তরুণের মন হইতে আন্তরিকতা দূর হইয়াছে, কপটতাই এখন তাহার একমাত্র বৃত্তি।

কোনো দিকে আশার আলো দেখিতে পাই না—চিন্তা করিতে গেলেই নিরাশায় মন ভাঙিয়া পড়ে। কিন্তু তথাপি মনে হয়, এ অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতেই হইবে। নারীর অমর্য্যাদার প্রতিকার নারীকেই করিতে হইবে—আর কেহ করিবে না। যে দিন নারী আপন ক্ষমতাবিষয়ে সচেতন হইবে সেই দিন এই ক্ষীণপ্রাণ বর্ব্বরগণ ভীত হইয়া গর্ত্তে মুখ লুকাইবে। নারীর সম্মান আজ চিতার আগুনের মত শ্মশানে জ্বলিতেছে—তাই তাহার চারিদিকে এই ভূতপ্রেতের তাণ্ডবনৃত্য! কিন্তু আগুন যদি জ্বলিয়া থাকে তবে তাহা হইতে যেন ভূতপ্রেতগণ নিষ্কৃতি না পায়। মনে হয়, ইহারা মরিবার জন্যই এই বহ্নির উৎসব আরম্ভ করিয়াছে—প্রার্থনা করি, উহাদের মৃত্যুতেই যেন এ উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে;

শ্রীতপতী দেবী

———

ব্যাধি

রামকানাইকে না চেনেন এমন লোক হাতীবাগানে কমই আছেন। আমার কাহিনীটি তাহারই সম্বন্ধে। সিনেমার চারি আনার টিকিট কিনিতে তাহার মত নিপুণ শিল্পী হাতীবাগানে আর নাই। সকালে হাফ-প্যাণ্ট পরিয়া যে ছেলেটি একঘণ্টা টিকিটঘরের সম্মুখে ঝুলিয়া দুইতিনশত দোদুল্যমান লোককে অগ্রাহ্য করিয়া প্রত্যহ প্রথম পাইকারী-হিসাবে টিকিট কেনে, তাহারই নাম রামকানাই।

সে আজ চারি বৎসর ধরিয়া ম্যাট্রিক ফেল করিয়া আসিতেছে। পিতার তিরস্কার এবং অঙ্গস্পর্শে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়াই ত সে তাহার নির্দ্দিষ্ট জীবনধারাটিকে কুলুকুলু শব্দে প্রবাহিত করিয়া চলিয়াছিল! কিন্তু হঠাৎ তাহার জীবনে একটি পরিবর্ত্তন আসিয়াছে।— কিছুদিন হইল পিতা পুত্রের সহিত সিভিল ডিসওবীডিয়েন্স আরম্ভ করিয়াছেন। ফলে রামকানাইয়ের এই পরিবর্ত্তন। রামকানাই কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ঘরে বসিয়া এখন কেবল কবিতা লিখিতেছে। পাড়ায় গুজব, রামকানাই প্রেমে পড়িয়াছে। কাল কয়েকখানা টিকিট কিনাইবার জন্য তাহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। গিয়া দেখি, সে চেহারা আর তাহার নাই, শুকাইয়া অর্দ্ধেক হইয়া গিয়াছে।

দেখা হইতেই কবিতায় কথা বলিতে লাগিল। অনেক বুঝাইলাম, কোনো ফল হইল না। বোধ হইল, যেন কোনো সিনেমা-অভিনেত্রীর প্রেমে পড়িয়াছে। কিছুই খুলিয়া বলিল না। ভাঙা ছন্দের প্রেমের কবিতা শুনিয়া চলিয়া আসিলাম।

আজ হঠাৎ শুনিলাম, তিনদিন তাহাকে খাইতে দেওয়া হয় নাই এবং তাহারই ফলে এই পরিবর্ত্তন!

বাঁকা চাঁদ

মাঝে মাঝে কবিতা লিখি বটে, কিন্তু কবি-খ্যাতি কখনও পাই নাই। বাংলাদেশের সম্পাদকেরাই পাগল না আমি পাগল তাহাও বুঝি না। আমার অধিকাংশ কবিতাই কেহ ছাপে না, ফিরাইয়া দেয়। মনে করিয়াছি, কবিতার পাণ্ডুলিপিগুলি (যাহা প্রতি ঋতুতেই বাড়িয়া যাইতেছে) নষ্ট করিব না, বাক্সবন্দী করিয়া রাখিয়া দিব, ভবিষ্যতে মূল্য বাড়িবে। আমি আমার প্রত্যেক খাতায় একটি করিয়া ভূমিকা লিখিয়া রাখিতেছি। দুইশত বৎসর পরে যদি কোনও গবেষক এগুলি উদ্ধার করেন তাহা হইলে তখনকার কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে এগুলি একেবারে 'পাঠ্যের' কৌলিন্য লাভ করিয়া ধন্য হইবে। কলেজের ছাত্রেরা পড়িবে। (তখন মেয়েরা কলেজে পড়িবে কিনা জানিনা, যদি পড়ে তবে তাহারাও আমার কাব্য পাঠ করিয়া আমার আত্মার তৃপ্তিবিধান করিবে।)

আমি ভূমিকায় লিখিতেছি—"বর্ত্তমানে বাংলা সাহিত্যে শস্তা কাব্যের ছড়াছড়ি। যে ব্যক্তি ছাতার সঙ্গে মাথা, ফুলের সঙ্গে ভুল, দাদুরীর সঙ্গে ভাদুড়ী কিংবা বাঁশীর সঙ্গে খাসী মিলাইতে পারে সেই কবি এবং তাহার কবিতা মাসিকে ও সাপ্তাহিকে ছাপা হয়। এ বাজারে আমার কবিতা ছাপিয়া কবিতার অপমান করিব না। কারণ আমার মধ্যে কৃত্রিমতা নাই। আমার গজল গান গুলি প্রকৃত সুরের ব্যথায় লেখা, আমার বৈষ্ণব কবিতাগুলি সত্যকার বৈষ্ণবীর প্রেমে রচিত, আমার ফুলের কাব্য বহুটাকা খরচ করিয়া ফুলবাগান প্রস্তুত

করিয়া তাহার মধ্যে বসিয়া লেখা। কবিতায় এরূপ বাস্তবতা—বিশুদ্ধ বাস্তববিলাসী ছাড়া আর কাহারও হাতে সম্ভব নহে।

কবি কালিদাস যাহা বলিয়াছেন তাহা ঠিক নহে। দরিদ্র হইলে গুণ নাশ হয় না। গুণ প্রকাশ করা কঠিন হয় মাত্র। গুণ অর্থে কবিতা। আমার সামান্য যাহা কিছু সম্বল ছিল, কবিতার প্রেরণালাভের বন্দোবস্ত করিতেই তাহা খরচ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এখন দারিদ্র্যদোষে গুণরাশি প্রকাশ হইতেছে না। গুণরাশি দুইটি বৃহৎ ট্রাঙ্কে বন্ধ করিয়া রাখিলাম। আশা করি নাশ হইবে না।

কথাটা বলিলাম এই জন্য যে হাতে প্রচুর অর্থ থাকিলে মাসিকপত্রে বা সাপ্তাহিকে কবিতা প্রকাশ করা যায়, ইহা আমি জানি। যে-কোনো নামকরা কবিকে টাকা দিয়া লিখাইয়া লইলেই হইল। কিন্তু আমি নিজের ক্ষমতাবিষয়ে নিঃসন্দেহ এবং এ বিষয়েও আমার সন্দেহ নাই যে বর্ত্তমান বাঙালী-সম্পাদকগণ কবিতার ভালমন্দ বুঝিতে পারে না।

কিন্তু বাঙালী যে জন্ম-কবি। বাংলা সাহিত্যে গদ্যের ইতিহাস আছে কিন্তু কবিতার ইতিহাস নাই। কারণ, কবিতা অর্থাৎ বাঙালীর আদি ভাষা কোন সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছিল তাহা কেহই বলিতে পারে না। সুতরাং বাঙালীর কবিতাকে যে-সম্পাদকগণ অগ্রাহ্য করিতে পারে, তাহাদিগকে ধিক। কবিতা-হিসাবে যাহা ইহাদের গ্রাহ্য, তাহা প্রকৃত কবিতা নহে—এবং কবিতা হইতে যে রচনা যতদূরে সরিয়া যাইবে, সে রচনা ততই মাসিক পত্রের মনের মত হইবে। ইহাই এই পৃথিবীর নিয়ম। নিয়মটি কবিতার ক্ষেত্র হইতে দেনার ক্ষেত্রে সরাইয়া দেখিয়াছি—কোনো ব্যতিক্রম হয় নাই। ঋণ গ্রহণ বাঙালীর জন্মগত শিক্ষা। বাঙালীর চরম মহাজন কাবুলিওয়ালা। ঋণ কর এবং পরে কাবুলিওয়ালার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাও—

দেখিবে তোমার বুদ্ধি প্রশংসিত হইতেছে। কিন্তু এই শস্তা প্রশংসার মোহে পড়িয়া কত বাঙালীর মেরুদণ্ড ও হাত পা ভাঙিতে দেখিয়াছি। আমি এই সুলভ প্রশংসা চাহি না। মহাকালকে আমি শ্রদ্ধা করি। আমার ভালমন্দের বিচারের ভার তাঁহার হাতেই ছাড়িয়া দিলাম।

বর্ত্তমানে আমার আর্থিক দেনা, বৃদ্ধির মুখে। কিন্তু মর‍্যাল দেনায় যে আমি ডুবিয়া গিয়াছি, আমাকে জীবন দিয়াও সে দেনা শোধ করিতে হইবে। প্রেমের দেনাও ত কম নহে। যাহার প্রেমে পড়িয়াছি, কথা ছিল, আজ সকালে তাহাকে পাইব—কিন্তু তাহার বাড়ি গিয়া দেখিলাম, তাহার একজোড়া জুতা পড়িয়া আছে—সে নাই। না পাওয়ার ব্যথায় কবিতা জাগে। হৃদয়ের গভীর প্রদেশ হইতে ছন্দ ঝরণার ধারার মত বাহির হইয়া আসে—

হে দেবী, শুধুই জুতা দেখাইলে আজিকে সকালে,
নিজে দিলে নাকো দেখা—মিছিমিছি আমারে ঠকালে!
প্যারট কোব্রা নহি, নহি আমি ল্যাডকোর কালী,
নিজেরে ঘষিয়া দিয়া দিব আমি আপনারে ডালি,
সে পথও রাখনি দেবী, দরজায় মারিয়াছ তালা—
উষ্ণ আশা ঠাণ্ডা ক'রে ঠাণ্ডা শিরে ধরাইলে জ্বালা।

মাত্র ছয় ছত্র উদ্ধৃত করিলাম। মোট একশত ছয় ছত্র লিখিয়াছি। আজ তিনচারিজন পাওনাদার আসিবে, এদিকে দেবী প্রতারণা করিলেন! মনটা দমিয়া আছে।

সন্ধ্যায় বাগানে গিয়া বসিলাম। তৃতীয়ার চাঁদ আকাশে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ক্ষীণ এবং বাঁকা। হঠাৎ এই চাঁদ আমাকে উতলা করিল। প্রাণের ভিতর গজল সুরের একটা নাচুনি-আলো বিদ্যুতের রেখার মত আঁকিয়া বাঁকিয়া খেলিয়া গেল :

হে বাঁকা চাঁদ, মুচকি হেসে, ঠারিস নে রে চোখ—

লিখিবার মত আলো বা কাগজ পেন্সিল হাতে বা কাছে ছিল না। একটি লাইনই বার বার গাহিতে লাগিলাম এবং "চোখের" সঙ্গে কি মিলাইব ঠিক করিতে লাগিলাম। একবার গাহিয়া পুনরায় যেমন 'হে বাঁকা চাঁদ' পর্য্যন্ত উচ্চারণ করিয়াছি এমন সময় কাহার পদশব্দে চমকাইয়া উঠিলাম। মুখ হইতে পুনরায় আপনা-আপনি উচ্চারিত হইল—হে বাঁকা চাঁদ—

আগন্তুক বলিল, "আজ্ঞে না, বাকী চাঁদা।"

হঠাৎ সব স্পষ্ট হইয়া গেল। আগন্তুক পাড়ার একটি ছেলে। সরস্বতী পূজার বাকী চাঁদা আদায় করিতে আসিয়াছিল, কাল আট আনা দিয়াছি, আরও আট আনা আজ দিবার কথা। বলিলাম, "আজ নয়, কাল সকালে।"

গজলটা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইল। বাঁকা চাঁদও বাকী চাঁদার দুর্ভাবনায় ডুবিয়া গেল।

পৃথিবীর পাগলামি

অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জেও পরিভ্রমণ বাকী রইলনা। দক্ষিণ সাগর সমূহের এইরূপ এক দ্বীপের ব্রঞ্জের মত গায়ের রংওয়ালা অধিবাসীবৃন্দকে একটা চীনে, 'ব্যবসাবাড়ী' সেলাইয়ের কল, alcohol নিউইয়র্কে-প্রস্তুত পোষাক পরিচ্ছদ এবং ইউরোপে যে সব বস্তুর আর চল নেই, সে সব বস্তুর ফিরি করেছে।

দক্ষিণের সাগরসমূহ! সেখানে বেতারের ষ্টেশন ও মুক্তার ডুবুরী যাদের ফুস্‌ফুস্‌ প্রায়ই ফাটে, সেখানে Copra-র planter-রা, যারা ত্রিশবছর ধরে যা রোজগার করেছিল, তা একদিনের মধ্যেই হারিয়েছে, কারণ কর্ম্মহীনদের 'মার্গারিন' কেনবার অবস্থা আর নেই, কারণ লক্ষ লক্ষ লোকে হতাশায় জ্বলে আজ শুকনো রুটি খাওয়াই সম্বল করেছে এবং সে কারণে মার্সাইয়ে, বাজার পড়ে যাওয়ার জন্যে আমদানী ও বন্ধ—!

পৃথিবী যেন এক বিরাট চাকার মত; একটা 'গীয়ার' (gear) যদি আজ ভেঙে যায়, পৃথিবীর অন্য যেখানে যেসব চাকাই থাকুনা, সব বন্ধ হয়ে যায়, এমনকি এই সুদূর দক্ষিণ সাগরেও।

* * *

উত্তরাঞ্চলেও কি লোকের যন্ত্রণাভোগের কসুর আছেন? 'আলাস্কায়' জমে যাওয়া মরুভূমির মত জনহীন স্থান সমূহেও কি 'মোটর' ও ব্যাঙ্কের অভাব আছে? সেখানেও কি অর্থনৈতিক সমস্যা ও ক্ষুধার জ্বালা কম?

'হাড্‌সন্‌ বে'র উপর যেখানে গির্জ্জা গিয়ে পড়েছে, সেখানে শ্বেতকায়রা তাদের 'ফোর্ট চার্চ্চহিল্‌' খাড়া করেছে; এত উত্তরে যে, অন্য কোন সরকারের কোনও 'পোষ্ট'ই অত উত্তরে যেতে পারে নি। কয়েক মাইল দূরে, এই আর্কটিক্‌ প্রদেশের 'blizzard' সহ্য করেও, বৃত্তাকারে কতকগুলো গাছ দাঁড়িয়ে আছে এবং তারপরেই কানাডিয়ান এস্কিমোদের বিস্তৃত রাজ্য।

সমুদ্রতীরে, হ্রদের চারিদিকে, নদীর কিনারায় কিনারায়, এই ধূ ধূ প্রসারিত রাজ্যের যেখানে সেখানে ছড়িয়ে পড়ে এই এস্কিমোরা, প্রাগঐতিহাসিক যুগের নির্দ্দয় সংগ্রামের মধ্যে, প্রকৃতি থেকে

জীবননির্ব্বাহের অধিকার ছিনিয়ে নেবার সততই চেষ্টা করছে। বছরের দশমাস ধরে, জমি ও জল এক হয়ে বরফে জমে থেকে, এ রাজ্য কেবল খা খা করে; তখন এখানে ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ ডিগ্রী পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা বিরাজ করে। কোন পাখীই এখানে বাঁচতে পারে না; জীবন ধারণের জল পর্য্যন্ত যোগাড় করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এসব সত্বেও, এরা তাদের এই পৃথক পৃথিবীতে বাস করে, সমস্ত সভ্যতা থেকেই দূরে থাকে। এদের অসভ্য বর্ব্বর বলা চলবে কি?

লেখকের গাইড হচ্ছে এক Lapon; এর পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত rein-deer-এর লোমশ চামড়ায় আচ্ছাদিত, এবং সঙ্গে সঙ্গে লেখক ও তাঁর সঙ্গীরাও ঐ একই পোষাকে ভূষিত; দম যেন বন্ধ হয়ে আসে। এই গাইডের গলায় ঝোলান ব্যাগে 'চেকের' তাড়া; ক্যানাডার সরকারকে সত্তর হাজার 'রেন্‌ডিয়ার' অল্প অল্প করে বিক্রী ক'রে আজ এ বড়লোক। এর কাজ হচ্ছে, মধ্যে থেকে এস্কিমোদের ইউরোপীয়ান সভ্যতার পরিচয় করান, যে সভ্যতা আজ Lapon-দের ধনী করেছে বটে কিন্তু অসুখীও করতে ছাড়েনি।

এঁদের সঙ্গে, কাঁচা ও জমান হরিণ-মাংস। কাঁচা কেননা বেশী পুষ্টিকর। এবং জমান, কেননা সহজ পরিপাচ্য।

এস্কিমোদের রাজ্যে, এক কুটীর থেকে অন্য কুটীরের দূরত্ব কল্পনাতীত; ক্ষুধার জ্বালা, শীত ও ঝড়, নেকড়ে বাঘ ও মেরুদেশীয় ভালুকের শত্রুতার চেয়ে বেশীই কষ্টকর। জীবন ধারণের আইন কানুন যে খালি শীত ও ক্ষুধার উপর নির্ভর করে, তা নয়, অনেকটা শিকার যোগাড়ের অদৃষ্টের উপরও নির্ভর করে। প্রত্যেক 'ট্রাইবের' নিজ নিজ রাজ্য; সেখানে সে দলের পরিবারদের নিজ নিজ [illegible]। কেবল দুর্ভিক্ষের সময়ই প্রতিবাদী রাজ্যে গিয়ে শিকার সন্ধান

করার অধিকার এদের আছে। নিজের প্রাণ নিজে বাচান নীতিই সেদেশে চলিত, কারণ সেখানে এমন কোন কর্তৃত্বশীল ব্যক্তি নেই যে এদের বিচার করে শাস্তি দিতে পারে। তবে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় যা কিছু, সে সবই এদের যাদুকর (sorcerer) কর্তৃক ধার্য্য হয়।

এদের বিশ্বাস যে দুষ্টব্যক্তিরা, তাদের মৃত্যুর পর, শাস্তি পেয়ে শূন্যের এমন স্থানে পরিক্রমণ করে বেড়াতে বাধ্য হয়, যেখানে অসামান্য ঠাণ্ডা। এদের কাছে স্বর্গ এক বস্তু যেটা পাতালে এবং যেখানে সর্ব্বদাই আগুন জ্বলছে।

* * *

নভেম্বর মাসে, Ross Welcomeএ তাঁবু গাড়া হল। সে সময়ে, উপসাগরের উত্তর, fjord সমূহ ইতিমধ্যেই বরফের সরে ঢাকা পড়েছিল ; কাজেই লেখকের দক্ষিণ-পানে যাওয়ার কোন বাধা ছিল না। দুজন এস্কিমো যুবক সঙ্গী ; এদের একজনের প্রেমপাত্রী Chesterfield Bayর কাছে বাস করত, যুবক তার সঙ্গে দেখা করতে উৎসুক ছিল, কারণ সে মেয়েটাকে খুবই ভালবাসত। তবে সে এ বিষয়ে বড় একটা নিজেকে ধরা দিত না, কারণ সেদেশে 'সেন্টিমেণ্ট' জানানটা ঠিক ভদ্রতাসঙ্গত নয়। যাই হোক, যুবকের ইচ্ছে ছিল জানার, যুবতী তাকে বিয়ে করতে রাজী কিনা।

এস্কিমোদের রাজ্যে, যুবক যুবতীদের বিবাহ তাদের বাপমারাই ঘটায়। ষোল সতের বছর বয়সে যুবতী একটা 'ফারের' নতুন পোষাক এবং তার সঙ্গে একটা 'amante' অর্থাৎ একটা থলে যা ভবিষ্যতে পৃষ্ঠে সন্তান বহনের কাজে লাগবে,—উপহার পায়। এই amante গ্রহণ করা মানে fiance' কে জানান যে, সে এবার তার fiancee কে নিজের ঘরে নিয়ে আসতে পারে। যদি প্রেরক

বেশী দিন এ কাজ করতে দেরী করে, অথবা তা'র বিবাহের বয়সের সময় তখনও না হয়, নেহাৎ ছেলেমানুষ বলে, তবে সেই fiancee ততদিন আর একটা কাউকে যোগাড় করে নিয়ে, তার সঙ্গেই থাকে। এই সাময়িক মিলনসম্ভূত সন্তানসন্ততিবর্গ—তাদের মা'র সঙ্গে আসে, যখন সে তার নির্দ্দিষ্ট স্বামীর ঘর করতে আসে।

Rolli Cartএর তাঁবুতে যুবক সংবাদ পেল যে তার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী ইতিমধ্যেই একটা 'amante' বহন করছে। একাই যাত্রা করে fiancee'-র কুটীর যেখানে সেখান থেকে যে সব কুটীর দূরে দূরে অবস্থিত সে সব কুটীর থেকেই দেখা আরম্ভ করাই রীতি; যুবক তাই প্রতি কুটীরের লোকজনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইতে লাগল; এগ্রামে আসার তার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি না-জানিয়ে বা কোনরকম অধৈর্য্য বা উৎকণ্ঠা প্রকাশ না করে, অন্য সব কথাই সে কইলে। ভবিষ্যৎ স্ত্রীর igloo * তে এসে, কর্ত্তব্য হচ্ছে, স্ত্রী ছাড়া, সেই পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কওয়া এবং সংস্কার অনুযায়ী নির্দ্ধারিত কিয়ৎক্ষণের জন্য fiancee কে দেখেও না দেখা,—যুবক তার কোন নিয়মই পালন করতে বাকী রাখলে না। এদের নিয়ম হচ্ছে, পাণিগ্রহণ প্রার্থনার পর দীর্ঘ কাল এমন কথোপকথন করা, যার থেকে মনে হবে যে, কথাবার্ত্তা বিশেষ বাধার মধ্যে দিয়েই এগুচ্ছে এবং তারপরেই কোনরকম ঢাকাঢাকি না করে স্ত্রীর স্বামীর সঙ্গে চলে যাওয়া।

লেখক ভবিষ্যৎ স্বামীর অর্থাৎ যুবকের আসার আগেই এসে, তার fiancee কে দেখেছিলেন। মেয়েটি সুন্দরী ও কর্ম্মপরায়ণা বটে; দাঁত

* এস্কিমোদের কুটির।

দিয়ে চিবিয়ে চামড়া 'ট্যান্' করতে, জুতো তৈরী, পোষাক কাটা বা নৌকা প্রস্তুত করার কাজও জানে এ মেয়ে। 'কায়াকের' (kayak) * পোষাক তৈরী করার দায়িত্ব বড় কম নয়, কারণ পোষাক যদি সত্যিকারের সব বিষয়ে দুর্ভেদ্য না হয়, অর্থাৎ বরফ জল ঠাণ্ডা প্রভৃতি 'প্রুফ' না হয় তো শিকারীর জীবন বিপন্ন হতে পারে।

লেখকরা—যখন সেখানে আসেন, তখন একজন অপরিচিত ব্যক্তিও সেখানে এসে মেয়েটির পাণিপ্রার্থনা করে। যতদিন নিয়ম তার বেশীও, মেয়েটি এই প্রস্তাবে বাধা দিয়েছিল, কিন্তু তিনদিনের দিন তার নতুন fiance'-র সঙ্গে তার ঘর করতে যেতে সে বাধ্য হয়। চতুর্থ দিনে, লেখকের সঙ্গী, সেই যুবক, সেই প্রথম ও সত্যিকারের fiance আসে এবং সমস্ত ব্যাপার জেনে অতি মৃদুভাবে বললে, "Mamianad kloni, আমি মনে বড়ই কষ্ট পেলুম।" বলার সঙ্গে সঙ্গেই, পিছন দিকে একবারও দৃষ্টিক্ষেপ না করে, ফিরে যাবার পথ সে নিলে। এখন তাকে, তার অধিকার ফিরে পাবার জন্যে, পুরো একটি বছর অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু এ সময়ের মধ্যে কি করবে সে? সেও কি একটা সাময়িক স্ত্রী জুটিয়ে নেবে না এবং যখন সে তার আগেকার ভালবাসার ধন ফিরে পাবে, তখনও পর্য্যন্ত এই দ্বিতীয় বস্তুটিকে নিজের করে রাখবে না? প্রায়ই দেখা যায় যে, পুরুষদের অনেকগুলো করে স্ত্রী এবং স্ত্রীদের অনেকগুলো পুরুষ আছে। সকলেই একসঙ্গে বেশ মিলে মিশে বাস করে, কোন ঝগড়াঝাঁটি হয় না এবং সতীনে সতীনে যে ভাব অন্যান্য দেশে দেখা যায়, তার চিহ্নও এখানে নেই।

---

* চামড়ার একরকম নৌকা; আমাদের দেশের মশকের সঙ্গে তুলনা করা চলে।

যখন কোন পুরুষ সুদূরে শিকারে যায়, এবং কোন কারণে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে না, তখন সে তার যাত্রার এক সঙ্গিনী যোগাড় করে নেয়; কেবল করার হচ্ছে এই যে এই সঙ্গিনীকে সুস্থদেহে ও সুস্থ চিত্তে সে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে বাধ্য।

* * *

ভ্রমণ চলতে লাগল; Tassiajormunt ট্রাইবের অনেকেই যোগ দিয়ে দল পুরু হোল। প্রথম ইউরোপীয়ান, Leden এদেশ ভ্রমণ করে যে মন্তব্য করেছিলেন সেই মতে সায় দিয়ে লেখক বলতে চান যে, এস্কিমো বর্ব্বর হলেও, তার মধ্যে আশ্চর্য্য দুটো গুণের পরিচয় পাওয়া যায়, যথা, sensibility ও finesse।

অনেকরকম শিকারই পথের সামনে পড়তে লাগল, কাজেই অন্ততঃ না খেয়ে মরার ভয়টা অন্তর্হিত হল; কিন্তু দলের গাইড, Illait-nok যা দেখে তাই গুলি করে আর বলে, "যে সব 'গেম' আমরা দেখছি, পূর্ব্ব পুরুষদের প্রেতাত্মারাই সে সব পাঠাচ্ছে; আমরা যদি তাদের না মারি তো পূর্ব্বপুরুষদের অসন্তুষ্ট করা হবে।" মৃতজন্তুদের হাড়গোড়, ও জিভ নিয়ে, বাকী যা কিছু, বিশেষ করে তাদের চোখ দুটি অতি সযত্নে সে পুঁততে লাগল; চোখগুলো ভাল করে ঢাকার উদ্দেশ্য, যাতে এই জন্তুদের আত্মারা দেখতে না পায় কেমন করে এদের উপর নেকড়েরা লাফিয়ে পড়ে।

অন্যান্য দলে, এঁদের সব খাবার নিমন্ত্রণ করতে লাগল; কিন্তু রীতি যা আছে তা ভাঙলে চলবে না। যথা, একই ভোজে মাছ ও মাংস খাওয়া এদের মানা; igloo পর্য্যন্ত এ দুটো জিনিষ, এমন কি একই রাস্তা দিয়ে নিয়ে আসারও নিয়ম নেই। এদের বিশ্বাস যে, অতি প্রাচীন কাল থেকেই, স্থলচর ও জলচর জন্তুদের মধ্যে বিবাদ চলছে,

কাজেই আত্মরক্ষার সুযোগ না দিয়ে—দুটি শত্রুকে এক করার মত পাপ আর কিছু নেই—!

* * *

তিনমাস এদের দেশে কেটে গেল। প্রায়ই দুচারটে 'ফ্যামিলি' দেখা যেত, যারা সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে কোন কিছু শিকার খুঁজে পায় নি। তবুও নিমন্ত্রণ রক্ষা করতেই হবে, নৈলে গৃহস্থ তথা অতিথিসেবকের অপমান হয়।

একবার বরফের কুটীর নির্ম্মাণ শেষ হবার পূর্ব্বেই সন্ধ্যা হয়ে উঠল; লেখকরা রাত কাটাবার জন্যে একটা iglooতে নিমন্ত্রিত হলেন, এই igloo ইতিমধ্যেই আটশ জনের আশ্রয় দিয়েছে! গৃহকর্ত্তা বরফের উপর চামড়া বিছিয়ে শুয়ে লেখকের জন্যে তার 'ফারের' বস্তার উপর তার দুই স্ত্রীর মাঝখানে জায়গা করে দিল। এস্কিমোরা উলঙ্গ হয়েই শুতে যায়, এ মেয়েদুটিও তাই; একটু সরে এরা লেখককে জায়গা দিলে। এ ধরণের অতিথিসেবা সময়ে সময়ে অতিথিকে বড়ই delicacyর মধ্যে ফেলে, যদিও এখন স্কাণ্ডিনেভিয়ার এস্কিমোরা তাদের অতিথিদের এই রকম মুস্কিল থেকে বাঁচাতে শিখেছে। এ কুটীরেও, লেখকের সঙ্গীর মত, এরা সব তাদের ফারের নীচে চেকের তাড়া বহন করে।

ইউরোপীয়ান এস্কিমোরা সব বড়লোক; এদের প্রায়ই কয়েক হাজার করে 'রেন ডিয়ার' থাকে, যার এক একটার দাম, দুশো সুইডিশ ক্রাউন (প্রায় এগার পাউণ্ড পাঁচ শিলিং)। এরা ঠিক উত্তর আমেরিকার 'লালচামড়ার' রেডইণ্ডিয়ানদেরই মত; ধনসম্পদে উন্নতি করছে বটে, কিন্তু 'সভ্যতা' বোঝবার মত অতদূর এখনও এগোয় নি। এরা ঝড়জল, তুষারপাত, ক্ষুধা, বন্যজন্তু প্রভৃতির উপর জয়লাভ করেছে

বটে কিন্তু আর্থিক উন্নতি এদের চরিত্রকে দুর্ব্বল করে ফেলেছে! একথা স্বয়ং লেখকের সঙ্গী Lapon বলেছিল, যখন এঁরা Fort Churchhill পরিত্যাগ করে, আমেরিকান্ 'ট্র্যাপার'দের সঙ্গে যাত্রা সুরু করেন।

* * *

পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে বেড়িয়ে, উন্নতি ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। অথচ, হঠাৎ এই প্রচীন ইউরোপীয় ভূখণ্ডেই 'প্রিমিটিভ' এক স্থানের সন্ধান পাওয়া গেল। সেটা হচ্ছে রুমানিয়াতে।

Babadag ও Taltscha র মধ্যবর্ত্তীস্থানে দানিয়ুব নদ ও কৃষ্ণ সাগরের জল কর্ত্তৃক ধৌত উপদ্বীপের Razim হ্রদের তীরে, তুর্কীদেশীয় একদল জেলে বাস করে। একরকম বেতের বুনুনীর কাঠামোর উপর খড়ের ছাউনী দেওয়া কুটীরে এদের বাস; এ কুটীর দেখতে ঠিক মৌচাকের মত এবং আফ্রিকার অধিবাসীদের বাসস্থানের সঙ্গে এসব কুটীরের কোন পার্থক্যই নেই।

এ সব যাই হোক না কেন, সবচেয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করে এদের মাছধরা পদ্ধতিতে; মান্ধাতার আমলে, এদেরই কোন পূর্ব্বপুরুষে মাছধরার যে উপায় বার করেছিল, সে উপায় হাজার হাজার বছর হয়ে গেছে, এদের অন্যান্য স্বদেশবাসী তা ভুললেও, এরা ভোলে নি; কেবল জাপানের কোন কোন ধর্ম্মানুষ্ঠান উপলক্ষে, এই প্রণালীর কিছু স্মৃতিচিহ্ন এখনও পাওয়া যায় বটে।

Razim হ্রদে, ছোট ছোট দ্বীপ ছড়িয়ে আছে; কেবল পাখীরই বাস সেসব স্থানে। দূরে ডাঙার দিকে, রক্তবর্ণের পর্ব্বতশ্রেণী যেন [illegible]শের কোলের সীমা নির্দ্ধারণ করে দিয়েছে। তীরের উপর বক [illegible] পায়চারী করছে, আর বুনো হাঁস সব এধার ওধার উড়ে

বেড়াচ্ছে, আর aigrette জাতীয় পাখী রূপোর তীরের মত চোখের সামনে ভেসে যাচ্ছে। এই দানিয়ুবের ব-দ্বীপেই পাখীদের স্বর্গের আরম্ভ বলা চলে।

শরের আগুন ঘিরে, রাত্রির অপেক্ষা করা হল। ধীরে ধীরে আঁধার নেমে আবছাওয়ার সৃষ্টি করলে; গাংশালিকের ও বুনো হাঁসের চীৎকার একে একে থামতে লাগল। শরের বন কেটে 'ক্যানাল' সব প্রবাহিত; এই রকম একটা 'ক্যানালে' জেলেরা, ছুঁচোল মাথাওয়ালা আলকাতরা মাখান এক নৌকা নামালে এবং রক্তবর্ণ 'এৎগ্রেৎ'দের প্রিয় এক জঙ্গল সাফ-করা স্থানে সেটাকে চালিয়ে নিয়ে গেল। গাঢ় অন্ধকার নেমে এল।

ক্যানালের উপর ইতিমধ্যেই পাঁচ খানা নৌকা ভাসছে; তাদের উপর কাঠের কয়লা ভর্ত্তি চুল্লী। আগুন জালান হল এবং তার আলোকে লেখক দেখতে পেলেন কি অদ্ভুত ধরণের সব জীব নৌকায় তোলা হয়েছে; দেখলেন যে, নৌকায় সুচাল কিন্তু হ্রস্ব ঠোঁটওয়ালা ভারী ধরণের সব জানোয়ার, পানকৌড়ি-জাতীয় পক্ষী। কেমন করে এই সব 'ফর্মোরাণ্ট'দের এই হ্রদের উপর আনা হল, এরা তো সাধারণতঃ পাহাড়ের ধারে বাস করে?—না, জেলেরা এদের এনেছে; পিতলের এক মোটা বলয় এদের গলায় চড়ান এবং এদের পা দড়ির সাহায্যে বাঁধা; এমনিভাবে জেলেরা তাদের এই ক্রীতদাসদের ধরে রাখে।

কর্কশ চীৎকার করে এসব পাখী জলে লাফিয়ে পড়ল এবং নৌকার সামনে সঁতার দিয়ে ঠোঁটের সাহায্যে অবিরাম জল খুঁজতে লাগল। হাজারে হাজারে, ছোটবড় মাছ, আগুনের আকর্ষণে নৌকার সামনে জমা; পানকৌড়ির মত জীবগুলি একধার থেকে সব মুখে নিতে আরম্ভ করলে। এসময় লোভে এদের গোল গোল চোখ জলছিল; এরা সব সময়ে কুড়িটে মাছ পর্য্যন্ত একসঙ্গে ধরতে পারে। কিন্তু ঐ যে ওদের গলায় রিং চড়ান, এর ফলে ওরা খালি মাছগুলো মুখেই রাখতে পারে, কিন্তু গিলতে পারে না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না রিং প্রায়

বুক পর্য্যন্ত নামে, ততক্ষণ অপেক্ষা করা হল—এবং তারপরে এদের দড়ির সাহায্যে হিঁচড়ে টেনে, এদের গলা টিপে মাছগুলো, তখনো জীবন্ত বার করে একটা টুকরীতে রাখা হল এবং তার পরে এদের ছেড়ে দেওয়া হোল।

অদ্ভুত চিত্রই বটে; দোদুল্যমান আলোক, ক্ষুধিত 'করমোরাণ্ট'দের গলাভাঙা চীৎকার, কালো নৌকার অল্প অল্প দোলা এবং বিকৃত সব মুখাকৃতি; অনতিদূরেই শরের বনের মধ্যে দিয়ে বাতাসের সন্ সন্ শব্দ,—অদ্ভুত এক রাত্রি, এই ইউরোপে,—কি আশ্চর্য্য বৈসাদৃশ্য! বুকারেষ্ট থেকে এরোপ্লেনে তিনঘণ্টার পথে, দানিয়ুবের ব-দ্বীপে, জেলেদের পাখীর সাহায্যে মাছধরা,—এমন এক প্রণালীতে যার ব্যবহার, আজ হাজার বছর হল, Gifer তে ও পূর্ব্বাঞ্চলের আরো হাজার স্থানে চলতী ছিল!

Braila শহর এই হ্রদ থেকে কয়েক ঘণ্টার পথ মাত্র; Braila বিংশশতাব্দীর এক শহর, যেখানে শত শত অটো, বড় বড় 'Sils' এবং যেটা শস্য সম্বন্ধে, ইউরোপের একটা বড় বাণিজ্য-কেন্দ্র। অথচ, লেখক যখন এই শহরের বৃত্তান্ত বর্ণনা করতে লাগলেন, তখন 'করমোরাণ্টের' সাহায্যে মাছ ধরা জেলে আহম্মক সে সব বিশ্বাসই করতে চাইল না।

এই ইউরোপেরই মধ্যে, এখনও বুনো ঘোড়ার অভাব নেই; বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়া থেকে কয়েক ঘণ্টার পথে, বুনো ঘোড়া দলে দলে দেখা যায়।

Shipkaর সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কট দিয়ে Philipopoli র দিকে যেতে, birch এর বনের মধ্যে দিয়ে পথ; এই সব birch গাছের গুঁড়ি এত মোটা যে, দুজন লোক হাত বাড়িয়ে তা ঘিরতে পারে না; এখান দিয়ে এলে এমন এমন একটা পর্ব্বতময় স্থানে পড়া যায়, যার সৌন্দর্য্য নর্থ আমেরিকার Coloradoর, Canyon এর কথা মনে করিয়ে দেয়। এখানে একটা 'auto strade' * তৈরী হচ্ছে, এবং এ ভীষণ কাজের জন্যে, হাজার হাজার সৈন্য নিযুক্ত। কিন্তু এখনও এদেশে অনন্ত

* মোটর গাড়ী চলার উপযুক্ত রাস্তা।

বিস্তৃত জনমানববাসহীন, শান্ত বন্য জমির অভাব নেই; উজ্জ্বল রংএর সব পর্ব্বতের গা কেটে প্রপাত; যে সব এখন বারিহীন, শুকনো, খটখটে; gorges যত নীচে নেমেছে, ততই বেশী চ্যাটাল হয়ে ক্রমে ক্রমে নীচের অনন্যসুন্দর প্রকৃতিদত্ত পশুপালনক্ষেত্রের সঙ্গে মিশেছে। এখানেই এখনও বন্যঘোটকের অস্তিত্ব পাওয়া যায়।

এরা কোথা থেকে এখানে এসেছে বা কেমন করে এখানে এখনও আছে এ-প্রশ্নের উত্তর কেহই দিতে পারে না। স্পেনে, বেশী দিন নয় বুনো উটের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে: কিন্তু সেখানেও যেমন তাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে সকলেই অজ্ঞ, এখানেও তাই।

সঙ্কীর্ণ এক উপত্যকার উপর তাঁবু খাটান হল এবং খুব এক বড় আগুন জ্বালান হলো, কারণ এই বলকানদেশীয় পর্ব্বতপুঞ্জে অতিরিক্ত ঠাণ্ডা। এই রোমাণ্টিক ক্যাম্পের একটা ফোটো তোলবার জন্যে লেখক এবং সঙ্গী পাহাড়ের এক promontory-র উপর উঠলেন এবং একারণেই সকলের জীবনও বাঁচল।

দূরে, ধূলির এক ঘূর্ণি ক্রমশঃ ক্যাম্পের দিকে ছুটে আসছে, এটা তিনি দেখতে পেলেন; তাঁর সু-উচ্চ স্থান থেকে তিনি বুঝতে পারলেন যে, সেটা একদল ঘোড়া; ভীষণ হ্রেষাধ্বনি ও শত শত খুরের খট খট ধ্বনি সকলের কানেই বেজে উঠল। বোলতার কামড়ের জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে, রাগে অধীর হয়ে, সামনে যা পাচ্ছে তাই পদতলে দলিত করে দ্রুত ছুটে পালাচ্ছে।

একটা মিনিটও নষ্ট করবার সময় ছিল না। যা কিছু তল্পীতল্পা ছিল, সে সব অটোয় দ্রুত চাপিয়েই ছুট। লেখক এখানে মন্তব্য করছেন যে যদি তাঁরা তাঁদের মেজাজ ঠাণ্ডা রাখতেন (sang-froid) তাঁদের এরকম পালাবার দরকার হত না, কারণ, না পালিয়ে পাহাড়ের ফাটলে বা বড় বড় পাথরের পিছনে লুকোলে অনেক কিছু মজাই দেখা যেত; কিন্তু উপায় ছিল না, সেই সব জন্তুর ঘর্ম্মাক্ত দেহ, বর্ব্বর হ্রেষা এবং সেই একত্রোৎপন্ন স্বাভাবিক ভীষণ কোলাহল, তাঁদের ভয় পাইয়ে দিয়েছিল।

ঘণ্টায় ষাট কিলোমিটার বেগে অটো ছুটতে লাগল, শুকনো এক

নদীগর্ভ এই বেগেই পেরোন হোল, অটোতে ভীষণ ঝাঁকি, তবুও ছোটার নিবৃত্তি নেই, কারণ এঁদের পিছনে সেই ঘোড়ার দল ; সর্ব্বদাই সন্ত্রস্ত সেই ঘোড়ার দলে, অন্ধের মত, পাগলের মত ছুটে আসছে। সুখের বিষয়, অটোর কোন টায়ারই ফাটে নি বা কোন 'এ্যাক্‌স্‌ল্‌'ই ভাঙে নি।

অবশেষে পাশের এক ছোট উপত্যকায় এসে ক্ষান্ত হওয়া গেল। কয়েক মিনিট বাদে সামনে দিয়ে, ঠিক যেন waterspoutএর মত, ঘোড়ার দল ছুটে গেল ; লম্বা কেশর-ওয়ালা সুন্দর সুন্দর প্রাণী ধূলির ঘূর্ণি উড়িয়ে তাদের দিশেহারা দৌড়-পথে, ছোট ছোট পাথর পদাঘাতে নিক্ষেপ করে, ছুটে চলেছে। একটা সাদা মর্দ্দাঘোড়া, শতাধিক ঘোড়ার দলপতি হয়ে, আগে আগে চলেছে।

এ ঘটনার পরে, ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে, নিরীহভাবে আহার চর্ব্বণ নিরত অনেক বুনো ঘোড়ার দলই দেখা, লেখকের সুযোগে ঘটেছিল।

অধুনা, এদের ধরে কাজ লাগান আরম্ভ হয়েছে, যেমন বুলগেরিয়ার ঠিক বুকের উপর স্থিত এই পর্ব্বতময়, বন্ধুর বন্য, অজানা প্রদেশ Philipopoliর অনন্যসুন্দর canous প্রভৃতিকেও উপকারে লাগান হচ্ছে।

* * *

বিভিন্ন মিশ্রণ-যুক্ত 'ট্র্যাজিক' এই ইউরোপের, লক্ষ লক্ষ অধিবাসী-পূর্ণ বড় বড় শহরে, যে সব শহর আজ modern, civilised, যথা Berlin, Vienna, Budapast প্রভৃতিতে,—আজ লোকে হতাশার তাড়নায় জ্বলছে। প্রতিদিন কত কত লোকে না খেয়ে মারা যাচ্ছেও। না খেয়ে মরা, ১৯৩২ সালে,—কেউ কি বলে দিতে পারে, কেন? ক্যানাডাতে কয়লার বদলে ইঞ্জিনে গম পোড়ান হচ্ছে, ব্রেজিলে কাফী সমুদ্রের জলে ছুঁড়ে ফেলা হচ্ছে, আর এখানে অনাহারে লোকের মৃত্যু—! এর প্রতিকার কোথায়? (ক্রমশ)

* * *

(লেখক, জিস্‌কা ; অনুবাদক, শ্রীতরুণ ঘোষাল)

বিরক্তিকর ব্যাপার

মনের মানুষ মনেতে থাক্,
বাহিরে তাহার বৃথাই খোঁজ,
নাগাল তাহার পাইলে হায়
দেখিবি হয়তো চ্যাপ্টা nose!
দেখিবি মানস-প্রতিমা, তার
রক্ত-মাংস-অস্থি-সার!
থোড়বড়ি খাড়া উচ্ছে পুঁই,
ঘুরিয়া ফিরিয়া বারম্বার!
বাহিরে তাহারে চাস্ না আর.
তাহারে চাস্ তো নয়ন বোজ!

দাঁত বার করে পশুটা কয়,
"রয়েছে আমার প্রচুর লোভ,
আমি তো খুঁজিব দুনিয়াময়
নাহলে আমার মেটে না ক্ষোভ!
এ কি ছোঁক্ ছোঁক্—কি নিস্‌পিস্,
ক্ষুধার জ্বালায় অহর্নিশ!
এ সাধ মিটায়ে মরিতে চাই,
হোক্ সে অমিয় হোক্ সে বিষ!
চাঁদের কিরণ, শ্যামার শিস্,
মনের সায়রে ফেলিছে টোপ্!

দেবতা এবং অসুর হায়
ঝগড়া করিছে চিরটা কাল,
তবুও ফুল তো ফুটিতে চায়
চাঁছিতে চাই যে কামান গাল!
আমি যে প্রেমিক গোবর গুঁই,
হৃদয় বলতো কোথায় থুই?
বিছানা ভরেছে ছারপোকায়,
স্বপনের আশে তাতেই শুই!
থোড়বড়ি খাড়া উচ্ছে পুঁই,
সবাই আমারে করিছে ঘাল!

কোথায় কাহার ডাগর চোখ,
কোথায় কাহার দোদুল দুল,
অমনি হায় রে আমি না-হক্
করিয়া ফেলি যে হিসাব ভুল!

কোথায় কখন কলতলায়,
কাহার কণ্ঠ কলকলায়,
অমনি হায় রে চিত্ত মোর
মাগুরের মত খলবলায়!
নয়ন দুটিও ছলছলায়,
ছাঁটিয়া ফেলি যে ঘাড়ের চুল!"

বলিনু তাহারে, "সাম্‌লে চল,
বড়ই তোর যে বেড়েছে বাড়,

প্রেমের পথ যে খুব পিছল,
পিছ্‌লে গেলেই খাবি আছাড়!

ভাঙিবে হাড় ও ভাঙিবে মন,
খুঁজিবি তখন অনুক্ষণ,
কোথায় আফিং, কোথায় লেক,
কোথা ডাক্তার—কোথায় 'ফোন'!
আমার গোপন যুক্তি শোন,
মানস প্রতিমা টুতিমা ছাড়!"

ভাবিলাম বুঝি এ বিদ্রূপ
শুনিয়া যা হোক থামিল চোর,
বদল হইল মুখের রূপ
ঝরিতে লাগিল নয়ন লোর!

হঠাৎ থামিল কলেজ 'বাস,'
অমনি আবার সর্ব্বনাশ,
বাহির করিয়া দন্ত সব,
দেখিনু ফেলিছে দীর্ঘশ্বাস!
ইচ্ছা করিছে একটি ঠাস্
চড়েতে তাহার ভাঙাই ঘোর!

"বনফুল"

———

বাঙালী জাতির ভবিষ্যৎ

[অমৃতবাজারের কল্যাণে হঠাৎ একদিন জানিতে পারিলাম যে পাটনার কোন এক সভায় আমি নাকি একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছি—"the theme of which was that if Bengalees do not take resoit to self-determination they will be effaced from this work,." কথাটি বিশ্বাস হইতেছিল না। কিন্তু আনন্দবাজারের পৃষ্ঠা উল্টাইতে উল্টাইতে যখন দেখিতে পাইলাম যে আমি সত্যসত্যই একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছি—"যাহার মর্ম্মার্থ এই যে বাঙালী আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা না করিলে তাহার অস্তিত্ব লোপ পাইবে" তখন মনে হইল যে দুই-দুইটি (বিশেষ করিয়া বাংলার শ্রেষ্ঠ দুইটি) সংবাদপত্র ভুল করিতে পারে না। ভুল হয়ত আমিই করিয়াছি বা করিতেছি। ভুল শোধরাইবার জন্যই সেই মর্ম্মেই এই প্রবন্ধের অবতারণা—]

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়া গেলেন—"বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি।" বাঙালীর মাথার টনক নড়িল। অতি-বিস্মৃত অতীতকে বর্ত্তমানে আনিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চলিতে লাগিল! সফলও প্রায় হইয়া আসিয়াছে। এমন সময় কে বা কাহারা ধুয়া ধরিল—বাঙালী-জাতির অবনতি ঘটিয়াছে। শ্রদ্ধেয় রামানন্দবাবু সেইদিন হইতে আজ পর্য্যন্ত এক যুগ ধরিয়া কাগজে-কলমে দেখাইয়া আসিতেছেন যে পূর্ব্বোক্ত উক্তির কোন ভিত্তি নাই। বাঙালী প্রায় আশ্বস্ত হইয়া আসিয়াছে এমন সময় শ্রদ্ধাস্পদ নীরদচন্দ্র চৌধুরী জানাইলেন—বাঙালীর কোন দিন কিছু ছিল না—এখনও নাই। বাঙালী স্তম্ভিত। গত বৎসর কলিকাতায় প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন হইয়া গেল। প্রবাস হইতে সুবিমলচন্দ্র সরকার স্বদেশবাসীদের আপনার অভিভাষণে শুনাইলেন—ভয় নাই, বাঙালী এখন মহা জাতি তো বটেই, মহাপথিকও—জগতের

সহিত পাল্লা দিয়া সে একই রাস্তা দিয়া অনন্তের দিকে চলিয়াছে! কথাটিতে ভয় নাই সত্য—কিন্তু সরল বাংলা অর্থে ভয় যথেষ্টই। সুবিমলবাবু কি ব্যঙ্গ করিয়া ইহাই জানাইতে চাহিয়াছেন যে বাঙালী-জাতি, ইহুদী বা বেদে হইয়া উঠিয়াছে বা উঠিতেছে। কে জানে? এদিকে সুবিমলবাবু যে শহর হইতে আসিয়াছিলেন সেই শহরে সেই সময়েই ডক্টর রাধাকমল আসিয়া বলিয়া গেলেন—ম্যালেরিয়া দেশের (অর্থাৎ বাংলার) দুই-তৃতীয়াংশ ছাইয়া ফেলিয়াছে, মৃত্যুর হার দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে এবং অদূর ভবিষ্যতে, এমন কি পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে, যে জায়গা ছিল বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল তাহা শ্মশানে পরিণত হইবে। হয়ত। কিন্তু মুস্কিল বাধিয়াছে চুনোপুঁটীদের—তাহারা কোন দিকে মুখ ফিরাইবে ভাবিয়া পায় না।

কবি গাহিলেন—"সুজলা সুফলা, শস্যশ্যামলা—"। চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল শরতের গাঢ় নীল আকাশ, তাহার উপরে শুভ্র লঘু মেঘখণ্ড ইতঃস্তত: ভ্রাম্যমান; শ্যামল ধানের ক্ষেত, মৃদু বাতাসে দোল খাইয়া আকাশে বাতাসে মৃদু গুঞ্জরণ তুলিয়া কল্পলোকের সৃষ্টি করিয়াছে; শ্বেতশুভ্র কাশগুলি সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। মানসচক্ষে দেখিতে পাইলাম, বাঙালীর গোলাভরা ধান, একান্নবর্ত্তী পরিবার। স্মৃতিপটে ফুটিয়া উঠিল, সুস্থ, সবল, হাস্যমুখ বাঙালী। ঔপন্যাসিক আসিয়া লিখিলেন পল্লীসমাজের কথা। সে উপন্যাস বায়স্কোপের পর্দ্দায় ফুটিয়া উঠিল। শিক্ষিত আত্মাভিমানী (আত্মপ্রতিষ্ঠিতও নয় কি?) বাঙালী যুবক আসিয়া কহিল, "বইটা দেখে পাড়াগাঁ সম্বন্ধে বেশ একটা idea হয়ে গেল যাহোক।" রাত্রে আহারের পর সিগারেটের ধূমে ফুটিয়া উঠিল—আত্মকলহ, গৃহবিবাদ, পরশ্রীকাতরতা, নীচাশয়তা—আরও কত কি? দৃষ্টি কোন দিকে দিব?

দ্রুতগামী ষ্টীমার, রেল, তারের লাইন সংবাদ বহন করিয়া আনিল, বাংলার ঘরে ঘরে দুর্ভিক্ষ, চতুর্দ্দিকে বন্যা, পল্লীগ্রাম ছারেখারে যাইতেছে। ঘরে ঘরে চিতাধূম উঠিয়াছে। বাংলা মহাশ্মশানে পরিণত হইতে চলিয়াছে। তা যাউক। পথে পথে তীব্র বৈদ্যুতিক আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে। বায়স্কোপে-বায়স্কোপে হাসির হিল্লোল উঠিয়াছে। দোকানে-দোকানে বিভিন্ন পসরার রূপ পথচারী পথিকের মন চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। করুক। কিন্তু সমস্যা—চাহিব কোন দিকে?

বাংলার দিকপালগণ একপা বাড়াইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। কোন দিকে দেখিব? সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বিজ্ঞানে জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, ব্যবসায়ে রাজেন্দ্রনাথ, সকলেই সেই একই। আর কোন দিকে দেখিব—কলায়, শিল্পে, রাজনীতিতে···সেই একই কথা।

কিন্তু তাহার পর?—তাহার পর? নিরন্ধ্র অন্ধকার। দূরে ক্ষীণ চিতারশ্মি হইতে নির্গত ক্ষীণ ধূম্‌রেখা আকাশমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলিয়াছে। শৃগালেরা কি যেন লইয়া কোলাহল করিতেছে—বোধহয় অর্দ্ধদগ্ধ মাংসপিণ্ড। পৃথিবীর গলদেশ হইতে কাঁটার মত বাঙালী জাতিটাকে তুলিয়া ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। মেজর গুপ্তের অপারেশন সাক্‌সেস্‌ফুল হইয়াছে। "জাগো; শঙ্করী, জাগো!"

* * *

ঘুম ভাঙিয়াছে। বিছানায় বসিয়া-বসিয়া চা খাইতে খাইতে হঠাৎ চোখ পড়িল টেবিলের তলায়—গাঁজার কলিকাটি ভাঙিয়া রহিয়াছে।

ম. চ. স.

তিমিঙ্গিল

তিমি মৎস্যই যে পৃথিবীর বৃহত্তম জীব, এ বিষয়ে জ্ঞানী ব্যক্তিরা একমত। আমি কিন্তু নিতান্ত অজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও বলিতে পারি যে, তিমিঙ্গিল নামধারী আর একটি অতি বৃহদায়তন জীব আছে যাহারা তিমি মৎস্যকে গিলিয়া খায়। বিশ্বাস না হয়, অভিধান দেখুন।

অপিচ, তিমিঙ্গিল যদি থাকিতে পারে, তবে তিমিঙ্গিল-গিল (যাহারা তিমিঙ্গিলকে গিলিয়া খায়) থাকিবে না কেন? এবং তিমিঙ্গিল-গিল থাকা যদি সম্ভবপর হয় তবে তিমিঙ্গিল-গিল-গিল থাকিতেই বা বাধা কি?

এই ভাবে প্রশ্নটাকে অনন্তের পথে ঠেলিয়া লইয়া যাওয়া চলিতে পারে। কিন্তু তাহাতে অনর্থক কতকগুলা গিল-গিল-গিল বাড়িয়া যাওয়া ছাড়া আর কোনই লাভ হইবে না। আমাদের প্রতিপাদ্য এই যে, জগতে সর্ব্বত্রই বৃহৎকে বৃহত্তর গ্রাস করিয়া থাকে। অর্থাৎ—বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।

শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত গুঁই মহাশয় বিছানায় চিৎ হইয়া শুইয়া চিন্তা করিতেছিলেন। রাত্রি এগারোটা বাজিতে সাতাশ মিনিট সময়ে তিনি হঠাৎ তড়াক্ করিয়া শয্যায় উঠিয়া বসিলেন। ঘরে আর কেহ থাকিলে মনে করিত, নিশিকান্তবাবু বুঝি বৈদ্যুতিক 'শক্' খাইয়াছেন। হইয়াছিলও তাই। তাঁহার মস্তিষ্কের ভিতর দিয়া চল্লিশ হাজার ভোল্টের প্রচণ্ড একটি আইডীয়া খেলিয়া গিয়াছিল।

নিশিকান্তবাবু একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ দালাল; ব্যবসা-সম্পর্কীয় সকল

বিত্তার হুনরী। তাঁহার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। ক্রয়-বিক্রয় তেজী-মন্দা বাজার-জ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহার সমকক্ষ কলিকাতা শহরে বড় কেহ ছিল না। এই সূক্ষ্ম বাজার-জ্ঞানের ফলে গত পঁচিশ বৎসরে তিনি কত লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহা তিনি ও ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষ ছাড়া আর কেহ জানিত না। যাহারা কর্ণোয়ালিস ষ্ট্রীটে তাঁহার চমৎকার সুসজ্জিত দোতালা বাড়ীখানা দেখিত, তাহারা সহিংসভাবে অনুমান করিত মাত্র।

কিন্তু গত কয়েক বৎসর ধরিয়া বাজারের এমন অবস্থা হইয়াছে যে, নিশিকান্তবাবুর চিত্তে সুখ নাই। কাজকর্ম্ম প্রায় বন্ধ আছে। কারণ, কাজ করিতে গেলেও লাভের মাত্রা এত কম হস্তগত হয় যে খরচা পোষায় না। ব্যবসার জগৎটা যেন ধীরে ধীরে প্রলয়পয়োধিজলে ডুবিয়া যাইতেছে।

নিশিকান্তবাবুর অবশ্য অর্থোপার্জ্জনের কোনও প্রয়োজন নাই; ব্যাঙ্ক হইতে ছয় মাস অন্তর যে সুদ বাহির করেন তাহাতে তাঁহার পাঁচটা হাতী পুষিলেও ব্যয়সঙ্কোচ করিতে হয় না। কিন্তু নিশিকান্ত কর্ম্মী পুরুষ, অর্থোপার্জ্জনের নেশা তিনি পঁচিশ বৎসর ধরিয়া অভ্যাস করিয়াছেন। তাই, আফিমের মৌতাতের মত উপার্জ্জনের মোহই তাঁহাকে বেশী করিয়া চাপিয়া ধরিয়াছে। অথচ দারুণ পরিতাপের বিষয় এই যে, বর্ত্তমান মন্দার বাজারে উপার্জ্জন একেবারেই নাই।

নিশিকান্ত জগদ্ব্যাপী অবসাদের মধ্যে কোথাও একটু আশার আলো দেখিতে পাইতেছিলেন না, এমন সময়ে রাত্রি এগারোটা বাজিতে সাতাশ মিনিটে তাঁহার মাথায় চল্লিশ হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল।

আলোক-বিভ্রান্তের মত নিশিকান্ত কিছুক্ষণ বিছানায় জড়বৎ বসিয়া রহিলেন। তাঁহার মাথায় ঘুরিতে লাগিল,—মোমবাতি! হ্যারিকেন লণ্ঠন!!

হাত বাড়াইয়া তিনি বেড্-স্যুইচ্ টিপিলেন; রক্ত বর্ণ নৈশ দীপ মাথার উপর জ্বলিয়া উঠিল। নিশিকান্ত প্রায় দশ মিনিট মুগ্ধ তন্ময় ভাবে সেই দিকে তাকাইয়া রহিলেন; তারপর ধীরে ধীরে আবার শয়ন করিলেন।

বালিশের পাশে তাঁহার নোটবুক ও পেন্সিল থাকিত। নিশিকান্ত বুকের তলায় বালিশ দিয়া উপুড় হইয়া শুইলেন, তারপর নোটবুকের পাতা উল্টাইতে লাগিলেন। নোটবুকের অবোধ্য ইঙ্গিতে তাঁহার ব্যবসা সংক্রান্ত যাবতীয় গুপ্ত কথা লেখা ছিল, তিনি সেইগুলি পড়িতে পড়িতে মনে মনে হিসাব করিতে লাগিলেন। প্রথমে হিসাব করিলেন, কত টাকা তিনি ইচ্ছা করিলেই ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য স্থান হইতে বাহির করিতে পারেন। হিসাব বোধ করি বেশ মনোমত হইল, কারণ তিনি পরিতোষের নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

অতঃপর তিনি নোটবুকের পাতায় পেন্সিল দিয়া আর এক-জাতীয় অঙ্ক কষিতে আরম্ভ করিলেন। বোধ হয় এটা খরচের হিসাব। সমস্ত যোগ করিয়া পাঁচ লক্ষ টাকার কিছু বেশী হইল। নিশিকান্ত খাতা হইতে মুখ তুলিয়া বিড় বিড় করিয়া কি বলিলেন, তারপর নোটবহি বন্ধ করিয়া বালিশের পাশে রাখিয়া দিলেন। তাঁহার মুণ্ডিত মুখে দশ হাজার দীপশক্তির যে হাসিটি ফুটিয়া উঠিল তাহার কাছে রক্তবর্ণ নৈশ দীপের প্রভা একেবারে ম্লান হইয়া গেল।

তিনি মনে মনে বলিলেন,—'তিন দিনে বাহাত্তর হাজার টাকা! মানে—রোজ চব্বিশ হাজার!'

নিশিকান্তবাবুর স্ত্রী পাশের ঘরে শয়ন করিতেন, মাঝের দরজায় পর্দ্দার ব্যবধান। নিশিকান্ত বাবুর দ্বিতীয় পক্ষ—তবে ভার্য্যাটি নেহাৎ তরুণী নয়, বয়স বত্রিশ তেত্রিশ। তিনি অত্যন্ত সৌখিন এবং বন্ধ্যা, এই জন্য বাংলা সাহিত্যে তাঁহার প্রবল অনুরাগ। প্রায়ই মাসিক পত্রিকায় কবিতা লেখেন।

নিশিকান্তবাবু ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন, পর্দ্দার নীচে দিয়া আলো দেখা যাইতেছে। বুঝিলেন, গৃহিণী এখনো মাসিক পত্র শেষ করেন নাই। জিজ্ঞাসা করিলেন,—'হ্যাঁগা, জেগে আছ?'

পাশের ঘর হইতে হ্যাঁগা উত্তর দিলেন,—'হুঁ।'

আলুথালু বস্ত্র কোমরে জড়াইয়া নিশিকান্ত স্ত্রীর ঘরে গেলেন। স্ত্রী পিঠে বালিশ দিয়া অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় শয্যায় দেহ প্রসারিত করিয়াছিলেন, মাথার শিয়রে একটা ত্রিপদের শীর্ষে বৈদ্যুতিক ল্যাম্প জ্বলিতেছিল। স্ত্রী কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া নিশিকান্তবাবুর চেহারা দেখিয়া ঈষৎ ভ্রূকুটি করিলেন।

নিশিকান্ত আলোর নিকটে গিয়া স্থইচ টিপিয়া আলো নিবাইয়া দিলেন; আবার জ্বালিলেন, আবার নিবাইয়া দিলেন।

বিরক্তভাবে গৃহিণী বলিলেন,—'ও কি হচ্ছে?'

নিশিকান্ত বলিলেন,—'বেশ—না? এই ইলেক্‌ট্রিক বাতি। স্থইচ টিপিলেই নিবে যায় আবার স্থইচ টিপিলেই জ্বলে ওঠে।'

স্ত্রী ধমক দিয়া বলিলেন,—'এত রাত্রে হল কি তোমার?'

নিশিকান্ত স্ত্রীর শয্যার পাশে আসিয়া বসিলেন; একটু যেন অন্য-মনস্ক ভাবে বলিলেন,—'আমি ভাবছি একটা ছাপাখানা করতে কত খরচ লাগে।'

স্ত্রীর হাত হইতে মাসিক পত্র পড়িয়া গেল। তিনি সচকিতে উঠিয়া

বসিলেন। বহুদিন হইতে তাঁহার বাসনা নিজের ছাপাখানা করিয়া একটি মাসিক পত্রিকা বাহির করেন; মাসিক পত্রে কেবল কবিতা ছাপা হইবে। পত্রিকার নাম হইবে—'মন-কুসুম'—সম্পাদিকা হইবেন স্বয়ং শ্রীমাধুরী দেবী!

স্বামীকে এই সুন্দর পরিকল্পনার কথা বলিয়াছিলেন। কবিতার মাসিক পত্র কিরূপ চলিবে সে-বিষয়ে নিশিকান্তবাবুর মনে কোনো মোহ ছিল না। অথচ স্ত্রীর একটা সখ মিটাইবার ইচ্ছা তাঁহার যে একেবারেই ছিল না, তাহাও নয়। কিন্তু বাজার মন্দা বলিয়া নিশিকান্ত গা করেন নাই।

মাধুরী দেবী এক নিশ্বাসে বলিলেন,—'সত্যি কিনবে?—আমার কতদিন থেকে যে সখ। 'মন-কুসুম'—কেমন নামটি হবে বল ত? নীচে লেখা থাকবে—সম্পাদিকা শ্রীমাধুরী দেবী!—খরচ এমন কিছু নয়; সেদিন 'নীলকান্ত প্রেসের' মালিক আমার কাছে এসেছিল। তারা প্রেস বিক্রি করতে চায়, কোথা থেকে শুনেছে আমি কিনতে পারি। খুব বড় প্রেস—ইংরেজী বাংলা সব আছে; নতুন দাম সাতাশ হাজার টাকা। বলছিল, আঠার হাজার পেলেই বিক্রি করবে। তা—কষামাজা করলে হয়ত কিছু কমেও দিতে পারে।'

নিশিকান্ত ঈষৎ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—'খবর নিও, যদি বারো হাজারে ছাড়ে ত নিতে পারি।'

মাধুরী দেবী বলিলেন,—'অত কমে দেবে কি? আচ্ছা—'

নিশিকান্ত শয্যাপ্রান্ত হইতে উঠিলেন। মাধুরী দেবী (তাঁহার হাত টানিয়া ধরিয়া তরল কণ্ঠে) বলিলেন,—'এখনি শুতে চললে?'

নিশিকান্ত আলস্য ভাঙিয়া বলিলেন,—'হাঁ। আর দ্যাখ, কাল দু'টিন ভাল কেরাসিন তেল আর গোটা দশেক হ্যারিকেন-লণ্ঠন কিনে

আনিও। আর পাঁচ বাণ্ডিল মোমবাতি।' বলিয়া নিগূঢ় ভাবে হাস্য করিতে করিতে তিনি নিজের শয্যায় গিয়া শয়ন করিলেন।

অতঃপর সাতদিন ধরিয়া নিশিকান্তবাবুর ভোমরা রঙের ছোট্ট সিডান-বডির গাড়িখানি মধু-সঞ্চয়ী মৌমাছির মত কলিকাতার পথে পথে গুঞ্জন করিয়া উড়িয়া বেড়াইল। নিশিকান্তবাবু কোথায় কোথায় গেলেন ও কাহার সহিত নিভৃতে কি কথা বলিলেন তাহা ব্যক্ত করা আমাদের সাধ্য নয়—সাধ্য হইলেও বলিতাম না। পরের গুহ্য কথা প্রকাশ করিয়া দিতে আমরা ভালবাসি না। এই সব যাতায়াতের ফলে নিশিকান্তবাবুর ব্যাঙ্ক হইতে লক্ষাধিক টাকা অপহৃত হইয়া কোন্ মৌচাকে সঞ্চিত হইল তাহাও বলিব না। ঘুষির পুংলিঙ্গে যে-শব্দ উৎপন্ন হয় তাহাকে আমরা অত্যন্ত ঘৃণা করি।

তারপর মাল খরিদ আরম্ভ হইল। নিশিকান্তবাবু যে যে মাল খরিদ করিয়া বাজার কোণঠাসা করিলেন তাহার ফিরিস্তি দিবার প্রয়োজন নাই; তিনি বাজার উজাড় করিয়া গুদামজাত করিলেন। বড় বড় দেশী বিলাতী ব্যবসায়ীরা বিস্ময়ে ভ্রূ তুলিল, মনে মনে হাসিল,—কিন্তু অকপট আনন্দে হাত ঘষিতে ঘষিতে মাল সরবরাহ করিল। কেবল নিশিকান্তবাবু কেরাসিন তেলের দিকে গেলেন না; অনেক মূলধন চাই, লাখে কুলাইবেনা। অপ্রসন্ন চিত্তে তিনি মনে মনে বলিলেন—'করে নিক্ ব্যাটারা কিছু লাভ।'

দশদিনের দিন নিশিকান্তবাবুর সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হইল। তিনি গুদামে গিয়া মাল পরিদর্শন করিলেন, অফিসে বসিয়া খাতাপত্র তদারক করিলেন; তারপর চেয়ারে ঠেসান দিয়া একটি স্থূলকায় সিগার ধরাইয়া বলিলেন,—'এইবার।'

সেইদিন রাত্রি সাতটার সময় কলিকাতা শহরের সমস্ত বিদ্যুৎবাতি

নিবিয়া গেল। রাত্রি দশটার সময় রাস্তার গ্যাস বাতিও হঠাৎ কয়েকবার দপদপ করিয়া চক্ষু মুদিল—তিনদিনের মধ্যে আর জ্বলিল না।

* * *

আলোকহীন মহানগরীর বর্ণনা আমরা করিব না। অন্ধকারের যে একটা রূপ আছে—কালিমা লইয়া যাঁহাদের কারবার তাঁহারা সে রূপ নয়ন ভরিয়া দেখুন এবং বর্ণনা করুন। নিশিকান্তবাবুর মত আমরা আলোর কারবারী।

রাস্তা এবং ঘর অন্ধকার; ট্রাম বন্ধ। হ্যারিকেন লণ্ঠন ও মোমবাতির দর ব্যাঙের মত লাফাইয়া লাফাইয়া চড়িতে লাগিল। অথচ ঐ দুইটি দ্রব্য নিশিকান্তবাবুর গুদামে বন্ধ। তিনি অল্পে অল্পে ছাড়িতে আরম্ভ করিলেন।

দ্বিতীয় রাত্রেও যখন আলো জ্বলিল না, তখন চারিদিকে বিরাট হৈ হৈ পড়িয়া গেল। আশ্চর্য্য দৈব দুর্ঘটনায় গ্যাস ও ইলেকট্রিক যন্ত্র এমন খারাপ হইয়া গিয়াছে যে কিছুতেই মেরামৎ হইতেছে না। কিন্তু গৃহস্থের আলো চাই। লণ্ঠন ও মোমবাতির দাম এমন একটা কোঠায় গিয়া উঠিল যে কল্পনা করাও কঠিন। নিশিকান্তবাবু মাল ছাড়িতে লাগিলেন, এবং ব্যাঙ্কে টাকা পাঠাইতে লাগিলেন। যে সব বড় বড় ব্যবসাদার একগাল হাসিয়া নিশিকান্তকে মাল বিক্রয় করিয়াছিল, তাহারা হাত কামড়াইতে লাগিল।

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার সময় নিশিকান্তবাবু হিসাব করিয়া দেখিলেন, তাঁহার মূলধন উঠিয়া বারো হাজার টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। তাছাড়া এখনো ষাট হাজার টাকার মাল গুদামে মজুত।

বারো হাজার টাকা পকেটে লইয়া নিশিকান্তবাবু অফিস হইতে বাড়ী ফিরিলেন। স্ত্রী তিনটা লণ্ঠন জ্বালিয়া স্বামীর জন্য স্বহস্তে চা

তৈয়ার করিতেছিলেন, তাঁহার কোলে নোটের তাড়া ফেলিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—'এই নাও।'

মাধুরী দেবী একমুখ হাসিয়া স্বামীকে অভ্যর্থনা করিলেন—'আজ সরকারকে বাজারে খোঁজ নিতে পাঠিয়েছিলুম; একটা হ্যারিকেনের দাম পাঁচটাকা!—হ্যাগা, আর ক'দিন?'

* * *

তৃতীয় দিন সন্ধ্যার সময় নিশিকান্তবাবুর গুদাম খালি হইয়া গেল।

শেষ কিস্তির ষাট হাজার টাকা ব্যাঙ্কে পাঠাইবার সময় ছিলনা। এই টাকাটাই নিশিকান্তবাবুর মূল লভ্যাংশ। এত টাকা এখন কোথায় রাখিবেন—নিশিকান্ত একটু চিন্তা করিলেন। অফিসের লোহার সিন্দুকে রাখিয়া গেলেও চলে, কিন্তু—দু'একটা সংবাদ নিশিকান্তর স্মরণ হইল। অন্ধকারের সুযোগ লইয়া চোর ও গুণ্ডার দল খালি অফিস-বাড়ী ইত্যাদি ভাঙিয়া লুঠ করিতেছে—বড় বড় দুই তিনটা অফিসে এইরূপ ব্যাপার হইয়া গিয়াছে। নিশিকান্ত নোটের গোছা পকেটে পুরিয়া লইলেন। বাড়ীতে রাখিলেই সব চেয়ে নিরাপদ হইবে। বাড়ীতে পাঁচটা গুর্খা দরোয়ান, দশটা চাকর আছে; তাহার উপর আবার দু'জন কনেষ্টবল্‌কে খরচা দিয়া পাহারা দিবার জন্য নিয়োগ করা হইয়াছে।

নিশিকান্ত অফিস হইতে বাহির হইয়া যখন মোটরে চড়িলেন, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। মোটরের কাচের ভিতর দিয়া দু'ধারি রাস্তার চেহারা সকৌতুকে দেখিতে দেখিতে চলিলেন। কলিকাতা যেন রাত্রিযোগে ভৌতিক শহরে পরিণত হইয়াছে। বড় বড় দোকানের বিদ্যুৎ-দন্ত বিকশিত হাসি আর নাই, অধিকাংশই বন্ধ। যেগুলি খোলা আছে তাহাতে মোমবাতি ও লণ্ঠন জ্বলিতেছে। পথে

গাড়ী মোটরের চলাচলও কম। মানুষ যাহারা যাতায়াত করিতেছে তাহাদের নিশাচর প্রেত বলিয়া ভ্রম হয়।

কলেজষ্ট্রীট বাজারের নিকটে পৌঁছিয়া নিশিকান্তবাবুর ভারি কৌতূহল হইল। কোনও একটা বড় কাজ করিয়া সাধারণের মতামত জানিবার ইচ্ছা স্বাভাবিক। তিনি মোটর হইতে নামিলেন। একটা ক্ষুদ্র দোকানে আলো জ্বলিতেছিল, তাহার সম্মুখীন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'মোমবাতি আছে?'

দোকানদার বলিল,—'আজ্ঞে আছে, তিনটাকা বাণ্ডিল।'

নিশিকান্ত পকেট হইতে তিনটাকা বাহির করিয়া দিয়া ছদ্ম বিরক্তির কণ্ঠে বলিলেন, দিন এক বাণ্ডিল। যত সব চোরের পাল্লায় পড়া গেছে। ইংরেজিতে যাকে বলে 'শার্ক' এই ব্যবসাদারওয়ালা হচ্ছে তাই!'

দোকানদার নেহাৎ অশিক্ষিত নয়, একটু রসিক; বলিল, 'শার্ক ত পদে আছে মশাই, ব্যবসাদারেরা যাকে বলে তিমি মাছ—তাই! আস্ত গিলে খায়। নিন এক বাণ্ডিল।'

নিশিকান্ত দোকানদারের কথাগুলি চাখিয়া চাখিয়া উপভোগ করিলেন; তিনি নিজেই যে তিমিমাছ, দোকানদার তাহা জানে না—অজ্ঞাতসারেই প্রশংসা করিতেছে। তাঁহার ছদ্ম বিরক্তিব ভিতর দিয়া একটু হাসি খেলিয়া গেল। তিনি মোমবাতির বাণ্ডিল লইয়া মোটরের দিকে ফিরিলেন।

মোটরে উঠিতে যাইবেন. এমন সময়—

তিমিঙ্গিল!

নিশিকান্ত হঠাৎ বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার চারিপাশে কয়েকজন লোক নিঃশব্দে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তিনি সচকিতে চারিধারে চাহিলেন; অস্পষ্ট আলোয় মুখমণ্ডলী ভাল দেখা গেল না।

একজন তাঁহার পেটের উপর ছোরার অগ্রভাগে রাখিয়া চাপা গলায় বলিল—'চিল্লাও মৎ!'

আর একজন তাঁহার কোটের ভিতর পকেটে হাত পুরিয়া নোটের তাড়া বাহির করিয়া লইল। নিশিকান্তবাবু হতভম্ব হইয়া রহিলেন। তিমিঙ্গিলের দল ছায়ার মত অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল।

তাহারা চলিয়া যাইবার মিনিটখানেক পরে নিশিকান্ত উন্মত্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—'পুলিস পুলিস! আমার ষাট হাজার টাকা—'

* * *

নিশিকান্ত থানায় গেলেন।

থানার দারোগা বলিলেন,—'লিখে নিচ্ছি। কিন্তু টাকা আর পাবেন না। এই আলোর গোলমাল হয়ে অবধি শহরটা চোর-বদমায়েসের আড্ডা হয়েছে।'

বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে নিশিকান্তবাবুর বিভ্রান্ত চিত্তে একটি ক্ষীণ সান্ত্বনা জাগিতে লাগিল—'যাক তবু বারো হাজার টাকা লাভ রইল।'

রাত্রি আটটার সময় তিনি বাড়ী পৌছিলেন। মাধুরী দেবী অধীরভাবে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি প্রবেশ করিতেই ছুটিয়া গিয়া বলিলেন, 'ওগো, ভারি সুখবর!! নীলকান্ত প্রেস কিনে নিয়েছি। বারো হাজারেই রাজি হয়ে গেল।

নিশিকান্ত বসিয়া পড়িলেন; তাঁহার গলা দিয়া একপ্রকার ঘড় ঘড় শব্দ বাহির হইল। ঘরের মধ্যেও যে তিমিঙ্গিল বসিয়া আছে তাহা কে জানিত!

এই সময়, যেন নিশিকান্তকে বিদ্রূপ করিয়া, কলিকাতার ইলেকট্রিক বাতি আবার জ্বলিয়া উঠিল। বাঙ্গাল যন্ত্র এতদিনে ঠিক হইয়া গিয়াছে!

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

টাইফয়েড

রাত্রি কত হইয়াছে আন্দাজ করা শক্ত।

একটি থার্ড ক্লাস কামরার জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া আনন্দ ঠিক করিবার চেষ্টা করিতেছিল ট্রেনটা হঠাৎ থামিয়া গেল কেন। সোঁ সেঁ শব্দ ছাড়া আর অন্য কিছু শোনা যাইতেছে না।—কিছুদূরে আকাশের গায়ে লাল আলো। আনন্দ বিশেষ কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া আবার শুইয়া পড়িল। ঘুমটা ভাঙিয়া যাওয়াতে বিরক্তও হইল।

শুইবামাত্র 'হুইস্‌ল' দিয়া ট্রেনটা ছাড়িল এবং ছাড়িবার সময় 'ঘচাং' করিয়া সমস্ত গাড়ীটাকে এমন একটা নাড়া দিল যে সামনের বেঞ্চ হইতে একটি ভদ্রমহিলা পড়িয়া যাইতে যাইতে সামলাইয়া লইলেন।

মহিলাটির সঙ্গে যিনি অভিভাবক ছিলেন তিনি শশব্যস্ত হইয়া বাঙ্ক হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "লাগল না কি ?"

মহিলাটি একটু অপ্রস্তুত হইয়াছিলেন—মৃদু হাসিয়া মাথা নাড়িয়া উত্তর দিলেন যে লাগে নাই।

মহিলাটির অভিভাবক-ভদ্রলোক কোনরূপে বাঙ্কের উপর একটু জায়গা করিয়া লইয়া তাহার মধ্যেই নাক ডাকাইতেছিলেন। মহিলাটির শুইবার স্থান ছিল না। তিনি বসিয়া বসিয়া ঢুলিতে লাগিলেন।

আনন্দের ঘুম আসিতেছিল না। সে সন্ধ্যা হইতে একটানা বেশ খানিকটা ঘুমাইয়া লইয়াছে। সে শুইয়া শুইয়া লক্ষ্য করিতে লাগিল যে ভদ্রমহিলাটি ক্রমাগত ঢুলিতেছেন।

হঠাৎ আনন্দের মনে হইল কাজটা অভদ্র হইতেছে।

সে উঠিয়া বসিল এবং একটু ইতস্তত: করিয়া অবশেষে বলিল, "আমি আর ঘুমোব না। আপনি এসে না হয় আমার এই বেঞ্চটাতে শুয়ে পড়ুন।" বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। বাঙ্কের উপর হইতে ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হল?"

আনন্দ বলিল, "আমার ঘুম হয়ে গেছে। ইচ্ছে করলে উনি আমার বেঞ্চটায় শুতে পারেন। বসে ঢুলছেন কি না!"

মহিলাটি একটু লজ্জিত হইয়া মাথা নত করিলেন।

"ধন্যবাদ!—বেশ তো,—অনু শুয়ে পড় তুই। কতক্ষণ আর বসে থাকবি!"

আনন্দ স্থান করিয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

অনু অর্থাৎ অনুপমা সসঙ্কোচে শয়ন করিলেন।

ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতে আনন্দ দেখিল, যাহাকে সে 'মহিলা' বলিয়া মনে করিতেছিল আসলে সে একটি ছিপছিপে রোগা-গোছের মেয়ে—বয়স বড়জোর উনিশ কি কুড়ি!

ধীর মন্থর গতিতে ট্রেন ষ্টেশনে প্রবেশ করিল।

কিউল।

চায়ের সন্ধানে গলা বাড়াইতেই বাঙ্ক হইতে অভিভাবক-ভদ্রলোকটি—অবিনাশবাবু—আনন্দকে বলিলেন, "আমার জন্যেও এককাপ নিন তো!" বলিয়া তিনি বাঙ্ক হইতে নামিয়া বসিলেন।

চা পান করিতে করিতে বাঁ হাতের আঙুল দিয়া মাথার রগ টিপিতে টিপিতে অবিনাশবাবু বলিলেন, "মাথাটা ভারি ধরেছে!"

সর্ব্বাঙ্গে বালাপোষ মুড়ি দিয়া এক বৃদ্ধ কোণে বসিয়া ছিলেন; তিনি অযাচিত ভাবে বলিয়া উঠিলেন, "মাথা ধরেছে তো? পায়ের

ছুটো বুড়ো আঙুলে বেশ করে কসকসিয়ে দড়ি বেঁধে রাখুন তো—এক্ষুনি ছেড়ে যাবে!"

অবিনাশবাবু বলিলেন, "তাই না কি?"

* * *

"কতদুর যাবেন আপনারা?

অবিনাশবাবু উত্তর করিলেন, "সাহেবগঞ্জ।"

আনন্দ যেন অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া উঠিল—"সাহেবগঞ্জ? আমার বাড়ী যে সেখানে। আমিতো সেখানেই যাচ্ছি। সাহেবগঞ্জে কোন জায়গাটায় যাবেন আপনি?"

"হরেরামবাবুর বাড়ী। চেনেন আপনি?"

"চিনি মানে? ঠিক সামনাসামনি বাড়ী আমাদের—একই গলিতে। কিন্তু তাঁরা তো ওখানে কেউ নেই আজকাল—তাঁরা—"

"গিরিডিতে। বাড়ীটা খালি আছে বলেই না যাচ্ছি। ছুটি পেলাম। একটু বেড়িয়ে যাওয়া যাক। হরেরাম আমার সম্বন্ধী।"

অকারণে আনন্দ বলিয়া ফেলিল, "বেশ করেছেন।" কিছুক্ষণ চুপচাপ। আনন্দ বইটা মনোযোগ দিয়া পড়িবার চেষ্টা করিল। আবার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইল, "আপনার সঙ্গে আর কে কে আছেন?"

"আজ এক চাকর ছাড়া আর কেউ নেই। কাল আমার ছেলে এসে পৌছুবে। কলেজের ছুটি হবে কাল তার। অনু আমার মেয়ে। বছর দুই হল স্ত্রী মারা গেছেন। তাই ছেলে-মেয়েদের ছুটি হলেই বেরিয়ে পড়ি কোথাও না কোথাও।"

আনন্দ কোন উত্তর দিল না। জানালা দিয়া সে দেখিতে

লাগিল পাহাড়ের ওপারের আকাশটায় কে-যেন মুঠামুঠা আবির ছড়াইতেছে।

অরুণ-রঞ্জিত মেঘমালা, আলোক স্বপ্নাচ্ছন্ন।

* * *

বেলা প্রায় আটটা বাজে। সাহেবগঞ্জ আসিল বলিয়া!

অবিনাশবাবু বাঙ্ক হইতে নামিয়া বসিয়াছেন।

আনন্দের সহিত নানা বিষয়ে গল্প চলিতেছে।

অনুপমা গল্পে যোগদান করে নাই। সে জাগিয়া অবধি জানালার বাহিরে মুখ বাহির করিয়া দেখিয়া চলিয়াছে।

কি যে এত দেখিতেছে—সেই জানে!

সাহেবগঞ্জ! ট্রেন থামিলেই অবিনাশবাবু বলিলেন, "আমার তিনটে কুলী লাগবে। অনু মা—দেখো কুঁজোটা না ভাঙে! আনন্দবাবু দেখুন"—

হঠাৎ আনন্দ বলিল, "দেখুন, আপনি আমার পিতৃতুল্য। আমাকে 'আপনি' বলে আর লজ্জা দেবেন না। আপনার ছেলে আমার সহপাঠী—না হয় ভিন্ন কলেজেই পড়ি আমরা।"

"আচ্ছা, আচ্ছা—তা সে—মানে" অবিনাশবাবু কি বলিবেন ঠিক করিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিলেন, "আচ্ছা, চারটে কুলীই ডাকো তাহলে।"—

ষ্টেশনে নামিতেই দীর্ঘ ঋজুদেহ বলিষ্ঠ এবং সুদর্শন একটি যুবক আসিয়া আনন্দকে সম্ভাষণ করিল, "কোথায় গিয়েছিলি তুই আনন্দ! আমি রোজ তোর খোঁজ করছি।"

আনন্দ বলিল, "কাশী বেড়িয়ে এলাম।"

মৃণাল গলার স্বর একটু খাটো করিয়া বলিল, "আজ ছটার সময় পাহাড়তলীতে আমরা meet কর্ব্ব!"

আনন্দ বলিল, "কেন?"

"ভুলে গেলে? বেশ ছেলে!"

"ও,—সেই ব্যাপার! আচ্ছা"—

আনন্দের মুখে ক্ষণিকের জন্য চিন্তার ছায়া পড়িল। সে আবার বলিল, "তুই যা এখন। যাব আমি।"

"মনে থাকে যেন"—বলিয়া মৃণাল চলিয়া গেল।

* * *

পথে আসিতে আসিতে অবিনাশবাবু বলিলেন, "বাঃ—চমৎকার পাহাড় তো!—এখান থেকে কতদূর!"

আনন্দ উত্তর দিল, "বেশী দূর নয়। এই রেললাইনগুলো পেরিয়ে একটা মাঠ—আমাদের ফুটবল খেলা হয় সেখানে—সেই মাঠটা পেরিয়ে একটু গেলেই পাহাড়—ওই যে এই বড় পাহাড়টার ওপর একটা গাছ দেখছেন, ওটা একটা তেঁতুল গাছ—আমরা সব নিজেদের নাম খোদাই করে এসেছি ওর গায়ে।"

অনুপমার চক্ষু দুইটি কৌতূহলে ভাষাময় হইয়া উঠিল।

অবিনাশবাবু বলিলেন, "এখানকার রাস্তাঘাটগুলিও বেশ ঝরঝরে!—এই রাস্তাটা সোজা বুঝি গঙ্গার ধারে গেছে?" বলিয়া তিনি একটি লাল কাঁকরের পরিচ্ছন্ন রাস্তার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন। চমৎকার রাস্তাটি! দুধারে গাছের সারি। গাছের ফাঁকে ফাঁকে আকাশ দেখা যাইতেছে। লাল রাস্তার উপর আলো-ছায়ার ছবি আঁকা। রাস্তার দুইপাশে প্রায় একই ধরণের পরিষ্কার পাকাবাড়ী। প্রায় প্রত্যেকটিরই সম্মুখে ছোট বাগান।

আনন্দ বলিল, "হ্যাঁ এই রাস্তাটা সোজা গঙ্গার ধারের দিকে গেছে—চার্চ্চ হয়ে!"

তাহার পর আনন্দ দেখাইতে দেখাইতে চলিল, "এটা ইস্কুল, ওই ডাক্তারখানা, এইটে মিউনিসিপ্যাল অফিস, এইটে গার্ড-বাঙলা—ওগুলো রেলওয়ে কোয়ার্টার"—

বেশ পরিচ্ছন্ন ছোট শহর।

অনুপমা বলিল, "আজ আমরা একটু পরে বেড়াতে বেরোব; কি বল বাবা?"

"আজ যাক। শরীরটার তেমন যুৎ নেই!"

২

ভালো ছেলে বলিতে যাহা বুঝায়, শ্রীমান আনন্দমোহন রায় তাহাই। এ অঞ্চলে নাম-করা ছেলে। স্কুলের সে ভাল ছেলে ছিল—কলেজেও ভাল লেখাপড়া করিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষায় যদিও সে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেয় নাই—কিন্তু কীর্ত্তিমান যে-কোন ছাত্র অপেক্ষা তাহার জ্ঞানের পরিধি ছোট নয়। চরিত্রবান সুস্থ অমায়িক যুবক। পরোপকারী। এই সাহেবগঞ্জেই যে-কোন বাড়ীতে অসুখবিসুখ করিলে আনন্দই ছিল সকলের ভরসা-স্থল। তাহার একদল ভক্ত ছিল—সেই ভক্তেরা অধিকাংশই স্কুলের ছাত্র। তাহারা আনন্দের জন্য সমস্ত করিতে প্রস্তুত।

আহারাদির পর আনন্দ নিজের ঘরে শুইয়া খবরের কাগজে মনোযোগ দিয়াছে এমন সময় বৌদিদি দর্শন দিলেন—

"কি ঠাকুরপো, কেমন দেখে এলে কাশী?"

"বেশ ভালই।"

"কোথায় উঠেছিলে?"

"আমার এক বন্ধুর বাসায়।"

"ভাগ্যে ঠিকানা দিয়ে যাওনি। তা হলে বিপদে পড়ে যেতে!"

"কেন?"

"টেলিগ্রাম যেত।"

"কেন?"—আনন্দ উঠিয়া বসিল।

"কেন দেখ তাহলে!" বলিয়া হাস্যমুখী বৌদিদি উঠিয়া গেলেন এবং ক্ষণপরে একটি 'ফোটো' হস্তে ফিরিয়া আসিলেন।

"কেন, এই দেখ!"

আনন্দ দেখিল। বলিল, "কাশীতে থাকে বুঝি?"

"কুষ্ঠি প্রভৃতির সব মিল—এখন মেয়ে পছন্দ হলেই হয়।"

আনন্দ বলিল, "আচ্ছা কেন তোমরা সবাই মিলে এমন করে উঠে-পড়ে লেগেছ বল দেখি!"

"তবে কি বলতে চাও বিয়ে করবে না! পঁচিশ বছর বয়স হতে চল্‌ল। আর কেন?"

"এখনতো তোমার উৎসাহের অন্ত নেই—কিন্তু বিয়ের পর তখন তুমিই নানারকম খুঁৎ বার করে একটা ঝগড়ার সৃষ্টি করবে। বেশ তো আছি। তোমাদের এত মাথাব্যথা কেন?"

"হিংসে করে!" বলিয়া বৌদিদি মুখ টিপিয়া হাসিলেন।

"আমি বিয়ে করে তোমাদের মত ন্যাতা-জোবড়া হয়ে থাক্‌তে চাই না!"

"তোমার এত পঞ্চাশ-গণ্ডা হাঙ্গামা পোয়াবে কে বলতো? ঘন ঘন চা চাই! খাওয়া নাওয়ার ঠিক নেই। সেবক-সমিতির পাণ্ডাগিরি করে রাত্রে বারোটার সময় আর দিনে দুটোর সময় বাড়ী ফিরবে—কে তোমার জন্যে রোজ রোজ বসে থাক্‌বে!"

"কেন, তুমি! অনর্থক বাড়ীতে নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করার কোন হেতু দেখতে পাচ্ছি না। তুমিতো একাই স্বচ্ছন্দে বেশ ম্যানেজ করছ!"

"পারবো না আমি।"

"আচ্ছা যখন অপারগ হবে তখন দাদার আর একটা না হয় বিয়ে দেওয়া যাবে। তোমাকে তখন পেন্‌শন্ দিয়ে কাশী পাঠিয়ে দিলেই হবে!"

"ইস্—তাই বৈ কি! দাদা তোমার কক্‌খোনো বিয়ে কর্ব্বে না! আমি মরে গেলেও না।"

আনন্দ খানিকক্ষণ বৌদিদির দিকে চাহিয়া রহিল। নিজের দাদাকে সে ভাল করিয়াই চিনিত। বৌদিদির ভুলটা আর ভাঙাইতে ইচ্ছা করিল না। সরল বেচারী!

বলিল, "ওঃ ভারি অহঙ্কার তো তোমার! আচ্ছা, যতদিন পার ততদিন তো ম্যানেজ কর! তারপর দেখা যাবে।"

ফোটোখানি তুলিয়া বৌদিদি বলিলেন, "কেন মেয়েটিতো দিব্যি দেখতে। সুন্দর চোখদুটি!"

"আমিতো বলিনি দেখতে খারাপ!"

নীচে গলি হইতে ডাক আসিল, "আনন্দদা—"

জানালার নিকট আনন্দ উঠিয়া গেল—"কে, কিশোর? কিরে—কি খবর?"

"আজ আমাদের 'বি' টিম আর 'সি' টিম হকি ম্যাচ হবে, আপনাকে রেফরি হতে হবে।"

"কাল সারা রাত ট্রেনে এসেছি। বংশীদাকে বল না!—"

"তিনি ভারি পার্শিয়ালিটি করেন! সেবার আমাদের মিছিমিছি একটা পেনালটি দিয়ে দিলেন!"

"যাঃ—তোরা ফাউল করেছিলি। আমি ছিলাম তো।"

"না, আনন্দদা, আপনিই হোন্—"

কিশোরের কিশোর মুখে অন্ধারের আভাস দেখিয়া আনন্দ হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা। কটার সময় ?"

"সাড়ে চারটে—"

"কটা বেজেছে এখন ?"

"আড়াইটে বোধ হয়—"

আমার হুইস্‌ল নেই কিন্তু, একটা নিয়ে যাস্‌।"

"আচ্ছা।" কিশোর চলিয়া যাইতেই সামনের বাড়ীর জানালার দিকে আনন্দের নজর পড়িল। দেখিল, অনুপমা দাঁড়াইয়া ছিল—তাহার দৃষ্টি পড়িতেই সরিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে অবিনাশবাবু আসিয়া দাঁড়াইলেন।

আনন্দ জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন লাগছে ? সব গুছিয়ে-টুছিয়ে নিয়েছেন তো ? কোন কিছু দরকার হলে বলবেন আমাকে !"

অবিনাশবাবু বলিলেন, "হ্যাঁ, গোছান প্রায় শেষ হয়ে গেছে। তবে শরীরটা তেমন ভাল নেই। কেমন যেন মাথাটা ধরে' আছে। অনু, চা হল মা ?"

আনন্দ বলিল, "চা না হয় আজ আমরাই পাঠিয়ে দিই। ওবেলা আমাদের এখানেই না হয় খাবেন !"

অবিনাশবাবু বলিলেন, "না, না—সে সব ঠিক আছে। অনু আমার কলেজে-পড়া মেয়ে হলে কি হয়—সব জানে! তা ছাড়া, আমার এই বুড়ো চাকর মধুয়া—একেবারে পাকা গিন্নী !"

বলিতে বলিতেই অনু এক পেয়ালা চা আনিয়া অবিনাশবাবুকে দিল।

আনন্দ দেখিল, চা দিয়া অনু বাঁ হাতে আঙুলগুলাতে ফুঁ দিতেছে!
অবিনাশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হল!"

"ও কিছু নয়। একটু পুড়ে গেছে!"

শুনিবামাত্র আনন্দ বলিয়া ফেলিল, "তাই নাকি! আমার কাছে ফার্স্ট এড-এর সেট্ আছে। ওষুধ একটা দিলে হয়" বলিয়া উত্তরের অপেক্ষামাত্র না করিয়া সে নামিয়া গেল। হস্তে একটা শিশি।

* * *

খেলা সবে শেষ হইয়াছে।

কিশোরদের টিম্ জিতিয়াছে।

তাহাদের দল আনন্দের চারিদিক ঘিরিয়া কলরব করিতেছে। ক্রমে ক্রমে ভিড় কমিতে লাগিল।

দুইচারিজন লোক—এদিকে ওদিকে পদচারণা করিতে করিতে আপন আপন গন্তব্যপথ ধরিল।

আনন্দের গায়ের ঘামটা মরিতেই সে-ও বাড়ীর উদ্দেশ্যে যাইতেছিল। এমন সময় মৃণাল দেখা দিল।

আসিয়াই বলিল, "পৌনে ছটা হয়েছে। চল আস্তে আস্তে যাওয়া যাক্ তাহলে!"

আনন্দ বলিল—"হ্যাঁ চল!"

মৃণাল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আনন্দের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "এত অন্যমনস্ক কেন বল দেখি! কি ভাবছিস্ তুই?"

"কি আবার ভাবব!"

"এত অন্যমনস্ক তা হলে কেন?"

"অন্যমনস্ক?—কই না!"

তাহারা ধীরে ধীরে পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হইল।

৩

পরদিন সকালে উঠিয়া আনন্দ খবর পাইল, অবিনাশবাবুর কাল রাত্রে একটু জ্বর-ভাব হইয়াছিল। সকালেও ৯৯ আছে—একেবারে ছাড়িয়া যায় নাই। মধুয়া খবর আনিয়াছিল।—সে উপসংহারে বলিল, খোঁকাবাবুর আজ আসিবার কথা ছিল—কিন্তু তিনি না আসিতে দিদিমণি ঘাবড়াইয়া গিয়াছেন!

আনন্দ বলিল, "আমি যাচ্ছি এক্ষুনি। ভয় কি?" মধুয়া চলিয়া গেলে আনন্দের দাদা বৈঠকখানার দরজায় উঁকি দিলেন। তাঁহার কানে পৈতা জড়ান, হাতে গাড়ু।

"ও বাড়ীতে কারা এসেছে রে?"

আনন্দ বলিল, "অবিনাশবাবু। হরেরামবাবুর ভগ্নীপতি।"

"তুই চিনিস্ না কি?"

"না। গাড়ীতে আসবার সময় আলাপ হল।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তিনি কথাগুলি শুনিলেন। তাহার পর কিছু না বলিয়া ঘরে ঢুকিয়া জানালাতে ঝুঁকিয়া সশব্দে নাকটা ঝাড়িয়া ফেলিলেন।

যাইবার মুখে কেবলমাত্র বলিয়া গেলেন, "ভগ্নীপতি কোথেকে জুটল আবার!"

আনন্দ কিছু বলিল না। হস্তস্থিত চায়ের খালি-পেয়ালাটি টেবিলে রাখিয়া বাহির হইয়া গেল!

* * *

ঘণ্টাখানেক পরে নবীনডাক্তার অবিনাশবাবুর বাড়ীতে দেখা দিলেন। সঙ্গে আনন্দ।

ডাক্তার, নামে নবীন হইলেও—বয়সে প্রবীণ। মরণের নানা মূর্ত্তি দেখিয়া এবং নিজের জীবনেও বারকয়েক শোক পাইয়া নবীনবাবু কেমন যেন একটু ভীতু ধরণের হইয়া গিয়াছিলেন। অথচ এ অঞ্চলে নবীনবাবুর নাম ডাক খুব। লোক অত্যন্ত ভাল। কিন্তু সর্ব্বদাই যেন ঘাবড়াইয়া আছেন—এই ভাব। অসুখের কথা শুনিয়াই আনন্দকে তিনি বলিলেন, "অ্যাঁ—বল কি—জ্বর আর মাথাধরা ছাড়ছে না? সারলে দেখছি।" অবিনাশবাবুর বাড়ী আসিয়া তাঁহাকে যথারীতি পরীক্ষা করিয়া নবীনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনারা থাকেন কোথায়?"

"লাহোরে—"

"লাহোরে? ম্যালেরিয়া ও অঞ্চলে হয় না কি?"

"হয়। তবে খুব যে বেশী তা' নয়।"

'আপনার জিবটা দেখি।" অবিনাশবাবু জিব দেখাইলেন, আবার একবার পাল্‌স্‌-টা গুনিলেন। পরে বলিলেন—

"শীত করে জ্বর এসেছিল?"

"আজ্ঞে না। মাথা ধরেছিল—এখনো ধরে আছে।"

"হুঁ।"

নবীন-ডাক্তার প্রেসক্রুপশন লিখিলেন, কুইনাইন মিক্শ্চার। বলিলেন, "আজ একটা-ডোজ ক্যাষ্টর অয়েল খেয়ে ফেলুন এখুনি। তার পর এই ওষুধ তিনদাগ করে—দিন-তিনেক খেয়ে দেখুন। ম্যালেরিয়া হলে কমে যাবে।"

বলিয়া তিনি উঠিতে গেলেন। অবিনাশবাবু ফী দিতে গেলে নবীনবাবু বলিলেন, "না, না—আনন্দের কাছ থেকে আমি ফী নিই না কি? আজন্ম ও আমাকে জ্বালাচ্ছে। ওর বয়স যখন বছরখানেক

তখনই একবার নিমোনিয়া হয়ে ভুগিয়েছিল আমাকে, তারপর সমস্ত ছেলেবেলাটা ওর নানা ব্যারামে কেটেছে! একটু বড় হবার পর থেকেই সেবা-সমিতিতে পাণ্ডাগিরি সুরু করলে! কোথায় কার কলেরা—কোথায় বসন্ত—কোথায় জলে ডোবা—ডাক নবীন-ডাক্তারকে! ফী নিয়ে আর কি করব ওর কাছ থেকে—দেবে তো ও সেই সেবা-সমিতির ফণ্ড থেকে! আমাকে আবার করে দিয়েছে তার প্রেসিডেণ্ট! কম জ্বালায় ও আমাকে! আপনারা জানেন না।"

অবিনাশবাবু হাসিয়া বলিলেন, "না, এ ফী আমি নিজে থেকে দিচ্ছি।" নবীন ডাক্তার দমিবার পাত্র নহেন।

"বেশ তাহলে আমাদের সেবা-সমিতি ফণ্ডে জমা করে দিন। আর দেখুন, আপনি ঘুরে ঘুরে বেড়াবেন না। চুপচাপ শুয়ে থাকুন। খাবেন বার্লি!"

নবীনবাবু যাইবার সময় আনন্দকে বলিয়া গেলেন, "দেখো হে এরা বিদেশী মানুষ—কোন অসুবিধা যেন না হয়। আমি চলি তাহলে। আমাকে এখুনি একবার মিরজাচৌকি যেতে হবে।"

নবীনবাবু চলিয়া গেলে আনন্দও চলিয়া যাইতেছিল। সিঁড়িতে কিছুদূর নামিয়াছে এমন সময় পিছন হইতে ডাক আসিল—

"—শুনুন।"

আনন্দ ফিরিয়া দেখিল—অনুপমা।

"কি?"

"বাবা বল্লেন, এই টাকা দুটো নিয়ে যান আপনার সেবা-সমিতি ফাণ্ডে জমা করে দেবেন।"

আনন্দ হাত বাড়াইয়া বলিল, "দিন—।'

অনুপমা তাহার হাতে টাকা দিতেই আনন্দ বলিল—"উঃ আপনার

আঙুলগুলো তো ভারি ঠাণ্ডা! সকাল থেকে জল ঘাঁটছেন বুঝি? কালকে আগুন যে পুড়েছিল, কেমন আছে, দেখি?”

অনুপমা মাথা নত করিয়া বলিল, “ভাল হয়ে গেছে!” বলিয়াই সে ভিতরে চলিয়া গেল।

আনন্দ সেকেণ্ড-ছুই সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া থাকিয়া নীচে নামিয়া গেল।

নীচে নামিয়াই দাদার সহিত মুখোমুখি।

দাদার কানে তখনো পৈতা। বৃন্দাবনবাবু সকালে উঠিয়া কানে পৈতা জড়ান এবং স্নান করিবার সময় নামান। কোঁচার টেপটা গায়ে জড়ান। আনন্দকে দেখিয়াই বলিলেন, “ওরে তুই পরের অসুখে মাথা ঘামিয়ে বেড়াচ্ছিস—এদিকে বুঁচকিটার যে দু'দিন থেকে পেটের অসুখ, তার খবর রাখিস?”

“কৈ না—বৌদি কিছু বলেন নি তো।”

সে প্রসঙ্গ ছাড়িয়া বৃন্দাবনবাবু আবার বলিলেন, “ভোঁদার পড়া-শোনাটাও ত একবার দেখতে পারিস। জিওমেট্রি ও একেবারে কিচ্ছু বুঝতে পাচ্ছে না।”

বলিয়া বৃন্দাবনবাবু ক্রুদ্ধ-কটাক্ষে সামনের বাড়ীর দোতালাটার পানে চাহিয়া দেখিলেন।

“আচ্ছা, দেখছি,” বলিয়া আনন্দ পাশ কাটাইল।

* * *

ক্ষণপরে দেখা গেল আনন্দ ভোঁদাকে জিওমেট্রি পড়াইতেছে: “বুঝলি—? Two sides of a triangle are together greater than the third side।—বুঝলি? Together—মনে থাকে যেন!”

ভোঁদা বলিল, "হ্যাঁ বুঝেছি। ও বাড়ীতে কারা এসেছে কাকা? ওই যে দেখ না—"

"কই?"

জানালা দিয়া দেখিল, অনুপমা ছাদে কাপড় শুকাইতে দিতেছে সদ্য স্নান করিয়া—টক্‌টকে লাল-পাড় একটি কাপড় পরিয়াছে। সূর্য্যের আলো সেই কাপড়ে প্রতিফলিত হইয়া হঠাৎ আনন্দের মনে রঙ ধরাইয়া দিল।

"ওরা অবিনাশবাবুর বাড়ীর। নে পড়! আচ্ছা—এটা বুঝেছিস্? আচ্ছা বলত straight line-এর definition কি?"

"Straight line is not curved" চট্ করিয়া ভোঁদা বলিয়া ফেলিল।

"ও ঠিক হল না! তুই ডেফিনিশন্ একটাও পড়িস্ নি?

এইত রয়েছে—"A straight line is the shortest distance between any two points—"

ভিতর হইতে বৌদিদি হাঁক দিলেন—"ঠাকুর পো, চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, খাবে এসো—"

আনন্দ ভিতরে গেল।

গিয়া দেখিল, বৌদিদি বুঁচকিকে কোলে করিয়া বসিয়া আছেন।

"বৌদি, বুঁচকির কি পেট খারাপ নাকি?"

"পরশু দিন একটু হয়েছিল। আজ ভাল আছে।"

"কেন?"

"এমনিই! সাবধানে রেখো। চারদিকে অসুখবিসুখ।"

এই বলিয়া সে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিল।

* * *

চতুর্দ্দিকে আগুন লাগিয়াছে। চারিদিক লালে লাল! নীল আকাশটাও যেন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। লাল আগুনের লকলকে রক্তশিখায় চতুর্দ্দিক উত্তপ্ত।

জল চাই!—জলও যে লাল! লেলিহান আগুনের দীপ্ত আভায় কালো জল পর্য্যন্ত রাঙা—যেন রক্ত!"

* * *

আনন্দের দিবানিদ্রা ভগ্ন হইল। অদ্ভুত স্বপ্ন তো।

উঠিয়া জানালাটা খুলিয়া দিতেই চোখে পড়িল আবার লাল! অনু জানালায় দাঁড়াইয়া আছে, লালপাড় শাড়ীর পাড়ে আগুন জ্বলিতেছে! সে জানালা বন্ধ করিয়া দিল। চোখ বুজিয়া আবার ঘুমাইবার চেষ্টা করিল। ঘুম কিন্তু আসিল না!

"আনন্দ দা—"

নীচে নামিয়া গেল। দেখিল কিশোর আসিয়াছে। হাতে একখানি খামের চিঠি। কিশোর বলিল, "মৃণালদা—আপনাকে এইটে দিতে বলেছে। তিনি আজ ট্রেনে কোথায় গেলেন।" বলিয়া চিঠি দিয়া কিশোর চলিয়া গেল।

আনন্দ চিঠি খুলিয়া পড়িল, "এখন কিছুদিন আমি এখানে থাক্‌বো না। তোমাকে আমার সঙ্গে আসতেই হবে। আগামী মাসের বুধবার দিন অমাবস্যা পড়েছে। সেই দিন তোমার কাছে আসব। গভীর রাত্রে প্রস্তুত থেকো।"

পাগল নাকি মৃণালটা? মাথায় তাহার কি খেয়াল ঢুকিয়াছে! ভাবিতে ভাবিতে আনন্দ কাহাকেও কিছু না বলিয়া বাহির হইয়া গেল। শহর ছাড়াইয়া মাঠ পড়িল। অন্যমনস্ক হইয়া সে মাঠের পর মাঠ ভাঙিয়া চলিল।

সন্ধ্যার পর ফিরিয়া শুনিল, অবিনাশবাবুর টেম্পারেচার বাড়িয়াছে। তাহারও সারা মনে অস্বস্তি।

৪

দিনতিনেক পরে।

সমস্ত ব্যাপার আদ্যোপান্ত শুনিয়া নবীন ডাক্তার বলিলেন, "সারলে দেখছি! এতো টাইফয়েডে দাঁড়াবে ব'লে মনে হচ্ছে।"

আনন্দ কেবল বলিল, "আপনি কখন যাচ্ছেন? আজ একবার আপনার যাওয়া দরকার।"

"বিকেলের দিকে যাব এখন।"

আনন্দ ফিরিয়া আসিতেই দেখিল, মধুয়া দাঁড়াইয়া আছে।

"বাবু, আপনাকে একবার ডাকছেন।"

"চল।"

অবিনাশবাবুর জ্বর—আজ সকালেই ১০২ ডিগ্রী আছে। একবারও ছাড়ে নাই। আনন্দকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "বাবা, তোমাকে অনেক কষ্ট দিচ্ছি। কিছু মনে কোরো না। কালকে অনুকে দেখতে দু'জন ভদ্রলোক আসবেন এখানে—আগে থাকতেই কথা হয়ে আছে। অশোক আজও কেন-যে এল না বুঝতে পারছি না।" অশোক অবিনাশবাবুর পুত্র। কলিকাতায় এম্‌-এ পড়ে। আনন্দ জিজ্ঞাসা করিল, "কোন চিঠিপত্র পেয়েছেন তাঁর?"

"কিছু না। সে অবশ্য চিঠিপত্র কমই লেখে। যাক্‌, কাল-নাগাদ না এসে পৌঁছলে একটা 'তার' করতে হবে। হ্যাঁ, যে-কথা বলছিলাম, কাল দুটি ভদ্রলোক আসবেন অনুকে দেখতে, তুমি বাবা একটু দেখাবার

বন্দোবস্ত করো। তাঁরা আসছেন অনেক দূর থেকে—এখন মানা করাও যায় না।"

"বেশ তো, সব ব্যবস্থা করব। সকালের ট্রেনে আসবেন ত?"

"হ্যাঁ, নবদ্বীপ থেকে আসছেন তাঁরা।"

"আচ্ছা, সব ব্যবস্থা আমি করব এখন!"

অনুপমা এক পেয়ালা চা আনিয়া আনন্দের হাতে দিতেই আনন্দ বলিয়া ফেলিল, "আপনি অবিনাশবাবুর কাছথেকে বার বার উঠে যাচ্ছেন কেন? আপনাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা না হয়—"

অনুপমা অকারণে লজ্জা পাইয়া গেল।

অবিনাশবাবু কেবল বলিলেন, "হয়ে যাচ্ছে একরকম করে। মেয়েটা দু'তিন রাত্রি ঘুমুতে না পেরে রোগা হয়ে গেল। কাল আবার দেখতে আসবে ওকে। ভগবান যা করেন তাই হবে।"

আনন্দ বলিল, "না-না, ওঁর রোজ রোজ রাতজাগা ঠিক হচ্ছে না। আজ রাত্তিরে আমি অপর ব্যবস্থা করব। কোন স্ত্রীলোক-নার্স যদি না পাই—পাওয়া শক্ত—আমরাই কেউ না-হয় আসব। আপনার এতে আপত্তি নেই তো?"

"না, কিছুমাত্র না। তবে তুমিই এসো বাবা। অচেনা লোক এলে—বুঝলে কি না—"

"আচ্ছা বেশ। তবে যাই এখন। ডাক্তারবাবু বিকেলে আসবেন।"

ঘর হইতে বাহির হইয়া আনন্দ দেখিল, অনুপমা বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছে। তাহার চোখে আনন্দ কি দেখিল তাহা সে-ই জানে। কিন্তু সহসা নির্ভয়ে তাহার কাছে গিয়া বলিল, "রাত্রে কপাটটা খুলে রেখো তাহলে তুমি।"

"আচ্ছা।"

হঠাৎ সে অনুপমাকে 'তুমি' বলিল কেন তাহা সে নিজেও জানে না! রাত্রি প্রায় এগারটা হইবে।

অবিনাশবাবু ঘুমাইতেছেন। অনুপমা ঘরের কোণে একটি চেয়ারে বসিয়া আছে। একখানি বই লইয়া পড়িবার চেষ্টা করিতেছে। পড়া কিন্তু হইতেছে না। নানা কথা মনে হইতেছে। এইবার তাহার আই-এ পরীক্ষা দিবার কথা। অথচ পড়াশোনা তো কিছুই হয় নাই! এখানে আসিয়া নির্জ্জনে পড়িবে মনে করিয়াছিল—কিন্তু বাবার জ্বর হইয়া সব মাটি হইয়া গেল। দাদাও আসিতেছে না কেন? আনন্দবাবু না থাকিলে কি মুস্কিলেই না সে পড়িত তাহার বাবাকে লইয়া! সুন্দর ছেলে এই আনন্দবাবু। পদশব্দ শুনিয়া সে চকিত হইয়া উঠিল!

"কে?"

অতি মৃদুস্বরে আনন্দ বলিল, "আমি। অবিনাশবাবু কি ঘুমিয়েছেন?"

অনুপমার বুকটা অকারণে কাঁপিতে লাগিল।

"হ্যাঁ"—বলিয়া আলোটা কমাইয়া অনুপমা বাহিরে আসিল। বাহিরে মানে, দালানে। সেখানেও একটা তক্তপোষ, একখানি চেয়ার। টেবিলে একটি বাতি জ্বলিতেছিল।

আনন্দ গিয়া চেয়ারটাতে বসিল।

অনুপমা জিজ্ঞাসা করিল, "নীচে খিল দিয়ে এসেছেন তো?"

"না, ভুলে গেছি। থামুন, দিয়ে আসি।"

"আপনি বসুন। আমি দিয়ে আসছি।"—বলিয়া অনুপমা নীচে নামিয়া গেল। একা বসিয়া অকারণ পুলকে আনন্দের সমস্ত অন্তর যেন পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সহসা তাহার মনে হইল, এই চেয়ারটাতেই

তো অনুপমা সকালে বসিয়াছিল—তাহার স্পর্শ যেন ইহাতে লাগিয়া আছে। ওই যে আলনাতে কোঁচান কাপড়গুলি ঝুলিতেছে—ওই যে শেলফে বইগুলি সাজান—সবই ত অনুপমার!

অনুপমা ফিরিয়া আসিতেই আনন্দ বলিল, "আপনি শুতে যান।"

অনুপমা স্বভাবতঃই একটু গম্ভীর প্রকৃতির। আনন্দের কথা শুনিয়া তাহার গম্ভীর মুখে একটু হাসির রেখা দেখা দিল।

আনন্দ জিজ্ঞাসা করিল, "হাসলেন যে?"

"আপনি কখনও আমাকে 'আপনি' বলছেন—কখনও 'তুমি' বলছেন। একটা যা-হয় ঠিক করে ফেলুন।"

আনন্দ একটু অপ্রতিভ হইল। বলিল, " 'তুমি'টা বলতে লোভ হচ্ছে—কিন্তু স্বাভাবিক ভদ্রতায় 'আপনি' বেরিয়ে পড়ছে। 'তুমি' বললে আপনি কিছু মনে করবেন না তো?"

"মনে করবার কি আছে? আমি বয়সে কত ছোট! আপনি আমার দাদার ক্লাস-মেট।"

"বেশ, তাহলে শুয়ে পড়—রাত হয়েছে।"

অনু বলিল, "ঘুম আসছে না।"

"তবু চেষ্টা করা উচিত। তাছাড়া কাল দুজন ভদ্রলোক দেখতে আসবেন—রাত্রি জেগে থাকাটা—"

"ভারি বয়ে গেছে আমার। পছন্দ না হলেই বাঁচি—"

বলিয়া হঠাৎ সে লজ্জায় মুখ ফিরাইয়া ঘরের ভিতর চলিয়া গেল।

আনন্দ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। একটু পরেই অনুপমা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "বাবা আজ বেশ ঘুমুচ্ছেন। কাল-পরশু মোটে ঘুম হয় নি রাত্রে!"

"ডাক্তারবাবু ঘুমের ওষুধ দিয়েছেন আজ—!"

কিছুক্ষণ দুইজনই চুপচাপ।

মিনিটখানেক পরে আনন্দ বলিল, "কাল যাঁরা আসছেন—তাঁরা পাত্রের কে হন ?"

"পাত্র স্বয়ং আর তাঁর বন্ধু !"

"পাত্র স্বয়ং ? কি করেন তিনি ?"

"দালালি।" বলিয়া অনু চুপ করিয়া গেল। তাহার পর বলিল, "আমি সব কথা ঠিক জানি না।"

আনন্দের হঠাৎ মনে হইল, অনুপমার কণ্ঠস্বরে কেমন যেন একটা অসহায় ভাব ফুটিয়া উঠিল।

"পাত্রটি শুনলাম নাকি দোজবরে ?"

চকিত হইয়া অনুপমা বলিল, "শুনেছি তাই। কে বলল আপনাকে ?"

"আপনার বাবাই আজ বিকেলে বলছিলেন। তিনি আপনার বিয়ে দেবার জন্য ভারি ব্যস্ত হয়েছেন, অথচ মনোমত পাত্র জুটছে না।"

অনুপমা কিছু না বলিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল।

আনন্দ বসিয়া ভাবিতে লাগিল, এদেশে মেয়ে হইয়া জন্মান কি দুঃখের ! পদে পদে অপমানিত হইতে হয়। লেখাপড়া শিখিয়া ভদ্রভাবে জীবনযাপন করা আরও দুরূহ ! ভদ্রভাবে চাকরি করা মুস্কিল, বন্ধুত্ব করা মুস্কিল, বিবাহ করা আরও মুস্কিল। আমাদের মনটা সতত কিশোরী-মুখী। অথচ লেখাপড়া শিখিতে গেলেই বয়স বাড়িবে ! তখন কোন অল্পবয়স্ক যুবক তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিবে না। সুতরাং অধিক বয়সের লোক চাই। সে লোকটাও কিশোরী-আহরণে ব্যর্থমনোরথ হইয়া তবে আসে ! এই ভদ্রলোক দ্বিতীয়পক্ষে

বিবাহ করিবেন তাহাও আবার নির্লজ্জের মত নিজে দেখিতে আসিয়েছেন!

অনুপমা ফিরিয়া আসিল। বলিল, "ওই কোণে কুঁজোতে জল আছে।"

আনন্দ বলিল, "শোন—"

"কি—"

"বল তো এ বিয়ে আমি পণ্ড করে দিতে পারি। তোমার কি মত আছে এ বিয়েতে?"

"আমার আবার মতামত কি! বাবার মতেই আমার মত!"

"তাহলে কাল যদি উনি পছন্দ করে যান, এবং পছন্দ করবেনই সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—তাহলে তুমি ওই দোজবরেটাকে বিয়ে করবে নাকি?"

কিছু না বলিয়া অনু শুইতে গেল। একা বিছানায় শুইয়া আনন্দের কথাগুলি তাহার কানে যেন গান গাহিয়া ফিরিতে লাগিল—'ওরা তোমায় পছন্দ করবেই, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই!" অনুপমা শুইয়া শুইয়া আশা এবং আশঙ্কা করিতে লাগিল, কাল যদি আনন্দবাবু উঁহাদের সহিত একটা অনর্থ বাধাইয়া বসেন! বলা তো যায় না!—

আনন্দ বসিয়া আছে। চতুর্দ্দিক নীরব। দূরে একটা ঘড়িতে টং টং করিয়া বারোটা বাজিল। টেবিলে হাত বাড়াইয়া আনন্দ একটা বই লইল। Coming of Arthur. দুইচারি পাতা উল্টাইয়া ভাল লাগিল না।

সে সায়েন্স-ষ্টুডেণ্ট—কবিতার ধার ধারে না।

কিন্তু মনে যে কবিতা জাগিতেছে—!

"অনু—মা"—অবিনাশবাবুর ঘুম ভাঙিয়াছে।

আনন্দ তাড়াতাড়ি গিয়া বলিল, "অমু ওঘরে ঘুমুচ্ছে। কি চাই!"

"একটু জল—।"

আনন্দ জল দিল।

টেম্পারেচার লইল, ১০৩ ডিগ্রী।

ঠিক এই সময় মৃণাল সুলতানগঞ্জের ঘাটে নৌকা করিয়া গঙ্গা পার হইতেছে! তমসাচ্ছন্ন গঙ্গা!

৫

তাহার পর দিন দুইজন আসিলেন না, আসিলেন একজন। পাত্র নিজে। লোকটিকে দেখিলে নিতান্ত খারাপ লোক বলিয়া মনে হয় না, একটু-যাহা খারাপ লাগে তাহা এই যে তিনি যুবক না হইয়াও যুব-জনোচিত ব্যবহার করিতে ব্যগ্র! একটু অস্বাভাবিক-রকম চটপটে। কামাইয়া কামাইয়া গণ্ডদেশ গণ্ডারচর্ম্মের মত—তাহার উপর ক্রীম, পাউডার! ওয়েষ্টকোট-পরা। চুল-ছাঁটা ঘাড়, হাতে-বাঁধা ঘড়ি, এবং ঠোঁটে-চাপা সিগারেট দিয়া তিনি যুবক সাজিতে চান। কিন্তু তাঁহার চোখ-মুখ নীরবে সকলকে বলিয়া দিতেছে, "বয়স পঁয়তাল্লিশের কম নয়!" ভাবগতিক দেখিয়া আনন্দের ইচ্ছা করিতেছিল—মেয়ে না-দেখাইয়া লোকটাকে বিদায় করিয়া দিতে। কিন্তু তাহা অসম্ভব। তাহারই বাড়ীতে অতিথি তিনি। ওই জন্যই আসিয়াছেন!

একটা রেকাবীতে নিমকি, কচুরি প্রভৃতি কতকগুলি খাবার এবং

এক পেয়ালা চা দিয়া আনন্দ গুম হইয়া বসিয়া ছিল। ভদ্রলোক খাইতেছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে শিস্ দিতেছিলেন।

আনন্দ ঈষৎ ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া নিকটেই একটি বেঞ্চে বসিয়া ভাবিতেছে—চা-খাওয়া শেষ হইলে সে কি করিবে। এখনি কি দেখিতে চাহিবে?

এমন সময় নবীন-ডাক্তার দেখা দিলেন।

"কেমন আছে হে আনন্দ তোমার রোগী আজ? চা আছে নাকি বেশী! দাও তো এক পেয়ালা! ভোর বেলা বেরিয়েছি এখনও বাড়ী ফেরা হয়নি!"

এক পেয়ালা চা লইয়া নবীনবাবু আনন্দের পাশেই বেঞ্চিতে বসিয়া পড়িলেন।

"কাল রাত্রে জ্বর ১০৩ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠেছিল। এখন ১০২ ডিগ্রী আছে। পেটটাও একটু খারাপ হয়েছে।"

"সারলে দেখছি।" বলিয়া তিনি খামখা চিবুকের নীচেটা চুলকাইতে লাগিলেন! তাহার পর বলিলেন, "নার্সিংএর ব্যবস্থা কি হয়েছে?"

"ওটাই তো আসল! লাহোর থেকে এসে ভদ্রলোক—সারলে দেখছি!"

"কাল রাত্রে আমি ছিলাম। দিনের বেলা আমাদের সেবা-সমিতির তিনটি ছেলেকে সর্ব্বদা থাকতে বলেছি। তিনজন-তিনজন করে থাকবে। একজন রোগীর বিছানার পাশে থাকবে—আর বাকী দু'জন 'অন ডিউটি' বাইরে থাকবে যদি কোন দরকার হয়। কিশোরকে 'ইনচার্জ্জ' করে দিয়েছি।"

—"কে কিশোর?"

"হালদারদের কিশোর। সেই যে ওবছর যার নিমোনিয়া হয়েছিল।"

"ও হ্যাঁ হ্যাঁ। সে ছোকরা বেশ ছেলে। এইবার ম্যাট্রিক দেবে না?"

"না, আস্‌ছে বছর। বেশ ছেলে। ক্লাসে ফার্ষ্ট হয়—সব দিকে চৌকোষ।"

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, "তোরই তো সব চেলা!—চল অবিনাশ-বাবুকে দেখে আসি।—দেরী হয়ে যাচ্ছে!"

আনন্দ আগন্তুক-ভদ্রলোককে বলিল, "আপনি বসুন—এক্ষুনি আসছি।"

পথে নামিয়া নবীনডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই বুঝি আবুহোসেন সাজবে? মন্দ মানাবে না।"

আনন্দ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আবুহোসেন সাজবে, মানে?"

নবীনডাক্তার বলিলেন, "তেলিপাড়ার ভারতী-নাট্যসমাজ আবুহোসেন করবে যে! জানিস্ না? কোলকাতা থেকে একজন ভাল আবুহোসেন আসার কথা। আমি ভাবলাম সেই বুঝি!"

'ইনি অবিনাশবাবুর মেয়েকে দেখতে এসেছেন।"

"অবিনাশবাবুর মেয়ের বিয়ে হয়নি নাকি এখনও?"

"না। উনি আই-এ পড়ছেন।"

"তাই নাকি?—সারলে দেখছি।"

উভয়ে উপরে উঠিয়া দেখিলেন, অবিনাশবাবু চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শুইয়া আছেন। পাশে কিশোর বসিয়া—মাথায় জলপটি লাগাইতেছে। অনুপমা দালানে ফলের রস করিতেছে।

তিনবার ডাকিবার পর অবিনাশবাবু চক্ষু ঈষৎ খুলিয়া বলিলেন, "এসেছেন আপনারা? বসুন। ওরে অনু"—

"আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমরা ঠিক করে নিচ্ছি!"

নবীনবাবু রোগী দেখিতে লাগিলেন। অবিনাশবাবু আবার চক্ষু মুদ্রিত করিলেন—কেমন যেন একটা অসাড় অবসন্ন ভাব। জ্ঞান আছে অথচ কথার উত্তর দিতে দেরী হইতেছে—যেন বেশী কথা বলিতে নারাজ। কষ্ট কি জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন, "মাথাটা একটুও ছাড়েনি। বড় যন্ত্রণা!"

বাহির হইয়া ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কদিন হল?"

আনন্দ বলিল, "আজ সেভেন্‌থ্‌ ডে।"

নবীনবাবু চলিয়া গেলেন। আনন্দ অনুপমাকে বলিল, "এইবার কাপড়-চোপড় পরে নাও—ভদ্রলোককে নিয়ে আসি—"

অনুপমা উত্তর দিল না। একবার যেন অধরদুটি কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু কিছু না বলিয়া সে আঙুলগুলাকে লইয়া কেবলই নিঙড়াইতে লাগিল।

আনন্দ বাহিরে চলিয়া গেল!

আনন্দ আসিয়া দেখিল, ভদ্রলোক বসিয়া একটু-যেন উস্‌খুস্‌ করিতেছেন।

অধিক ভূমিকা না করিয়া আনন্দ বলিল, "আপনি এখনি কি মেয়ে দেখতে চান?"

"বেশ তো! আমার আর আপত্তি কি?"

"কিন্তু আপনাকে এমন ভাবে মেয়ে দেখতে হবে যেন মেয়ে তা জানতে না পারে।"

"তার মানে ?"

"তার মানে, আপনি যেন অবিনাশবাবুকে দেখতে গেছেন এইভাবে সেখানে যাবেন। সেখানে যে-মেয়েটিকে দেখবেন, সেইটি বুঝবেন অনুপমা। অন্য কোন মেয়ে ও বাড়ীতে নেই।"

"এরকম লুকোচুরি করে দেখার অর্থ কি ?"

"অর্থ এই-যে এই অসুখের বাড়ীতে আয়োজন করে মেয়ে দেখাবার লোকাভাব। মেয়ে এখন তার অসুস্থ বাবার সেবা করবে, না সাজগোজ করবে—বলুন !"

"আচ্ছা-আচ্ছা—তাই করুন। সাজগোজ করে দেখাটা আমি পছন্দও করি না !"

মেয়ে-দেখা কার্য্য শেষ হইয়াছে। আনন্দ ও সেই ভদ্রলোক নীচের ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

আনন্দ আসিয়াই বলিল, "আপনার কি আর এক প্লেট খাবার চাই ?"

"কেন ?"

আনন্দ হাসিয়া বলিল, "মেয়ে দেখার পর এক প্লেট খাবারের দাবী যে-কোন বাঙালী করতে পারে !"

"না-না—থাক্ ! বরং আর এক কাপ চা হলে মন্দ হত না !"

"বেশ। ওরে ভোঁদা, দু-পেয়ালা চা করতে বল।"

আনন্দ বলিল, "এইবার আসল কথা পাড়া যাক—মেয়ে আপনার

পছন্দ হল কি না সেটা তো অবিনাশবাবু জানতে চাইবেন। কি বলব তাঁকে? সাধারণতঃ লোকে বলে থাকে, 'গিয়ে চিঠি লিখে জানাব'। আপনিও কি তাই বলবেন?"

ভদ্রলোক একটু থতমত খাইয়া গেলেন। তাহার পর বলিলেন, "মেয়েটির বয়স কত হবে, বলতে পারেন?"

"ঠিক বলা শক্ত। তবে উনিশ-কুড়ি হবে নিশ্চয়ই। আই-এ যখন পড়ছেন; এর কম নয়।"

"তাহলে বয়স খুব বেশী। অবিনাশবাবু আমাকে আইডীয়া দিয়েছিলেন, ষোল-সতেরো।"

"কন্যাদায়গ্রস্ত বাপেরা মেয়ের বয়স স্বভাবতই লুকোতে চায়। আপনার বয়স কত?"

এরূপ প্রশ্নের জন্য ভদ্রলোক প্রস্তুত ছিলেন না। বলিলেন, "সাইত্রিশ।"

আনন্দ হাসিয়া বলিল, "কন্যাদায়গ্রস্ত বাপেরা মেয়ের বয়স যেমন লুকোয়, দ্বিতীয়বার যাঁরা বিয়ে করছেন তাঁরাও নিজেদের বয়স একটু হাতে রেখে বলেন। এইটেই রেওয়াজ হয়ে গেছে। অবশ্য আপনার কথা বলছি না, তবে অনেকে করেন।"

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, "বলেন কি? বাংলা দেশে আবার মেয়ের অভাব! এ দেশে বিয়ে করবার জন্যে বয়স লুকোতে হয় নাকি পুরুষ-মানুষকে? You can get any number of girls educated or otherwise, provided you have money। আমার তা আছে, সুতরাং আমার বয়স লুকোবার দরকার কি? তা ছাড়া, আমাকে দেখে কি বুড়ো বলে মনে হয় না কি?"

আনন্দ বলিল, "আপনি যদি রাগ না করেন তো বলি। আমার মনে হয়েছিল, আপনার বয়স পঁয়তাল্লিশ!"

খাপ্‌ছাড়া রকম হাসি হাসিয়া ভদ্রলোক বলিলেন, "তাই নাকি?"

আনন্দ বলিল, "তাহলে অবিনাশবাবু যদি জিজ্ঞেস করেন, কি বলব?"

"আপনার কথা-বার্ত্তা শুনে মনে হয়, আপনি ষ্ট্রেট-ফরোয়ার্ড। আপনাকে স্পষ্ট বলাই ভাল, মেয়ে আমার পছন্দ হয় নি। অত বেশী বয়সের মেয়েকে আমি বিয়ে করবো না। তাছাড়া মেয়েটি ভারি 'সিক্‌লি'।"

আনন্দ মূঢ়ের মত বসিয়া রহিল। অপমানটা তাহার নিজের গায়ে যেন লাগিল। পছন্দ হইল না? আশ্চর্য্য!

ইহাতে আনন্দ খুশী হইল, না দুঃখিত হইল, সে নিজেই বুঝিতে পারিল না। শুধু সে মনে মনে বলিতে লাগিল—"পছন্দ হল না? অবাক কাণ্ড!"

বেলা বারোটার ট্রেনে ভদ্রলোক বিদায় লইলেন।

আনন্দ অশোকের নামে টেলিগ্রাম করিল—

Come sharp father seriously ill—Anu.

৬

আনন্দ একা বসিয়া ছিল।

শহরের বাহিরে রেল-লাইনের ধারে একটি পুলের উপর অন্ধকার-নির্জ্জনে বসিয়া সে ভাবিতেছিল, তাহার জীবনে অতর্কিতভাবে

যে তরুণীর আবির্ভাব ঘটিয়াছে তাহাকে লইয়া সে কি করিবে! বিশেষ কিছুই ঘটে নাই, অথচ মনের মধ্যে এ কি আন্দোলন! মধুর, অথচ বেদনাময়। নিজেকে তাহার ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হইল। এত দুর্ব্বল সে? সামান্য একটা নারীর সান্নিধ্যে তাহার এতদিনের সংযমের প্রাসাদ ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে? অসম্ভব! হইতে পারে না!

আনন্দমোহন রায়ের শুভ্র চরিত্রে আজিও কলঙ্কের রেখা পড়ে নাই। পড়িবেও না!

তাই বলিয়া সে কি আজীবন ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবে? তাহাও তো সম্ভব নয়। বিবাহ তাহাকে করিতেই হইবে—আজ না হোক কাল।

অনুপমাকে বিবাহ করা সম্ভব কি?

ব্রাহ্মণ—কায়স্থ। বাধা দুস্তর হইবে। অনুপমা এ বিষয়ে কিছু ভাবে কি? জিজ্ঞাসা করিতে লজ্জা হয়। কৌতূহলের কিন্তু অন্ত নাই!

সমাজ ও সংসারের নিয়ম জটিল। মনের নিয়ম কিন্তু সরল ও সহজ—পুরুষ নারীকে কামনা করে।

দূরে পাহাড়ের গায়ে সাবুই ঘাসে আগুন লাগিয়াছে।

রাত্রে আনন্দ যখন বাড়ী ফিরিল, তখন রাত্রি দশটা হইবে। আসিয়াই শুনিল, অবিনাশবাবু দুই-তিন বার তাহার খোঁজ করিয়াছেন। সকাল বেলা মেয়ে দেখানর পর হইতে আনন্দ আর অবিনাশবাবুর বাড়ী যায় নাই। অনুপমাকে অপছন্দ করিয়া গিয়াছে—এই অতি রূঢ় সংবাদটা সে অসুস্থ অবিনাসবাবুকে দিতে ইতস্ততঃ করিতেছিল। অথচ—

সেবক-সমিতির একটি ছেলে আসিয়া বলিল, "আনন্দদা, আপনি

একবার আসুন। অবিনাশবাবুর জ্বর ১০৪ ডিগ্রী হয়েছে। আমরা ডাক্তারবাবুকে খবর দিয়েছিলাম। তিনি বল্লেন, 'বাথ্' দিতে।"

"আচ্ছা,—তোরা গরম জল তৈরি কর, আমি আসছি।" বলিয়া সে ভিতরে চলিয়া গেল।

গিয়া দেখিল, বৌদিদি তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। —"কিছু আক্কেল নেই তোমার! কটা বাজে বল তো?"

অপ্রস্তুত আনন্দ বলিল, "আমার ভাত ঢাকা-দিয়ে তোমরা খেয়ে নিলেই পার! দাও, তবে বেশী দিও না, ক্ষিধে নেই!"

বৌদিদি বলিলেন, "আজকাল ঠাকুরপোর ক্ষিদে-তেষ্টা সবই কমে গেছে দেখছি! ও-বাড়ীর মেয়েটি বেশ,—না?"

আনন্দ কিছু বলিল না। আসনটা পাতিয়া বসিল। তাহার পর বলিল, "ছি বৌদি, ভদ্রলোকের মেয়েকে নিয়ে রসিকতা করা ঠিক নয়, বিশেষতঃ তার অসাক্ষাতে।"

আনন্দ বৌদিদির মুখে ও-বাড়ীর মেয়েটির সম্বন্ধে ইঙ্গিত শুনিয়া চটিয়া উঠিয়াছিল। ভয়ও পাইয়াছিল।

বৌদিদি হাসিয়া বলিলেন, "না-না, রসিকতা নয়—সত্যি মেয়েটি বেশ ভালই। ভালকে ভাল বলব না? ওরা যদি ব্রাহ্মণ হত তাহলে বেশ হত!"

আনন্দ জিনিসটাকে লঘু করিবার অভিপ্রায়ে বলিল, "আমি ভাবছি তুমি বদি বোবা হতে বেশ হত! দাদা কোথায়?"

"তিনি সন্ধ্যাবেলাই খেয়ে কোথায় বেড়িয়েছেন। বোধ হয় তাসের আড্ডায়।"

অবিনাশবাবু মাঝে মাঝে দুই-একটা ভুল বকিতেছেন। রাত্রি দুইটা হইবে।

আনন্দ বসিয়া একখানি বই পড়িতেছে।

ঘরে অনুপমা নাই।

অবিনাশবাবু হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "রেখে দাও তোমার গান্ধী!" আনন্দ অল-পটি বদলাইয়া হাওয়া করিতে লাগিল। খানিকক্ষণ হাওয়া করিবার পর অবিনাশবাবুর যেন একটু ঘুম আসিল। আনন্দ আবার পুস্তকে মনোযোগ দিল।

মনোযোগ স্থায়ী হইল না। বইটা সে রাখিয়া দিল।

তাহার পর নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সে দালানে গেল। দালানে গিয়া ধীরে ধীরে পাশের ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু বেশী দূর নয়।

অর্দ্ধ-মুক্ত জানালা দিয়া সে দেখিল, অনুপমা ঘুমাইতেছে!

শাড়ীর পাড়টুকু ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। তেমনি নিঃশব্দ-পদে আবার সে ফিরিয়া আসিল।

"টং"—ঘড়িতে আড়াইটা বাজিল!

আর একটি ছেলে নীচে শুইয়া অঘোরে ঘুমাইতেছিল।

সেবক-সমিতির একটি ভলাণ্টিয়ার। আনন্দ তাহাকে জাগাইল।

"ওরে তুই একটু ওঠ। আমি ষ্টেশনে যাব একবার, এই গাড়ীতে বরফ আসার কথা আছে। ঘুমিয়ে পড়বি না তো?"

"নাঃ"—বালক উঠিয়া বসিল।

আনন্দ এখনি বাহির হইয়া যাইতে চায়। নিজের উপর আস্থা সে ক্রমেই হারাইয়া ফেলিতেছে! ট্রেন আসিতে এখনও প্রায় ঘণ্টাখানেক দেরী আছে। থাকুক!—সে বরং রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইবে। এখানে থাকা ঠিক নয়।

"—কোথা যাচ্ছেন?"

আনন্দ পিছন ফিরিয়া দেখিল—অনুপমা! "একি, তুমি ঘুমওনি!"

"ঘুমিয়েছিলাম। ঘুমটা ভেঙে গেল!—কোথা যাচ্ছেন আপনি? বাবা এখন কেমন আছেন?"

"সেই রকমই। আমি ষ্টেশনে যাচ্ছি বরফ আনতে।"

বলিয়া সে নামিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ অনুপমা বলিল "বাইরে ঠাণ্ডা। আপনি বরং একটা কিছু গায়ে দিয়ে যান!"

বলিয়া সে নিজের র‍্যাপারটা আনিয়া দিল।

ষ্টেশনের 'ওভারব্রিজে' দাঁড়াইয়া অনুপমার র‍্যাপারটা সর্ব্বাঙ্গে জড়াইয়া আনন্দ অনুপমাকেই ভুলিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল।

দূরে 'সাইডিং'এ একটা এঞ্জিন একটানা শব্দ করিয়া চলিয়াছে—সসসস—।

ট্রেন আসিল।

আনন্দ নামিয়া গেল। প্রত্যেক কামরায় খোঁজ করিল। কই, জামালপুর হইতে বরফ লইয়া কেহ আসে নাই তো!

এই শীতকালে বরফ পাওয়া মুস্কিল ব্যাপার। কি করা যায়? দেখা যাক—কাল আটটার ট্রেনটাতে যদি আসে।

—"কি হে আনন্দ—কোথা যাচ্ছ!"

দেখিল, রেলের এক চেনা বাবু। গোল-লণ্ঠন হাতে। রূপোলি বড় বড় বোতাম লাগান গলা-বন্ধ কোট। কাঁধের উপর রেল কম্পানির লেবেল মারা T. T. C.!

"কোথায় যাব আবার! বরফ আসার কথা ছিল।—কই দেখতে তো পাচ্ছিনা কাউকে!"

"বরফ কেন?"

"এক ভদ্রলোকের টাইফয়েড হয়েছে—তাঁরি জন্যে!"

"ও বুঝেছি বুঝেছি। বৃন্দাবনদা বলছিলেন বটে আজ ক্লাবে। ভদ্রলোকের বুঝি এক মেয়ে আছে!"

আনন্দ বলিল—"হ্যাঁ। কেন?"

"না, এমনি। বৃন্দাবনদা বলছিলেন কিনা, মস্ত মাগী, অথচ বিয়ে হয়নি। বিয়ে দিলে অ্যাদ্দিন—" তাহার পর হঠাৎ থামিয়া আনন্দের পিঠটা চাপড়াইয়া দিয়া বলিল, "বেড়ে আছ তুমি আনন্দ!—"

ট্রেন ছাড়িয়া দিল। চলন্তি-ট্রেনে টি-টি-সি লাফাইয়া উঠিলেন। উঠিয়া টুপিটা খুলিয়া আনন্দকে গুডবাই করিয়া বলিলেন, "চলি। Wish you good luck."

তাঁহার বিকশিত দন্তগুলি আনন্দকে যেন কামড়াইয়া দিয়া অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল!

গায়ে গলা-বন্ধ কোট। পায়ে ফিতা-বিহীন স্প্রিংএর জুতা—পরনে থান-কাপড়। কদমছাঁট চুল। কানে খড়কে গোঁজা এবং দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীতে একটি অষ্ট-ধাতুর অঙ্গুরীয়। হস্তে পানের বোঁটায় কিঞ্চিৎ চুন। পান চিবাইতে চিবাইতে শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনমোহন রায় আপিসে যাইতেছেন। আনন্দের বৈমাত্রেয় দাদা বৃন্দাবনবাবুর প্রবীণ-মহলে নিষ্ঠাবান বলিয়া খাতির আছে। আহ্নিক না করিয়া জল-গ্রহণ করেন না। মাছ-মাংস খাওয়ার বিরোধী,—হিন্দুরাই যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম জাতি ইহা নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করেন এবং হিন্দুত্ব বজায় রাখিতে সাধ্যমত চেষ্টাও করেন। আপিসে পিপাসা পাইলে

তিনি মৈথিল ব্রাহ্মণ চাপরাশিকে দিয়া লোটা মাজাইয়া সম্মুখস্থ কূপ হইতে জল উত্তোলন করাইয়া, জুতা খুলিয়া—আলগোছে তাহা পান করেন,—ইহা আপিসস্থ সকলেই জানে! আপিসের সাহেবেরা বৃন্দাবনবাবুকে উপযুক্ত কর্ম্মচারী বলিয়াই মনে করেন এবং তদনুযায়ী তাঁহাকে খাতিরও করেন। বৃন্দাবনবাবু যদিও সম্মুখে গদগদ হইয়া তাঁহাদের সেলাম করিতে পাইলে কৃতার্থ হইয়া যাইতেন, আড়ালে কিন্তু তিনি তাঁহাদের সম্বন্ধে যে ভাষা ব্যবহার করিতেন তাহা ভদ্ররুচি বিগর্হিত। "গোখাদক ম্লেচ্ছ ব্যাটারা"—ইহাই ছিল তাঁহার মৃদুতম সম্ভাষণ।—অবশ্য আড়ালে।

এই সব কারণে প্রবীণ বিজ্ঞ মহলে বৃন্দাবনবাবুর একটি শ্রদ্ধার আসন ছিল।

যাহারা অপেক্ষাকৃত কম বিজ্ঞ, তাহারা কিন্তু বৃন্দাবনবাবুকে এতখানি শ্রদ্ধা করিত না। এমন কি, দুইচারিজন অপরিণতমস্তিষ্ক যুবক তাঁহাকে "বাস্তু ঘুঘু" আখ্যা দিতেও দ্বিধা করে নাই। পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই কিন্তু দুইচারিজন এমন সন্দেহও করিত যে প্রত্যহ সন্ধ্যায় তাস খেলিবার অছিলায় বৃন্দাবনবাবু যে-গৃহে যাতায়াত করেন, এবং যে কারণে যাতায়াত করেন তাহার মূলে সেই গৃহের বিধবা পুত্রবধূটি! কু-লোকে নানারূপ গুজব রটাইয়া থাকে—তাহার উল্লেখ আর না-ই করিলা।

বৃন্দাবনবাবু আপিস যাইতেছিলেন এমন সময় গলির মোড়ে আনন্দের সহিত তাঁহার দেখা হইয়া গেল। আনন্দ সাধ্যপক্ষে তাহার দাদার সম্মুখীন হইত না। এবং দৈবাৎ দেখা হইলে পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিত। আজ কিন্তু সে সক্ষম হইল না।

বৃন্দাবনবাবু পানের বোঁটাটায় একটা কামড় দিয়া বলিলেন, "কে রে!

শোন। একটা দরকারী কথা আছে”— বলিয়া তিনি পকেট হইতে পোষ্টকার্ড একখানি ও চশমার খোলটি বাহির করিলেন। “কাশী থেকে পরেশবাবুর চিঠি এসেছে। তুই, বেড়াতে যাচ্ছি বলে কাশী গিয়ে বসে রইলি, অথচ আমাকে একটা ঠিকানা পর্য্যন্ত দিয়ে গেলি না! আবার খরচ করে যেতে হবে তো?”

আনন্দ প্রমাদ গণিল। মরীয়া হইয়া বলিয়া ফেলিল, “এখন ওসব কথা থাক। পড়াশোনা করতে করতে এখন বিয়ে করাটা ঠিক নয়!”

বৃন্দাবন বলিলেন, “আহা, তুমি ঠিক নয় বললেই তো চলবে না! ওদিকে মেয়ের বয়স যে হুহু শব্দে বেড়ে চলছে। পরেশবাবু হিন্দু ব্রাহ্মণ—তাঁর মুখে অন্ন রুচছে না। তিনি লিখেছেনও তাই।” —বলিয়া বৃন্দাবনবাবু চশমাটি পরিধান করিয়া পোষ্টকার্ডখানি তুলিয়া ধরিয়া পড়িলেন, “কি বলিব বৃন্দাবনবাবু, মেয়ের বয়স তেরো পার হইয়া চৌদ্দতে পড়িল—আমার রাত্রে নিদ্রা ও দিনে আহার ঘুচিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। আজকাল যা দিনকাল পড়িয়াছে, আমার সহধর্ম্মিনী সর্ব্বদা ভয়ে কাঁটা হইয়া থাকেন, কখন কি অনর্থ ঘটিয়া যায়!” এখন শুনলে ত? এ অবস্থায় আর দেরী করা ঠিক নয়। আমি তো মনে করছি আগামী মাঘমাসেই—”

আনন্দ বর্ত্তমান সঙ্কটটা এড়াইবার জন্য বলিল, “আচ্ছা, একটু ভেবে দেখি।”

“এতে আর ভাবা-ভাবি কি আছে? আজকাল ওই হয়েছে তোমাদের এক দস্তুর—‘ভেবে দেখি!’ তাছাড়া তোমার ভাবার আছে কি?—আমি যতদিন বেঁচে আছি—”

আনন্দ তর্ক না করিয়া কেবল বলিল, “তবু একটু ভেবে দেখি!”

"আরে কি মুস্কিল! আমি তাদের কথা দিয়ে রেখেছি গেল আশ্বিনে। ভদ্রলোক টাকাও প্রায় হাজারখানেক অগ্রিম দিয়ে রেখেছেন"— বলিয়া তিনি কৌটা খুলিয়া কপ-করিয়া এক খিলি পান মুখে ফেলিয়া দিলেন!

আনন্দ স্তম্ভিত হইয়া গেল! হাজারখানেক টাকা অগ্রিম লওয়া হইয়া গিয়াছে! সে কি একটা পণ্য-দ্রব্য? খরিদ্দার পূর্ব্ব হইতে দাদন দিয়া গিয়াছে!

বৃন্দাবনবাবু বলিলেন, "তাহলে একটা দিন-স্থির—"

আনন্দ হঠাৎ বলিয়া বসিল, "টাকা ফেরৎ দিন। ওখানে আমি বিয়ে করবো না।" বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেল!

বৃন্দাবনবাবুর বিস্মিত কণ্ঠ হইতে বাহির হইল, "মানে?" কিন্তু তাহা তিনি-ছাড়া আর কেহ শুনিল না!

বৃন্দাবনবাবু আপিস চলিয়া গেলেন। আনন্দ বাড়ীতে আসিয়া নিজের ঘরে খিল দিল! দাদার কাণ্ড দেখিয়া সে বিচলিত হইয়াছিল, কিন্তু বিস্মিত হয় নাই। স্বার্থের জন্য দাদা সবই করিতে পারেন। যাক সে কথা। আনন্দ অনুপমার কথা ভাবিতে লাগিল। জীবনে কোন স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে তাহার এরূপ মনোভাব কখনও হয় নাই। দুই চারি দিন মাত্র আলাপ, অথচ অনুপমার চিন্তাই তো সে সারাক্ষণ করিতেছে! অনুপমার দাদা অশোক কেমন লোক? সে তো টেলিগ্রাম করা সত্ত্বেও আসিয়া পৌঁছিল না! ব্যাপার কি কিছুই বোঝা যাইতেছে না। অবিনাশবাবুর জ্বর খুব বাড়াবাড়ি—১০৩ হইতে ১০৪, কখনও বা ১০৫ পর্য্যন্ত উঠিতেছে। নবীনবাবু বলিলেন, বুকেও নাকি সর্দ্দি বসিয়াছে।

বেশ প্রলাপ বকিতেছেন। হঠাৎ তাহার মনে হইল, জামালপুর হইতে বরফ কিছু আসিয়াছে বটে—কিন্তু তাহাতে কুলাইবে না। জামালপুরে একজন ভলান্টিয়ারকেই পাঠাইতে হইবে। খানিকটা ভাল টিঞ্চার ডিজিটেলিস্‌ও আনাইতে হইবে—নবীনবাবু বলিয়াছেন। কাহাকে পাঠানো যায় আনন্দ ভাবিতে লাগিল।

আর এক উপদ্রব আসিয়া জুটিয়াছে, তেলিপাড়া ভারতী নাট্য-সমাজ। তাহারা আনন্দকে আসিয়া ধরিয়াছে, ষ্টেজ ম্যানেজমেণ্টের ভার তাহাকে লইতে হইবে। দুইচারিজন ভলান্টিয়ারও তাহাদের চাই। স্কুলের ছেলেরা থিয়েটার লইয়া বেশী মাতামাতি করে, ইহা আনন্দের ইচ্ছা নয়। তথাপি কিছু-একটা রফা করিতে হইবে। কারণ, তেলিপাড়ার বাবুরা সেবক-সমিতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং লোকও ভাল। একটু থিয়েটার-প্রবণ এই যা'। এই সময় মৃণালটা কোথা গেল! তাহাকে ভিড়াইয়া দিলেই সব গোল চুকিয়া যাইত! মৃণালও তাহার জীবনে একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে! লবণ-আইন-অমান্য করার দরুন জেল খাটিয়া মৃণাল যেন বদলাইয়া গিয়াছে। সর্ব্বদাই কি যেন ভাবে। মাঝে মাঝে তাহাকে শুধু বলে, "আমার আদর্শ বদলাইয়াছে!" হঠাৎ আনন্দ আবিষ্কার করিল যে এত চিন্তার মধ্যেও অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত অনুপমার চিন্তা তাহার মনে সমানে বহিয়া চলিয়াছে। দুয়ারে ধাক্কা পড়িল—কপাট খুলিয়া দেখি বৌদিদি!

বৌদিদি একটু মুচকি হাসিয়া বলিলেন, "ঘরে খিল দিয়ে কি হচ্ছে? ও বাড়ী থেকে তোমাকে ডাকতে এসেছে! চা খেয়ে তবে যাও।" বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

আনন্দ বাহিরে গিয়া দেখিল, মধুয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া মধুয়া বলিল, "কলকাতা থেকে চিঠি এসেছে

দিদিমণি আপনাকে একবার ডাকছেন! সময় হবে কি আপনার এখন!"

আনন্দ বলিল, "আমি চা খেয়েই যাচ্ছি।"

ভিতরে যাইতেই বৌদিদি বলিল, "এত বেলায় চা আর না-ই খেলে! ভাত তো রান্না হয়ে গেছে।"

আনন্দ বলিল, "তুমিও বৌদি পেছনে লাগলে! Thou too Brutus! সংসারের নানাবিধ জ্বালা-যন্ত্রণার মধ্যে তুমিই একমাত্র লোক আছ যেখানে—"

বৌদিদি বলিলেন, "থাক থাক্—বোঝা গেছে! সেদিন সামান্য একটা জামার ছিট এনে দিতে বল্লাম, বলা হল, এখন সময় নেই! ভোঁদাকে দিয়ে আনাতে হল! সে বিছ্‌ছিরি এনেছে!"

আনন্দ গম্ভীর মুখে বলিল, "একটা লোক টাইফয়েডে ভুগছে। নিতান্ত অসহায়—বিদেশে একা। তার কাজটা আগে করা উচিত, না তোমার ছিট্ খুঁজে বেড়ান উচিত? বল! আচ্ছা—আজই তোমার ছিট্ এনে দিচ্ছি! ব্লাউসের তো? কি ধরণের চাই?"

আসল কথা, বৌদিদির ছিটের আর প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু সাধারণতঃ বৌদিদি-জাতীয় মহিলাদের এ সম্বন্ধে মাথার ছিট্ আছে, তাই তিনি বলিলেন, "ওই ও-বাড়ীর মেয়েটি একটি জামা পরে বেড়ায়—দেখনি তুমি?"

"কোন্ বাড়ীর মেয়েটি?"

"আহা, কিছু যেন বুঝতে পারছেন না! ওই তোমার অনুপমা গো—! সেই যে কাল বিকেলে পরেছিল—চকোলেট রংএর উপর লাইট্ হলুদ রঙের ফুট্-ফুট্ দাগ—"

আনন্দ গম্ভীর হইয়া বলিল, "বেশ। আজ খুঁজে আনব।"

অন্যমনস্ক হইয়া আনন্দ চা শেষ করিয়া উঠিতে যাইতেছিল, এমন সময় বৌদিদি আবার বলিলেন, "দেখ, ডবল বহর যদি হয়, তাহলে এক গজ আর সিংগ্‌ল্‌ বহর হলে' কিন্তু দেড় গজ লাগবে।"

আনন্দ অন্যমনস্ক ভাবেই উত্তর দিল, "আচ্ছা।"

বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

বৌদিদি ছিটের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন!

অবিনাশবাবুর বাড়ী গিয়া আনন্দ অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িল। গিয়া দেখিল, অনু কাঁদিতেছে!

"কি হল? কাঁদছ যে!"

অনুপমা একটি পত্র আনন্দের হাতে দিল। পত্রে লেখা—

অনু দেবী,

আপনার টেলিগ্রাম যথাসময়ে এসেছে। কিন্তু দুঃখের সহিত আপনাকে জানাচ্ছি—অশোকবাবুকে পুলিসে ধরে নিয়ে গেছে। পলিটিক্যাল সাস্‌পেক্ট—এই অজুহাতে। যদি আপনারা প্রয়োজন মনে করেন, আমি যেতে পারি। টেলিগ্রাম করবেন তাহলে!

বিমান।

আনন্দ জিজ্ঞাসা করিল, "বিমান কে?"

"দাদার একজন বন্ধু—"

"তোমার সঙ্গে আলাপ আছে না কি?"

"হ্যাঁ খুব। আমাদের বাড়ীতে সেবার সমস্ত পূজা ভেকেশানটা কাটিয়ে এসেছেন।"

আনন্দের মুখটা অকারণে অন্ধকার হইয়া উঠিল।

অনুপমা কহিল, "বিমানবাবুকে কি টেলিগ্রাম করব—আসতে ?"

"সেটা আমি কি করে বলব। তুমি যা ভাল বোঝ কর। তোমার যখন এমন বিশেষ বন্ধু—তখন বিপদের সময় ডাকা উচিত। এখন কোন কাজ নেই তো ?—চললাম !"

বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া আনন্দ বাহিরে চলিয়া গেল। এমন আকস্মিকভাবে আনন্দ কোন দিন চলিয়া যায় নাই। আজ হঠাৎ এমন করিয়া চলিয়া গেলেন কেন বিশ্লেষণ করিতে গিয়া অনুপমার অধরে অতি-ক্ষীণ একটি হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল।

ছানার জল করিতে হইবে।

অনুপমা ষ্টোভ জ্বালিতে বসিল।

ষ্টোভে স্পিরিট ঢালিয়া দেশলাই জ্বালিয়া বসিয়া-বসিয়া স্বচ্ছ নীল শিখাটি দেখিতে দেখিতে অনুপমা ভাবিতে লাগিল, বিমানবাবুর চিঠি দেখিয়া আনন্দবাবু অমন করিয়া হঠাৎ চলিয়া গেলেন কেন ?

তাহার অধরে ক্ষীণ হাস্যরেখাটি আবার ফুটি ফুটি করিতে লাগিল !

৮

আনন্দ তাহার শ্রদ্ধাস্পদ অগ্রজকে এড়াইয়া চলিতেছে। আপিস হইতে ফিরিয়া তিনি আনন্দের খোঁজ লইয়াছিলেন, আনন্দ ত্রিসীমানায় ছিলনা ! সন্ধ্যাহ্নিক, আহারাদি প্রভৃতি সারিয়া যখন তিনি তাসের আড্ডায় যাইবার আয়োজন করিতেছেন—তখনও তিনি আর একবার আনন্দের সন্ধান করিলেন, কিন্তু পাইলেন না। ভোঁদা আসিয়া বলিল যে অবিনাশবাবুর বাড়ীতেও আনন্দ নাই—তাহারা

বলিল, চারিটার পর হইতে সে আর ও-বাড়ীতে যায় নাই। মলিদার কম্ফরটারটা গলায়, কানে এবং মাথায় বেশ করিয়া বাঁধিতে বাঁধিতে বৃন্দাবনবাবু খবরটা শুনিলেন। তাহার পর ভোঁদাকে বলিলেন, "তোর মাকে ডাক।"

ভোঁদার মা আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আনন্দ কোথায় গেছে জান গা ?"

"বলতে পারিনা তো—"

"রাত্রে যখন খেতে আস্‌বে, বলো তো যে আমার সঙ্গে কাল সকালে দেখা না করে যেন কোথাও না বেরোয়।—বুঝলে ?"

কোণ হইতে লাঠিটা তুলিয়া লইয়া বৃন্দাবনবাবু নৈশভ্রমণে বাহির হইলেন।

খানিকটা ছিট্ বগলে করিয়া আনন্দ রাত্রি ন'টা-নাগাদ বাড়ী ফিরিল। ছিট্ দেখিয়া বৌদি উল্লসিতা! বৌদিদির যাহা কিছু সখের সামগ্রী আনন্দই তাহা চিরকাল আনিয়া দিয়াছে, হয় নিজের স্কলারশিপের টাকা দিয়া, না হয় নিজের হাতখরচ হইতে পয়সা বাঁচাইয়া। বৃন্দাবনমোহন এই সব বিলাসিতার সমর্থন করিতেন না। কিন্তু রোধও করিতেন না। আপিসে যেমন তাঁহার সহিত বড়-সাহেবের সম্পর্ক, বাড়ীতে তাঁহার নিজের সহিত স্ত্রীর সম্পর্ক অবিকল সেইরূপ ছিল। বড়সাহেব যেমন নিম্নতন কর্ম্মচারীদের তুচ্ছ দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করেন, গৃহস্থালির বড় সাহেব বৃন্দাবনবাবু তেমনি এইসব সামান্য বিলাস-প্রিয়তা প্রভৃতি ছোটখাটো অপরাধ দেখিয়াও দেখিতেন না। এ বিষয়ে তাঁহার মহত্ত্ব ছিল স্বীকার করিতেই হইবে।

তাঁহার দুইটি বিষয়ে কড়া নজর ছিল—স্ত্রীর সতীত্ব ও গৃহকর্ম্মনিপুণতা! স্ত্রীর সহিত তিনি কথাবার্ত্তা কমই বলিতেন—কিন্তু যখনই বলিতেন উপরোক্ত দুইটি বিষয় লইয়াই বলিতেন। বাজে-কথা—বিশেষতঃ স্ত্রী-জাতির সহিত—বৃন্দাবনবাবু একেবারেই পছন্দ করিতেন না। লোকে কিন্তু—যাক্ সেকথা!

আনন্দ বৌদিদির মারফৎ দাদার আদেশ শুনিয়া বলিল, "তুমি দাদাকে বলে দিও—এ বিয়ে আমি কিছুতে করতে পারব না! তিনি যেন আমাকে মাপ করেন!"

"বেশ তো বাবু, তুমি নিজেই বলো। আমার এসব বিষয় নিয়ে তোমার দাদার সঙ্গে কথা কইতে ভয় করে!"

"না, আমি আর এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করব না!"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বৌদিদি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজও তুমি যাবে না কি ও-বাড়ীতে।"

"দেখি— !"

আহারাদি শেষ করিয়া আনন্দ বাহির হইয়া গেল!

৯

আনন্দ বাড়ী হইতে বাহির হইল বটে—কিন্তু কোথায় যাইবে ঠিক ছিল না। অবিনাশবাবুর চিকিৎসা ও সেবা ঠিকই চলিতেছে, সেবা-সমিতির বালকগণ ঘড়ির কাঁটার মত কাজ করিয়া যাইতেছে। তাহার বার-বার না গেলেও চলে। বস্তুতঃ অকারণে যাওয়াটা তাহার

নিজেরই যেন নিজের কাছে খারাপ লাগিতেছে। সে নিজের কপটাচরণ নিজেই যেন ধরিয়া ফেলিয়াছে—সে সহসা আবিষ্কার করিয়াছে যে অবিনাশবাবুর অসুখের ছুতা করিয়া আসলে সে বার-বার অনুপমার কাছেই যাইতে চায়। আবিষ্কার করিয়া অবধি সে মনে মনে কুণ্ঠিত হইয়া আছে। ঠিক করিয়াছে, বিনা প্রয়োজনে সে আর অবিনাশবাবুর বাসায় যাইবে না। অন্যায় হইতেছে।

রেল লাইন পার হইয়া সে মাঠের দিকে অগ্রসর হইল। অন্ধকার মাঠ। জনপ্রাণীশূন্য!—মাঠের প্রান্তে দূরে একটা পাকা বাড়ী আছে বটে, কিন্তু এই শীতে কপাট জানালা সব বন্ধ।

একাকী অন্ধকারে আনন্দ প্রেতের মতন মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কত কথা মনে হইল। এই মাঠে কত খেলায় সে জিতিয়াছে ও হারিয়াছে। কত আঘাত পাইয়াছে ও দিয়াছে। আশৈশবের ক্রীড়াভূমি এই মাঠ—অন্ধকারে জননীর মত তাহার আর্ত্ত মনে যেন সান্ত্বনা বহন করিয়া আনিল!

কত বন্ধুবান্ধবের কথা মনে হইল। কে কোথায় ছড়াইয়া গিয়াছে। স্কুলের সহপাঠী রামদেও, হরেন, নন্দকিশোর, ললিত—কোথায় তাহারা এখন! নিতাই কি এখনও বাঁচিয়া আছে? স্কুল-জীবনে নিতাই ছিল তাহার ধ্যান, জ্ঞান। নিতাই যদি মেয়ে হইত তাহাকে ঠিক সে বিবাহ করিত। নিতাই এখন কোথায়?—যাহাকে না হইলে একদণ্ড চলিত না—তাহার কথা এখন আর কই মনেও পড়ে না তো!

কোথায় সেই রসিকলাল? তাহার টিকি লইয়া অহরহ সকলে ঠাট্টা করিত! বেচারীকে ভাল-মানুষ পাইয়া একদিন সকলে তাহার টিকিটা কাটিয়া পর্য্যন্ত দিয়াছিল! রসিকলাল বেচারী কাঁদিয়া

ফেলিয়াছিল। কোথায় সে এখন। বাল্যকালের বিস্মৃতপ্রায় সঙ্গীদল এই অন্ধকার মাঠে যেন তাহাকে ঘেরিয়া ধরিল! থাকিবার মধ্যে আছে এক মৃণাল! এই একমাত্র লোক যে তাহার আশৈশব সহচর। কিন্তু সম্প্রতি কিছুদিন হইতে মৃণালের একি খেয়াল হইয়াছে তাহা সে বুঝিতে পারে না। মৃণালের বহু বক্তৃতা সে বহু গোপন স্থানে বসিয়া শুনিয়াছে—কিন্তু আজও সে বুঝিতে পারে নাই—কি ব্যাপারে সে লিপ্ত আছে। অথচ মৃণাল খুলিয়া কিছু বলে না। আভাসে-ইঙ্গিতে সে বলে, কার্য্যটি দুরূহ। বুধবারে সে সব খুলিয়া বলিবে বলিয়াছে—দেখা যাক্!

আশ্চর্য্য ছেলে এই মৃণাল! যেমন শরীর—তেমনি বুদ্ধি! মৃণাল তাহাকে বারম্বার বলিয়াছে যে কার্য্যে সে ব্রতী তাহাতে আনন্দের সাহায্য সে চায়। অথচ কি সে কার্য্য তাহা খুলিয়া বলিবে না। আগেই সে প্রতিশ্রুতি চায়! আনন্দের সাহায্য তাহার চাইই! তাহারও পাত্তা নাই। কোথায় সে?

হঠাৎ কাছে শৃগাল ডাকিয়া উঠিতেই আনন্দের চমক ভাঙিল! কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে! এ যে একেবারে পাহাড়ের কাছাকাছি!

ফিরিয়া যাওয়া দরকার। ফিরিতে ফিরিতে সে আবার ভাবিতে লাগিল। দেখিল তাহার এত এলোমেলো চিন্তার মধ্যেও একটি চিন্তা তাহার মনের মধ্যে অটুট আছে তাহা অনুপমার। তাহার সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ করিয়া দিয়া অনুপমার মুখখানি তাহার মনের মধ্যে জাগিয়া আছে। আশ্চর্য্য!

হঠাৎ তাহার মনে হইল, অবিনাশবাবুর অসুখ যদি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে!—সে তো কাহাকেও কিছু বলিয়া আসে নাই, যদি প্রয়োজন হয় তাহা হইলে তাহাকে তো কেহ খুঁজিয়া পাইবে না!

যতদূর সম্ভব দ্রুতগতিতে সে ফিরিতে লাগিল। অন্ধকারে তাড়াতাড়ি রেল-লাইন পার হইতে গিয়া সে হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গেল। হাঁটুটা বোধহয় ছড়িয়া গেল!

গলিটার মোড়ে আসিয়া সে একবার থমকিয়া দাঁড়াইল। মিউনিসিপালিটির বাতিটা হেলিয়া-পড়া পোষ্টের উপর হইতে যৎসামান্য আলোক বিকীরণ করিতেছে। সামনের একটা বাড়ীর পাকা বারাণ্ডায় একটা কুকুর কুণ্ডলী-পাকাইয়া শুইয়া আছে। পদ-শব্দ পাইয়া কতকগুলা ছুঁচা কিচকিচ করিয়া সরিয়া পড়িল! চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ।

অতি ধীরে ধীরে চোরের মতন, আনন্দ অবিনাশবাবুর বাড়ীটার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। অবিনাশবাবুর ঘরে আলো জ্বলিতেছে। তাহার পাশের ঘরের জানালায় মনে হইল যেন অনুপমা দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া সরিয়া গেল।

আনন্দ একবার নিজেদের বাড়ীটার দিকে চাহিয়া দেখিল। সমস্ত চুপচাপ। তখন সে ধীরে ধীরে ডাকিল, "বিনয়।"

"যাই"—বলিয়া একটি বালক আসিয়া বাতায়নে দাঁড়াইল।

"কপাটটা খুলে দিয়ে যা—"

"যাই"—বলিয়া বিনয় নামিয়া আসিল। আসিয়া বলিল, "বাঃ কপাটটা তো খোলা রয়েছে। আমি যে বন্ধ করে গেলাম! খুললে কে?"

আনন্দ ভিতরে প্রবেশ করিতে করিতে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছেন অবিনাশবাবু এ বেলা—"

"ভাল না। জ্বর একটু আগে দেখেছিলাম ১০৪'৬ ডিগ্রী। সর্ব্বদাই বিড় বিড় করে কি বক্‌ছেন—আর বিছানায় কি যেন খুঁজছেন।"

"অনুপমা জেগে আছেন না কি?"

"এক্ষুনি তো জেগে ছিলেন।"

আনন্দ আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিল। উঠিয়া দেখিল, আপাদ মস্তক ঢাকা দিয়া অনুপমা ঘুমাইতেছে। কে বলিবে এখনি জাগিয়াছিল!

আনন্দ অবিনাশবাবুকে দেখিয়া ধীরে ধীরে আবার নামিয়া চলিয়া গেল। ভারতী নাট্যসমাজে একবার যাওয়া দরকার! অনেক করিয়া তাহারা বলিয়া গিয়াছে।

যাইতে যাইতে তাহার মনে হইল, অনুপমা কি সত্য ঘুমাইতেছে?

১০

পরদিন আনন্দের উঠিতে বেলা হইল। শুইতে অনেক রাত্রি হইয়াছিল। উঠিয়াই বৃন্দাবনমোহনের সহিত দেখা হইয়া গেল। কানে পৈতা-জড়ান বৃন্দাবন আনন্দকে দেখিয়া বলিলেন, "বেলা আটটা পর্য্যন্ত শুয়েই থাক্‌বি না কি? উঠে পড়।"

আনন্দ উঠিয়া পড়িল। পলাইতে পারিল না।

বৃন্দাবনমোহন বলিলেন, "কাশীর ব্যাপারটা আমি মিটিয়ে ফেল্‌তে চাই। ও সব ছেলেমানুষী ছাড়—"

আনন্দ চুপ করিয়া রহিল।

বৃন্দাবনমোহন ছাড়িবার পাত্র নহেন। বলিলেন, "চুপ করে থেকে লাভটা কি বল! 'হাঁ' 'না' একটা কিছু বলতেই তো হবে। এ ক্ষেত্রে যখন 'না' বলার পথটা বন্ধ, তখন 'হাঁ' বলাটাই ভাল! শুনেছি মেয়েটি দেখতে বেশ সুশ্রী—তোকে যা-তা একটা ধরে দিতে চাই না!"

আনন্দ উপস্থিত-বিপদটা এড়াইয়া যাইবার জন্য বলিল, "তার চেয়ে আপনি নিজে একবার দেখে আসুন।"

"তুই বাপু নিজেই যা না।"

"না, আমি যাব না।"

"এই শীতে আমাকে আবার কাশীপর্য্যন্ত দৌড়তে হবে! আচ্ছা বেশ তাই হবে।"

আনন্দ রেহাই পাইয়া হাঁফ ছাড়িল।

প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া সে যখন বৌদিদির কাছে চা পান করিতে গেল, তখন বৌদিদি একটি খবরের মতন খবর দিলেন।

"ও-বাড়ীর মেয়েটি এসেছিল একটু আগে! বেশ সুন্দর কথা বার্ত্তা।"

আনন্দ আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

"হঠাৎ আমাদের বাড়ীতে কেন?"

"চায়ের দুধ নিতে এসেছিল। তোমার সেবক-সমিতির ছেলেরা সব ঘুমুচ্ছে। মধুয়া বাজারে গেছে। নিজেই এসেছিল বেচারী!"

"তার বাবা কেমন আছেন?"

"ভাল নয়। বাঁচবে তো? মেয়েটির মুখখানি ভারী শুকনো!"

"ভগবান জানেন"—বলিয়া আনন্দ চায়ের বাটিতে চুমুক দিল। তাহার মনে মনে নিজের অজ্ঞাতসারেই একটা আফশোষ ঘনাইয়া উঠিতেছিল। আহা অনু আসিয়াছিল, অথচ সে গাধার মত শুইয়া ঘুমাইতেছিল!

নীরবে চায়ের বাটিটা শেষ করিয়া আনন্দ উঠিতে যাইবে এমন সময় বৌদিদির কোল হইতে বুঁচকি বলিয়া উঠিল, "তা-তা।"

"শুনছ ঠাকুর পো, তোমাকে ডাকছে! একটু কোলে নাও

বেচারীকে! অবিনাশবাবুরা এসে-থেকে এদের আর ছোঁওনি তুমি!"

আনন্দ হস্ত-প্রসারণ করিতেই বুঁচকি ঝাঁপাইয়া কোলে আসিল। আনন্দ তাহাকে লইয়া বাহির হইয়া গেল। বাহিরের ঘরে আসিয়া দেখিল, থানার দারোগা বিনোদবাবু আসিয়া বসিয়া আছেন।

"নমস্কার বিনোদবাবু! খবর কি?"

বিনোদবাবু ও আনন্দ পরস্পর পরিচিত। বিনোদবাবু আনন্দকে যথেষ্ট খাতির করিতেন। বিনোদবাবু বলিলেন, "আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে, প্রাইভেটে।"

"খুকীটাকে দিয়ে আসি তাহলে।"

খুকীকে দিয়া আনন্দ ফিরিয়া আসিল। কহিল, "চলুন বেরোন যাক।" পথে চলিতে চলিতে বিনোদবাবু বলিলেন, "আপনাদের বাড়ীর সামনে যে ভদ্রলোকেরা এসেছেন, চেনেন আপনি তাঁদের?"

"আগে আলাপ ছিল না, ট্রেনে আলাপ হয়েছিল। তারপর এসেই অসুখে পড়েছেন সেই সূত্রে একটু ঘনিষ্ঠতা হয়েছে।"

"কে কে আছেন ও বাড়ীতে?"

"অবিনাশবাবু আর তাঁর এক মেয়ে। তাঁর এক ছেলে—"

"ওই ছেলেই তো যত গোল করেছে মশাই! কলকাতায় পলিটিক্যাল সাসপেক্ট বলে তাকে ধরেছে! আমার উপর হুকুম এসেছে বাড়ী সার্চ্চ করতে। শুনলাম, আপনার সঙ্গে আলাপ—তাই আপনাকে একবার প্রাইভেটলি—"

আনন্দ ভয় পাইয়া গেল।

"বাড়ী সার্চ্চ? সে তো অসম্ভব! অবিনাশবাবুর টাইফয়েড, নবীনবাবু বলছেন সীরিয়স্ ব্যাপার। এ অবস্থায় সার্চ্চ করা—"

বিনোদবাবু লোকটি ভাল। দেখিলে মনে হয় না তিনি কোন নিষ্ঠুর কার্য্য করিতে পারেন। ধপধপে ফর্সা রঙ। নাকের ডান পাশে একটি কালো আঁচিল—এই আঁচিলটাই ছিল তাঁহার মুখের মধ্যে একটু খুঁৎ তাহা না হইলে বিনোদবাবুকে সুপুরুষই বলা চলে! তিনি বলিলেন, "সার্চ্চ তো করতেই হবে। তবে অবিনাশবাবুর যাতে কোন কষ্ট না হয় সেটা আমরা দেখব। তাছাড়া আপনি যখন রয়েছেন এ ব্যাপারে—কোন রকম—সে কথা বলাই বাহুল্য। বুঝলেন কি না আমাদের চাকরি! কিছু মনে করবেন না! চলুন তাহলে।"

আনন্দ বিস্মিত হইয়া বলিল, "এখুনি?"

"হ্যাঁ—সেরেই ফেলা যাক্—"

বলিয়া বিনোদবাবু ফিরিলেন। আনন্দও সঙ্গে সঙ্গে ফিরিল।

সার্চ্চ করিয়া বিশেষ কিছু বাহির হইল না।

বিনোদবাবু কার্য্য-সমাধা করিয়া চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় বারম্বার ক্ষমা-প্রার্থনা করিয়া গেলেন। সত্যই লোকটি ভাল।

কিছুক্ষণ পরে নবীনবাবু আসিলেন।

সব কথা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। উত্তেজনার চোটে ষ্টেথোস্কোপটা বার-দুই তাঁহার হাত হইতে পড়িয়া গেল!

—"তার মানে? পুলিস এসেছিল?—আমাদের বিনোদ-দারোগা! ডেঞ্জারাস লোক তো! মুচকি মুচকি হাসে, দেখলে মনে হয় খুব ভালমানুষ! পেশেন্টের বিছানার নীচেও সার্চ্চ করেছে? সারলে দেখছি। টাইফয়েড রুগী—সীরিয়স কেস্! সটান এসে রুগীটাকে ডিষ্টার্ব করে গেল! তার কি এটা জ্ঞান নেই যে এসব রুগীর নড়াচড়া একেবারে বারণ! হঠাৎ একটা স্লাফ আলগা হয়ে গেলেই তো বাস—খতম।—সারলে দেখছি! আজ কদিন হল?"

আনন্দ বলিল, "আজ তেরো দিন!"

"কাল রাত্রে কেমন ছিলেন?"

আনন্দ বলিল, "এই বিনয়, বল।"

বিনয় একটা খাতা দেখিয়া মুখস্থ করার মত বলিয়া গেল, "কাল রাত্তির নটায় টেম্পারেচার ১০৩.৪, বারটায় ১০৩.৬, তিনটের সময় ১০৩, ছটার সময় ১০২.৮ এখন ১০৩.২। ইউরিন মাত্র একবার হয়েছিল।" ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভুল বকছিলেন?"

"হ্যাঁ! বিড়-বিড় করে—"

নবীনবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সব শুনিলেন। রোগী দেখিলেন। তাহার পর বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "সুবিধের নয়—! আনন্দ দেখিস এ ছেলেগুলো যেন ভাল করে হাত-টাত ধোয়। এদের কারো হলেই তো গেছি!"

আনন্দ বলিল, "আচ্ছা।"

টেলিগ্রাম করিতে হয় নাই।

স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বিমানবাবু পরদিন আসিয়া উপস্থিত হইলেন —পশ্চাতে কুলী। কুলীর মাথায় খাকি ওয়াড়-দেওয়া চামড়ার সুটকেস। তদুপরি একটি হোল্ডল। ভদ্রলোকের গলায় মাফলার জড়ান—গায়ে হালফ্যাশানের চেষ্টারফিল্ড, চেষ্টারফিল্ডের দুই পকেটে ভর্ত্তি কমলা-লেবু! হস্তে নেভিকাটের টিন্—বগলে একটি বিলাতী মাসিক-পত্র, চক্ষে হোয়াইট গোল্ডের ফ্রেম-দেওয়া চশমা! মুখে নিখুঁৎ ভদ্র-ভাব। গোঁফ-দাড়ি কামান।

কুলী বলিল, "এহি হরেরামবাবুকা বাসা।"

আনন্দ, নবীন-ডাক্তারের নিকট হইতে ফিরিতেছিল।

আগন্তুক ভদ্রলোককে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাকে খুঁজছেন?"

"অবিনাশবাবু বলে একজন ভদ্রলোক—"

"হ্যাঁ—ওইটেই! ওরে পচা, কপাটটা খুলে দিয়ে যা।"

'অন-ডিউটি' পচা আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

"থ্যাঙ্ক্‌স"—বলিয়া বিমানবাবু ভিতরে চলিয়া যাইতেছিলেন এমন সময় আনন্দ জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার নাম কি বিমানবাবু?"

স্মিতমুখে ভদ্রলোক বলিলেন, "হ্যাঁ—!"

"টেলিগ্রাম পেয়ে আসছেন বুঝি?"

"না। কোন খবর পাই নি। তাই চলে এলাম"—বলিয়া তিনি ফিরিয়া বলিলেন, "আচ্ছা যাই—নমস্কার—!"

"নমস্কার। আমিও আসছি একটু পরে—"

আনন্দ দাঁড়াইয়া দেখিল, পরিষ্কার—পরিচ্ছন্ন একটি আধুনিক যুবক ভিতরে অনুপমার কাছে চলিয়া গেল। নিজের অর্দ্ধ-মলিন খদ্দরের পাঞ্জাবীটাকে তাহার ধিক্কার দিতে ইচ্ছা করিল! হঠাৎ উপরের দিকে চাহিয়া দেখিল, অনুপমা জানালায় দাঁড়াইয়া আছে! মনে হইল যেন সে আনন্দের চোখের দিকে চোখ তুলিয়া ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল; ক্ষণকালমাত্র! তাহার পর সে সরিয়া গেল। হয়ত মনের ভুল কিন্তু আনন্দের মনে হইল, দৃষ্টিটুকু যেন মিনতি-ভরা।

আনন্দ আর উপরের দিকে না চাহিয়া সোজা নিজের বাড়ীর ভিতর চলিয়া গিয়া বৌদিদিকে জিজ্ঞাসা করিল, "বৌদিদি, উনুন খালি আছে না কি?"

মৃদু হাসিয়া বৌদিদি বলিলেন, "চা চাই তো! তোমার সাড়া পেয়েই জল চড়িয়েছি।"

"ও থ্যাঙ্কস"—বলিয়া আনন্দ রান্নাঘরের দাওয়াতেই একটা পিঁড়ি

লইয়া বসিয়া পড়িল। বলিল, "দু' পেয়ালা চা তৈরী কর। এক কাপ বিমানবাবুকে পাঠিয়ে দিই।"

"বিমানবাবু কে আবার?"

"এইমাত্র কলকাতা থেকে এলেন ভদ্রলোক। অনুপমার দাদার ক্লাস-মেট—"

বৌদিদির বঙ্কিমচন্দ্র পড়া ছিল। হাসিয়া তিনি বলিলেন, "অর্থাৎ ভস্মানের আবির্ভাব হল!"

আনন্দ শুধু বলিল, "কি যে বল পাগলের মত। কেউ শুনে ফেললে কি হবে বল তো? তোমাদের ওই এক চিন্তা—"

বৌদিদি বলিলেন, "ওদের বাড়ীতে পুলিস এসেছিল না কি—সার্চ্চ করতে?"

"হ্যাঁ। অবিনাশবাবুর ছেলেকেও পুলিসে ধরেছে কলকাতায়! মুস্কিলে পড়েছেন ভদ্রলোক!—"

বৌদিদি শঙ্কিত-কণ্ঠে বলিলেন, "তুমি মিশোনা বাপু ওদের সঙ্গে, কোথা থেকে কি হয় বলা যায় না।"

আনন্দ একটু হাসিল মাত্র। তাহার পর বলিল, "দেখা যাক—অদৃষ্টে যা থাকে সে হবে! চা হল?"

চা লইয়া গিয়া আনন্দ দেখিল, দালানে বসিয়া অনুপমা ও বিমান কথা কহিতেছে। বোধহয় অশোকের অ্যারেষ্ট-হওয়া সম্বন্ধেই কোন কথা হইতেছিল, আনন্দকে দেখিয়া তাহারা থামিয়া গেল।

"আপনার জন্যে চা নিয়ে এলুম।"

"So very kind of you. Thanks. বসুন। অনুর কাছে

সব শুনছিলাম। ওর তো ধারণা দেখছি—আপনি মানুষ নন, দেবতা!”

“তাই না কি? এরকম ভাবে আমাকে গালাগালি দেবার অর্থ? আমার জটা নেই,—তিনটে চোখ, চারটে হাত, পাঁচটা মাথা, ছটা আনন, কিছুই তো নেই। যানের মধ্যে মাঝে মাঝে বাইক চড়ি। ষাঁড়, ময়ূর কিম্বা ইঁদুর-চড়া আমার পক্ষে অসম্ভব! হঠাৎ আমাকে দেবতা বলে' অপদস্থ করবার মানে কি?”

“না, না, ঠাট্টা নয়! অনু সত্যিই খুব প্রশংসা করছিল আপনার—”

“কি যে বলছ তুমি বিমানদা! না আনন্দবাবু, আমি বিশেষ কিছু বলিনি—” বলিয়া লজ্জিতা অনুপমা উঠিয়া গেল।

আনন্দ জিজ্ঞাসা করিল, “অবিনাশবাবুকে দেখেছেন?”

“হ্যাঁ, দেখলাম। খুব সীরিয়স্‌ বলেই তো মনে হচ্ছে? নবীনবাবু বেশ ভাল ডাক্তার তো? I mean, যদি দরকার হয় কলকাতা থেকে ডক্টর সেনকে আনাতে পারি!”

“নবীনবাবু এ অঞ্চলের মধ্যে বড় ডাক্তার। প্রবীণ লোক। সদাশয় ব্যক্তি। আমরা তো ছেলেবেলা থেকে ডাক্তার মানে নবীনবাবুকেই বুঝি।”

“বুড়ো ডাক্তারেরা একটু সেকেলে ধরণের হন কি না। আজকালকার আপ-টু-ডেট্‌ সব চিকিৎসা—”

আনন্দ জিজ্ঞাসা করিল, “কলকাতায় আপ-টু-ডেট্‌ চিকিৎসা করে টাইফয়েড-রোগী কি আর মরছে না আজকাল?”

“না তা' নয়—তবে—”

“তবে?”

"তবে অনুর হয় তো একটু স্যাটিসফ্যাকশন হত।"

অনুপমা বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, "না—না। নবীনবাবুর হাতেই চিকিৎসা থাক। বড় যত্ন করে দেখেন উনি। বিমানদা এসে-অবধি ডাক্তার সেন—ডাক্তার সেন করছেন। নবীনবাবুকে আমার তো খুব বিশ্বাস হয়।"

"একটা কিছু যদি হয়ে যায়, তখন বলো না যেন যে বিমানদা কিছু করলে না। অশোক অনুপস্থিত, এ অবস্থায় কোন ত্রুটি যেন না হয়, খরচের ভয় করিনা।"

বলিয়া তিনি বিলাতী কায়দায় 'shrug' করিলেন।

অনু বলিল, "না—ওসব থাক্—"

আনন্দ বলিল, "বেশ তো, নবীনবাবু তো আজ বিকেলে আসবেন, তখন তাঁকে বললেই হবে। তিনি যদি দরকার বোঝেন, তখন ব্যবস্থা করলেই হবে।"

বিমানবাবু বলিলেন, "হ্যাঁ—সেই বেশ।"

আনন্দ জিজ্ঞাসা করিল, "খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা—"

অনুপমা বলিল, "সে সব হয়েছে।—আপনি আজ আসবেন তো রাত্তিরে? কষ্ট হয়তো থাক—"

আনন্দকে বলিতে হইল, "না, কষ্ট কি? আস্‌ব আজ।"

বৈকালে আনন্দ অবিনাশবাবুর বাড়ী যাইতে পারে নাই। তাহার স্পোর্টিং ক্লাবের মীটিং ছিল। মীটিং শেষ হইবার পর সে অবিনাশ-বাবুর বাড়ীতে গিয়া বিমানদার সহিত মুখোমুখি বসিয়া গল্প করিতে ইচ্ছা করিতেছিল না।

"—কে আনন্দ না কি? শুনেছ?"

আনন্দ ফিরিয়া দেখিল, জীবনদা।

"কি শুনব ?"

"মৃণাল মারা গেছে—"

"অ্যাঁ—সে কি ! কি করে ? কোথায় ?"

"মুঙ্গেরে—রেলে কাটা পড়েছে !"

আনন্দের হঠাৎ মনে হইল আজই তো বুধবার—অমাবস্যা। আজই তো তাহার আসিবার কথা ছিল। মৃণালের কত কথা যে বলিবার ছিল !—অকথিত রহিয়া গেল চিরদিনের মত। এ কি সত্য ?

আনন্দ নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল !

সেই মাঠ ! আনন্দ একা আবার অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মৃণাল মারা গিয়াছে ? বিশ্বাস হয় না।

বলি-বলি করিয়াও কি কথা সে না বলিয়া সহসা চলিয়া গেল। সেই তেজস্বী মৃণাল !—লোকের বিপদে কি প্রাণ দিয়াই না সেবা করিত ! এই সেবক-সমিতি তো তাহারই প্রতিষ্ঠান ! সম্প্রতি সে কেমন যেন উন্মনা হইয়া ঘুরিত !—জিজ্ঞাসা করিলে বলিত বৃহত্তর সত্যের সন্ধান সে পাইয়াছে। কি সে সত্য ? তাহার সন্ধান সে তো আনন্দকে দিয়া গেল না ! মৃণালের জীবনের কত ছোট-খাটো খুঁটিনাটি তাহার মনে পড়িতে লাগিল ! ভারি অভিমানী ছিল সে। আনন্দ কাহারও সহিত বেশী ভাব করিলে মৃণাল মনে মনে চটিয়া যাইত। আনন্দ তাহার একার বন্ধু থাকিবে—কোন তৃতীয় ব্যক্তির স্থান সেখানে নাই !—দিব্য তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া গেল তো ! সত্যই কি মৃণাল মরিয়াছে ? আর আসিবে না !

আনন্দের চোখে অশ্রু জমিয়া উঠিল।—হঠাৎ তাহার মনে হইল, অনুপমা তাহার জীবনে সহসা আবির্ভূত হইয়াছে—তাই কি মৃণাল চলিয়া গেল? অভিমানী মৃণাল!

অনুপমা? কোথাকার কে! অথচ সারা মনটা জুড়িয়া বসিয়া আছে। আজ বিমানের কাছে তাহার প্রশংসা করিয়াছে। শুনিয়া-অবধি আনন্দের মন আকাশে-আকাশে উড়িয়া বেড়াইতেছে। আজ রাত্রে সেখানে যাইতে হইবে। বিমান আসিয়াছে—যাইবার আর দরকার কি? কিন্তু তাহার অন্তরতম মন বলিল, আসিয়াছে বলিয়াই যাইবার দরকার আছে। তাহা ছাড়া, অনুপমা নিজমুখে আসিতে বলিয়াছে এবং সে প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছে।

—যাইবে বই কি!

বিমান আর অনু কি এক ঘরে শুইবে? সেটা ঠিক হইবে না। উপরে তো দুখানি ঘরও নাই। এই শীতে বিমানবাবু কি দালানে শুইতে রাজী হইবেন? দালানও তো ঘর। একই ঘরে দুইজনের শোয়াটা—আনন্দ অনুপমা-সমস্যায় মগ্ন হইয়া গেল।

বিচিত্র মানুষের মন! আশৈশবের সহচর মৃণালের মৃত্যুশোক ভুলিয়া আনন্দ কোথাকার অচেনা অনুপমার স্বপ্ন দেখিতেছে জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে।

অবিনাশবাবুর খবর লইবার জন্য আনন্দ আবার নবীন-ডাক্তারের বাড়ী গেল। এবার দেখা হইল।

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "কম্প্লিকেশন এসেছে।"

শঙ্কিত-কণ্ঠে আনন্দ জিজ্ঞাসা করিল, "এ বেলা কি অবিনাশবাবুর অবস্থা খারাপ দেখলেন না কি?"

"অবস্থা তো খারাপই। ভীষণ টক্‌সীমিয়া—তার ওপর এক ফোড়নদার ছোক্‌রা এসে জুটেছে। সারলে দেখছি!"

"বিমানবাবু কিছু বললেন না কি?"

"বললে, রক্ত দেওয়ার যদি দরকার মনে করেন—আমি রক্ত দিতে পারি সচ্ছন্দে। আজকাল কলকাতায় রক্ত-দেওয়া একটা ফ্যাশান হয়েছে কি না!"

আনন্দ তাহার পর বলিল, "কলকাতা থেকে ডাক্তার-আনাবার কথা কিছু হল না কি!"

"হ্যাঁ। বলছিল ওই ছোক্‌রা। আমি বললাম, একটা কেন, দশটা ডাক্তার তোমরা আনতে পার! মেয়েটি কিন্তু বাইরে থেকে কাউকে আনাতে রাজী নয় দেখলাম—"

অকারণে আনন্দ বলিল, "মেয়েটি বেশ ভাল!"

নবীনবাবু একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "মৃণালের খবর শুনেছিস্?"

"শুনেছি।"

"উঃ—বড় লোকসান হয়ে গেল একটা! এমন ছেলে এ তল্লাটে আর হবে না। তোরা দুটিতে মাণিকজোড় ছিলি।"

"চল্লাম।"—মৃণালের কথা মনে করিয়া হঠাৎ তাহার বুকের ভিতরটা কেমন যেন মুচড়াইয়া উঠিল!

বাড়ী ফিরিয়া দেখিল, একখানি টেলিগ্রাম আসিয়াছে—তিন-পাহাড় হইতে। সেখানে তাহার ছোট বোন বীণার অবস্থা সঙ্গীন। দুই দিন হইতে প্রসব-বেদনা, ছেলে এখনও হয় নাই। বীণার স্বামী

হিলপাহাড়ে ষ্টেশনে কাজ করেন। তিনি আনন্দকে যাইবার জন্য টেলিগ্রাম করিয়াছেন।

আনন্দ আবার নবীন-ডাক্তারের বাড়ী ছুটিল। তিনি বারকয়েক 'সারলে দেখছি' বলিয়া শেষটা ঠিক করিলেন যে হাঁসপাতালের ধাত্রীটিকে লইয়া অবিলম্বে আনন্দ চলিয়া যাক—তাহার পর দরকার যদি হয়, তিনি যাইবেন।

নিজের ভগ্নীর অসুখ। যাইতেই হইবে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, আনন্দ মনে মনে যেন একটু বিরক্তই হইল! আজ রাত্রে সে যেন এখানে থাকিতে পাইলে বর্ত্তিয়া যাইত। যাইবার পূর্ব্বে সে একবার অবিনাশবাবুর বাড়ী গেল। দেখিল ছবি আঁকিয়া বিমানবাবু 'টেলি-ভিশনের' তথ্য অনুপমাকে বুঝাইতেছে এবং ঝুঁকিয়া পড়িয়া অনুপমা তাহা দেখিতেছে। তাহার আগমন তাহারা জানিতে পারিল না। তাহারও জানাইতে প্রবৃত্তি হইল না—ধীরে ধীরে সে নামিয়া গেল!

১৩

তিন দিন পরে।

রাত্রি দুইটা হইবে। অন্ধকার ভেদ করিয়া ট্রেন ছুটিয়া চলিয়াছে। একটি ইন্‌টার-ক্লাস কামরায় আনন্দ একা বসিয়া আছে। যমে-মানুষে টানাটানি করিয়া মানুষ এবার জয়ী হইয়াছে—বীণা বাঁচিয়াছে। আনন্দ সাহেবগঞ্জে ফিরিয়া চলিয়াছে। তিন দিন সে অনুপমার কোন খবর পায় নাই।

এই তিন দিন আনন্দ যাহা ভাবিয়াছে তাহা বর্ণনা করিবার নহে। অনুভব করিবার। এ অনুভূতির ভাষা নাই!

সাহেবগঞ্জে যখন সে পৌঁছিল—তখন শেষ-রাত্রি। ষ্টেশনে চেনা-কাহারো সহিত দেখা হইল না।—ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া দেখিল শুকতারাটা জল-জল করিয়া জ্বলিতেছে! অত্যুজ্জ্বল শুক্র-গ্রহ!

তাহার সমস্ত অন্তর কানায় কানায় পরিপূর্ণ!

—ধীরে ধীরে সে গলির মোড়ে আসিয়া দাঁড়াইল।

মিউনিসিপালিটির বাতি নিভিয়া গিয়াছে।

চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ।

গলির ভিতরে প্রবেশ করিয়া অবিনাশবাবুর বাড়ীর দিকে সে তাকাইয়া দেখিল।—অন্ধকার। অবিনাশবাবুর ঘরে-পর্য্যন্ত আলো জ্বলিতেছে না। ইহার মানে কি?

"বিনয়—কিশোর—"

কাহারো সাড়া নাই। ইহারা ঘুমাইয়া পড়িল না কি? দেখিল, কপাটটা খোলা! ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, গাঢ় অন্ধকার; হাত বাড়াইয়া হাতড়াইয়া সিঁড়ি দিয়া সে উপরে উঠিতে লাগিল। উপরেও অন্ধকার। কম্পিত কণ্ঠে সে ডাকিল, "অনু—অনুপমা—"

কেহ নাই। অবিনাশবাবুর শয্যা শূন্য!

নীচে নামিয়া গিয়া নিজেদের বাড়ীর দরজায় সে সজোরে করাঘাত করিতে লাগিল। বৌদিদি আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিয়া বলিলেন, "অবিনাশবাবু কাল সকালে মারা গেছেন। ওঁরা সব চলে গেছেন—কালই সন্ধ্যা বেলা।" একটু থামিয়া বৌদিদি আবার বলিলেন, "উনিও

ফিরেছেন কাল কাশী থেকে। ১৭ই মাঘ দিন স্থির হয়েছে।”

আনন্দ বিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহার মুখে কথা জোগাইল না।

বৌদিদি বলিলেন, “ভেতরে এসো। বীণা কেমন আছে?”

“ভাল।”

বলিয়া সে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিল। আলোটা জ্বলিতেই চোখে পড়িল মৃণালের ফোটোখানা।

মৃণাল তাহার দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে!

হিন্দু-বাংলা ও মুসলমান-বাংলা

বাংলাভাষা হিন্দুবাংলা হইবে না মুসলমানবাংলা হইবে ইহা লইয়া তর্ক উঠিয়াছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলি পাঠশালা হইবে না মক্তব হইবে ইহাও প্রশ্ন। এ প্রশ্নের উত্তর এই যে দুই রকমই হউক। বাংলাভাষা রাষ্ট্রভাষা হইলে পঞ্চাশ রকম বাংলা হইবে—তাহার চেয়ে দুই রকম ভাল। হিন্দুর লেখা বই হিন্দুরা পড়িবে, মুসলমানের লেখা বই মুসলমানে পড়িবে। ভাষা-বিভাগ হইলে, লেখক ও পাঠক বিভাগও চাই। অনর্থক তর্ক করিয়া কালক্ষেপ করা সমীচীন নহে—ভাষা সম্বন্ধে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় সম্বন্ধে ইহা যদি শেষ কথা না হয় তাহা হইলে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব কখনও মিটিবেনা, যদি মেটে, দাঙ্গায় অথবা যুদ্ধে। ইহার কোনোটাই ভাষার পক্ষে সুবিধাজনক নহে।

সংবাদ সাহিত্য

বিংশ শতাব্দীর প্রায় আরম্ভ হইতেই আমাদের দেশে শস্তা জাপানী খেলনা ও নানা মনিহারী দ্রব্যের যে প্রকার অবাধ আমদানী সুরু হইয়াছিল এবং এগুলি যে-ভাবে অচিরকালমধ্যে আমাদের অন্দর ও বাহির ছাইয়া ফেলিয়াছিল, তাহাতে বহুবিধ সুবিধা সত্ত্বেও জাপানী মালের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা হারাইয়াছিলাম। অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইয়াছিল যে জাপানী কোনও বস্তু বলিতে আমরা তাহার শস্তামি-বিষয়ে যেরূপ ভীত হইয়া উঠিতাম, তেমনি দুইখানি হাত অতি সরল ভাবে পকেটে ঢুকাইয়া যতগুলি পয়সা একবারে দুই মুঠায় উঠে ঠিক ততগুলি পয়সাই খরচ করিয়া নানাবিধ দ্রব্য কিনিয়া গৃহিণী এবং পুত্রকন্যার মুখে হাসি ফুটাইবার বন্দোবস্ত করিতাম। ফলে আর যাহাই হউক একটি জ্ঞান লাভ করিয়াছি এই যে এতদিন যে শস্তার মাত্র তিনটি অবস্থা ছিল বলিয়া জানিতাম, এখন স্বচক্ষে দেখিলাম, অবস্থা তিনটি নহে, বহু।

কিন্তু এ সম্বন্ধে যেটুকু দুঃখের সেটুকু চাপা দিয়া সুখের দিকটাই উদ্ঘাটিত করি। জাপানী শস্তা মালে দেশের ছেলেমেয়েদের মুখে হাসি ফুটিয়াছে এই কথাটিই আসল, অভিভাবকের পয়সা গিয়াছে তাহাতে ক্ষতি নাই।

সম্প্রতি জাপানী কবি নোগুচি কলিকাতা আসা উপলক্ষে হঠাৎ জাপানী বস্তু সম্বন্ধে এই সব পুরাতন কথাগুলি মনে পড়িয়া গেল। মনে পড়িবার বিশেষ কারণ এই যে কোনো দেশেরই উৎকৃষ্ট দ্রব্য আমরা

লই না, নিকৃষ্টের দিকেই আমাদের দৃষ্টি। জাপানে যাহা অচল, জাপানীরা তাহা ভারতবর্ষে পাঠায়, জার্মানিতে যাহা অচল, জার্মানগণ তাহা এদেশে বিক্রয় করে। আমাদের আর কিছুই বক্তব্য নাই, লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন ঠকাইয়া না যায়।

—

মৈত্র মহাশয় জাপানী-কবিতার এজেন্ট হইয়া যে-মাল বঙ্গদেশের বাজারে চালাইতে চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে আমরা বিশেষ শঙ্কান্বিত হইয়াছি। এগুলি যে খেলনা হইতেও শস্তা মনে হইতেছে! মাসিক ও সাপ্তাহিক যদি এই শস্তামালে পৃষ্ঠা সাজাইতে বসে তবে বাংলাদেশের লক্ষাধিক কবি মুহূর্ত্তে বেকার হইয়া পড়িবে। কবিতা-আমদানির উপরে কি "ডিউটি" বসানো যায় না?

—

সিনেমার প্রভাবে আমাদের দেশের দুধের বাছাদের কি সর্ব্বনাশই যে হইতেছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। শুনা যায়, এক বাড়ির একটি শিশুকে হঠাৎ একসময় খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছিল না। শিশুর মাতা ও পিতা সন্তানহারা হইয়া পাগলের মত হইলেন। বাড়ির অন্যান্য লোকেরা খুঁজিতে বাহির হইল। এক বেলা খুঁজিবার পর অবশেষে শিশুকে পাওয়া গেল এক সিনেমাঘরের বারান্দায়। সে তখনও হাঁটিতে শেখে নাই, হামাগুড়ি দিয়াই চলিয়া আসিয়াছে! অনুসন্ধানকারীগণ অবাক হইয়া দেখিল, ছেলেটি সিনেমার এক অভিনেত্রীর ছবি সম্মুখে করিয়া বুকিং অফিসের নিকট বসিয়া আছে!

—

গল্পটি বিশ্বাস করা শক্ত, কিন্তু অবস্থা যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে বিশ্বাস না করিয়া উপায় নাই। সিনেমার আওতায় একজাতীয় 'তরুণ'

বর্দ্ধিত হইতেছে; সিনেমার অভিনেত্রীই ইহাদের ধ্যান এবং জ্ঞান। রাত্রে ইহারা সিনেমা-অভিনেত্রীর স্বপ্ন দেখে এবং দিনের বেলা তাহাদের ফোটো-পোষ্টকার্ড কিনিয়া বেড়ায়। আবার সাপ্তাহিক কাগজগুলিও ইহাদের পথ চাহিয়া বসিয়া থাকে—কারণ ইনাইয়া বিনাইয়া অভিনেত্রীর ফোটোগ্রাফের রূপ বর্ণনা আর কেহ করিতে জানে না। যে-কোনো অভিনেত্রী ইহাদিগের বুকে ছুরি মারিয়া যায়; একদিন ছবি দেখে, আর সাতদিন বিহ্বল হইয়া পড়িয়া থাকে। এই লেখকরূপী বৃহন্নলা-সম্প্রদায়কে প্রশংসা করিতেই হইবে—কেননা ইহারাই যথার্থ ত্যাগী। পৃথিবীর প্রবল জাতিসমূহ জীবন উপভোগ করে—বাণিজ্য দ্বারা এ দেশ হইতে পয়সা লুটিয়া লয়—আর ইহারা তাহাদের চতুর অভিনয়ের ছবি-মাত্র দেখিয়াই আধমরা হইয়া পড়ে। স্বাস্থ্য নাই, তাই চোখে ঘুমও নাই। ক্ষমতা নাই, তাই অভিনেত্রীদের অদৃশ্য চরণে শির লুটাইয়াই পড়িয়া থাকে। বলিবার ভাষা নাই, তাই নামজপ করিতে করিতে মুখে ফেনা উঠিয়া যায়।

—

তবু আমরা এই সম্প্রদায়কে তারিফ করিতেছি। আর যাহাই হউক, ইহাদের অধ্যবসায় প্রশংসনীয়।

একজন বলিতেছেন—

…চোখ কখন জড়িয়ে এসেছিল জানি না—এক সময় প্রশান্ত মহাসাগর সাঁতরে উঠলুম। চারিদিকে শান্তি! শান্তি! আনন্দে উৎফুল্ল আমি—কী স্বপন দেখলুম—আমি বঙ্কিমবাবু নই, তা নয়ত 'আহা কী হেরিলাম' বলে তিন পাতা লিখে ফেলতাম।

তা যখন নই তাই যা দেখেছিলাম সেই কথাই বলছি—মারলে ওবেরন এসেছে কলকাতায়। বড়দিনের বাজারে সহরে রঙ বেরঙ

সাজের মেলা—মেট্রোতে এসেছে ছবি দেখতে—উঃ কী ভীড়! চাপে দেশলাইয়ের কাঠি হয়ে যাবার যোগাড়! টুপি, স্কার্ট, সাড়ি, লম্বা ঝুলওয়ালা কোট—কিছুর অভাব নেই···আমি এগিয়ে চলেছি, মারলে দেখব বলে, মারলে! মারলে! সে যে আমার স্বপ্ন। সে যে আমারি মত এই কলকাতারি মানুষ···সেই মারলে এসেছে কলকাতায়। মারলে! মারলে! ওই তো মারলে! কাকে ডাকছে! আমায় না!—হ্যাঁ আমায়ই তো!—মারলে আমার সামনে···হাত ধরে জিজ্ঞেস করলে কী চাই; আমি বল্লুম অটোগ্রাফ। মারলে আবার হাসলো, বল্লে, আর কিছু না? সুধা কেমন জানি না—আমার মুখে কে মধু ঢেলে দিলে।···

হায় এমন করেই 'মারলে'! স্বপ্ন-মারলে লেখকের মুখের ভিতর বাক্য-সুধা 'ঢাললে'? একেবারে উন্মাদ না হইলে প্রেম! প্রলাপ না হইলে স্বপ্ন! হায় বঙ্গবীর, এই মারলে হইতে তোমাকে কে বাঁচাইবে!

—

এদিকে আমাদের ঢাকা যে কলিকাতাকে টেক্কা মারিয়া আগাইয়া চলিয়াছে নানা গোলমালে আমরা তাহা লক্ষ্যই করি নাই। ঢাকার তরুণীর পরিচয়, নায়ক-নায়িকার প্রথম সাক্ষাৎ-কৌশল, মিলন, বিরহ, সমস্তই একেবারে নূতন রূপ লইয়া দেখা দিয়াছে।

তরুণীর স্বরূপ—

> একটি তরুণী একটা দোকান থেকে সওদা হাতে বেরিয়ে বার দুই ট্যাক্সি বলে হেঁকে, ট্রামের অপেক্ষায় ফুটপাথে পায়চারী করছিল।

মহাশূন্যে ট্যাক্সি বলিয়া হাঁকা এবং না পাইয়া ট্রামের জন্য অপেক্ষা করার মধ্য দিয়া লেখক বোধহয় তরুণীর পরিচয় ফুটাইয়াছেন। তাহা এই যে তরুণী, জীবনে এই প্রথম ঢাকা হইতে কলিকাতা পৌঁছিয়াছে।

—

লেখক ও পাঠকের ব্যালান্স

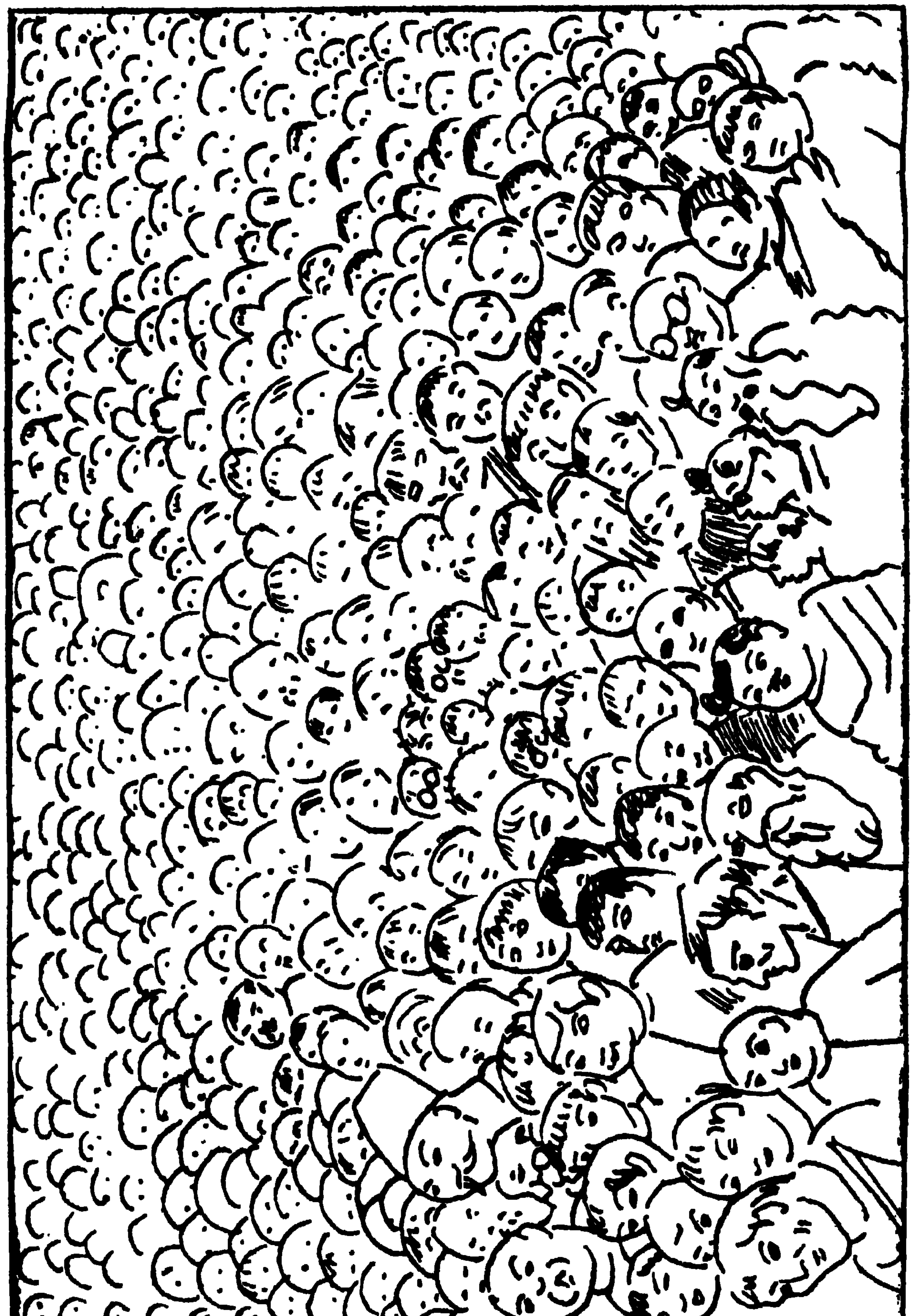

বাংলা সাময়িক পত্রের সম্পাদকসংখ্যা

বাংলা সাময়িক পত্রের পাঠকসংখ্যা

অভিনেতা ও অভিনেত্রীর ব্যালান্স

অভিনেতা ও অভিনেত্রীর ব্যালান্স

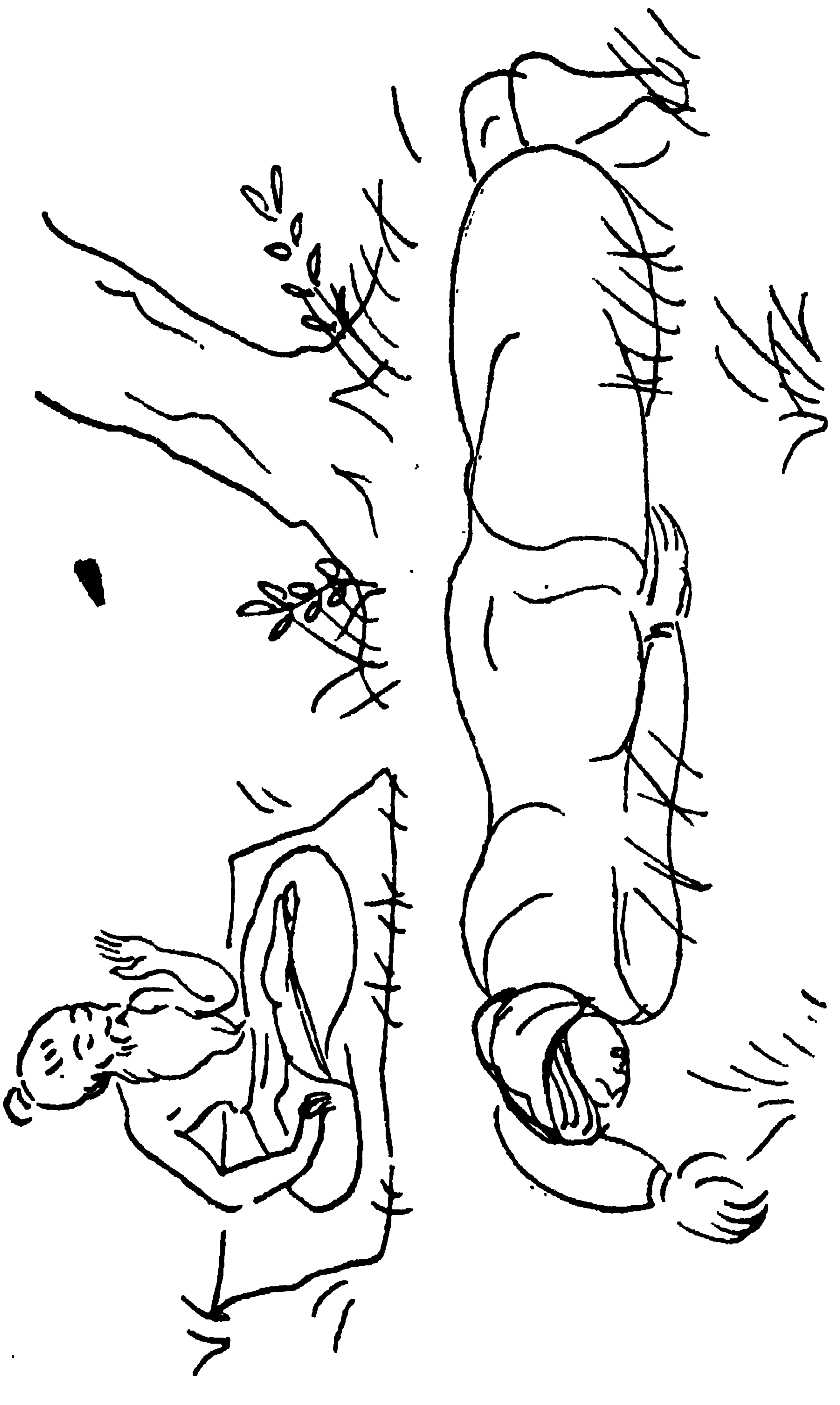

নির্ব্বাসিতা সীতা ও বাল্মীকি

এদিকে নায়কের সঙ্গে মিলনও আসন্ন হইয়া আসিয়াছে। ঢাকাই কৌশলে মিলন ঘটিল। নায়ক শিক্ষিত অথচ ফেরিওয়ালা এবং তরুণ।—

এমন সুদর্শন তরুণটিকে খবরের কাগজ ফিরি করতে দেখে কৌতূহলী হয়ে সে বার দুই তার পানে চাইল। তার পর তার হাত থেকে সব রকম কাগজের এক একখানা নিয়ে হাত ব্যাগ থেকে দাম দিয়ে পাতা ওলটাতে লাগল।

দীপক (তরুণ নায়ক) তা পকেটে রাখবার সময় লক্ষ্য করল একটি পয়সা অত্যন্ত উজ্জ্বল। ভাল করে দেখে বুঝল, তরুণী ভুল করে পয়সার বদলে একটা গিনি দিয়েছে।

সে তরুণীর কাছে গিয়ে বল্লে "দেখুন আপনি ভুল করে…"

"তাই নাকি ?" বলে মনে মনে ফিরিওয়ালার সাধুতার অজস্র প্রশংসা করে. তরুণী বল্লে, "এই যে বাকী দাম।"

"এযে টাকা দিলেন মোটে এক পয়সা দেবেন।"

"এবারে ভুল করিনি।"

"কিন্তু আপনি তা দেবেন কেন ?"

"আমি দিলুম—

হায় কলিকাতা ট্রামওয়ে কম্পানি! তোমার অনিয়মিত ট্রাম ছাড়ার কৃপায় পথের মোড়ে মোড়ে গল্প রচিত হইতেছে, সে সংবাদ তুমি রাখ না।

—

তরুণী এতক্ষণ পরে ট্রাম পাইয়া চলিয়া গেল। ট্যাক্সির কথা আর তাহার মনেই পড়িল না। কিন্তু তেরো লক্ষ লোকের মধ্যেও অপরিচিত নায়ক-নায়িকার পুনর্মিলন হইতে আটকায় না। ইচ্ছা করিলেই হইল।

শস্তা মেসের যে খুপরীতে দীপক কদন্ন খেয়ে বাস করত সেখানে ভুলেও আলো বাতাসের গতি বিধি ছিল না। তাই অনেক রাত অবধি সে গোলদীঘির একটা বেঞ্চিতে বসে কাগজ পড়ত ও ভাবত।

সে দিনও সে বসেছিল। ওপরে নিদহারা চাঁদ স্বপ্ন পারাবারের খেয়া বেয়ে চলেছে…সেই দিকে চেয়ে চেয়ে দীপক আনমনা হয়ে পড়েছিল।

তার তন্ময়তা ভাঙল দূরে মেয়ে গলার আর্ত্তস্বর শুনে। শব্দের অনুসরণ করে গিয়ে সে দেখল, যে তরুণী সেদিন তাকে …পাশের গলিতে এক গুণ্ডা তার পথ আগলে সোনার রিষ্ট-ওয়াচ কেড়ে নেবার উপক্রম করচে। বোধ করি তরুণী সিনেমা থেকে ফিরছিল পথে এই দুর্দ্দৈব!

দীপক এক লাফে গুণ্ডাটার ঘাড়ের উপর যেয়ে পড়ল।

তরুণী আকুল হয়ে পড়েছিল। দীপককে দেখে হাঁপ ছেড়ে বললে, "আপনি?—বাঁচলুম।"…বিপাক দেখে গুণ্ডাটা দৌড়ে পালাল।

দীপক অনেক রাত পর্য্যন্ত পুলিস আইন অগ্রাহ্য করিয়া গোলদীঘিতে বসিয়া থাকিত। বোধ হয় তরুণীটি সিনেমা দেখিয়া ছবিঘর কিংবা আলফ্রেড থিয়েটার হইতে রাত বারোটায় ফিরিতেছিল। একা! গোলদীঘির পাশের গলি দিয়া!

—

আবার তরুণ-তরুণীর মিলন (বোধহয়) কলেজ স্ট্রীটেই।—

"কি কি কাগজ আছে?"

দীপক দিল। কিন্তু তরুণী দাম দিতে গেলে দীপক হাত গুটিয়ে নিয়ে বল্লে, "না না…"

"কাগজ নেওয়া হল না তা হ'লে।"

পথের মাঝে কথা কাটাকাটি করে তরুণীর মর্য্যাদা হানি ঘটাবার ভয়ে দাম নিতে হ'ল।

নিরালা রাত্রিতে পার্কের বেঞ্চিতে বসে দীপক বহুক্ষণ ...দেখল। এত দামী নোট তৈরী হয় এর আগে সে জানত না—এ দিয়ে যে একটা সাম্রাজ্য তৈরী করা চলে।

অথচ এমন তরুণীকেও বায়োস্কোপ দেখিয়া একা ফিরিতে হয় এবং রাত বারোটায় এবং পায়ে হাঁটিয়া!—শুধু ইহাই নহে। দীপক মোটর-চাপা পড়িয়া হাসপাতালে গেল—এবং জ্ঞান হইতেই দেখিল, তরুণী নার্স করিতেছে!

লেখক বি. এস-সি উপাধিধারী। অন্যায় নহে, কারণ বিজ্ঞানে নিষ্ঠা না থাকিলে এরূপ প্লট কল্পনা করা যায় না। তদুপরি এরূপ গল্প লিখিয়া যদি কিঞ্চিৎ টাকা পাওয়া যায় তবে ত আমাদের বলিবার কিছুই নাই। অতএব দাদা, মূর্খ সম্পাদকদের ঠকাইয়া যাহা পার উপার্জ্জন করিয়া লও, দিনসময় বড় খারাপ। অন্য কোনো দিকে সুবিধা না হইলেই গল্প লিখিবে, এবং লিখিলেই সুবিধা হইবে। ইহার চেয়েও মৌলিক প্লট এদেশে চলিতেছে, সঙ্কোচ করিও না।

—

স্বীকার করিতেই হইল, রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপাইবার গৌরব একমাত্র বিচিত্রারই প্রাপ্য। আমরা বৃথাই সিরোলিনের প্রবন্ধকে গাল দিলাম! এখন ভাবিতেছি, ইহার পর বিচিত্রার কি হইবে। রবীন্দ্রনাথের বয়স চুয়াত্তর পার হইয়া গিয়াছে, বিচিত্রার যে সবে নয়! হায় সম্পাদক, নিজের নামের একখানা চিঠিও জুটিলনা, পরের চিঠি ছাপাইয়া বিচিত্রার কান মলিলে!

—

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক ও সাহিত্যসাগর আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ প্রণীত "আরকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য" সম্বন্ধে "শনি ঠাকুর" নামক লেখক যাহা জানাইয়াছেন তাহা বাংলাভাষার উপর অত্যাচারের একটি নিদর্শন। তিনি লিখিতেছেন—

"ভূমিকায় শ্রীযুক্ত ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় গ্রন্থকারদ্বয়কে দ্রোণার্জ্জুন সদৃশ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। অত্যুক্তি নহে নিশ্চয়ই, কিন্তু অতীব পরিতাপের বিষয় এই যে গুরুশিষ্য দ্রোণার্জ্জুন-লিখিত পাণ্ডিত্যপূর্ণ এই পুস্তকে বিস্তর রচনাপ্রমাদ (মুদ্রাকর প্রমাদ নহে) স্থান পাইয়াছে।

—

পৃঃ ৬৭ :—"স্বীকার করি মুসলমান না হইলে [?] বাংলাভাষা ও সাহিত্য কৃষক কণ্ঠেই ফুটিয়া উঠিত……কিন্তু ভদ্রসমাজে সমাদৃত হইত না।"

পৃঃ ২৯—পংক্তি—১৫ ;—"কয়েকটি পত্র হারিয়া গিয়াছে" বড় সমস্যায় পড়িয়াছিলাম। "হারিয়া" অর্থ সোজা কথায় পরাজিত হইয়া। কিন্তু তাহাতে কোন ভাল অর্থ হয় না। আমাদের ভাঁড়ুদত্ত বিজ্ঞভাবে কহিল, ছাপার ভুলে "জ" স্থানে "র" বসিয়াছে। হাজিয়া হইলে অবশ্য অর্থ একপ্রকার হয়। তবে লোকের হাত পা-ই হাজিয়া গিয়া থাকে। কাগজপত্র হাজিয়া যায় এরূপ কথা কুত্রাপি শোনা যায় নাই। আর তা ছাড়া শুদ্ধি পত্রেও সেরূপ কোন কিছুর উল্লেখ দেখিলাম না। অবশ্য 'হারাইয়া' হইলে আর কোন গোল থাকে না।

৯৯ পৃঃ ১২ পংক্তি ;—"ইহা একপ্রকার পদভূষণ ; পায়ের গোড়ালির দিকে আটকাইয়া……পাতার দিকে ঝুলাইয়া রাখিতে হয়।"…লিখিতে যে যুগ্ম গ্রন্থকারের কাহারও কলমে "আটকাইল না" ইহাই আশ্চর্য্য।

পৃঃ ১০০—"মুসলমান রমণীরা কপালে সিন্দুর বিন্দু পরিধান করিতেন।"—কবে হয়ত শুনিব আজকাল মেয়েরা কপালে খয়েরের ফোঁটা "পরিধান" করেন। গ্রন্থকারদ্বয় হঠাৎ সিন্দুরের প্রতি এতটা সম্ভ্রমপূর্ণ হইয়া উঠিলেন কেন? অথচ সিন্দুর ব্যবহার-কারিণীদের

প্রতি তাদের এরূপ ভাব দেখা যায় না। নহিলে "ইহা মেয়েলোকেরা বক্ষ আবরিত করিবার জন্ম ব্যবহার করিতেন।" (পৃঃ ১০১)—এহেন ভাষা গুরুশিষ্য কাহারও কলমে "আটকাইল না"! এস্থলে "মেয়েলোকদের" বক্ষ আবরিত করিয়া ভাষা এবং নারীর প্রতি গ্রন্থকারদ্বয় যেরূপ অসৌজন্য প্রকাশ করিয়াছেন বক্ষ আবরিত না করিলেও ততটা প্রকাশ পাইত না।

পূর্ব্ববঙ্গসুলভ ভ্রমপ্রমাদেরও অপ্রতুলন নাই। পৃঃ ১০১—"বাদলা দিয়া "জড়ীর" কাজ করা হইত।"

পৃঃ ২৬;—পংক্তি—১৮;—"গোলাপ কলিকাটীকে অকালে ঝড়িয়া পড়িতে বাধ্য না করিলে—"

"জড়ী" কোন জাতীয় পদার্থ তাহা আমাদের জানা নাই। পূর্ব্ববঙ্গজাত কোন দ্রব্য হইতে পারে। তবে জরি অবশ্য আমাদের পরিচিত বস্তুই।

"ঝড়িয়া" শব্দটির অর্থ বহু চেষ্টাতেও বাহির করিতে না পারিয়া ভাঁড়ুদত্ত বলিয়াছিল, সম্ভবতঃ ক্রিয়া পদে ঝড় হইতে "ঝড়িয়া" হইয়াছে। হইতেও পারে; অসম্ভব নয়। কারণ চট্টগ্রাম সমুদ্রের ধারে: বঙ্গোপসাগর হইতে নিয়তই ঝোড়ো বাতাস চট্টগ্রামে বহিতেছে।

কথা বলিবার সময় কাহারও কাহারও মুদ্রাদোষ দেখা যায়। লেখকদ্বয়ের লেখাতেও সেরূপ মুদ্রাদোষ দেখিতে পাইতেছি। ১০৯ পৃষ্ঠার পুস্তকে কমপক্ষে চল্লিশ বার "এ হেন" শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে—যদিও অনেক স্থলেই উহার ব্যবহার সুষ্ঠু হয় নাই।

আর একটি শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করিয়া আমরা নিরতিশয় শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছি। গ্রাম্য কথায় "উপরি দোষ" হওয়া অর্থে ভূতপ্রেতগ্রস্ত হওয়া বুঝাইয়া থাকে। "উপরি" শব্দটাও যেন গ্রন্থকারদ্বয়কে ভূতের মত পাইয়া বসিয়াছে। স্থানে অস্থানে উপরি শব্দ যোগে—"উপর্য্যুক্ত," 'উপর্য্যালোচিত', 'উপর্য্যঙ্কিত', "উপর্য্যোল্লিখিত" ইত্যাদি ভূতের সমাবেশ করা হইয়াছে। সময়ে সতর্ক না হইলে "এ হেন"র মত "উপরি"ও মুদ্রাদোষে পরিণত হইবে।

শুনিয়াছি ডাক্তারসাহেব সুফীতত্ত্ব সম্বন্ধে মৌলিক প্রবন্ধ লিখিয়া পি, এইচ, ডি, ডিগ্রী পাইয়াছেন, ভাল। তবে সম্ভবতঃ প্রবন্ধটি বাংলা ভাষায় লিখেন নাই।

—

অমৃতবাজার পত্রিকায় কিছু দিন পূর্ব্বে একটি বিজ্ঞাপন দেখিয়াছিলাম, জনৈক ভদ্রলোক মেয়েদের সঙ্গে intellectual basis-এ আলাপ করিতে চাহেন। আমাদের ইন্‌টেলেক্ট নাই, শুধুই ইমোশন আছে, এইরূপ একটি অপবাদ বহুদিন হইতে শুনিয়া আসিতেছিলাম। উক্ত বিজ্ঞাপনদাতা-ভদ্রলোকটি বোধহয় ভারতীয় চরিত্রের কলঙ্ক ঘুচাইয়া এই প্রথম ইনটেলেক্টের ক্ষেত্রে পা বাড়াইলেন। বিজ্ঞাপনটি মেয়েদের পক্ষে লোভনীয় হইবে কিনা জানি না, কারণ স্ত্রীজাতির ইন্‌টেলেক্ট এবং ইমোশন এই দুইয়েরই অভিজ্ঞতা আছে। তবে তাহারা বিজ্ঞাপন দিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে নাই—কারণ বাজারে পুরুষের ইনটেলেক্ট এবং ইমোশনের কর্ম্মফল প্রত্যেক পুস্তকের দোকানেই পাওয়া যায়। মেয়েদের কীর্ত্তিও কিছু কিছু আছে, তাহাও উক্ত স্থান সমূহে প্রাপ্তব্য। এ বাজারে স্ত্রী হউক, পুরুষ হউক, যাহারই ইন্‌টেলেক্ট বা ইমোশন আছে সেই এক বা একাধিক গ্রন্থ রচনা করিয়া বাজারে ছাড়িয়াছে, কেহই উহা লইয়া অন্তরালে বসিয়া রহে নাই। অতএব বিজ্ঞাপনদাতা বিজ্ঞাপনের সাহায্যে ইনটেলেকচুয়াল বেসিস্‌-এ কিছু গড়িয়া তুলিবার পূর্ব্বে পুস্তকের বাজার অনুসন্ধান করুন।

—

অমৃতবাজারের গত ১৯ শে ডিসেম্বরের একটি বিজ্ঞাপন, বিজ্ঞাপন-হিসাবে সত্যই অভিনব বলিয়া বোধ হইতেছে। পুরুষ যে অনুগ্রহ করিয়া পুরুষ-বিবাহ না করিয়া স্ত্রীলোক-বিবাহ করে, এবং এইরূপ বিবাহ যে স্ত্রীর পক্ষে অনেকটা চাকরি-পাওয়ারই সামিল, ইহা এই বিজ্ঞাপনদাতা খুলিয়া বলিয়াই ফেলিয়াছেন। বিজ্ঞাপনটির মর্ম্ম এই—

GOLDEN OPPORTUNITY FOR A LADY GRADUATE

Wanted a Hindu Graduate······of sound health and willing to proceed to Great Britain after marriage with her husband for teaching diploma for a 33 years [?] healthy rich Vaish Zeminder widower and a 1st class M. Sc. L. T, having two daughters and one son etc.

ইহা স্বর্ণসুযোগ নিশ্চয়ই, কারণ স্বর্ণের মূল্য বর্ত্তমানে প্রতি তোলা ৩৪৸৵০।

—

বৈশম্পায়ণ-জন্মেজয় নহে, যদু এবং মধু। স্থান মহাভারত নহে, ভারতবর্ষ। মধু জিজ্ঞাসা করিল, হে যদু, গল্প লিখিতে হইলে, কি কি গুণ থাকা প্রয়োজন? যদু উত্তর করিল, হে মধু, কিছু কাগজ আর পেন্সিল প্রয়োজন। মধু জানাইল, এ সমস্ত তাহার আছে, কিন্তু তথাপি গল্প লেখা যাইতেছে না। যদু বলিল, আর দরকার একখানা হাত! মধু আলোয়ানের ভিতর হইতে লম্বা দুইখানা হাত বাহির করিয়া বলিল, এই দেখ, একখানা নহে দুই খানা আছে—তবু গল্প লিখিতে পারিতেছি না। যদু বলিল, হে মধু, আর প্রয়োজন, কিঞ্চিৎ কৌশল। মধু বলিল, তাও হাজার রকম জানি! যদু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তবু গল্প হয় না? মধু লজ্জিত ভাবে স্বীকার করিল, হয় না। কিন্তু ইহা ছাড়া আর কি প্রয়োজন যদু ভাবিয়া পায় না। ভাবিতে ভাবিতে সহসা তাহার মনে পড়িল, ভাষার কথাটা তাহার বলা হয় নাই। ঠিক ত, গল্প লিখিতে ভাষাও যে চাই! মধুকে বলিল, হে মধু, আর প্রয়োজন, ভাষা।

মধু তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, না,—ভাষার কোন দরকারই নাই, এই দেখ, বলিয়া সে ঘর হইতে পৌষের ভারতবর্ষখানা বাহির করিয়া যদুর সম্মুখে খুলিয়া ধরিল। যদু দেখিল—

"প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত সে ত' প্রকৃতির নগ্ন দেহের একটি আভরণ মাত্র।…সূর্য্যদেব যখন পশ্চিম নীলাকাশে পদাঘাত করেন সৌন্দর্য্যের শেষ রক্তাভাযুক্ত মেঘের স্তরে, পাহাড়ের চূড়ায় বন-বনানীর উচ্চ শিরে আলিম্পনা করেন,…চিমনীর ধূসর ধোঁয়াগুলি কুণ্ডলী পাকিয়ে লতিয়ে লতিয়ে ডূপশিখার মত অনন্তে মিশে আরতির আড়ম্বর বৃদ্ধিই করে।… স্পিরিটে যদি আগুন ধরে, স্পিরিট অসীম থাকুক, আগুন অতি অল্প থাকিলেও ধ্বক্ ধ্বক্ করে সব পুড়ে শেষ হয়ে যায় যদি বাতাসের সহযোগিতা থাকে।…বম্বের মত এত বড় শহর…কোথায় বা এর উত্থান, কোথায় বা এর পতন!… দুর্গাবাঈকে হঠাৎ পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে লালকে লালময় করে দেয়। চুম্বনে চুম্বনে অগ্নিশিখার মত লাল ও উত্তপ্ত করে দিয়েছিলো।…বিকট কদম গাছটা…কচি কোমল সবুজ পাতাগুলির ফাঁকে ফাঁকে বের হয়ে থাকে [ফোটা কদমের বর্ণনা!] লালের ওপর সাদা শির-তোলা পাপড়ী, কে বলবে যে এগুলো ফুলের রেণু। দূরথেকে মনে হয় যেন শত শত, সহস্র সহস্র ফুলের তোড়া স্তরে স্তরে সজ্জিত হয়ে আছে। সমস্ত তোড়া নিয়ে একটা মস্ত বড় তোড়া, এই তোড়ার ওপর শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের কোলে মাথা রেখে শুয়ে থাকতেন আর শ্রীকৃষ্ণ বাঁশের বাঁশী বাজিয়ে শ্রীরাধাকে

প্রেমমোহে আচ্ছন্ন করে সুখসমুদ্র কল্লোলে ভাসিয়ে দিতেন। [ডালপাতাসুদ্ধ সমস্ত কদম গাছটাই শ্রীকৃষ্ণের চেয়ার কিংবা শ্রীরাধার বালিশ!]

—

এক নিঃশ্বাসে শেষ করা গেল না, সুতরাং একটু বিশ্রাম লইয়া মধু পড়িতে লাগিল—

> পাঁচটি দীর্ঘ বৎসরে জীবনের গতি একঘেয়ের মাঝে এসে ঠেকে দাঁড়ালো।...প্রমত্ত প্রেমিকদল যুবতীদের শুনিয়ে শুনিয়ে গান ধরে, প্রেমের গান বহু রাগিণীতে বিশ্রী ঐক্যতানের সৃষ্টি করে। ছোট ছেলেমেয়েরা কেমন ছিঁ-ছিঁ-রিঁ রিঁ করে ছোটে...বিরক্তি ধরে গেছে, বিতৃষ্ণা হয়ে গেছে...মাতালের ফণী রক্ত চক্ষু দেখে...।

যদু লজ্জিত হইয়া বলিল, ভাষা দরকার নাই, কিঞ্চিৎ সাহস দরকার।

কোনো কোনো দৈনিক সাপ্তাহিক কিংবা মাসিকপত্রে পুস্তক-সমালোচনার একটি বিভাগ থাকে। আমাদেরও আছে। নিজেদের কথা খুলিয়া বলিব না, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই যে পুস্তক না পড়িয়া সমালোচনা লেখা হয় ইহা ঠিক। না পড়িয়া লেখার অনেকগুলি সুবিধা আছে—(এ সুবিধা গ্রন্থকার এবং সমালোচক উভয়ের পক্ষেই সমান)—প্রথমত, বই পড়িবার দায় হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, প্রশংসা করিবার পক্ষে কোনো বাধা থাকে না এবং প্রশংসা করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ হয় না। পড়িয়া লিখিতে গেলেই নানারূপ

গোলমাল চোখে পড়ে, বিবেক পথ রোধ করিয়া দাঁড়ায় এবং আরও কত কি।

—

আমাদের অনেক বিশিষ্ট বন্ধু-সম্পাদক কিন্তু বই না পড়িয়া সমালোচনা লেখায় একবার বিব্রত হইয়াছিলেন। বই-খানির নাম আচার্য্য জগদীশচন্দ্র। বন্ধুবর জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানসাধনা এবং আবিষ্কারের কথা দ্বারা ভূমিকা করিয়া বইখানির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লিখিয়া প্রেসে দিয়াছেন। প্রথম প্রুফ পড়া হইয়া গিয়াছে—তাহা সংশোধন হইতেছে এমন সময় সংশোধনকারী-কম্পোজিটর আসিয়া সম্পাদক মহাশয়কে বলিল, স্যর, আপনি বোধ হয় ভুল করেছেন, ইনি জগদীশ বসু নন, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র, আমাদের গুরুদেব; ইনি একজন সাধু!—সাধুর কথা শুনিয়া সম্পাদক সাবধান হইয়া গিয়াছেন। ইহার পর হইতে, সমালোচনা লিখিবার পূর্ব্বে তিনি বইখানি অন্তত স্পর্শ করিয়া দেখিয়া থাকেন।

—

অল্পদিন হইল একখানি দৈনিক কাগজে এই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি হইয়াছে। উহাতে একখানি অনুবাদ-পুস্তক সম্বন্ধে খুব প্রশংসা করিয়া বলা হইয়াছে—"অনুবাদের সঙ্গে মূল থাকিলে আরও ভাল হইত।" অথচ উক্ত পুস্তকে প্রত্যেক পৃষ্ঠা অনুবাদের পূর্ব্বপৃষ্ঠায় মূল ছাপা আছে। স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি, সমালোচক শুধু যে মূলে ভুল করিয়াছেন তাহা নহে, অনুবাদও দেখেন নাই। ফলে সাতদিন পরে ঐ পুস্তকের দ্বিতীয়বার সমালোচনা বাহির করিতে হইয়াছে!

—

প্রাপ্তিস্বীকার ও সমালোচনা

হিজুল নদীর কূলে। শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক শ্রীতারাদাস মুখোপাধ্যায় ১১, আরপুলি লেন, কলিকাতা। মূল্য ॥০ আনা। সমালোচনা পরে প্রকাশিত হইবে।

পল্লব (কবিতার বই)

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীআশুতোষ সান্যাল প্রণীত।

একখানি ছোট কবিতার বই, দুইজন কবির রচনা। রাধাচরণবাবু প্রবীণ কবি, আশুবাবু নবীন। রাধাচরণ বাবুর 'চৈত্র' কবিতাটি খুব ভাল লাগিল! আশু বাবুর সনেট গুলিতে স্বকীয়তার গাম্ভীর্য্য আছে। এ বইখানি সম্বন্ধে এখন এইটুকু বলিতে পারি। ভবিষ্যতে উচ্চতর প্রশংসা করিবার জন্য আমরা প্রস্তুত হইয়া রহিলাম।

হারমোনিয়ম কিনিতে হইলে

ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মই কেনা উচিত

৫০ বৎসর ধরিয়া ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম স্বরের মাধুর্য্য গঠন, স্থায়িত্ব ও অন্যান্য গুণের জন্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। অন্য হারমোনিয়ম কিনিবার পূর্ব্বে একবার ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম সম্বন্ধে খোঁজ করিবেন। নব-প্রকাশিত সচিত্র মূল্য-তালিকার জন্য আজই পত্র লিখুন।

সোনোরা ডবল-রীড্ বক্স-হারমোনিয়ম, ৩ অক্টেভ, ৫ ষ্টপ বাক্সসহ ৩০৲ টাকা।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্

১১নং এস্প্লেনেড, কলিকাতা

শ্রীপরিমল গোস্বামী এম-এ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ২৫।২, মোহনবাগান রো, শনিরঞ্জন প্রেস হইতে শ্রীপ্রবোধ নান কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শনিবারের চিঠি

৮ম বর্ষ] চৈত্র, ১৩৪২ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব

(১৮৩৬—১৮৮৬)

১

শ্রীচৈতন্যদেবের দেহত্যাগের ৩০২ বৎসর পরে, কবি রামপ্রসাদের মৃত্যুর ৬২ বৎসর পরে এবং রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর মাত্র দুই বৎসর পরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব হুগলী জেলায় কামারপুকুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

কবি রামপ্রসাদের মৃত্যুর তারিখ ঠিকমত জানা যায় নাই। তবে প্রবাদ এইরূপ,—যে-বৎসরে রামপ্রসাদের মৃত্যু হয়, সেই বৎসরেই রাজা রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৭৪ খৃঃ-কেই রামমোহনের জন্ম-তারিখ বলিয়া ধরা গিয়াছে। প্রবাদ সত্য হইলে, ঐ বৎসর, কিংবা

তার কাছাকাছি কোন এক বৎসরে রামপ্রসাদের মৃত্যু হইয়া থাকিবে, এরূপ অনুমান করা যায়।

২

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রথম ও প্রধান গুরু একজন ভৈরবী। তাঁহার নাম যজ্ঞেশ্বরী। শ্রীরামকৃষ্ণ ভৈরবীকে যোগমায়ার অংশ বলিতেন। তিনি অনেক শাস্ত্র জানিতেন, যেমন বিদূষী ছিলেন তেমনি অসামান্যা রূপবতীও ছিলেন। তাঁহার বয়স ৩৫ হইতে ৪০ অনুমান করা গেলেও, দেখিতে আরো অল্পবয়স্কা বলিয়া মনে হইত। তান্ত্রিক সাধনার সমস্ত রহস্য তিনি জানিতেন। ৬৪ খানা তন্ত্র হইতে যত রকমের সাধন আছে, তা সমস্তই একে একে যুবক রামকৃষ্ণকে তিনি শিক্ষা দিয়াছিলেন। বৈষ্ণব-সাধনার অঙ্গীভূত যে মধুর ভজন,—তাও ভৈরবীর নিকট হইতেই তিনি পাইয়াছিলেন। তোতাপুরী প্রদত্ত শ্রীরামকৃষ্ণের নির্বিকল্প সমাধি ভৈরবীর মনঃপূত হয় নাই; কেন-না তিনি বলিয়াছিলেন—উহাতে ভক্তির হানি হয়। ভক্তিপন্থীদের এই অভিমত প্রাচীন এবং সর্ব্বজনবিদিত।

ভৈরবীর সহিত দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ এক আকস্মিক ঘটনা। ১৮৬১ খৃঃ-এর কথা। তখন শ্রীরামকৃষ্ণের বয়স ২৫ বৎসর মাত্র। প্রথম সাক্ষাতের পরেই ভৈরবী শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার পুরুষ বলিয়া বুঝিতে পারিলেন এবং প্রকাশও করিলেন। ভৈরবী বলিলেন—

—"এই ত গৌরাঙ্গ দেব নিতাইয়ের খোলে।"

(রা. পুঁ.—পৃঃ ৭৫)

শ্রীমথুর, রাণী রাসমণির জামাতা, এ কথা মানিল না। ভৈরবী পণ্ডিতদের ডাকাইতে বলিলেন,—পণ্ডিতেরা আসিয়া সভা করিয়া বসিল। ভৈরবী

যেমন সংস্কৃত ভাষা খুব ভাল জানিতেন, তেমনি কঠিন শাস্ত্র-বাক্য-সকল ব্যাখ্যা করিতেও অতিশয় নিপুণা ছিলেন। তিনি পণ্ডিতদের চোখে আঙ্গুল দিয়া—প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিলেন যে রাগাত্মিকা ভক্তি-পথে যে মহাভাবের কথা আছে,—সেই মহাভাবের চিহ্নসকল শ্রীরামকৃষ্ণের শরীরে বিদ্যমান। ব্রজে এই মহাভাব শ্রীরাধিকার, এবং নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদেবের হইয়াছিল। সুতরাং এই মহাভাবের অধিকারী শ্রীরামকৃষ্ণও অবতার পুরুষ। ইহাই শাস্ত্রের প্রমাণ।

এই ঘটনার ১৪ বৎসর পরে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র এবং পূরা ২০ বৎসর পরে স্বামী বিবেকানন্দ পরমহংসদেবের নিকটে আগমন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে আজও সে-সকল ভক্তেরা ঈশ্বরের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন, এবং তাঁহার ফোটো ও তৈলচিত্রাদিকে রীতিমত ভোগ-রাগাদি দিয়া পূজা ও অর্চ্চনা করেন, তাঁহাদের কর্ত্তব্য,—বাঙালীর গত শতাব্দীর এই নব্য নর-পূজার প্রথম প্রবর্ত্তনকারিণী, অতি অদ্ভুত ক্ষমতাশালিনী, ভৈরবীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে সর্ব্বাগ্রে মস্তক অবনত করা। এই মহীয়সী মহিলার চিরপূজ্য মহিমাকে, এক স্বামী বিবেকানন্দ ব্যতীত, অপর কেহ এতাবৎ যথেষ্ট সম্মান দেন নাই। কিন্তু এখন দেওয়া কর্ত্তব্য।

আচার্য্য অদ্বৈত ও যবন হরিদাস যেমন চৈতন্যদেবকে অবতারের সিংহাসনে হুহুঙ্কারে আহ্বান করিয়াছিলেন,—ভৈরবী শ্রীযজ্ঞেশ্বরীও তেমনি সিংহিনীর মতোই পণ্ডিতদের সহিত তর্ক করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণকে, এক সঙ্গে চৈতন্য ও নিত্যানন্দের অবতার বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের ষড়ভুজ মূর্ত্তির প্রকাশে যেমন রামচন্দ্র ও কৃষ্ণের অবতারত্ব শ্রীচৈতন্যে সংক্রামিত ও আরোপিত হইয়াছে তেমনি ভৈরবীও

শ্রীরামকৃষ্ণে যুগপৎ—শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দের অবতারত্ব আরোপ করিয়াছেন। ভৈরবী অর্থে সাধারণতঃ বুঝি তান্ত্রিক সাধনের সাধিকা—সন্ন্যাসিনী। কিন্তু তিনি শ্রীরামকৃষ্ণে আরোপ করিলেন যে অবতার-বাদ তাহা বৈষ্ণবীয়। ইহা অতিশয় অদ্ভুত, তার কারণ ভৈরবী অসাধারণ।

বাঙ্গালীর ইতিহাসে শ্রীচৈতন্যের পরেই, শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার-পুরুষ বলিয়া গণ্য ও মান্য হইয়াছেন। ঈশ্বর, শ্রীরামকৃষ্ণের দেহ ধারণ করিয়া বাংলাদেশের কামারপুকুর গ্রামে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে অবতরণ করিয়াছিলেন কি না—এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ কথা নয়। বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্র লিখিতে গিয়া বলিয়াছিলেন—ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান। তবে তিনি ইচ্ছা করিলে মানুষ হইয়া জন্মিতে পারিবেন না কেন? রবীন্দ্রনাথ ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, যেহেতু ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান, সুতরাং তাঁহার মানুষ হইয়া জন্মিবার কোন প্রয়োজনই হয় না। ঈশ্বরের মানুষরূপে জন্মগ্রহণ করা সম্পর্কে—বাংলাদেশের ষোড়শ শতাব্দীর সঙ্গে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বিশেষ প্রভেদ দেখা যাইতেছে না। ইতিহাসের যোগসূত্র ঠিক আছে, ছিন্ন হয় নাই।

(৩)

কবি রামপ্রসাদের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের একটা যোগের কথা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন আমাদের বলিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিতেন,—ইতিহাস-পথে মহাপুরুষদের আগমনের পূর্ব্বে তার আভাষ পাওয়া যায়। মহাপুরুষেরা যেন রূপ, আর কবিরা যেন সুর। সুর আগে আসে। রূপ পরে আসে। সুর আসিলেই বুঝিতে হইবে যে রূপ আসিতেছে। চিত্তরঞ্জন

দৃষ্টান্ত দিয়া বলিয়াছেন যেমন দেখ, চণ্ডীদাসে সুর, তারপরেই শ্রীচৈতন্যে সেই সুরকে প্রাণময় করিয়া জীবন্ত রূপ। ঠিক তেমনি রামপ্রসাদে সুর, আর তার পরেই, রামপ্রসাদের সুরের অনুযায়ী শ্রীরামকৃষ্ণে রূপ। সুতরাং চিত্তরঞ্জনের সুস্পষ্ট অভিমত যে, যাহা রামপ্রসাদে সুর, তাহাই রামকৃষ্ণে রূপ।

কবিকল্পনার বাহুল্য সত্বেও, কথাটি ইতিহাস আলোচনার অভিজ্ঞতা-রূপেই অর্জ্জিত হইয়াছিল। কাজেই অবহেলার বস্তু নয়।

(৪)

রামপ্রসাদের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের তুলনার কালে, যেন রাজা রামমোহনকে অতর্কিতে অথবা সন্তর্পণে ডিঙ্গাইয়া যাওয়া হইল, মনে হইতে পারে। কিন্তু তাহা আমাদের অভিপ্রায় নয়।

রামপ্রসাদের সহিত রামমোহনের একটা যোগ ছিল, ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন একথা প্রথম বলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন,—দীনেশবাবুর কথা অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন—কোন যোগ নাই। ইহা লইয়া এককালে অনেক হইয়া গিয়াছে। তা যাক। কিন্তু রামমোহন ব্রহ্মসঙ্গীত লিখিতে বসিয়া, রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীতকে, বহুস্থানে অনুকরণ যে করিয়াছেন,—তার প্রমাণ হাতে-হাতেই আছে। রামপ্রসাদ গাহিলেন "অজপা হইলে রোধ, তবে জন্মে তাঁর বোধ।" রামমোহন অনুকরণে বলিলেন—"অজপা হতেছে শেষ, বাড়িল আশা অশেষ" অথবা "অজপা হতেছে শেষ, ত্যজ দম্ভ রাগ দ্বেষ।" "অজপা" ঠিক আছে। রামপ্রসাদ গাহিলেন—"অদ্য অব্দে শতান্তে বা অবশ্য মরিতে হবে"। রামমোহন অনুকরণ করিলেন "অবশ্য তেজিতে হবে কিছু

দিনান্তর"। "অবশ্য" ঠিক আছে। এই রকমের আরো দৃষ্টান্ত খুঁজিলেই পাওয়া যায়।

সুতরাং দেখা গেল রামমোহন, প্রসাদী-শ্যামাসঙ্গীত অতিশয় অভিনিবেশসহকারেই পাঠ করিয়াছিলেন। "ধাতু পাষাণ মাটী মূর্ত্তি, কাজ কিরে তোর সে গঠনে?" রামপ্রসাদের একথাটাও রামমোহন গভীরভাবেই অনুধাবন করিয়াছিলেন। "তারা আমার নিরাকারা" প্রসাদীসঙ্গীতে এও ত রামমোহন দেখিয়াছেন? কিন্তু "কালো মেঘ উদয় হ'লো অন্তর অম্বরে"র সঙ্গে সঙ্গে রামপ্রসাদ যে কালীর "প্রতি-মূর্ত্তিকে মনে কল্পনা করিতেন" এবং "বাহ্যেতেও প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া" পূজা করিতেন,—ইহাও ত রামমোহন জানিতেন।

মূর্ত্তিপূজা—মানসিকরূপকল্পনা এবং নিরাকারা,—এ তিন অবস্থাই যে রামপ্রসাদের "মনোময় যন্ত্রে"—একত্রে বিরাজ করিত, ইহা রামমোহন নিশ্চয় দেখিয়াছিলেন। অতবড় ধর্ম্মবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা,—জগতের বিবিধ, বিচিত্র ধর্ম্মগুলিকে বিশ্লেষণ করিয়া, তাহাদের উচ্চ, নীচ, শ্রেণী-বিভাগ, যিনি সর্ব্বপ্রথম করিলেন, তিনি রামপ্রসাদের মনের ও ধর্ম্মানু-ভূতির তিনটি স্তর অবশ্যই দেখিয়া থাকিবেন। কেননা বিভিন্ন ধর্ম্ম-সকলের শ্রেণীবিভাগে,—এই তিনটি স্তর সর্ব্বত্রই রামমোহন স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এবং বলিয়াছেন—"বস্তুতঃ (১) কি মানস-মূর্ত্তির অবলম্বন করিয়া (২) কি হস্ত নির্ম্মিত মূর্ত্তির অবলম্বন করিয়া উপাসনা করিলে অবশ্যই সাকার উপাসনা হইবে"। (ব্রাহ্মণ সেবধি) রামমোহন সাকারের পক্ষপাতী নহেন, নিগু‍র্ণ নিরাকারের পক্ষপাতী। সাধারণ ব্রাহ্মেরা সগুণ নিরাকারের উপাসক। কিন্তু কি রামপ্রসাদ, কি শ্রীরাম-কৃষ্ণে নিগু‍র্ণ নিরাকার উপাসনা প্রচুর থাকা সত্ত্বেও,—তাঁহাদের কাছে রামমোহনের অভিপ্রায় অনুযায়ী "এসকল কাল্পনিক উপাসনা ধিকৃত হয়

নাই।” এইখানেই প্রভেদ দৃষ্ট হয়। এবং রামপ্রসাদের সুর—রামমোহনে নয়, পরন্তু শ্রীরামকৃষ্ণে রূপ পাইয়া প্রাণময় হইয়া উঠিয়াছে, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সেই কথাই মনে করাইয়া দেয়।

রাজা রামমোহন হইতে,—রামপ্রসাদ ও রামকৃষ্ণে পার্থক্য বুঝা গেল। রামমোহনে, প্রত্যেক ধর্ম্মের নিম্নস্তবগুলিকে বর্জ্জন করিবার উপদেশ আছে। রামপ্রসাদ ও শ্রীরামকৃষ্ণে, ধর্ম্মের নিম্নস্তরগুলি বর্জ্জনের কথা নাই। রামমোহনের ব্রাহ্মধর্ম্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণের হিন্দুধর্ম্ম বিশ্লেষণ করিয়া,—রামকৃষ্ণদেব দুইজন শানাইদারের দৃষ্টান্ত দিয়া বলিয়াছেন,—“একজনে পোঁ ধরিয়া সুর দিতে হয়। অপরে বাজায় রাগরাগিণী নিচয়॥ পোঁ ধরা এ ব্রাহ্মধর্ম্ম একসুর তায়। হিন্দুয়ানী নানা রাগ-রাগিণী বাজায়॥” (রা. পুঁ.—পৃঃ ২৯৪)। বাংলা সাহিত্যে এমনি সহজ উপমা দিয়া কথা বলিবার ধরণ শ্রীরামকৃষ্ণই প্রথম প্রচলন করিয়াছেন।

(৫)

রাজা রামমোহন ও শ্রীরামকৃষ্ণ,—এই দুই মহাপুরুষ হইতে গত শতাব্দীতে বাংলাদেশে দুইটি আধুনিক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে,—ইহা প্রত্যক্ষ। এই দুইটি ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে উপ-দল আছে, সুতরাং দলাদলিও আছে। কিন্তু তাহা এক্ষণে আমাদের আলোচ্য নয়। রামমোহনের সম্প্রদায় মূর্ত্তিপূজা-বিরোধী, এবং তাহাতে জাতিভেদ নাই। রামকৃষ্ণের সম্প্রদায় মূর্ত্তিপূজক এবং তাহাতে জাতিভেদ আছে। রামকৃষ্ণপন্থী-সন্ন্যাসীদের মধ্যে না থাকিলেও গৃহীদের মধ্যে জাতিভেদ আছে। এইখানেই ভেদ বা পার্থক্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

কিন্তু রামমোহন ও রামকৃষ্ণে যে এক অতি অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে,

তাহা উভয়েরই ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য। চারিত্র-পূজার দিনে, মহাপুরুষদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের প্রতি মনোযোগী হওয়া আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য।

—রাজা রামমোহন, তাঁহার অমানুষিক প্রতিভাবলে, জগতের বিবিধ ধর্ম্মগুলিকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বিশ্লেষণ করিয়াছেন। পরে তাহাদের মধ্য হইতে সাধারণ সত্য বাহির করিয়া, উচ্চ ও নীচ ভেদ করিয়া, ধর্ম্মগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। এই হেতু রামমোহনকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতেরা, ধর্ম্মবিজ্ঞানের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া অশেষপ্রকারে সম্মানিত করিয়াছেন। বেদজ্ঞ পণ্ডিত মোক্ষ-মুলারের নাম এই প্রসঙ্গে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

—শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার অতি উগ্র ও তীব্র বিশ্বগ্রাসী ধর্ম্মপিপাসা তৃপ্ত করিবার জন্য, যতগুলি পৃথক পৃথক ধর্ম্ম হাতের কাছে পাইয়াছেন, তার প্রত্যেকটিই নিজ জীবনে, আচার ও অনুভূতি দ্বারা আস্বাদন করিয়া গিয়াছেন। নারীভাবেও সাধন করিয়াছেন, হনুমান-ভাবেও সাধন করিয়াছেন, এমন কি কর্ত্তাভজাদের দলে গিয়া মিশিতেও তাঁহার আপত্তি হয় নাই। মুসলমান-ধর্ম্ম সাধনকালে, কোনরূপ মূর্ত্তির কাছ দিয়াও তিনি যান নাই,—দেখা বা পূজা করা ত দূরের কথা। দাড়ি রাখিয়াছেন, কাছা দেন নাই,—মসজিদে গিয়া (ভাগিনেয় হৃদয়ের ভয়ে) লুকাইয়া নমাজ পড়িয়াছেন,—অবশেষে এমন কি সেই অর্দ্ধ-উন্মাদ ব্রাহ্মণ গোমাংস ভক্ষণের জন্য পুনঃ পুনঃ দারুণ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। মথুর রাসমণির জামাতা, নানা অছিলায় তাঁহাকে গোমাংস খাইতে দেন নাই। নতুবা খাইতে তাঁহার কোন আপত্তিই ছিল না।

বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্বন্ধে, দুইটি ভিন্ন দিক হইতে বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জ্জনে রামমোহন ও রামকৃষ্ণে কি সাদৃশ্য নাই ?

(৬)

এক্ষণে ধর্ম্মজগতের উন্নত ও আধুনিক মনোভাব হইতেছে, এক ধর্ম্মের লোক অপর ধর্ম্মের প্রতি শুধু সহিষ্ণুতা নয়, সহানুভূতি প্রদর্শন করিবেন। শুধু অপর ধর্ম্মের প্রতি নয়, অপর ধর্ম্মাবলম্বী লোকদের প্রতিও সহানুভূতি দেখাইবেন। মুসলমান হিন্দুর নিকট, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া বিভীষিকা উৎপাদন করিবে না। রামমোহনের "প্রার্থনা পত্রের" ছত্রে ছত্রে ইহার উল্লেখ আছে।

অপর ধর্ম্মাবলম্বীদের সম্বন্ধে রামমোহন লিখিতেছেন—"ভ্রাতৃভাব আচরণ করা কর্ত্তব্য"—"অতিশয় প্রিয় পাত্র জ্ঞান করা কর্ত্তব্য"—"বিরোধীভাব কর্ত্তব্য নহে" ইত্যাদি। আর শ্রীরামকৃষ্ণদেব সকল ধর্ম্মকেই নমস্কার করিয়া, রামমোহন প্রবর্ত্তিত, দেবেন্দ্র-কেশব পরিচালিত ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধেও বলিয়া গিয়াছেন—"যতবিধ আছে ধর্ম্ম, সবে নমস্কার॥ ইদানীর ব্রাহ্মধর্ম্ম যাহা ছড়াছড়ি। ইহাকেও বারবার নমস্কার করি"॥

(রা. পুঁ.—পৃঃ ২৯৪)

সুতরাং রামমোহন ও রামকৃষ্ণে সাদৃশ্য আছে বই কি। নাই বলা চলে না।

(৭)

এযুগের ধর্ম্ম শুধু পারমার্থিক ব্যাপার নয়। ঐহিকেরও প্রয়োজন আছে। স্বামী বিবেকানন্দ, শুনি, বলিয়া গিয়াছেন, "যে ভগবান আমাকে পৃথিবীতে খাইতে দিতে পারেন না, তিনি যে পরকালে আমাকে স্বর্গে অনন্ত সুখে রাখিবেন, তা কেমন করিয়া বিশ্বাস করি?" বিশ্বাস করা কঠিন।

শ্রীচৈতন্যদেব (১) মুসলমান (২) নারীজাতি ও (৩) অবনত শ্রেণীকে একত্রে তাঁহার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে টানিয়া আনিয়া উন্নত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবগ্রন্থে তার প্রমাণ আছে। ফলে অনেক খ্যাতনামা মুসলমান বৈষ্ণব হইয়াছিল। নারীজাতি ও অবনত শ্রেণীও বৈষ্ণব হইয়া ধন্য হইয়াছিল। মুসলমানের বৈষ্ণব হওয়ার কোনই বাধা ছিল না।

রামমোহনের ব্রাহ্মধর্ম্মে মুসলমান ও অবনতশ্রেণী আসিল না। শ্রীরামকৃষ্ণের নব্য হিন্দুধর্ম্মেও মুসলমান বা অবনতশ্রেণী নাই। এই দুই ধর্ম্মেই একটা পারমার্থিক সহানুভূতি অপর ধর্ম্মের প্রতি থাকিলেও, ব্যবহারিক জগতে তার ফল কিছুই বেশী দেখা যায় নাই।

যদি মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী, এবং সেই সঙ্গে হিন্দু অবনত শ্রেণী, ও নারীজাতির প্রতি, শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম্ম, নবযুগের জাতীয়তাবোধসম্পন্ন একটা সহানুভূতির ভাব ও তার ফলে জাতীয় একতাবোধ না আনিতে পারে, তবে যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের অত কাছে এবং এত দীর্ঘকাল থাকিবার পরেও, তদীয় ভাগিনেয় হৃদয়ের "কামকাঞ্চন লোভ" দূর হয় নাই, তেমন ঈশ্বর আমাদের মধ্যে জন্মিলেও, আমাদের জাতীয় ভাবে উদ্ধারের আশা সুদূরপরাহত বলিয়াই ত আশঙ্কা হয়। চারিদিকের অবস্থা কোনমতেই আশাপ্রদ বলিয়া ত মনে হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব জাতীয় জাগরণের পূর্ব্বাভাষ। স্বামী বিবেকানন্দ এই দিক হইতেই তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন। আমরাও সেই দিক হইতেই তাঁহাকে দেখিব। এ ছাড়া অবতারপুরুষকে দেখিবার এ যুগে আর অন্য পথ নাই।

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী

আত্মহত্যা

পর পর কয়েকটি আত্মহত্যার সংবাদ পাঠ করিয়া শ্রীমান্ পল্লব-কুমারের তরুণ হৃদয়টি ফাটিয়া চৌচির হইবার উপক্রম হইল। রাত্রে মেসের ছারপোকা-জর্জ্জরিত খাটে শুইয়া কেবলই চিন্তা করিতে লাগিল, সমাজের এই নিদারুণ অবস্থা কিরূপে পরিবর্ত্তন করা যায়। কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া অগত্যা সওয়া একটার সময় ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন জাগিয়া উঠিয়াও কোন লাভ হইল না। উঠিতে বসিতে স্নান করিতে খাইতে সেই এক চিন্তা। কলেজে যাওয়া হইল না। সমস্ত দিনরাত্রি ভাবিয়া ভাবিয়া শেষে স্থির করিল, যদি সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তন করা সম্ভব নাও হয়, অন্ততঃ একটি তরুণীর আত্মহত্যা যদি নিবারণ করিতে পারে, তাহা হইলেও মনকে প্রবোধ দেওয়া যাইতে পারে। পুরুষ মানুষ হইয়া যদি এইটুকুও সে না করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার নিজেরও আত্মহত্যাই কর্ত্তব্য। সঙ্কল্প স্থির করিয়া উপায় চিন্তা করিতে আরম্ভ করিল। কে আত্মহত্যা করিতে মনঃস্থ করিয়াছে, তাহা নিরূপণের উপায় এবং তাহা জানিতে পারিলে কিরূপে তাহাকে নিরস্ত করিতে পারা যায় তাহার উপায়, প্রভৃতি চিন্তা করিতে করিতে ঘড়িতে সওয়া একটা বাজিয়া গেল।

দুই দিন পরে আনন্দবাজার পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপন বাহির হইল :—"যদি কোন তরুণী আত্মহত্যা করিতে মনঃস্থ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বক্স নং ০০০-তে একখানি পত্র লিখিয়া তাহার উত্তর

না পাওয়া পর্য্যন্ত আত্মহত্যা স্থগিত রাখিবেন। যে কারণে আত্মহত্যা করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহার প্রতীকার হয়ত সেই পত্রের উত্তরে পাইবেন।”

বিজ্ঞাপনের উত্তর আসিল অনেক। কেহ লিখিয়াছেন, “মহাশয়, দুই ভরি আফিম সংগ্রহ করিয়াছি। আজই রাত্রে এ জীবনের শেষ করিব সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, কিন্তু আপনার বিজ্ঞাপন দেখিয়া নিরস্ত হইলাম। তিন দিনের মধ্যে উত্তর না পাইলে আমার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিব।”

একজন লিখিয়াছেন, “মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা মারিতে কি আপনার এতটুকু কষ্ট হইল না? দারুণ মনঃকষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া যে নিজেকে এ সংসার হইতে সরাইয়া ফেলিতে চায়, তাহার সহিত কি ইয়ার্কি না করিলে চলিত না?”

একজন লিখিয়াছেন, “আমি যে কারণে আত্মহত্যা করিতে যাইতেছি, তাহার প্রতীকার শিবেরও অসাধ্য, আপনি ত কোন ছার! সুতরাং বৃথা সময় নষ্ট করিয়া কোন লাভ আছে বলিয়া মনে হয় না। তথাপি, আপনি ভদ্রলোক, আপনার কথানুসারে আমি অন্ততঃ এক মাস আমার সঙ্কল্প স্থগিত রাখিলাম।”

একজন লিখিয়াছেন, “মানব-মনের সত্যিকার ধর্ম্মের সঙ্গে সামাজিক রীতির যে চিরন্তন দ্বন্দ্ব চলিয়াছে, সেই দ্বন্দ্বের সংঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া আমি এই শেষ পথ অবলম্বন করিতে যাইতেছিলাম। কেন আপনি আমায় বাধা দিলেন? যদি বাধা দিলেনই, তবে যাহাতে এ দ্বন্দ্বের সমাধান করিতে পারি, তাহার পথ বলিয়া দিবেন। যাঁহারা বিনাইয়া বিনাইয়া রসাল কথাদ্বারা এই দ্বন্দ্বের সঙ্গে আমার পরিচয় করাইয়া দিয়াছেন, তাঁহারা ইহার কোন সমাধান বলিয়া দেন নাই।

আগামী মঙ্গলবার বেলা বারটা পর্য্যন্ত আপনার পত্রের অপেক্ষা করিব।”

একজন লিখিয়াছেন, “অন্নবস্ত্রের অভাব, স্বামীর নিষ্ঠুরতা, শাশুড়ীর অমানুষিক নির্যাতন, অসহ্য রোগ-যন্ত্রণা, পর পর তিনটি সন্তানের শোক, তারপর পিতামাতার অশ্রুজল—এ সকল এতদিন কিরূপে সহিয়াছি, তাহাই আমার নিকট পরমাশ্চর্য্য মনে হইতেছে। আমার বাঁচিয়া থাকার কোন অর্থ নাই। সুতরাং আমাকে আর জীবনপথের মরীচিকা দেখাইয়া প্রলুব্ধ করিবেন না। আমি মরিয়াই আছি—শুধু শরীরটা ভস্মীভূত হইতে যেটুকু বিলম্ব।”

একজন লিখিয়াছেন, “সেদিন আমাকে দেখিতে আসিয়া তিনি (বোধ হয় আপনারই কোন বন্ধু) আমার ছোট বোনটিকে পছন্দ করিয়া গেলেন। এ অবস্থায় আমার এ পৃথিবী হইতে বিদায় লওয়া ব্যতীত আর কি কর্ত্তব্য থাকিতে পারে, তাহা অনুগ্রহ করিয়া আমাকে লিখিয়া জানাইবেন।”

একজন লিখিয়াছেন, “গত টেষ্ট পরীক্ষার ম্যাথেম্যাটিক্‌সে শূন্য পাইবার পর হইতে জীবন শূন্য মনে হইতেছে। পার্শ্বে ‘এক’ জনকে পাইলে হয়ত ‘দশ’ জনের মত এ শূন্য জীবনেরও একটা অর্থ হইত; কিন্তু বাবার মনের যেরূপ গতি, তাহাতে আমাকে দশ জনের মত একজন করা অপেক্ষা ম্যাথেম্যাটিক্‌সে এক শতের মধ্যে কিরূপে একশত পাইব, সেইদিকেই তাঁহার চিন্তা বেশী। সুতরাং” ইত্যাদি।

একজন লিখিয়াছেন, “সার্কাস শিখিতে গিয়াই আমার এ দুর্দ্দশা। আপনি হয়ত ভাবিতেছেন, বাঙালীর মেয়ের এ সখ কেন? কিন্তু আপনি যে সার্কাসের কথা ভাবিতেছেন, আমি সে সার্কাস শিখিতে যাই নাই। কিছুদিন হইতে বাংলা সাহিত্যের মাষ্টারপিস্‌গুলি

পড়িতে আরম্ভ করি। ফলে শরীর ও মন কিরূপে পৃথক রাখা যায় তাহা শিখিবার জন্য ব্যাকুলতা জন্মে এবং বহু চেষ্টায় কৃতকার্য্যও হই। কিন্তু যে বাড়ীতে আমাকে বাস করিতে হইতেছে, এখানে শরীর ও মন পৃথক রাখিবার মত যথেষ্ট স্থান বা ব্যবস্থা নাই। ফলে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। অতএব" ইত্যাদি।

একজন লিখিয়াছেন, "বাছা, আমি তোমার জেঠাইমার বয়সী। আমাকে এরা নারীনিকেতনে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। দেখ ত আস্পর্দ্ধা! আমি একা এমন দশটা নিকেতন চালাইতে পারি। সেদিন পাঁচিল টপকাইতে গিয়া কোমর ভাঙিয়া গিয়াছে। আমার আর বাঁচিবার সাধ নাই। যদি এর একটা সদুপায় শীঘ্র না জানাও, তাহা হইলে এখান হইতে বাহির হইয়া তোমার মুণ্ড চিবাইয়া খাইব।"

এইরূপ বহু পত্র পড়িতে পড়িতে পল্লবকুমার ঘামিয়া উঠিল। এত পত্র আসিবে, তাহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। ইহা অপেক্ষা দুই চারিটা আত্মহত্যার সংবাদ বরং সহনীয় ছিল। ভীমরুলের চাকে ঘা মারিয়া মোটেই ভাল করে নাই। রাত্রে শুইয়া শুইয়া এইরূপ সংবদ্ধ ও অসংবদ্ধ বহু চিন্তা করিতে করিতে যখন ঘুম আসিল, তখন একটা বাজিয়া পনের মিনিট হইয়াছে। ভাগ্যে তাহার সিঙ্গল-সীটেড ঘর, নতুবা মেসের অন্য লোকেরা এই সব পত্র লইয়া একটা হুলস্থূল বাধাইয়া তুলিত।

পল্লবকুমার ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। উঃ স্বপ্নের সে কি ভীড়! যেন দশটার বাস্। নানাপ্রকার তরুণীমূর্ত্তি ত আছেই, তাছাড়া লেক, রেলের লাইন, কেরোসিনের বোতল, মেডিক্যাল কলেজ, কেমি-ক্যাল লেবরেটরি, সব যেন বায়োস্কোপের ছবির মত আসিতেছে

আর যাইতেছে। সর্ব্বশেষে মনে হইল যেন অবসন্ন হইয়া সে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের রকে শুইয়া পড়িয়াছে।

সকালে উঠিয়া চাকরের হাতে গরম মুড়ি, গরম জিলিপী ও গরম চা দেখিয়া মনের গ্লানি অনেকটা কাটিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে চারকটা আরো কয়েকখানা পত্র রাখিয়া গেল। নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই যেন সেগুলি এন্‌ভেলপ হইতে বাহির করিল এবং নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেন সেগুলির উপর চোখ বুলাইতে লাগিল। আত্মহত্যা নিবারণের সাধু সঙ্কল্প ইতিমধ্যেই অনেকটা শিথিল হইয়া আসিয়াছে। একখানা চিঠি পড়িয়া তাহার মুখে যেন একটু প্রসন্নতার ভাব ফুটিয়া উঠিল এবং তখনই চাকরকে ডাকিয়া আর এক কাপ চায়ের অর্ডার দিল।

চিঠিখানি এইরূপ—"আপনার বিজ্ঞাপন দেখিয়া মনে হইতেছে, আপনি বড় ছেলেমানুষ এবং ভারি দুষ্টু। আমার আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু এই বিজ্ঞাপন পড়িবার পর হইতে মনে হইতেছে, বোধ হয় আত্মহত্যা করাই ভাল। তাই আপনাকে একথা জানাইয়া আপনার পত্রের অপেক্ষায় রহিলাম। আমরা ব্রাহ্মণ। আগামী বৎসর ম্যাট্রিক দিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আত্মহত্যা করিলে আর তাহা দেওয়া হইবে না।

পুঃ। আমার গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, চুল মাঝারি। একথা লিখিলাম বলিয়া আমাকে নির্লজ্জ মনে করিবেন না। আত্মহত্যা করিবার প্রাক্কালে কাহারও লজ্জা থাকিতে পারে না।

পুঃ। পাছে আত্মহত্যার সঙ্কল্প নষ্ট হইয়া যায়, এই ভয়ে আজ দুই দিন আয়নায় মুখ দেখি নাই।

পুঃ। যদি পত্র লিখিতে ইচ্ছা না করে, তাহা হইলে যে-কোন দিন (রবিবার বাদ) দুপুরে এখানে আসিলেন। বাবা তখন অফিসে

থাকেন। মাকে বুঝাইতে কষ্ট হইবে না। আপনি না আসা পর্য্যন্ত আত্মহত্যা করিব না।

ইতি—বিনীতা মল্লিকা।”

পল্লবকুমার দোকানে গিয়া দাড়ি কামাইল। একটার সময়ে মেস হইতে যাত্রা করিয়া সওয়া একটার সময়ে মল্লিকার বাড়ী পৌঁছিল। কড়া নাড়িতেই মল্লিকার দাদা আসিয়া দরজা খুলিলেন। পল্লবকুমারের পল্লবিত আশা যেন সহসা সমূলে বিনষ্ট হইল। তাহার শুষ্ক কণ্ঠে কোন কথাই বাহির হইল না। কিন্তু দাদাটির অমায়িকতায় নির্ভয়চিত্তে গৃহের ভিতরে প্রবিষ্ট হইল এবং মল্লিকার আত্মহত্যা নিবারণের উপায় চিন্তা করিতে লাগিল।

খাইয়া দাইয়া পান চিবাইতে চিবাইতে যখন পল্লব মেসে ফিরিল তখন রাত্রি দশটা। বহু চেষ্টা করিয়াও সারা রাত্রি ঘুমাইতে পারিল না।

কিছুদিন পরে যখন পুনরায় একটি আত্মহত্যার সংবাদ বাহির হইল, তখন পল্লবকুমার পূর্ব্ব বিজ্ঞাপনের উত্তরগুলি পুনরায় পড়িয়া দেখিতেছিল, এমন সময়ে মল্লিকা আসিয়া বলিল, “আর বিজ্ঞাপন-টিজ্ঞাপন দিও না কিন্তু।”

“ভাস্কর”

নাতি আধুনিক সাহিত্য

উপন্যাস ও গল্প

শনিবারের চিঠি অতিআধুনিক সাহিত্যের অনাচারে বিরক্ত হইয়া একটা রব তুলিয়া দিয়াছিল যে আজকাল কেউ কিছু লিখিতে পারে না। এই মতবাদের বুমেরাং ফিরিয়া আসিয়া তাহার কাছে পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। ঘটোৎকচ যখন কুরুকুল চাপিয়া পড়িয়াছিল তাহার পেষণে যে দুই চারিজন পাণ্ডবীয় বীর প্রাণ ত্যাগ করে নাই এমন কথা বলা যায় না। শনিবারের চিঠির স্বপ্রচারিত মতবাদের তলে এমন কয়েকজন লেখক চাপা পড়িয়াছেন, যাঁহাদের শনিবারের চিঠি সত্যকারের সাহিত্যিক মনে করেন। ইহাকেই বোধ হয় বলে সরস্বতীর ব্যঙ্গ।

শনিবারের চিঠি এতদিন নেতিমূলক সমালোচনা করিয়া আসিয়াছে। কোন্‌টা সাহিত্য নহে, ইহাই তাহার মুখ্য বক্তব্য ছিল; তাহাতে যেন ভালর অপেক্ষা মন্দই বেশি হইয়াছে। কিন্তু তাহার আর একটা কর্ত্তব্য আছে, কোন রচনাকে সে সত্যকারের সাহিত্য মনে করে তাহাও তাহার বলা উচিত।

নানা কারণে একদল লেখক, সাহিত্য যাহাদের পক্ষে অব্যাপার, বাঙালী পাঠকের সম্মুখে উদ্ধত নাসিকা লইয়া বিরাজ করিতেছে, অথচ যাঁহাদের রচনায় সরস্বতীর স্মিত সম্মতি আছে তাঁহারা অপেক্ষাকৃত অন্তরালে পড়িয়াছেন। ইহার প্রধান কারণ বাঙালী পাঠকের মানসিক আলস্য; সে এমন কিছু পড়িতে চায় না, যাহাতে চিন্তা করিতে হয়।

দ্বিতীয় কারণ, তাহার আত্মম্ভরিতা; সে এমন কিছু পড়িতে চায়, যাহাতে সাহিত্য রস থাকুক আর নাই থাকুক, অন্য দশটা বিদ্যার বাঁধা গৎ কিছু থাকা চাই-ই। তৃতীয়ত, এই সব সাহিত্যিক, নিজেদের সাহিত্যধর্ম্ম সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় নহে বলিয়া আত্মসম্মানজ্ঞানশূন্য, ফলে তাহারা নিজের পায়ে হাঁটিতে ভরসা পায় না; তাহারা পাঠকের সম্মুখে আসিয়া হাজির হইয়াছে একেবারে বিখ্যাত ব্যক্তির সার্টিফিকেটের ঐরাবতে চাপিয়া।

আজকাল লেখকের সংখ্যা বাড়িয়াছে, পাঠকের সংখ্যা বাড়িয়াছে, কিন্তু ভাল লেখকের সংখ্যা বাড়িয়াছে, এমন মনে করিবার কারণ নাই। অকৃতী পুস্তকের বাহুল্যে যে-দুচারখানি ভাল বই বাহির হয়, তাহা চাপা পড়িয়া যায়। সে দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য কে কষ্ট করিবে? সু-সাহিত্যের প্রতি অবিচার চিরকাল চলিয়া আসিতেছে। কারণ প্রকৃত সাহিত্য কেবলমাত্র আপনার সার্থক অস্তিত্বের উপরে দাঁড়াইতে চেষ্টা করে, বাঁচিবার জন্য সে অন্য কোন শক্তির সঙ্গে প্যাক্ট করিতে ঘৃণা বোধ করে। কিন্তু অকৃতী রচনার তো আত্মসম্মান নাই, কাজেই সে ধনীর দুয়ারে খ্যাতির দুয়ারে সার্টিফিকেট খুঁজিয়া মরে। মোটরযুক্ত সাহিত্যিককেই বোধ করি মহাসাহিত্যিক বলে।

এই কয়েক বছরের মধ্যে বাঙলা সাহিত্যে যে কয়খানি উৎকৃষ্ট গল্প, উপন্যাস, নাটক ও কাব্য প্রকাশিত হইয়াছে একে একে আমরা তাহাদের পরিচয় দিব। প্রথমেই পথের পাঁচালীর লেখক—

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
যাত্রা বদলের

নাম মনে পড়িতেছে।

যাত্রাবদল দশটি ছোট গল্পের সমষ্টি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগুলি ছোট গল্প নহে, বড় গল্পের অংশ। ছোট গল্প সাধারণতঃ একটি মাত্র ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া দানা বাঁধিয়া ওঠে। বিভূতিবাবুর গল্পের বৈশিষ্ট্য এই যে ইহার কেন্দ্র কোন ঘটনাশ্রয়ী নহে, এবং সেইজন্যই ইহার পরিণাম অবশ্যম্ভাবী নাটকীয়তার দিকে নহে। বিভূতিবাবুর গল্পগুলির উপজীব্য স্মৃতি। সে-স্মৃতিও আবার অধিকাংশ স্থলে শৈশবের বা কৈশোরের।

'ভণ্ডুল মামার বাড়ী'তে হেডমাষ্টার তাঁর শৈশব ও কৈশোরের স্মৃতি মন্থন করিয়া অর্দ্ধসমাপ্ত ভণ্ডুল মামার বাড়ীর কাহিনী বলিতেছেন। 'উইলের খেয়াল' গল্পের নায়ক পূর্ণবাবু যদিচ বৃদ্ধ, কিন্তু পরিণত বয়সে সম্পত্তির মালিক হইয়া দারিদ্র্যের দুঃখে অবহেলিত যৌবনকে ফিরিয়া পাইবার জন্য একেবারে মৃত্যুপণ করিয়া বসিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে ইহা বার্দ্ধক্যের কাহিনী নয়। ইহা হারানো যৌবনের মৃত্যুমুখী অভিনয়। কাজেই ইহাকেও আমরা অল্প বয়সের স্মৃতির পর্য্যায়ে ফেলিতে পারি। 'সার্থকতা'র নায়ক ননী হঠাৎ ধনী হইয়া গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া জীর্ণ গ্রামবাসীর প্রাণে একবারের জন্য যৌবনের আশা ও উদ্যম ফিরাইয়া আনিয়াছে। বসন্তের আগমনে যেমন পৃথিবীতে নূতন করিয়া আশা ও উৎসাহ ফিরিয়া আসে তেমনি ননীর সঙ্গে যেন গ্রামবাসী বৃদ্ধদের সম্মিলিত যৌবনকালের একটা দিন ঘুরিয়া আসিয়াছে। যৌবনের স্মৃতির একটি দিন। 'বাইশ বছর' গল্পের নায়ক নিজমুখে তাহার বাইশ বছরের বহুদিন-গত যৌবনের দীর্ঘ নিঃশ্বাসের কাহিনী বলিতেছে। 'বৈদ্যনাথ' একটি ভবঘুরে দুর্দ্দান্ত ছোকরা। সব দোষ সত্ত্বেও লেখকের যেন তাহার প্রতি সমবেদনার ভাব আছে, কারণ তাহার কোন গুণ না থাকিলেও একটি অমূল্য ঐশ্বর্য্যের অধিকারী সে,—সম্মুখে

এখনো তাহার কৈশোর ও যৌবন। সতীশ 'ডানপিটে' ছেলে। জীবনের বহু অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া সে ঐশ্বর্য্যের মুখ দেখিয়াছে। কিন্তু বার্দ্ধক্যে আবার দুটি জিনিষ তাহার ফিরিয়া আসিয়াছে। কৈশোরের দারিদ্র্য ও স্মৃতি। গান যেমন 'সমে' ফিরিয়া আসে; সে-ও তেমনি বৃদ্ধ বয়সে কাশীতে ফিরিয়া গিয়াছে, হারানো কৈশোরকে খুঁজিতে। 'যাত্রা বদল' এই গ্রন্থের শেষ গল্প; এই গল্পের নামেই বইয়ের নামকরণ। নৈহাটি ষ্টেশনে একটি ভদ্রলোকের যুবতী স্ত্রী বিয়োগ লইয়া গল্পটি। ভদ্রলোক স্ত্রীকে লইয়া কর্ম্মস্থলে সংসার পাতিতে চলিয়াছিলেন। পথে এই দুর্ঘটনা। অন্যান্য গল্পে দেখিয়াছি লেখকের মুখ অতীতের দিকে, যাহা হইয়া গিয়াছে তাহাই লেখকের উপজীব্য। এ গল্পে পার্থক্য এই যে যাহা হইতে পারিত, তাহাই লেখকের উপজীব্য—লেখকের মুখ ভবিষ্যতের দিকে। বাহিরের এই ভেদসত্ত্বেও উভয়ে সগোত্র। একটিতে যাহা ঘটিয়াছে তাহার স্মৃতি, অন্যটিতে যাহা ঘটিতে পারিত, তাহার স্মৃতি—উভয়েই স্মৃতিমূলক।

'কনে-দেখা' গল্পটিও একটি লোকের বিগত জীবনের সুখ-দুঃখের স্মৃতি—তবে তাহার মূলে মানুষ নয়, একটি বিলাতী পাম গাছ। কাজেই ইহাকেও আমরা স্মৃতি পর্য্যায়ী কাহিনীর অন্তর্গত মনে করিতে পারি। বিশেষ, বিভূতিবাবু জীবনকে যে দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখিয়া থাকেন, তাহাকে বুঝিতে হইলে এ গল্পটি আমাদের সাহায্য করিবে।

'পেয়ালা' গল্পটির পেয়ালার সঙ্গে নায়কের বহু মৃত্যুর স্মৃতি জড়িত, কাজেই সে-ও এই পর্য্যায়ের অন্তর্গত। কিন্তু শুধু এইটুকু বলিলে যথেষ্ট বলা হইবে না—আমার মতে এই গল্পটি বাংলা সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ। সামান্য কয়েকখানি পাতায় লেখক যে অজ্ঞেয় রহস্যের রস সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা কেবলমাত্র শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের দ্বারাই সম্ভব।

একটি বস্তুকে অবলম্বন করিয়া বাস্তবাতীত রহস্য সৃষ্টিতে এ গল্পটি, অন্যান্য প্রভেদ সত্ত্বেও, রবীন্দ্রনাথের ক্ষুধিত পাষাণের সমকক্ষ না হইলেও সগোত্র। ইহা ভূতের গল্প না হইয়াও ভয়াবহ। সেক্সপীয়র বলিয়াছেন, আমাদের ক্ষুদ্র জীবন বিশাল নিদ্রাবেশ দ্বারা জড়িত। এ গল্পটি সেই জীবনাতীত নিদ্রাবেশকে স্মরণ করাইয়া দেয়। আমরা যে চোখ বাঁধিয়া উত্তুঙ্গ পর্ব্বতশিখরে দাঁড়াইয়া আছি, চোখ বাঁধা বলিয়াই তাহা বুঝিতে পারি না। এই 'পেয়ালা'র মত গল্প মাঝে মাঝে আমাদিগকে এই কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, আমাদের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া ওঠে। শুনিয়াছি বিভূতিবাবু পরলোক তত্ত্বের আলোচনা করেন, তিনি নিজের লেখা এই গল্পটিতে পরলোকের কি রহস্য প্রকাশ পাইতেছে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখিবেন কি!

বিভূতিবাবুর গল্পের উপজীব্য স্মৃতি, সে স্মৃতি হয় কৈশোরের নয় শৈশবের। যে-বয়স একদিন আমাদের পক্ষে অত্যন্ত সহজ ছিল, কিন্তু আজ যাহা পরমতর দুর্লভ, তাহারই স্মৃতিদ্বারা লেখক আমাদিগকে ব্যাকুল করিয়া তোলেন। সে স্মৃতির রাজ্যে আর আমাদের ফিরিবার অধিকার নাই, এ কথা সব সময়ে আমাদের মনে থাকে না, তাই ডানপিটে সতীশ কৈশোরের কাশীতে ফিরিয়া গিয়াছে, কৈশোরকে ফিরিয়া পাইবার জন্য। তাই 'উইলের খেয়ালের' পূর্ণবাবু মরণ পণ করিয়া বৃদ্ধ বয়সে যুবকের মত আচারব্যবহার করিতেছেন। লেখক ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিয়াছেন পূর্ণবাবু আর হারানো যৌবনকে ফিরিয়া পাইবেন না, তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার সম্মুখে মৃত্যু, আর কাশী-প্রত্যাগত সতীশের সম্মুখে তদপেক্ষাও ভীষণ পরিণাম—নৈরাশ্য। পূর্ণবাবু বুঝিতেও পারিলেন না যে তিনি আর যৌবনকাল ফিরিয়া পাইবেন না। কিন্তু সতীশ কাশী ফিরিবার দুই দিনের মধ্যেই বুঝিয়া লইয়াছে—'স্বর্গ আর স্বর্গ নহে।'

শুধু সতীশ ও পূর্ণকে নহে, বিভূতিবাবু পাঠককে সেই সুখের কৈশোর-যৌবনের স্মৃতির কথা স্মরণ করাইয়া ব্যাকুল করিয়া দেন, হঠাৎ আমাদের মনে পড়িয়া যায়, একদিন আমাদেরও বয়স বাইশ বছর ছিল, আর একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস উত্থিত হইয়া লেখকের ও নায়কদের নিঃশ্বাসের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া সেই হারানো যৌবনের রাজ্যের দিকে সমীরিত হয়। বিভূতিবাবু যদি এ যুগে না জন্মিয়া দু'শ বছর আগে বাংলা দেশে জন্মগ্রহণ করিতেন তবে লেখক হিসাবে তাঁহার নাম সেই দলের মধ্যে থাকিত—যাঁহারা ঠাকুরমার ঝুলির অমর রূপকথাগুলি লিখিয়াছেন। বয়ঃপ্রাপ্ত মানুষের হারানো শৈশব যে-রাজ্যে আসিয়া জমা হয় বিভূতিবাবুর লেখনী যেন সেই দেশের ইঙ্গিত জানে, সে দেশের সিংহদ্বারের সোনার চাবি, আমাদের মনে হয়, বিভূতিবাবুর কল্পনার মণিকোঠায় গচ্ছিত আছে।

এই তো হইল বিভূতিবাবুর বক্তব্য বিষয়। এবার দেখা যাক, তাঁহার বক্তব্য বস্তু কি? অর্থাৎ কা'দের বিষয়ে তিনি গল্প বলিতে ভালবাসেন? আমরা দেখিয়াছি তাঁর গল্পের নায়ক বালক বা কিশোর, কিম্বা বৃদ্ধ, যখন সে মনে মনে বিগত যৌবনে ফিরিয়া গিয়াছে। আবার 'কনে দেখা' গল্পে দেখিয়াছি গল্পের প্রতিনায়ক একটি বিলাতী পামগাছ। এখন এক হিসাবে শিশু, কিশোর, বৃদ্ধ এবং পামগাছ, বা প্রকৃতির মধ্যে একটি ঐক্য আছে। ইহারা সকলেই খানিকটা পরিমাণে নিষ্ক্রিয়। কঠোর জীবন-সংগ্রামের কেন্দ্রে ইহাদের কারো স্থান নয়, কেহ বা প্রবেশ করে নাই, কেহ বা তাহা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে। বয়ঃপ্রাপ্ত মানুষের মধ্যে যে দুর্দ্দমনীয় ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়াশীল জীবনেচ্ছা আছে, ইহাদের মধ্যে তাহা নাই। ইহারা যেন খানিকটা পরিমাণে জীবন-রঙ্গমঞ্চের দর্শক; কোনদিন অভিনেতা হইতে পারে,

বা ছিল, কিন্তু আজ নহে। জীবনের ঘুম পাড়ানি মাসি পিসির ঘরে ইহাদের স্থান। পূর্ণবয়স্ক জীবন-সংগ্রামে নিরত মানুষের স্থান বিভূতিবাবুর গল্পের কেন্দ্রে নহে, তাহারা এক-আধ বার আসে যায়, কিন্তু এখানে বাসা বাঁধিতে পারে না। 'সার্থকতা' গল্পের যুবক নায়ক ননী গ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছে, কিন্তু সেখানে বাসা বাঁধিতে পারে নাই, কারণ গ্রামের জীর্ণ পরিবেশের মধ্যে তাহাকে নিতান্ত বেমানান হইত। পামগাছটি শিশু বা বৃদ্ধের মত নিষ্ক্রিয় ও অসহায়, সেইজন্য তাহা বিভূতিবাবুর গল্পের মধ্যে এমন মানাইয়া গিয়াছে। জীবনের যেখানে কঠোর জীবন-সংগ্রাম দুর্দ্ধর্ষ কোটালের বানের মত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়া ভাঙিতেছে, চূরিতেছে, যেখানে সক্রিয় ইচ্ছা শক্তির সঙ্গে ইচ্ছা শক্তির দ্বন্দ্ব, সেই জীবনের চিরকালব্যাপী কুরুক্ষেত্রের মধ্যে বিভূতিবাবুর মন যেন কল্পনায় আশ্রয় খুঁজিয়া পায় না। তাঁহার স্থান এ সবের প্রত্যন্ত প্রদেশে তিনি শৈশবের সীমান্ত প্রদেশের কবি—যে সীমান্তে প্রকৃতি এবং শিশু এবং বৃদ্ধ শিশুর দ্বিতীয় শৈশব আসিয়া মিলিয়াছে।

তারপরে তাঁর গল্পের পরিবেশও তাঁর বক্তব্য বস্তুর অনুরূপ। প্রধানত তাহা পাড়াগ্রাম, যেখানে জীবন-সংগ্রাম কঠোর নয়। কলিকাতা শহরেও কয়েকটি গল্পের পরিবেশ বটে, কিন্তু শহর সেখানে উগ্রমূর্ত্তি নয়। শহরের মধ্যে যে-অংশটাতে খানিকটা পরিমাণে পাড়াগ্রামের আভাস পাওয়া যায়, সেই গলিতে, ছোট রাস্তায় বা বৈঠকখানায় চারাগাছের বাজারের একান্তে।

আবার এই গল্পগুলি বলিবার শুনিবার বা ঘটিবার কালও তাঁহার বক্তব্য বস্তুর অনুরূপ। স্মৃতিকথা শুনিবার কাল বর্ষা সন্ধ্যা, বা বর্ষার সন্ধ্যাসম মেঘাচ্ছন্ন দুপুর, বা শীতের সন্ধ্যা ছাড়া আর কি হইতে

পারে! তাঁহার স্মৃতিমূলক অনেক গল্পই বর্ষা সন্ধ্যায় গরম মুড়ির অনুপান যোগে কথিত।

বিভূতিবাবুর অধিকাংশ গল্প উত্তম পুরুষে কথিত। স্মৃতিকথা ঘটনা নহে, স্বভাবতই ইহা কথিত হইবার যোগ্য। অনেকস্থলে লেখক নিজে কথক, অনেক স্থলে গল্পের নায়ক প্রথম পুরুষে গল্প বলিয়া চলিয়াছেন। যে গল্পে সক্রিয় ইচ্ছাশক্তিমান মানুষ লইয়া কারবার সেখানে উত্তম পুরুষের কথনপদ্ধতি উপযুক্ত না হইতে পারে, কিন্তু যেখানে গল্পের নায়ক, প্রতিনায়ক, অধিনায়ক, উপনায়ক নিষ্ক্রিয় ব্যক্তি সেখানে ইহাই যোগ্য পদ্ধতি, লেখক তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। বিশেষ, স্মৃতিকথার পক্ষে ইহা একেবারে অনিবার্য্য বলিলেই চলে।

বনফুলের তৃণখণ্ড

"বনফুল" এই ছদ্ম নামের অন্তরালে লুক্কায়িত থাকিয়া শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় এতদিন ধরিয়া ব্যঙ্গ কবিতার তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করিয়া আসিতেছিলেন। এবার তিনি গল্প লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তৃণখণ্ড তাঁহার লিখিত প্রথম গল্পগ্রন্থ।

ইহা একটি ডাক্তারের জীবনকথা। ডাক্তার এবং উকীল স্বভাবতই এমন কাজ করিয়া থাকেন যাহাতে তাঁহাদের পক্ষে মানুষের জীবনের অনেক বীভৎস, নৃশংস, স্বার্থপর মনোভাব দেখা অনিবার্য্য হইয়া দাঁড়ায়। এই সব উপজীব্য লইয়া দুর্দ্দান্ত বাস্তবমূলক গল্প লেখা স্বাভাবিক। কিন্তু এই গ্রন্থে আর একটা দিক আছে যাহা সব ডাক্তারের জীবনে ঘটে না, কারণ সব ডাক্তার কল্পনাবান নহে। বনফুল এক সঙ্গে কবি ও কবিরাজ (ডাক্তার)। ইহাতে একদিকে দুর্দ্দমনীয় বাস্তবের স্রোত, আর তার পাশাপাশি সমান দুর্দ্দমনীয় কল্পনার লীলা। কল্পনা ও

বাস্তবের যুক্ত বেণীর খরস্রোতে মানুষ অসহায়ভাবে তৃণখণ্ডের মত ভাসিয়া চলিয়াছে, ইহাই বোধ করি লেখকের বক্তব্য।

কল্পনা-অংশ ডাক্তারের ব্যক্তিগত জীবনের নিভৃততম কাহিনী, তাহার সঙ্গে বাহিরের ঘটনার কোন যোগ নাই। এই অংশের ভাবের বাহন হৃদয়াবেগ; অনেক সময়ে হৃদয়াবেগের প্রাবল্য কবিতার রূপ গ্রহণ করিয়াছে। আবার বাস্তব-অংশের ভাবের বাহন ব্যঙ্গ। কল্পনা ও বাস্তব হৃদয়াবেগ ও ব্যঙ্গের দ্বারা প্রকাশিত। ইহাতেই লেখকের কৃতিত্ব।

দুই নৌকায় পা দিয়া চলা কঠিন, কিন্তু একেবারে অসম্ভব নয়। কিন্তু এক পা ব্যঙ্গের গোরুর গাড়ীতে, অন্য পা হৃদয়াবেগের আকাশ-চারী এরোপ্লেনে দিয়া চলা, না দেখিলে বিশ্বাস হয় না। বনফুল তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, বিশ্বাস না করিবার আর উপায় নাই।

ইহার প্রধান কারণ কল্পনা ও ব্যঙ্গের বিপরীত ধর্ম্ম লেখকের সধর্ম্ম। ব্যঙ্গ যদি তাঁহার পক্ষে একটি pose মাত্র হইত, তবে পদে পদে বিপদের আশঙ্কা থাকিত। কিন্তু ব্যঙ্গ বনফুলের জন্মগত দৃষ্টি-ভঙ্গি। ব্যঙ্গ আর কিছুই নহে, সত্যের বিপরীত মূর্ত্তি। জলের মধ্যে নিসর্গের যে-ছায়া উল্টাভাবে প্রতিবিম্বিত হয়, তাহা নিসর্গের ব্যঙ্গ। জীবনের ব্যঙ্গরূপ অর্থাৎ বিপরীত রূপ তাহাদেরই কাছে যথার্থ সহজ, যাহাদের অন্তরে জলাশয় আছে, যেখানে জীবনের ব্যঙ্গরূপ প্রতিবিম্বিত। বনফুলের হৃদয়ে কল্পনার সেই সরোবর আছে, যেখানে বাস্তব উল্টা ভাবে প্রতীয়মান। কাজেই তাঁহাকে আর তথাকথিক satirist-এর ন্যায় বাহিরে খুঁজিয়া বেড়াইতে হয় না। বাস্তবিক পক্ষে কল্পনা ও ব্যঙ্গ দুই বিভিন্ন শক্তি নয়, ইহা একই শক্তির বিভিন্ন প্রকাশ। সেই জন্য দেখা যায় পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখকদের কাছে জীবনের ironyটা

স্বতঃপ্রকাশ। এবং আপাত-পৃথক এই দুই শক্তিই জীবনের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়াছে।

নিছক ব্যঙ্গ রচনা আছে, আবার হৃদয়াবেগ-প্রধান রচনাও আছে। কিন্তু তৃণখণ্ডের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে বাস্তবকে কল্পনার শিখর হইতে দেখা হইয়াছে, এবং কল্পনাকে বাস্তবের রূঢ় মর্ত্ত্যভূমি হইতে দেখা হইয়াছে। এবং এই বিনিময়-দৃষ্টির সামঞ্জস্যের ফলে দুটির যথার্থ মূর্ত্তি ধরা পড়িয়াছে। তথাকথিত তরুণগণের বাস্তব গল্প যে অবাস্তব বলিয়া মনে হয়, তাহার কারণ বাস্তব তাহাদের কাছে সত্য নহে। সত্যকে দেখিতে হইলে একটু দূরে দাঁড়াইতে হয়, সে দূরত্ব দেশকালের হইতে পারে; তদভাবে কল্পনার দূরত্ব থাকা প্রয়োজন। যে-বাস্তবকে তাহারা আঁকিতে চাহিয়াছে, নিজেরা সেই বাস্তবেরই অংশ হওয়াতে তাহাকে পৃথক করিয়া দেখিতে পারি নাই। বনফুল নিজের মধ্যে দ্বিধা করিয়া বাস্তবকে কল্পনার ব্যবধান হইতে এবং কল্পনাকে বাস্তবের ব্যবধান হইতে দেখিতে সমর্থ হইয়াছেন। এবং সেইজন্যই তাঁহার বাস্তব কল্পনাময় এবং কল্পনা বাস্তব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শেষ রক্ষা

সুপ্রসিদ্ধ গল্পলেখক অম্বুজাক্ষ ভৌমিক অতিশয় চিন্তাগ্রস্ত। বর্ত্তমান বাজারে লেখক মাত্রেই একটু বিপন্ন। ভাল লেখার সমঝদার নাই, ভাল লেখার বাজার-দর কম এবং ভাল লেখাকে ক্ষত বিক্ষত করিবার জন্য একদল সমালোচক সর্ব্বদাই সশস্ত্র হইয়া আছেন। ভৌমিক

মহাশয়ের বর্ত্তমান চিন্তার কারণ কিন্তু স্বতন্ত্র। তিনি গত পরশ্ব হইতে একটি গল্প স্থরু করিয়াছেন—খুব মনোরম ভাবেই স্থরু করিয়াছেন—(লিখিতে লিখিতে নিজেরই তাঁহার বার কয়েক রোমাঞ্চ হইয়াছে)—কিন্তু কি করিয়া এই বিস্ময়কর উপাখ্যানটি তিনি শেষ করিবেন তাহা তাঁহার মাথায় কিছুতেই আসিতেছে না। গল্পের শেষ রক্ষা করা সত্যই একটি দুরূহ সমস্যা—গল্পলেখক মাত্রেরই তাহা জানা আছে। শেষ-বরাবর আসিয়া ভৌমিক মহাশয় লেখনী সম্বরণ করিয়া বসিয়া আছেন। সকাল হইতে চার পেয়ালা কড়া চা এবং এক প্যাকেট সিগারেট শেষ হইয়া গিয়াছে—গল্প কিন্তু শেষ হইতে চাহে না।

ভৌমিক মহাশয় বসিয়া আছেন—নির্জ্জন ত্রিতলের ঘরটিতে। ঘরের কপাটটি খোলা ছিল এবং সেই মুক্ত দ্বারপথ দিয়া কিঞ্চিৎ বাতাস, স্ত্রীর কণ্ঠস্বর, ছেলেমেয়েদের হুড়োমুড়ির শব্দ এবং দুইটি বায়সের চীৎকারধ্বনি প্রবেশ করিতেছিল। বাতাসটা মন্দ লাগিতেছিল না—কিন্তু উপরোক্ত শব্দগুলির প্রত্যেকটিই যেন গল্পের প্লটটিকে গলাধাক্কা দিয়া মস্তিষ্ক হইতে বিদূরিত করিয়া দিতেছে—ভৌমিক মহাশয়ের এইরূপ মনে হইল। তিনি ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দ্বার-দেশ অর্গলবদ্ধ করিলেন এবং একটি ভীমকান্তি সিগার ধরাইয়া হাঁটু নাচাইতে লাগিলেন। এই ভাবে কিছুক্ষণ কাটিল। জানুযুগল পরিশ্রান্ত হইল—কিন্তু গল্পের কোন স্থরাহা হইল না। ভৌমিক মহাশয় তখন ক্লান্ত হাঁটুকে আর না ঘাঁটাইয়া দক্ষিণ কর্ণটি লইয়া পড়িলেন। একটি দিয়াশালাই কাঠি সন্তর্পণে তিনি দক্ষিণ কর্ণ-বিবরে প্রবেশ করাইয়া দক্ষিণ চক্ষু ও গণ্ডদেশ কুঞ্চিত করিলেন। গল্পের শেষটা আজ লিখিয়া দিতেই হইবে—কারণ গল্প দেওয়ার আজই শেষ দিন। আজ গল্পটি দিতে না পারিলে "চমৎকারিণী" নামক মাসিক পত্রিকায় তাহার স্থান এ মাসে অন্ততঃ হইবে না। এ

মাসে না হইলে পঁচিশটি টাকা ত মারা যাইবেই—উপরন্তু তিনি গৃহিণী এবং সম্পাদক উভয়েরই নিকট খেলো হইয়া যাইবেন।

সম্পাদককে কথা দিয়াছেন যে একটি বৃহৎ এবং চমকপ্রদ গল্প তিনি পঁচিশ টাকা পাইলে লিখিয়া দিবেন এবং তৎপূর্ব্বে তিনি গৃহিণীর নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, আগামী মাসে তিনি তাঁহাকে পঁচিশ টাকা দিয়া একখানি মুগার শাড়ী খরিদ করিয়া দিবেনই দিবেন। দ্বিতীয় পক্ষের গৃহিণীকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে বৈ কি।

গৃহিণীকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে বলিয়াই তিনি "চমৎকারিণী" পত্রিকায় আদৌ লিখিতে রাজী হইয়াছেন। তাহা না হইলে তিনি ওরূপ তৃতীয় শ্রেণীর কাগজে উত্তেজক গল্প লিখিতে রাজী হইতেন কি? অম্বুজাক্ষ ভৌমিক একজন নামজাদা রক্ষণশীল লেখক। চিরকাল তিনি তাঁহার প্রত্যেকটি গল্পে পূণ্যের জয় ও পাপের ক্ষয় দেখাইয়া আসিয়াছেন এবং এই ধরণের গল্প ভৌমিক মহাশয়ের হাতে খোলেও ভাল। তাঁহার লিখিত "হিন্দু-বৈজয়ন্তী" গ্রন্থের পাতায় পাতায় উপদেশ। গল্পচ্ছলে নীতিকথা প্রকাশ করিতে তিনি অদ্বিতীয়! তাঁহার 'বঙ্গ-বিষাণ' নামক গ্রন্থটি প্রত্যেক যুবক-যুবতী, শুধু যুবক-যুবতী কেন, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই পড়িয়া দেখা উচিত। এ হেন ভৌমিক মহাশয় প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায় উপনীত হইয়া কেবল গৃহিণীর মনোরঞ্জনার্থেই এক ছ্যাবলা কাগজের সম্পাদকের ফরমায়েস অনুযায়ী এই ফ্যাসাদে পড়িয়াছেন। নীতিমূলক তাঁহার একটি সুন্দর গল্প ছিল। কেমন করিয়া বিলাসপুরের ধর্ম্মাত্মা জমিদার একটি অজ্ঞাতকুলশীলা রমণীর সতীত্ব রক্ষার নিমিত্ত সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পথে দাঁড়াইলেন—কেমন করিয়া দুরাত্মা ধনী মাধবলাল বজ্রাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইল এবং কেমন করিয়া আবার সেই সর্ব্বস্বান্ত জমিদার কেবলমাত্র পূণ্যবলে এক

সন্ন্যাসীর সহায়তায় হস্তচ্যুত জমিদারী পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইলেন—এই সমস্তই সুন্দর প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি তাঁহার "সতীর আশীর্ব্বাদ" নামক গল্পটিতে লিখিয়াছিলেন। কিন্তু "চমৎকারিণী"র সম্পাদক মহাশয় মাইনাস্ থ্রী চশমা পরিধান করিয়া সম্ভবতঃ কণ্টিনেণ্টাল ভাব-রাজ্যের অলি-গলিতে ঘুরিয়া বেড়ান—তিনি উক্ত গল্পটি পছন্দ করেন নাই এবং কি ধরণের গল্প হইলে তাঁহার পছন্দ হইতে পারে তাহারও আভাস দিয়াছেন। তরুণী গৃহিণীর অভিমানভরা মিষ্ট মুখখানির খাতিরে "যা থাকে কপালে" বলিয়া পরশু দিন হইতে ভৌমিক মহাশয় কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া পড়িয়াছেন। বদ্ধপরিকর হইয়াও বিশেষ কিছু সুবিধা হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে না। শেষ-পর্য্যন্ত কানে দিয়াশালাই কাঠিও ঢুকাইতে হইয়াছে।

২

"উঃ" বলিয়া কাঠিটি ভৌমিক মহাশয় কান হইতে বাহির করিলেন। বাতায়ন-পথে চাহিয়া দেখিলেন খোলার বাড়ীর চালে বসিয়া একটি বীর হনুমান দাঁত খিঁচাইতেছে এবং একটি বৃদ্ধা তদ্দর্শনে নিজের বড়িগুলি সামালাইতেছেন। ভৌমিক মহাশয় যে গল্প ফাঁদিয়াছেন এই সব অকিঞ্চিৎকর দৃশ্য তাহাতে কাজে লাগিবে না ভাবিয়া তিনি চক্ষু অন্যদিকে ফিরাইলেন। অন্যদিকে মানে ঘরের দেওয়ালের দিকে। কিন্তু ভৌমিক মহাশয়ের ভাড়াটে গৃহের দেওয়ালেও এমন কোন কিছু ছিল না যাহা তাঁহার "প্রেমের জন্য" নামক গল্পের শেষরক্ষা করিতে পারে। নিরুপায় হইয়া ভৌমিক চক্ষু মুদিয়া চুরুটে একটি টান দিলেন। টান দিয়াই বুঝিলেন চক্ষু খুলিতে হইবে। চুরুট নিভিয়াছে, ধরান দরকার। নিপুণভাবে চুরুটটি তিনি ধরাইলেন। ধরাইয়া ভাবিতে

লাগিলেন এ অবস্থায় কি করা উচিত। নায়ক নায়িকার বাড়ীর পাঁচিল ডিঙাইয়াছেন। অমাবস্থার দ্বিপ্রহর রাত্রি। টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছে। নায়ক গুঁড়ি মারিয়া আসিয়া একটি পেয়ারা গাছের তলায় আশ্রয় লইবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু সম্মুখে একটি গরু থাকাতে আর অধিকদূর অগ্রসর হইবার সাহস তাঁহার হইতেছে না।

ভৌমিক মহাশয় এই পর্য্যন্ত অবলীলাক্রমে লিখিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু ইহার পর আর কি লিখিলে আর্ট বজায় থাকিবে, নায়ক আর কোন কোন দুরূহ প্রক্রিয়া করিলে তাহা সম্পাদকের মনোহরণ করিতে পারিবে তাহা ভৌমিক মহাশয়ের মাথায় কিছুতেই আসিতেছে না। তিনি চিরকাল পুণ্যের জয় ও পাপের পতন চিত্রিত করিয়া আসিয়াছেন— এই অশ্লীলমনা নায়ককে লইয়া এখন কি করা কর্ত্তব্য তাহা তিনি ভাবিয়াই পাইতেছেন না। ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার ইচ্ছা করিতেছে 'বেল্লিককে চাবকাইয়া উহার পিঠের ছাল ছাড়াইয়া ফেলি! কিন্তু আর্ট তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইবে এবং আর্ট ক্ষুণ্ণ হইলেই পঁচিশটি টাকা!

উঃ ভগবান্, এ কি সমস্যা! তখন তিনি প্রাণপণে ভগবানকেই ডাকিতে লাগিলেন—"ঈশ্বর এ উভয়-সঙ্কট হইতে আমাকে বাঁচাও! পাপের চিত্র আমি আঁকিতে পারিব না—অথচ গৃহিণীকেও চটাইতে পারিব না। দয়াময়, দয়া কর!"

ভগবান যেন স্বকর্ণে শুনিলেন।

দুই মিনিটে সব ঠিক হইয়া গেল।

*　　　*　　　*

ভূমিকম্প হইয়া যাইবার পর কম্পান্বিতকলেবর ভৌমিক মহাশয় নামিয়া দেখিলেন দেওয়াল চাপা পড়িয়া তাঁহার পত্নী মারা গিয়াছেন: মুগার শাড়ীর আর দরকার হইবে না।

"বনফুল"

প্রবন্ধের মধ্যে বিজ্ঞাপন

পেটেণ্ট ঔষধের গুণগানপূর্ণ প্রবন্ধ ছাপা বাংলা সাময়িক পত্র সম্পাদকদের রীতি হইয়া পড়িয়াছে। সামান্য অর্থ লোভে যাহারা এরূপ হীনতা সহ্য করিতে রাজি হয় তাহাদের বিরুদ্ধে সামাজিক কোনো শাসন নাই। ইহারা সাহিত্য-সমাজে পতিত, অর্থ লোভে ইহারা যাহা ইচ্ছা করিতে পারে—দেশ সেবার নাম করিয়া দেশের ক্ষতি করিতে ইহাদের বাধে না। আমরা বহুদিন ধরিয়াই বলিয়া আসিতেছি, বিজ্ঞাপনে যে সকল অতিশয়োক্তি থাকে তাহা বিজ্ঞাপন-সাহিত্যেরই ভাষা। কেহ তাহা পড়িয়া তাহাকে বৈজ্ঞানিক সত্য হিসাবে গ্রহণ করে না, বিজ্ঞাপন হিসাবেই গ্রহণ করে।

বিজ্ঞাপন দাতা এবং ভাবী ক্রেতার মধ্যে সরল যোগাযোগ। কোনো দেশে সম্পাদক কোথায়ও ঘুঁষ খাইয়া গুপ্ত কৌশলে কোনো জিনিষের গুণ প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করে না। কিন্তু এ দেশে সবই সম্ভব। এ দেশে সাধারণ কাগজের সম্পাদকদের লেশমাত্র দায়িত্ব জ্ঞান নাই, আভিজাত্য বোধ নাই—ভদ্রতার আদর্শ নাই—বিবেক নাই—টাকার বিনিময়ে (অনেক ক্ষেত্রেই তাহা যৎসামান্য) তাহারা যে-কোনো মুহূর্ত্তে যে-কোনো দুষ্কার্য্য করিতে পারে। দুই চারিটি পয়সা দিয়া কেহ জুতা মারিয়া গেলেও সে জুতা শিরোধার্য্য করিতে যাহাদের আত্মসম্মানে আঘাত লাগে না—বর্ব্বরোচিত হাসির সহিত সেই জুতার ধূলা যাহারা সর্ব্বাঙ্গে আশীর্ব্বাদের মত বহন করিয়া বেড়ায় তাহারা সাহিত্য সমাজ রাজনীতি প্রভৃতিরও বিচার

করে। কেহ এমন ইঙ্গিত করিয়াছেন, আমরা ভয় দেখাইয়া বিজ্ঞাপন আদায়ের চেষ্টা করি। কথাটি সত্য নহে। "সত্য নহে"—ইহার চেয়ে সহজ ভাষায় তাহার উত্তর দিতে পারিলাম না।

কিন্তু যে-বস্তু নিজগুণেই ভাল তাহার বিক্রেতার কাহাকেও ভয় করিতে হয় না। আমরা যে-বিষয়ে অভিজ্ঞ নহি, সে বিষয়ে, পয়সা দিয়া কেহ আমাদের কাগজে প্রবন্ধের সাহায্যে বিজ্ঞাপন প্রচার করিবে এতবড় স্পর্দ্ধা কোনো বিজ্ঞাপন দাতার নাই। আমরা সেইরূপ বিজ্ঞাপন গ্রহণ করি যাহাদ্বারা লোকের প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা কম। যে বিজ্ঞাপন আমরা ছাপি সে বিজ্ঞাপনের আমরা বাহকমাত্র—ইহার ভিতর কোনো কৌশল নাই—ফাঁকি নাই, পাঠককে ঠকাইবার ফন্দী নাই। আমরা মন্ত্রতন্ত্র বা কবচ প্রভৃতির বিজ্ঞাপন গ্রহণ করি না। কারণ আমরা উহাতে বিশ্বাস করি না। কেহ যদি কোনো ঔষধের বিজ্ঞাপনে লেখেন "অব্যর্থ ঔষধ" তাহা হইলে তাহা আমরা ছাপি না—কারণ কোনো অব্যর্থ ঔষধ আছে বলিয়া বিশ্বাস করি না।

রাগ কোরো না দাদা

সত্যি কথা বলব কেবল
শপথ করা মিথ্যে,
নিত্য নূতন রঙীন ফানুস
জ্বলছে আমার চিত্তে।
স্বপ্ন-ভরা দোকান আমার
ব্যবসা করি স্ফূর্তির
রূপকথারই যোগান দিয়ে
করছি উদর-পূর্ত্তি।

কল্পনাতে ধোঁয়াচ্ছে স্রেফ্
মিথ্যা গাদা গাদা,
দোহাই তোমার—আর যা কর—
রাগ কোরো না দাদা।

রূপসীদের দেখলে পরে
প্রাণটা করে চুলবুল,
মনের ক্ষেতে ধান খেয়ে যায়
চটুল যত বুলবুল,
তাদের হাসি ভঙ্গিমা আর
কালো চোখের দৃষ্টি,
নেশার মত মগজে মোর
ঘটায় অনাসৃষ্টি।

সুযোগ পেলেই আড়-নয়নে
তাকাই আধা-আধা
দোহাই তোমার—আর যা কর—
রাগ কোরো না দাদা।

পদব্রজে ঘুরে বেড়াই
জুতোর তলা ক্ষইয়ে,—
নেহাৎ-দাদা ছাপোষা লোক
মোটর-গাড়ী কৈ হে?
তাই ত যখন 'রোল্‌স' হাঁকায়
হাম্‌দো-মুখো মিন্‌সে
বুকের মাঝে স্বতঃই জাগে
একটুখানি হিংসে।

কট্‌মটিয়ে তাকাই, দেখি
ছিটিয়ে গেছে কাদা—
দোহাই তোমার—আর যা কর—
রাগ কোরো না দাদা।

দেশোদ্ধারের মীটিং করি
দেশবন্ধু পার্কে—
'স্বদেশটাকে চিবিয়ে খেলে
সাগরপারী শার্কে—'
এমন সময় কনেষ্টবল!
পালাই মেরে লম্ফ,

ঘরে গিয়ে হাঁপাই, তবু
থামে না হৃৎকম্প!

রুদ্ধ স্বরে বলি—'শালা
গুণ্ডা হারামজাদা!'
দোহাই তোমার—আর যা কর—
রাগ কোরো না দাদা।

কুৎসা শুনে হাস্য ক'র,
প্রাণটা পরিতুষ্ট।
বিশেষ যদি নারী-কেচ্ছা
প্রচার করে দুষ্ট,
এবং তাতে মন্দ মধুর
থাকে 'রসের' গন্ধ—
রসিকতায় হই বেসামাল,
আলগা নীবিবন্ধ—

আপনা হতে বেরিয়ে থাকে
দন্ত শাদা শাদা
দোহাই তোমার—আর যা কর—
রাগ কোরো না দাদা।
ভাবছ দাদা, লোকটা আমি
লুচ্চা পাজি ভণ্ড,
লুব্ধ ভীরু মিথ্যাবাদী—
মারবে শিরে দণ্ড?

কিন্তু দাদা, তোমায় আমায়
প্রভেদ যে একচুল নাই
আমি তোমার মাসতুত ভাই
এতে ত আর ভুল নাই !

চেহারা ঠিক একই রকম
নাকটি খাঁদা-খাঁদা
দোহাই তোমার—আর যা কর—
রাগ কোরো না দাদা !
'চন্দ্রহাস'

ডিটেকটিব

[নাটক]

প্রস্তাবনা

একটি সুসজ্জিত ড্রয়িং রুম। বেলা আন্দাজ চারটে। খোলা জানালা দিয়া গ্রাম্য বহিঃপ্রকৃতি দেখা যাইতেছে। গ্রামের জমিদার এবং এই গৃহের মালিক শ্রীমান অনন্ত চৌধুরী জানালার ধারে একটা কৌচে বক্রভাবে বসিয়া অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে একটি ডিটেকটিব উপন্যাস পড়িতেছে ও মাঝে মাঝে উত্তেজিত ভাবে হাত ছুঁড়িতেছে। তাহার চেহারা ভাল, গোঁফ দাড়ি কামানো ; বয়ঃক্রম চব্বিশ বৎসর। একটা নির্ব্বাপিত পাইপ তাহার ঠোঁটের কোণ হইতে ঝুলিতেছে।

ঘরের অন্য কোণে দু'টি চেয়ারে পাশাপাশি বসিয়া অনন্তর মাতা বিমলা দেবী ও সধবা জ্যেষ্ঠা ভগিনী সুরমা মৃদুস্বরে কথোপকথন করিতেছেন। সুরমার হাতে সেলাই।

সুরমা। এবার অন্তুর বিয়ে দাও মা! এম্ এ পাস করলে, চব্বিশ বছর বয়স হল—আর কি। আমাদের ঘরে অতবড় আইবুড় ছেলে মানায় না। লোকে নানান্ কথা কইতে আরম্ভ করবে। উনি বলছিলেন, জমিদার-বংশের ছেলে তাড়াতাড়ি বিয়ে না দিলে কোন্ দিন কি করে বসবে।

বিমলা। আমি কি তা বুঝি না মা। কিন্তু হলে হবে কি, ছেলে যে আস্ত পাগল; বিয়ের কথা তুললেই হাত পা ছুঁড়তে আরম্ভ করে। জানিস ত ওকে!

সুরমা। কি, বলে কি? বিয়ে করবে না-ই বা কেন?

বিমলা। কি যে বলে তার মাথামুণ্ডু আমি কিছুই বুঝতে পারি না। বলে, জীবনে কাজ আছে—শুধু বিয়ে করলেই চলে না।—আমি ত বুঝিনা মা এত কাজই বা কিসের! পড়াশুনো করবার ইচ্ছে ছিল, বেশ ত, এম্ এ পাস করলি, এবার বিয়ে থা করে বাপ-পিতমো'র সম্পত্তি ভোগ-জাত কর। তা নয়—কাজ! আর কি কাজ করবি তাও না হয় খুলে বল। তা বলবে না,—কেবল ঐ বইগুলো রাতদিন মুখ গুঁজে পড়বে। কি যে ওতে আছে আমার পিণ্ডি—

সুরমা। ওগুলো ত ডিটেকটিব উপন্যাস,—কেবল খুনজখম জালজুচ্চুরি এই সব। আজকাল বাংলাতেও বেরিয়েছে। ছাই, আমার একটুও ভাল লাগে না।

বিমলা। হ্যাঁরে, তা—ওসব বইয়ে কি বিয়ে করতে মানা করেছে? তোরা লেখাপড়া জানিস, বলতে পারিস বাপু।

সুরমা। না, তা করবে কেন! তবে ও সব বই বেশী পড়লে মানুষ খেয়ালী হয়ে পড়ে—আজগুবি ব্যাপার কিনা।

অনন্ত। (নিজমনে উত্তেজিত কণ্ঠে) সাবধান, এক পা যদি এগিয়েছ—

বিমলা। ঐ শোন, নিজের মনেই বকছে। হ্যাঁরে, শেষে ওর মাথা খারাপ হয়ে যাবে না ত ?

সুরমা। না মা, বই পড়ে কি তা হয়। অন্তু ছেলেবেলা থেকেই ঐ রকম ভাবপ্রবণ, একটুতে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। একেবারে ছেলেমানুষ ত। কিন্তু এবার ওর বিয়ে দেওয়া দরকার, তা আমি বলে দিলুম বাপু। বৌ না হলে আর ঘরদোর মানাচ্ছে না।

বিমলা। আমার কি অসাধ ? জয়নগরের জমিদার শশী হালদার ত মেয়ে নিয়ে মুকিয়ে বসে আছে, মুখের কথা খসাতে যা দেরী; কিন্তু ছেলে যে ও কথায় কানই দেবে না।

সুরমা। আমারও সন্ধানে একটি চমৎকার মেয়ে আছে মা। ডানা কাটা পরী, বয়স বার বছর কিন্তু বেশ বাড়ন্ত গড়ন। চোদ্দ বছর বলে স্বচ্ছন্দে চালানো যায়, আইনে বাধে না। আমার খুড়তুত দেওরের মেয়ে। জানো ত তারা কি রকম বড় মানুষ—ঐ এক মেয়ে।

অনন্ত। (হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া) খবরদার ! দিদি, hands up !

সুরমা। সে আবার কি ?

অনন্ত। কোন কথা নয়, মাথার ওপর হাত তোলো নইলে এখুনি গুলি ছুঁড়ব। (পাইপ দিয়া বন্দুকের মত নির্দ্দেশ করিল)

সুরমা। পাগলামি করিস নি অন্তু।

অনন্ত। পাগলামি নয়, শিগ্‌গির মাথার ওপর হাত রাখো নইলে নিশ্চিত মৃত্যু। রাখলে না ? তবে গেল গেল, ওয়ান—টু—

সুরমা। নে বাপু, পারি না তোর জ্বালায়। (মাথায় হস্ত রাখিয়া) কি হল এতে ?

অনন্ত। এবার সত্যি কথা বল কি ষড়যন্ত্র করছিলে আমার বিরুদ্ধে?

সুরমা। ষড়যন্ত্র আবার কি! তোর এবার বিয়ে দেব, তারই ব্যবস্থা করছিলুম। বিয়ে না দিলে তুই সত্যিই পাগল হয়ে যাবি।

অনন্ত। বিয়ে! (হাস্য) এবার হাত নামাতে পার। দিদি, আজ পর্য্যন্ত কখনো দেখেছ ডিটেকটিব বিয়ে করেছে? জগতের কোনো ভাল ডিটেকটিব কখনও বিয়ে করেনি, তারা চির কুমার।

সুরমা। তা হোক না তারা চিরকুমার। তুই ত আর ডিটেকটিব নস্‌, তুই বিয়ে করবি না কেন?

অনন্ত। আমি ডিটেকটিব নই? দিদি, তুমি জানো না, আমার মতন দিগ্বিজয়ী ডিটেকটিব বাংলাদেশে আর দ্বিতীয় নেই। বলে দেব, কি দিয়ে আজ তুমি ভাত খেয়েছ? তবে শোনো, মুগের ডাল, এঁচোড়ের ডালনা, রুইমাছ ভাজা, কৈ মাছের ঝাল—

সুরমা। আহা কি শক্ত কথাই বললেন। নিজে যা দিয়ে ভাত খেয়েছিস সেইগুলো আউড়ে গেলি।

অনন্ত। আচ্ছা বেশ। তুমি কোন তেল মেখে চুল বেঁধেছ বলে দেব? (মস্তক আঘ্রাণ পূর্ব্বক) জবাকুসুম! কেমন এবার হয়েছে? মা, আমি কি কাজ করব ঠিক করে ফেলেছি।

বিমলা। কি কাজ করবি?

অনন্ত। আমি ডিটেকটিব হব, কলকাতায় মস্ত আফিস করব, তার নাম হবে (চিন্তা) অনন্ত দুর্দ্দশালয়। হাজার হাজার লোক জটিল রহস্য নিয়ে আমার কাছে হাজির হবে, আমি তাদের রহস্য উদ্ঘাটন করে ছেড়ে দেব। যার ছেলে চুরি গেছে তার ছেলে খুঁজে বার করব, যার টাকা চুরি গেছে তার টাকা উদ্ধার করব।

ব্যস, মানুষ বিপদে পড়লেই অনন্ত চৌধুরী ডিটেকটিবের কাছে ছুটে আসবে—

সুরমা। আ পোড়া কপাল! এত লেখাপড়া শিখে শেষে এই কাজ করবি? লোকে হাসবে যে।

অনন্ত। (চক্ষু পাকাইয়া) হাসবে! হাসুক ত দেখি কার কতখানি ক্ষমতা! (পরিক্রমণ করিয়া) বলাই! বলাই!

বলাই প্রবেশ করিল। সে বাড়ীর একজন সরকার—অনন্ত'র অত্যন্ত অনুগত ও প্রিয়পাত্র। তাহার বয়ক্রম চল্লিশ, মোটা বেঁটে, মুখ ভাবলেশনহীন।

বলাই। আজ্ঞে—

অনন্ত। (কটমট করিয়া তাহার পানে তাকাইয়া থাকিয়া) বলাই, আমি ডিটেক্‌টিব হব। তোমার হাসি পাচ্ছে?

বলাই। আজ্ঞে—বোঁ বোঁঃ শব্দে—একটুও হাসি পাচ্ছে না—

অনন্ত। ডিটেকটিবের কাজ হচ্চে মানুষের দুঃখ দূর করা—বুদ্ধ যীশুর সঙ্গে তাদের কোনও প্রভেদ নেই। আমি সেই কাজ করতে যাচ্চি। বুঝতে পারছ?

বলাই। আজ্ঞে পারছি।

অনন্ত। হাসি পাচ্ছে না?

বলাই। আজ্ঞে উঁহু!

মস্তক সঞ্চালন

অনন্ত। বেশ—যাও।

বলাইয়ের প্রস্থান

দিদি দেখলে?

সুরমা। যা ইচ্ছে কর বাপু, আমি আর তোর সঙ্গে পাগলামি করতে পারি না।

উত্থানোদ্যতা

অনন্ত। হুঁ হুঁ দাঁড়াও। তুমি কার জন্যে জামা তৈরী করছ বলে দেব ? এক কথায় বলে দিতে পারি—deduction—বুঝলে—deduction !

সুরমা। আচ্ছা বল ত দেখি।

অনন্ত। (কিছুক্ষণ চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া রহিল, নিজ মস্তকে টোকা মারিল) জামাই বাবুর জন্যে ! ঠিক বলেছি কি না ?

সুরমা। (অর্দ্ধ সমাপ্ত লাল রঙের ফ্রক তুলিয়া ধরিয়া) যা বলেছিস। তোর জামাই বাবুর এখন লাল ফ্রক পরবারই ত বয়স।

হাস্য

অনন্ত। (বিস্মিত ভাবে) অ্যাঁ ! ওটা ফ্রক নাকি ! সেই জন্যেই মন খুঁৎ খুঁৎ করছিল। আচ্ছা এবার বলে দিচ্ছি—

সুরমা। আর বলতে হবে না। (বাহিরে মোটরের শব্দ শুনা গেল) কে বুঝি এল। মা, চল আমরা ভেতরে যাই।

অনন্ত। দাঁড়াও, যেতে হবে না—কে এসেছে আমি শুধু মোটরের শব্দ শুনে বলে দিচ্ছি—

চক্ষু মুদিয়া নিজ মনে

আট সিলিণ্ডার গাড়ী—একটা ট্যাপিটের আওয়াজ হচ্চে—হর্ণটা সিলভারডেল, বুঝেছি। দিদি, জামাইবাবু তোমাকে দেখতে এসেছেন—

একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক প্রবেশ করিল। পশ্চাতে বলাই।

অনন্ত। (চক্ষু মুদিয়া হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক) আসুন জামাইবাবু—

সুরমা। (তাড়াতাড়ি উঠিয়া অনন্তকে ঠেলা দিয়া) দূর হতভাগা ! চোখ খুলে ত্যাখ।—আসুন কাকা বাবু।

আগন্তুককে প্রণাম করিল। বিমলা ঘোমটা দিয়া প্রস্থান করিলেন

অনন্ত। (চক্ষু খুলিয়া) তাই ত! এ ত জামাই বাবু নয়—এ যে জগদীশবাবু। এ হে হে, ভারি ভুল হয়ে গেছে। তাই মনটা খুঁৎ খুঁৎ করছিল! যা হোক কিছু আসে যায় না। জগদীশ-বাবু বিরাজপুরের জমিদার আর জামাইবাবু লাখরাজপুরের জমিদার। কাছাকাছি আন্দাজ ত করেছি। বসুন কাকাবাবু।

প্রণাম করিল জগদীশবাবু উপবিষ্ট হইলেন।

সুরমা। কতদিন পরে কাকাবাবুকে দেখলুম। শরীর বেশ ভাল আছে? কাকিমা ভাল আছেন?

জগদীশ। আর মা, আমাদের আবার ভাল থাকা। আমি ত তবু উঠে হেঁটে বেড়াচ্ছি, তোমার কাকিমা একেবারে শয্যা নিয়েছেন। যতদিন বয়স ছিল ততদিন আশায় বুক বেঁধে ছিলেন; এখন রক্তের জোরও কমে আসছে, মনও ভেঙে পড়ছে। বয়স যত বাড়ে শোকও তত কেটে কেটে বসে কিনা জানো ত সবই তোমরা—

সুরমা (দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া) জানি বৈ কি কাকাবাবু।

কিছুক্ষণ সকলে নিস্তব্ধ রহিলেন

জগদীশ। অনন্ত এম্-এ পাস করেছে খবরটা কয়েকদিন হল পেয়েছি। তুমিও শ্বশুরবাড়ী থেকে এসেছ শুনলুম। তাই ইচ্ছে হল, তোমাদের একবার দেখে আসি। আজ দাদা বেঁচে থাকলে কত আনন্দ করতেন, জমিদারীতে উৎসবের ঘটা পড়ে যেত; এই উপলক্ষে কত দানধ্যান সৎকার্য্য করিতেন,—তাঁর মৃত্যুর পর আমি আর এ বাড়ীতে পদার্পণ করিনি, এই প্রথম এলুম। দাদা কতদিন হল স্বর্গে গেছেন সুরমা?

সুরমা। বারো বছর।

জগদীশ। হ্যাঁ—তাই হবে। প্রথমে মেয়েটাকে হারালুম, তারপর বছর-দুই যেতে না যেতেই দাদাও স্বর্গে গেলেন। সংসারে দাদাই ছিলেন আমার একমাত্র বন্ধু। তিনি যাবার পর মনে হল, ভগবান একে একে বুঝি আমার সব স্নেহের বন্ধনগুলি কেটে নিচ্ছেন। সেই থেকে কেমন যেন হয়ে গিয়েছি। সংসারের কাজকর্ম্ম করি বটে, কিন্তু কিছুতেই যেন আঁঠা নেই—

তাঁহার কণ্ঠস্বর গভীর হতাশার মধ্যে মিলাইয়া গেল

সুরমা। মহামায়ার কোনো খবরই কি পাওয়া গেল না ?

জগদীশ। না মা, কোনো খবরই পাওয়া গেল না। সে ম'রে গেছে এ খবরটাও যদি পেতুম—তবু নিশ্চিন্ত হতে পারতুম।

সুরমা। না না, ও কথা বলবেন না কাকা। মহামায়া নিশ্চয় বেঁচে আছে—হয়ত ভাল ভাবেই আছে।

জগদীশ। সেইটেই যে ভরসা করতে পারছি না মা। যদি বেঁচে থাকে হয়ত এমন অবস্থায় আছে যে বাপ হয়ে সে কথা ভাবতেও আমার গা শিউরে ওঠে। তার চেয়ে তার ম'রে যাওয়াই ভাল।

সুরমা। (ক্ষীণ কণ্ঠে) ভগবান কি এমনই করবেন !

জগদীশ। সেই কথাই মাঝে মাঝে ভাবি। জ্ঞানতঃ কখনো কোনো পাপ কাজ করিনি ; তবে ভগবান আমাকে এমন শাস্তি দেবেন কেন ? খোঁজবারও ত ত্রুটি করিনি, দেশ তোলপাড় করে ফেলেছি। যে আমার মেয়ে এনে দিতে পারবে তাকে বিশ হাজার টাকা পুরস্কার দেব বলে ঘোষণা করেছি। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিবার পর উঠিয়া

এবার তা'হলে উঠি। তোমরা ভাল আছ দেখে বড় খুশী হলুম।—বৌ-ঠাকরুণকে আমার প্রণাম দিও।

নেপথ্যের উদ্দেশে হাত তুলিয়া নমস্কার করিলেন

অনন্ত, বাবা, তোমার প্রতি আমি কোনো কর্ত্তব্যই করতে পারিনি, নিজের শোকেই ডুবে আছি। তুমি লেখাপড়া শিখে কৃতী হয়ে বেরিয়েছ, এখন নিজের জমিদারীতে থেকে বাপের মত মর্য্যাদার সঙ্গে সম্পত্তি ভোগ দখল কর, প্রজাদের সুখী করবার, উন্নত করবার চেষ্টা কর। এ বুড়োর সাহায্য যখন দরকার হবে তখন তা চাইতে সঙ্কোচ কোরো না—মনে রেখো তোমার বাবা আমার অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু ছিলেন। আমার ত নিজের আর সন্তান নেই—এখন তোমরাই আমার ছেলে-মেয়ে। আশীর্ব্বাদ করি, দীর্ঘজীবী হও।

প্রস্থানোদ্যত

অনন্ত। কাকাবাবু, এখুনি যাবেন না, আর একটু বসুন। আপনার সঙ্গে দুটো কথা আছে।

জগদীশ। (উপবেশন করিয়া) বেশ, কি কথা বল।

অনন্ত। (উদ্দীপ্তভাবে) কাকাবাবু আপনার কথা শুনতে শুনতে একটা মহান্ প্রেরণা আমার প্রাণে এসেছে। আমি আপনার মেয়ে মহামায়াকে খুঁজে বার করব। যেমন করে পারি তাকে আপনার কোলে ফিরিয়ে দেব।

জগদীশ। (কিছুক্ষণ বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া থাকিবার পর) অনন্ত, তুমি তোমার বংশের উপযুক্ত কথাই বলেছ। কিন্তু এখন আর তা পারবে না বাবা। আমি ত চেষ্টার ত্রুটি করি নি, এতদিন

পরে আর তাকে খুঁজে বার করা যাবে না! তুমি ছেলেমানুষ, তোমার প্রাণে উদ্দীপনা আছে—

অনন্ত। পারব পারব পারব। জানেন আমি জীবনের ব্রত গ্রহণ করেছি—ডিটেকটিব হব। তিন মাসের মধ্যে আমি তাকে খুঁজে বার করব, এই প্রতিজ্ঞা করলুম। যদি না পারি তাহলে —তাহলে—আমার জমিদারী আমি বিলিয়ে দেব।

জগদীশ। অনন্ত, কি বলছিস তুই—

অনন্ত। মরদকা বাৎ হাঁথীকা দাঁত। কথার নড়্চড়্ হবে না। তিন মাসের মধ্যে আপনি মেয়ে ফিরে পাবেন। লিখে রেখে দিন।

জগদীশ। অনন্ত, তুই যে আমার প্রাণে আবার আশা জাগিয়ে তুলছিস।

অনন্ত। আলবৎ তুলছি—একশ'বার তুলছি। এবং শেষ পর্য্যন্ত খাড়া করে রাখব।

জগদীশ। অনন্ত, বাবা—(কাঁদিয়া ফেলিলেন। সুরমাও চোখ মুছিল)

অনন্ত। না না, কান্নাকাটি নয়। আমি ডিটেকটিব, আপনি আমার মক্কেল। Strictly business, এর মধ্যে কান্নাকাটি করলে চলবে না। দিদি, অশ্রু সম্বরণ কর।

জগদীশ। সুরমা, ও কি সত্যই পারবে?

সুরমা। পারবে কাকাবাবু। (সগর্ব্বে) অন্তু আজ পর্য্যন্ত কখনও ফেল হয় নি।

জগদীশ। যদি পারিস অনন্ত, তাহলে—কি আর বলব—আমার যা আছে সব তোর।

অনন্ত। ও চলবে না। Business is business! বিশ হাজার টাকার এক কাণাকড়ি বেশী নয়।—আচ্ছা, এবার তবে কাজের কথা আরম্ভ হোক। মহামায়া যখন হারিয়ে যায়, তখন আমার বয়স

কম—সব কথা ভাল মনে নেই। আপনি গোড়া থেকে সমস্ত ইতিহাস আর একবার বলুন।

নোটবুক ও পেন্সিল বাহির করিয়া বসিল

জগদীশবাবু কপালের উপর দিয়া একবার হস্ত সঞ্চালন করিলেন, তারপর ধীরে ধীরে কহিতে লাগিলেন।

জগদীশ। বলার আর আছে কি? ঘটনা খুবই সংক্ষিপ্ত। কুম্ভ মেলায় কলকাতায় গিয়েছিলুম—আমি, আমার স্ত্রী, আর মহামায়া।—স্নানের দিন ঘাটে স্নান করতে গেলুম—

অনন্ত। একটা কথা। কতদিন আগে?

জগদীশ। আজ থেকে চৌদ্দ বছর।

অনন্ত। মহামায়ার তখন বয়স কত?

জগদীশ। চার বছর।

অনন্ত। তাহলে এখন তার বয়স চৌদ্দ আর চারে আঠারো বছর।

জগদীশ। হাঁ। যদি সে বেঁচে থাকে।

অনন্ত। নির্ঘাৎ বেঁচে আছে। তারপর বলে যান।

জগদীশ। গাড়ীতে-ক'রে স্নান করতে যাচ্ছিলুম। সঙ্গে কয়জন পেয়াদা ছিল; গাড়ীর মধ্যে ছিলুম আমরা স্বামী-স্ত্রী, আর মহামায়া। মহামায়ার গায়ে গয়না ছিল! ঘাটের কাছে ভয়ঙ্কর ভিড়—চার দিকে মানুষের ঠেল ঠেলি। গাড়ী দাঁড়িয়ে পড়ল। এই সময় কে একজন হঠাৎ ছোঁ মেরে মহামায়াকে তার মা'র কোল থেকে তুলে নিয়ে ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল, গিন্নী চীৎকার করে উঠলেন; আমার পেয়াদারা গাড়ীর ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ল। চারিদিকে হৈ হৈ পড়ে গেল। পুলিস আর স্বেচ্ছাসেবকেরা

চতুর্দ্দিকে খুঁজে বেড়ালে। কিন্তু ভিড়ের মধ্যে আর তাকে পাওয়া গেল না।

কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া

তারপর কি চেষ্টাই না করেছি তাকে ফিরে পাবার জন্যে! জলের মত টাকা খরচ করেছি; কাগের মুখে খবর পেয়ে ছুটে গিয়েছি দেখতে আমার মেয়ে কিনা,—কিন্তু—

মাথা নাড়িলেন

অনন্ত। বেশ। এখন বলুন ত, মহামায়া সুন্দর ছিল কিনা।

জগদীশ। খুব সুন্দর ছিল। আমার দুর্গাপ্রতিমার মত মেয়ে।

অনন্ত। (নোট করিয়া) আচ্ছা তার গায়ে এমন কি কোনো চিহ্ন ছিল যা দেখে তাকে চিনতে পারা যায়?

জগদীশ! চিহ্ন! হ্যাঁ ছিল। তার বাঁ পায়ের চেটোর ওপর একটা আধুলির মত লাল জড়ুল ছিল—ঠিক যেন সিঁদুরের টিপ।

অনন্ত। (নোটবুক বন্ধ করিয়া) ব্যস, হয়ে গেছে। এবার আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ী যান। কাল আমি কলকাতায় যাচ্ছি; তারপর তিনমাসের মধ্যে মহামায়াকে আবিষ্কার করব।

জগদীশ। অনন্ত, যদি পারিস বাবা, তাহলে আমার যথাসর্ব্বস্ব—

অনন্ত। ব্যস ব্যস, ওকথা আর নয়। বিশ হাজার টাকা। Business! তাহলে কাকাবাবু, আপনি এখন আসুন গিয়ে, আমি ইতিমধ্যে plan of campaignটা ঠিক করে ফেলি।

জগদীশ প্রস্থান করিলেন, সুরমা তাঁহার পশ্চাতে গেল

অনন্ত। (গভীর ভ্রূকুটি করিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া) আমার একজন অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট দরকার। সব ডিটেকটিভেরই একজন গণেশ থাকে, যে তার কীর্ত্তিকলাপ লিপিবদ্ধ করে। আমার গণেশ কৈ?—ঠিক হয়েছে! [illegible]লাই। [illegible]লাই।

বলাই প্রবেশ করিল

বলাই। আজ্ঞে বিরাজপুরের হুজুর বোঁ বোঁ শব্দে চলে গেলেন।

অনন্ত। বেশ করেছেন। এখন শোনো, তুমি আমার গণেশ।

বলাই। (বুঝিতে না পারিয়া) আজ্ঞে বোঁ বোঁ শব্দে—

অনন্ত। কাল তুমি আমার সঙ্গে কলকাতায় যাচ্ছ। সেখানে মস্ত অফিস খুলে বসব, তার নাম "অনন্ত দুর্দ্দশালয়"। আমি হব শার্লক হোমস্, আর তুমি হবে আমার ওয়াটসন্। বুঝেছ ?

বলাই। আজ্ঞে বোঁ বোঁ শব্দে—আমি কি হব ?

অনন্ত। ওয়াটসন্। এসো বুঝিয়ে দিচ্ছি—

যবনিকা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কলিকাতার একটি বাসাবাড়ীর অভ্যন্তর। বাড়ীটি ক্ষুদ্র কিন্তু দুই ভাগে বিভক্ত; প্রতি ভাগে একটি ব্রাহ্ম পরিবার বাস করেন। মধ্যে যাতায়াতের পথ আছে। দুই বাড়ীর কন্যা কেয়া ও নলিনীর মধ্যে নিবিড় বন্ধুত্ব।

কেয়ার বসিবার ঘর। ঘরের আসবাব দামী নয়, কিন্তু বেশ নিপুণ ভাবে সাজানো। কেয়া একটা খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন পড়িতেছে। নলিনী উদাস ভাবে টেবিল্ হারমোনিয়ম বাজাইয়া গান করিতেছে। বেলা আন্দাজ সাড়ে তিনটা।

গান—

অন্ধকার! হে করুণ অন্ধকার!
ঘুচাও আলোর অরুণ অহঙ্কার।

চঞ্চল আঁখি-খঞ্জনে, হে তিমির,
বাঁধো অঞ্জনে সুনিবিড়—
সুপ্তি—ফুল-সমীর ঢালুক গন্ধভার।
দাও বিরাম, হে অভিরাম, কোমল অন্ধকার।

কেয়া। [কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া] কী যে তুই গান গাস নলি, আমার একটুও ভাল লাগে না। অন্ধকার—খালি অন্ধকার! তুই দেখাতে চাস যে তোর প্রাণে ভারি দুঃখ। ওটা তোর একটা 'পোজ'।

নলিনী। [উদাস চক্ষু ফিরাইয়া] 'পোজ'! কেয়া, তুই এই কথা বললি? আমার প্রাণের ব্যথা তুইও বুঝলি না!

কেয়া। ব্যথাটা কি শুনি!

নলিনী। ব্যথা কি বলে বোঝানো যায়! গানে তার স্পর্শ লেগে থাকে, দীর্ঘশ্বাসে তার মূর্তি ফুটে ওঠে। পৃথিবীতে ব্যথা ছাড়া আর কি আছে? ভেবে ছাখ, আমি কে? কোথা থেকে এসেছি? দুদিন পরে আবার কোথায় চলে যাব? জীবনের অনুচ্চারিত আশা-আকাঙ্ক্ষা, সবই হয়ত অতৃপ্ত থেকে যাবে—

কেয়া। থাকবে না গো থাকবে না। তোমার কি হয়েছে আমি বুঝেছি!

নলিনী। কি হয়েছে?

কেয়া। তুই মনে মনে প্রেমে পড়েছিস।

নলিনী। প্রেম! [দীর্ঘশ্বাস] কার সঙ্গে?

কেয়া। যিনি এখনি আসবেন—সেই সমরেশবাবুর সঙ্গে।

নলিনী। [করুণ হাস্য] সমরেশবাবুর সঙ্গে!—কেয়া, তোৎলার সঙ্গে কখনো প্রেম হয়?

কেয়া। কেন হবে না? তোৎলা কি মানুষ নয়! সমরেশবাবুর মতন অমন চমৎকার চেহারা কটা দেখেছিস? আর অমন বিদ্বান্‌ই বা কটা পাওয়া যায়! তুই কি মনে করিস, তোৎলা বলে উনি তোর যোগ্য নন? উনি তোকে কী ভীষণ ভালবাসেন তা জানিস?

নলিনী। কি করে জানব? আস্ত কথা তো কখনো শুনি নি।

কেয়া। কথাই বুঝি সব? এই না বলছিলি মনের ব্যথা কথায় বোঝানো যায় না। ওঁর মনের কথা ভাবে-ইঙ্গিতে বোঝা যায়।

নলিনী। তুই ওঁর ভাব-ইঙ্গিত সব বুঝে নিয়েছিস দেখছি! তা এতই যখন বুঝেছিস তখন তুই-ই সমরেশবাবুকে নে না।

কেয়া। মুখে বলছিস, কিন্তু আমি সমরেশবাবুর দিকে হাত বাড়ালে তুই কি আর রক্ষে রাখবি? হয়ত আমার গলা টিপেই শেষ করে দিবি।

নলিনী। কিছু করব না। তোৎলার আমার দরকার নেই।

কেয়া। ইঃ—দরকার নেই। কি বলব নলি, তুই আমার প্রাণের বন্ধু। আর সমরেশবাবুর ওপর আমার একটুও লোভ নেই—তা নইলে তোকে মজা টের পাইয়ে দিতুম।

নলিনী। তোর বুঝি সমরেশবাবুর ওপর লোভ নেই?

কেয়া। নাঃ—আমার এখন খালি টাকার লোভ। কি করে টাকা রোজগার করব সেই হয়েছে আমার ধ্যান-জ্ঞান।

নলিনী। টাকা রোজগার করে কি করবি?

কেয়া। মা বাবাকে সাহায্য করব। এখন বড় হয়েছি, মা বাবাকে সাহায্য করব না?

নলিনী। [একটু ইতস্ততঃ করিয়া] কেয়া, বাড়ীতে কি টাকার টানাটানি হয়েছে?

কেয়া। টানাটানি নয়। কিন্তু মা বাবা দুজনেরই বয়স হচ্ছে। বাবা হাসপাতালে ডাক্তারী করেন, মাকেও স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করতে হয়। আমি যদি মেয়ে না হয়ে ছেলে হতুম তাহলে ত এতদিনে সংসারের ভার আমাকেই নিতে হত! কিন্তু মেয়ে হয়ে জন্মেছি বলে কি কিছুই করব না? তাই ঠিক করেছি চাকরি নেব। তবু ত মা বিশ্রাম পাবেন।

নলিনী। কি চাকরি করবি?

কেয়া। তুই তো জানিস শর্টহ্যাণ্ড ও টাইপিংয়ের ট্রেনিং নিয়েছি। কোনও কোম্পানি বা অফিসে সেক্রেটারির কাজ স্বচ্ছন্দে করতে পারব।

নলিনী। কিন্তু চাকরি পাবি কোথায়? আজকাল পুরুষরাই চাকরি পাচ্ছে না।

কেয়া। সেই জন্যই ত রাতদিন কাগজে বিজ্ঞাপন দেখছি। এই ছাখ না, কালকেতুতে একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছে—একজন ডিটেকটিবের অফিসে টাইপিষ্ট চাই! ভাবছি কাল গিয়ে দেখা করব।

নলিনী। ডিটেকটিবের অফিসে চাকরি করবি?

কেয়া। তাতে কি হয়েছে! ডিটেকটিব কি আমায় খেয়ে ফেলবে?

নলিনী। না—তবে ডিটেকটিব শুনলেই কেমন গা শিরশির করে—

কেয়া। তোর সবতাতেই এই! সব জিনিষের খারাপ দিকটাই দেখতে পাস।—প্রেমে পড়েছিস তাও হা-হুতাশ করছিস!

নলিনী। কে প্রেমে পড়েছে?

কেয়া। তুই, আবার কে?

নলিনী। কেয়া, তুই হাসালি। তোৎলার সঙ্গে আমার প্রেম।

কেয়া। ন্যাকামি করিস নি নলি, এমন চুল ধরে টেনে দেব যে টের পাবি। নে, সমরেশবাবুর আসবার সময় হল, এবার একটা মিষ্টি দেখে গান ধর, তিনি যেন এসে শুনতে পান।

নলিনী। [উঠিয়া] আমি পারব না।

কেয়া। পারবি না? ও—লজ্জা করছে বুঝি! আচ্ছা, তোর হয়ে আমিই না হয় গেয়ে দিচ্ছি—

হারমোনিয়ামের সম্মুখে গিয়া বসিল; মৃদু স্পর্শে
চাবির উপর হাত চালাইয়া

কি গাইব? আচ্ছা একটা মিলন সঙ্গীত গাই—

বঁধুয়া মধু রাতে
এলে নন্দন-মধু হাতে।
চম্পকবন গন্ধে বন-বেতসী রন্ধ্রে
সুর কুহরে বাতে—মধু রাতে!
পরশে তব শিহরে তনু খানি
শিথিল বেণী সরমে অনুমানি
কণ্ঠে বিবশ বাণী
তন্দ্রা আঁখি পাতে।
—মধুরাতে।

গান শেষ হইবার পর সমরেশ প্রবেশ করিল

সমরেশ। ন্ ন্ ন্—নমস্কার!

কেয়া। আসুন সমরেশ বাবু। বসুন। ঐ চেয়ারটাতে বসুন না!

নলিনীর পাশের চেয়ার নির্দ্দেশ করিল

সমরেশ। হাঁ—এই যে (চেয়ারের প্রান্তে উপবেশন করিয়া গলা

খাঁকারি দিল) গ্ গান শুনতে পাচ্ছিলুম সিঁড়িতে উঠতে উঠতে, তাই ভ্ভাবলুম আপনারা এই খানেই আছেন! ন্ন্ন্নলিনী দেবী, আপনি গ্গাইছিলেন বুঝি ?

কেয়া। (তাড়াতাড়ি) হ্যাঁ—আমি বাজাচ্ছিলুম আর ও গাইছিল। কেমন শুনলেন ?

সমরেশ। চ্চ্চমৎকার! এমন গলা ক্কখনো শুনিনি।

কেয়া মুখে কাপড় দিল

নলিনী। (হঠাৎ উঠিয়া) আমি যাই—

কেয়া। (জনান্তিকে) খবরদার নলি, মেরে ফেলব একেবারে। এত হিংসুটে তুই! আমার প্রশংসাও সহ্য হয় না ? (নলিনী আবার বসিয়া পড়িল) সমরেশবাবু, আমরা শুনেছি আপনি খুব ভাল গাইতে জানেন একেবারে ওস্তাদি গান। আজ আপনার গান আমাদের শোনাতে হবে।

সমরেশ। (ভীতভাবে) আমি গ্গ্গান গাইব। তার চেয়ে আমার গলায় ছ্ছ্ছ্ছুরি দিন না।

কেয়া। সত্যি গাইতে জানেন না ?

সমরেশ। কখনো চেঃ চেঃ চেষ্টা করিনি। ক্কথা কওয়াটাই আমার পক্ষে এমন শ্শক্ত ব্যাপার যে—

হতাশ হস্ত সঞ্চালন

কেয়া। কেন, আপনি ত চমৎকার কথা বলেন!

সমরেশ। ব-বলি নাকি ? কৈ আ-আমি ত তা লক্ষ্য করিনি। নলিনী দেবী, আপনি ল-লক্ষ্য করেছেন ?

নলিনী নিরুত্তর

ঐ দেখুন, নলিনী দেবী ম্-মনের কথাটি পষ্ট করে ব্-বলতে পারছেন না।

কেয়া। [মুখ টিপিয়া হাসিয়া] নলিনী দেবী মনের কথা লুকিয়ে রাখতেই ভালবাসেন। তবে সময় উপস্থিত হলে সত্যি কথা আপনি বেরিয়ে পড়বে। সে যাক, আপনি যে আমাদের একদিন বেড়াতে নিয়ে যাবেন বলেছিলেন? তার কি হল, ভুলে গেলেন নাকি?

সমরেশ। ভ্-ভুলিনি। তবে উপযুক্ত স্-সাহসের অভাবে কথাটা পাড়তে পারছিলুম না। [সাগ্রহে নলিনীকে] য্-যাবেন আজকে? চ্-চ্-চলুন না।

নলিনী। কেয়া তুই যা, আমার আজ শরীরটা—

কেয়া। বা রে! উনি আমাকে নেমন্তন্ন পর্যান্ত করলেন না, আমি যাব, আর তোমাকে সাধাসাধি করছেন তুমি যাবে না? বেশ ব্যবস্থা ত!

সমরেশ। না না—আমি দু-দুজনকেই সাদরে আহ্বান করছি। ম-মানে—অর্থাৎ—আপনারা দুজনে না গেলে আমি ব্-বড়ই দুঃখিত হব।

কেয়া। নলিনী একলা গেলেও দুঃখিত হবেন?

সমরেশ। ম্-মানে [মাথা চুলকাইয়া] দু-দুঃখ একটু হবে বৈকি।

কেয়া। [হাসিয়া উঠিল] ওটা লোক-দেখানো দুঃখ। তাহলে নলি, যা শিগগির কাপড় পড়ে আয়।

নলিনী। [উদাসভাবে] অচ্ছা।

প্রস্থান

কেয়া। কোথায় যাওয়া হবে?

নলিনীর চেয়ারে বসিল

সমরেশ। যেখানে আপনারা ব্-বলবেন। -লেকের ধারে খ্-খানিক বেড়িয়ে তারপর সন্ধ্যের সময় সিনেমা দেখে—

কেয়া। না, সন্ধ্যের পর বাইরে থাকা মা-বাবা পছন্দ করেন না। সন্ধ্যের আগেই ফিরব।

সমরেশ। [কেয়ার দিকে ঝুঁকিয়া] দেখুন, ক্-কেয়া দেবী, আপনি বোধ হয় আমার ম্-মনের ভাব বুঝতে পেরেছেন—ম্-মানে নলিনী দেবীকে আমি—[গলা খাঁকারি দিয়া রক্তবর্ণ]—আপনার ক্-কাছ থেকে আমি কি কিছু সাহায্য প্-পেতে পারি না? অর্থাৎ আপনি যদি ম্-মাঝে মাঝে—

কেয়া। ঐ বোধ হয় মা আসছেন।—আপনার সঙ্গে এ বিষয়ে পরে কথা হবে—কি বলেন? আজই লেকের ধারে বেড়াতে বেড়াতে হয়ত সুযোগ হবে।

হিরণ্ময়ীর প্রবেশ

কেয়া। মা, সমরেশবাবু আমাকে আর নলিকে বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছেন।

সমরেশ। [নমস্কার করিয়া] এই সামান্য একটু এদিক ওদিক—

হিরণ্ময়ী। তা বেশ ত। [উপবেশন করিলেন] তোমার শরীর বেশ ভাল আছে বাবা?

সমরেশ। আজ্ঞে আমার শরীর ত বরাবরই ভ্-ভাল থাকে। এই সেদিন মুষ্টিযুদ্ধে একটা গ-গোরাকে কাৎ করেছি। কাজেই স্বাস্থ্য একরকম ভালই ব্-বলতে হবে।

হিরণ্ময়ী। কাজ কর্ম্ম বেশ ভাল চলছে?

সমরেশ। আজ্ঞে, একরকম মন্দ নয়। স্-সম্প্রতি একটা বড় কণ্ট্র্যাক্ট পাওয়া গেছে, তা থেকে কিছু ল্-লাভ থাকবে বলে মনে হয়।

হীরেন্দ্রবাবুর প্রবেশ

হীরেন্দ্র। এই যে সমরেশ। ভাল আছ ত ?

সমরেশ। আজ্ঞে হঁ্যা।

নমস্কার করিল

কেয়া। বাবা, আমরা ওঁর সঙ্গে বেড়াতে যাচ্চি।

হীরেন্দ্র। তা বেশ। সকাল সকাল ফিরো।

সমরেশ। আজ্ঞে হঁ্যা, স্-সন্ধ্যের আগেই আমি পৌঁছে দিয়ে যাব।

সাজসজ্জা করিয়া নলিনী প্রবেশ করিল। সাধারণ ভাবে কথা বার্ত্তা হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে কেয়া পাশের ঘরে গিয়া সাজ-পোষাক বদলাইয়া আসিল।

কেয়া। চলুন তাহলে, আর দেরী করে কাজ নেই।

জনান্তিকে

মা, তোমাদের চায়ের সব ব্যবস্থা করে রেখে গেলুম—জলও প্রায় গরম হয়ে গেছে। বাবাকে চা তৈরী করে দিও—বুঝলে ? লক্ষ্মীটি !

হিরণ্ময়ী। [সস্নেহে] আচ্ছা গিন্নী ঠাকুরুণ, সেজন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না।—যাও, বেড়িয়ে এস।

কেয়া। [পিতাকে চুপি চুপি] বাবা, তোমার জন্যে একরকম নতুন খাবার তৈরী করে রেখেছি—মার কাছে চেয়ে নিও।

হীরেন্দ্র। [সহাস্যে] আচ্ছা। তোমরা চা খেলে না ?

কেয়া। আমরা ফিরে এসে খাব।

কেয়া, নলিনী ও সমরেশের প্রস্থান

হীরেন্দ্র। [উৎকণ্ঠিত ভাবে] হঁ্যাগা, সমরেশ-ছোকরা কি কেয়ার জন্যে— ?

হিরণ্ময়ী। না—নলিনী।

হীরেন্দ্র। [দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া] ও—যাক। আমার ভয় হয়েছিল।

হিরণ্ময়ী। না—কেয়ার এখনও ওদিকে মন যায়নি।

হীরেন্দ্র। [মুখ আবার মেঘাচ্ছন্ন হইল] কিন্তু একদিন ত ওর মন ওদিকে যাবে। একদিন হঠাৎ এক ছোকরা এসে ওকে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। তখন আমরা কি করব?

দুজনে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন

দ্বিতীয় দৃশ্য

কলিকাতায় অনন্তের অফিস—'অনন্ত দুর্দ্দশালয়'। আধুনিক নূতন আসবাব দ্বারা সজ্জিত। দুটি কৌচও আছে। ঘরের এক পাশে ছোট টেবিলে টাইপ-রাইটার। মধ্য-স্থলে বড় সেক্রেটেরিয়েট টেবিলের সম্মুখে অনন্ত আসীন। পাশে বলাই দাঁড়াইয়া আছে। সময় অপরাহ্ন।

অনন্ত। দেখ বলাই, ছদ্মবেশ না করলে ডিটেকটিব হওয়াই বৃথা।

বলাই। আজ্ঞে ঠিক কথা। এমনিতে আপনাকে ডিটেকটিব বলে মনেই হচ্ছে না। কেবলি সন্দেহ হচ্ছে আপনি জমিদার অনন্তবাবু।

অনন্ত। এ কথাটা অ্যাদ্দিন আমার মাথায় আসেনি, তাই ত মহামায়াকে খুঁজে বার করতে পারছি না। আজ সকালে হঠাৎ মাথায় খেলে গেল—ছদ্মবেশ ছাড়া যে ডিটেকটিব হওয়াই যায় না। দুনিয়ায় যত বড় বড় ডিটেকটিব জন্মেছে, তারা হরদম ছদ্মবেশ পরে বসে আছে।

বলাই। আজ্ঞে সে ত বটেই। আমি শুনেছি, ভাল ভাল দিগ্‌গজ ডিটেকটিবরা বোঁ বোঁ শব্দে ছদ্মবেশ পরেই ভূমিষ্ঠ হয়।

অনন্ত। তা ঠিক বলতে পারি না। যা হোক, যেই কথাটা মনে আসা, সঙ্গে সঙ্গে একসেট ছদ্মবেশ আনিয়ে নিয়েছি। এতদিনে আমার ডিটেকটিব সাজবার সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হল।

বলাই। আজ্ঞে তবে আর কি? এইবার ঐ জমিদারবাবুর মেয়ে মহামায়াকে বোঁ বোঁ শব্দে খুঁজে বার করে ফেলুন।

অনন্ত। নিশ্চয়। মহামায়া ত মহামায়া, ছদ্মবেশের জোরে বড় বড় চোর ডাকাতকে খুঁজে বার করা যায়।

দেরাজ হইতে একটা মোড়ক বাহির করিয়া

এই হচ্ছে আমার ব্রহ্মাস্ত্র। ছদ্মবেশ করতে হলে কি করতে হয় জানো?

বলাই। আজ্ঞে জানি বৈ কি। মুখে কালি-ঝুলি মাখতে হয়,—বহুরূপীরা ত তাই করে।

অনন্ত। বলাই, তুমি একেবারে আহাম্মক—ঠিক ডাঃ ওয়টসনের মত; কালি-ঝুলি কিছুই মাখতে হয় না,—চাই শুধু একজোড়া ইয়া বড় গোঁফ, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া ভুরু, আর নীল চশমা।

বলাই। আজ্ঞে, শুধু গোঁফ আর ভুরু?

অনন্ত। স্রেফ গোঁফ আর ভুরু—আর নীল চশমা। চেহার একেবারে বদলে যাবে। এই দ্যাখ—

ছদ্মবেশ পরিধান

দেখছ? চেহারা বদলে গেছে কি না?

বলাই। [মহাবিস্ময়ে] আজ্ঞে আপনাকে বোঁ বোঁ শব্দে ঠিক বুড়ো কর্ত্তাবাবুর মত দেখাচ্ছে। তাঁরও অমনি গোঁফ আর ভুরু ছিল।

অনন্ত। [হৃষ্টভাবে] কেমন—বেশ ভারিক্বি গোছের দেখাচ্ছে ত?

বলাই। আজ্ঞে বোঁ বোঁ শব্দে তিরিশ বছর বয়স বেড়ে গেছে!

অনন্ত। বাস্—আজ এই বেশেই মহামায়াকে অনুসন্ধান করতে বেরুব, আজ আর তাকে না ধরে ছাড়ছি না। বলাই, মোটর বার কর।

বলাই। আজ্ঞে, আজ কোন দিকে বোঁ বোঁ শব্দে অনুসন্ধান করতে যাওয়া হবে?

অনন্ত। [চিন্তা করিয়া] লেকের ধারে যাব। দুর্গাপ্রতিমার মত মেয়ে, পায়ে আলতার মত লাল জড়ুল, আঠারো বছর বয়স,—যদি কোথাও পাওয়া যায় ত লেকের ধারে। ও ইডেন গার্ডেন-ফার্ডেন সব বাজে—মিছে কদিন ঘুরে বেড়ালুম। ওদিকে দুর্গা-প্রতিমার মত মেয়ে একটাও নেই।

বলাই। আজ্ঞে দুর্গাপ্রতিমার মত মেয়ে ইডেন গার্ডেনে যেতেই পারে না।

অনন্ত। ব্যস, তাহলে মোটর বার কর। চারটে বাজে—এই উপযুক্ত সময়।

বলাই। আজ্ঞে।

প্রস্থান

অনন্ত। [পাইপ ভরিতে ভরিতে চারিদিকে তাকাইয়া] অফিস ঘরটি দিব্যি হয়েছে। দোতলার ওপর ঘর, চারদিক খোলা, বাইরে প্রকাণ্ড সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দিয়েছি—'অনন্ত-দুর্দ্দশালয়'। চমৎকার হয়েছে। শার্লক হোম্স এসব দেখলে হিংসে হত। মক্কেল যদিও এখনো একটিও আসেনি কিন্তু এবার আসতে আরম্ভ করলে-বলে। তখন যত জটিল রহস্য আছে সব একেবারে হুড়োহুড়ি

লাগিয়ে দেবে। টাইপিষ্ট সেক্রেটারির জন্যে বিজ্ঞাপন ত দিয়েছি; কাল সকালে তারা আসবে ইন্টারভিউ করতে। বেশ একটি আধবয়সী মোটাসোটা ইউরেশিয়ান স্ত্রীলোক দেখে রাখা যাবে। ছুঁড়ি চলবে না, তাদের খালি ইয়ার্কি দেবার ফন্দি। [নীচে মোটর-হর্ণ বাজিল] ও সব এখানে চলবে না। এখানে স্রেফ গম্ভীর ব্যাপার—প্রাণ নিয়ে টানাটানি—খুন জখম—

পাইপ ধরাইয়া প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

লেকের এক অংশ। সমরেশ ও কেয়া পাশাপাশি বেড়াইতেছে।

কেয়া। নলি কোথায় গেল?

সমরেশ। তিনি ঐ গ্‌গাছের নীচে বেঞ্চিতে বসেছেন। ম্‌-মিস কেয়া, এই অবকাশে আমার ব্‌ব্‌বক্তব্যটা বলে নিই। দেখুন, আমার অবস্থা বড়ই কৃকাহিল হয়ে পড়েছে, নলিনী দেবী ছাড়া আর কিছু ভ্‌ভাবতেই পারি না। রাত্রে ঘ্‌ঘুম নেই সারারাত প্যাট্‌ প্যাট্‌ করে চেয়ে থাকি। অথচ তিনি আমার কথা একেব্বারেই ভাবেন না। অর্থাৎ আমাকে ব্‌বোধ হয় তিমি ঘ্‌ঘৃণা করেন। আপনি আমাকে ঘ্‌ঘৃণা করেন না, কিন্তু তিনি—

কেয়া। নলিনী আপনাকে ঘৃণা করে এটা কি করে বুঝলেন?

সমরেশ। ম্‌মানে আমাকে দেখলেই তিনি মুখের ভাব এমন উউদাস করে ফেলেন, এত কৃকম কথা কন্‌ যে—

কেয়া। [সহাস্যে] ও দেখে ভয় পাবেন না। নলির ঐ স্বভাব; ও যে জিনিসটি চায় তার প্রতি এমন ভাব দেখায় যেন সেটা ওর দু'চক্ষের বিষ।

সমরেশ। ত্‌-তাই নাকি? ত্‌-তাহলে কি আমার প্রতি উনি—

কেয়া। মোটেই বিরূপ নন। কিন্তু আপনারও উচিত মনের ভাব আরো স্পষ্ট করে জানানো।

সমরেশ। [হতাশভাবে] ক্‌কি করব মিস্ কেয়া, আমার বাক্-যন্ত্রটা এমন বেয়াড়া যে য্‌যতই প্রাণে আবেগ উপস্থিত হয়, ক্‌কথা ততই বে-এক্তিয়ার হয়ে পড়ে।

কেয়া। বাক্-যন্ত্র ছাড়া পুরুষের অনুরাগ জানাবার আর কি কোনো রাস্তা জানা নেই?

সমরেশ। আর কি করব বলুন?

কেয়া। ওকে বিপদ থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করুন; সেকালে নাইটরা কি করত? সমরেশবাবু, আপনি এত বুদ্ধিমান, এত বড় ইঞ্জিনীয়ার আর এই সামান্য বিঘ্ন উত্তীর্ণ হতে পারছেন না?

সমরেশ। আপনার কাছে যেটা স্‌সামান্য বোধ হচ্ছে—সেটা আমার কাছে যে ব্যা-ব্যাবিলনের হ্যা-হ্যাঙ্গিং গার্ডেন তৈরী করার চেয়েও শক্ত। ঐ যে বিপদ থেকে উদ্ধারের কথা বললেন, বিপদ কোথায় যে উদ্ধার করব? একটা স্‌সুবিধে মত বিপদও যদি ঘটত, কিন্তু কলকাতা শহরে হঠাৎ বিপদই বা পাওয়া যায় কোথায়?

কথা কহিতে কহিতে দুজনে অদৃশ্য হইল

পট পরিবর্তন

লেকের অন্য অংশ। রাস্তার ধারে অনন্তর মোটর দাঁড়াইয়া আছে।
ছদ্মবেশী অনন্ত গাড়ী হইতে নামিতেছে।

অনন্ত। বলাই, তুমি গাড়ীতে বসে থাক, আমি এখন অন্বেষণে বেরুলুম।

বলাই। যে আজ্ঞে।

অনন্ত। আর দ্যাখ, তুমিও রাস্তার দিকে নজর রেখো, দুর্গাপ্রতিমার মত কেউ যায় কিনা লক্ষ্য করো।

বলাই। যে আজ্ঞে।

অনন্ত। আঠারো বছর বয়স হওয়া চাই মনে থাকে যেন।

বলাই। আজ্ঞে যদি বোঁ বোঁ শব্দে উনিশ বছর বয়স হয়?

অনন্ত। তাহলে লক্ষ্য করবার দরকার নেই।

প্রস্থান

পট পরিবর্ত্তন

লেকের অন্য অংশ। নির্জ্জন বৃক্ষতলে নলিনী একাকিনী
বেঞ্চিতে বসিয়া আছে।

নলিনী। দু'জনে কথা কইতে কইতে চলে গেল। আমি যে এখানে বসেছি তা লক্ষ্যই করলে না। [দীর্ঘনিশ্বাস] আমার না এলেই ভাল হত। —একা—একা—পৃথিবীতে আপনার বলতে কেউ নেই। আত্মীয় বন্ধু নেই। বন্ধুত্ব—সে ত ছলনা। ভালবাসা—সে ত প্রতারণা! [পিছনে অনন্তের আবির্ভাব] এ পৃথিবী একটা প্রাণহীন মরুভূমি! বাপ নেই—মা নেই—

অনন্ত। সব আছে।

অনন্ত বেঞ্চিতে আসিয়া বসিল। নলিনী চমকিত ভাবে একবার
তাকাইয়া একটু দূরে সরিয়া বসিল)

অনন্ত। বাপ মা সব আছে—শুধু কোথায় আছে জানেন না। সে খবর আমি দিতে পারি।

নিজ বক্ষে টোকা মারিল

নলিনী। (শঙ্কিতভাবে) কে আপনি ? কি চান ?

অনন্ত। কিছু চাই না। আপনি কে, আমি জানি। আপনার নাম মহামায়া।

নলিনী। আমার নাম মহামায়া নয় আপনি ভুল করেছেন।

অনন্ত। ভুল ! [হাস্য] ভুল আমি করি না। আপনার বয়স আঠারো বছর কিনা ?

নলিনী ব্যাকুলভাবে চারিদিকে তাকাইল

অনন্ত। ভুল হবার জো নেই একেবারে ঠিক ধরেছি।—এখন আপনার বাঁ পায়ের জুতো খুলুন ত দেখি।

নলিনী। [দাঁড়াইয়া উঠিয়া ভয়ার্ত্তস্বরে] অ্যাঁ !—সমরেশ বাবু ! কোথায় গেলেন—সমরেশ বাবু।

সমরেশ। [দূর হইতে] যাচ্ছি।

অনন্ত। তাইত। গোলমাল ঠেকছে। পুলিস ডাকবে নাকি ?

ছুটিতে ছুটিতে সমরেশ ও কেয়ার প্রবেশ।

সমরেশ। কি কি হয়েছে ?

নলিনী। [সমরেশের হাত চাপিয়া ধরিয়া] ঐ লোকটা আমাকে জুতো খুলতে বলছে।

সমরেশ। [মুষ্টি পাকাইয়া সগর্জ্জনে] কী—[অনন্ত পলায়ন করিল] আজ ব্যাটাকে খুনই করব।

পশ্চাদ্ধাবন

নলিনী। সমরেশবাবু যে চলে গেলেন, কেয়া

কেয়া। চল্ আমরাও ওঁর পেছনে পেছনে যাই।

উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়া দৌড়াইতে আরম্ভ করিল

পট পরিবর্ত্তন

অনন্তের মোটর। ফুটবোর্ডে বলাই বসিয়া আছে।

বলাই। আঠারো বছরের দুর্গাপ্রতিমা ত এ অঞ্চলে একটিও নেই দেখছি। পঞ্চান্ন বছরের একখানি রক্ষেকালীর প্রতিমা একবার গেলেন, তারপর থেকে বোঁ বোঁ শব্দে বসেই আছি।

দৌড়াইতে দৌড়াইতে অনন্তের প্রবেশ

অনন্ত। বলাই শিগ্‌গির গাড়ী ষ্টার্ট দাও—তাড়া করেছে।

বলাই। কে, দুর্গা প্রতিমা?

অনন্ত। শুধু দুর্গাপ্রতিমা নয়, সঙ্গে প্রকাণ্ড এক মহাদেব আছেন, গদার মত দুই বাহু ঘোরাতে ঘোরাতে ছুটে আসছেন।

বলাই। তাইত। তাহলে বোঁ বোঁ শব্দে—

মোটরের হ্যাণ্ডেল ঘুরাইয়া ষ্টার্ট দিবার চেষ্টা করিল,
কিন্তু গাড়ী ষ্টার্ট লইল না

অনন্ত। ঐ রে, মহাদেব এসে পড়ল! আজ দক্ষযজ্ঞ বাধালে দেখছি। নাঃ, বিনা রণে আর নিস্তার নেই।

বলাই। হুজুর, আমার মাথায় এক বুদ্ধি এসেছে।

অনন্ত। কি বুদ্ধি চট্‌পট্ বল মহাদেব এসে পড়ল।

বলাই। গোঁফ ভুরু আমায় দিন, তাহলে আর বোঁ বোঁ শব্দে আপনাকে চিনতে পারবে না!

অনন্ত। ঠিক বলেছ।

গোঁফ ভুরু খুলিয়া বলাইকে দিল বলাই উহা পরিধান করিল।

বেগে সমরেশ প্রবেশ করিল, পশ্চাতে নলিনী ও কেয়া

সমরেশ। ক্‌কোনদিকে গেল দেখেছেন ?

অনন্ত। কি হয়েছে মশায় ?

সমরেশ। একটা লোক লম্বা গোঁফ, চোখে নীল চশমা, এদিক দিয়ে য্‌যেতে দেখেছেন ?

অনন্ত। কৈ, না, এদিকে ত সেই রকম কেউ আসে নি।

সমরেশ। ত্‌তবে গেল কোথায় ?

অনন্ত। তা ত বলতে পারি না। আপনার সঙ্গে মেয়েরা রয়েছেন দেখছি, কোন বিপদ হয় নি ত ?

সমরেশ। ব্‌বিপদ হয়নি কিন্তু শিগ্‌গির হবে—সেই লোকটার।

চারিদিকে পরিক্রমণ করিতে লাগিল

নলিনী। [কেয়াকে] ছাখ ভাই, ওই লোকটার গোঁফ ঠিক সেই রকম। [বলাইকে নির্দ্দেশ]

অনন্ত। [নিকটে গিয়া নমস্কার পূর্ব্বক] অপরাধ নেবেন না। কিন্তু আপনারা কি আমার শোফারকে সন্দেহ করছেন ?

কেয়া। ইনি বলছেন যে ওর গোঁফ ঠিক সেই রকম।

অনন্ত। [বলাইকে ডাকিয়া] বলাই, তোমার গোঁফ সেই রকম কেন ?

বলাই। আজ্ঞে বোঁ বোঁ শব্দে—আমার গোঁফ কি রকম ?

অনন্ত। [ধমক দিয়া] যে রকমই হোক, তোমার গোঁফ দেখে এদের সন্দেহ হয়েছে।

বলাই। আজ্ঞে, সন্দেহের কোনও কাজই ত বোঁ বোঁ শব্দে আমার গোঁফ করে নি।

অনন্ত। না করুক, কিন্তু দুটি ভদ্রমহিলার যখন সন্দেহ হয়েছে তখন ও গোঁফ আর রাখা চলবে না। আমি গিয়ে কামিয়ে ফেলবে।

বলাই। যে আজ্ঞে—

কেয়া ও নলিনীর সকৌতুক হাস্য

সমরেশ। [ফিরিয়া আসিয়া] ন্‌নাঃ—পালিয়েছে। কিন্তু পালিয়ে য্‌যাবে কোথায়! যেখানে পাই খ্‌খুঁজে বার করব। তারপর—চলুন। [অনন্তকে] আপনি ত্‌তাহলে দেখেন নি?

অনন্ত। না।

সমরেশ। ন্‌নমস্কার।

কেয়া ও নলিনীকে লইয়া প্রস্থান

অনন্ত সেইদিকে তাকাইয় দাঁড়াইয়া রহিল।

যবনিকা

পথ

কবিতা লিখিতে হয়
সে সময়
যে সময়ে সময় অচল!
ঘুমের অঞ্চল দিয়ে টান,
অথবা নিদ্রার ভান,
কিম্বা অন্য কোন আবরণে;
পরস্পর প্রতারণা করে সর্ব্বজনে,
যে সময়ে;
সে সময়ে

কবির লেখনী অস্ত্র
ফেলি ভব্যতার বস্ত্র
প্রসব-বেদনা আর্ত্তনাদে
কত ছন্দে কাঁদে !
তখন আকাশে চাঁদ
ফেলি জোছনার ফাঁদ
তারকা ধরিবে আশে ঘোরে ;
ঘটি নিয়ে যায় চোরে
পাশের ঘরেতে
আরশুলা বাঁধে বাসা দুধের সরেতে ;
আরও কত কারা
হয়ে আত্মহারা
এদিকে ওদিকে যায় নিঃশব্দে গোপনে ;
প্রতি ক্ষণে
জন্ম, মৃত্যু, প্রেম, অভিসার ;
যে যাহার
কার্য্যে ব্যস্ত,
কবি হস্তে আছে ন্যস্ত
অক্লান্ত লেখনী—
কল্পনার খনি—।
অনন্তে ভূতের নৃত্য
ওদিকে জাগে ভূত।—
ইসারায় দিশা হারা
এই ত প্রেমের ধারা !

বলিবার নাই কিছু শাস্ত্রগত বাণী ;
সবই জানি
কিছু বলিব না ;
শুধু চলিব না
কল্পনার পথ-ছাড়া অন্য পথে ;
চড়িয়া পুষ্পক রথে
খরচ-বর্জ্জিত সুখে
উর্ব্বশীর মুখে
চুম্বন আঁকিয়া
অমৃতের ভাণ্ড হতে কিঞ্চিৎ চাখিয়া,
গোপনে নিভৃতে
বিনা feeতে
এ সকল সুখ অনাবিল ;
তথা বিনা bill
আসে শুধু গৃহস্ত জীবনে,
কাব্যের কদম্ব বনে
লেখনীর বাঁশরী বাজায়ে
কাব্য-কলা-বৌটিকে শ্রীরাধা সাজায়ে।
বিগতযৌবন কবি
দেখে যৌবনের ছবি
নিজ লেখনীতে,
কবিতার মাদক ধ্বনিতে
যত অবেড়ান দেশ
ভুলিয়া গমন-ক্লেশ

ঘুরে আসে ;
উঠানের ঘাসে
ফুটে উঠে বসোরা গোলাপ।
হয়ত জোলাপ
পরে প্রয়োজন হবে।
কিন্তু এই ভবে
সে ভয়েতে ভীত হ'লে, হায়,
বেঁচে থাকা দায়।
সুতরাং
মদ্য, কি গঞ্জিকা, কিম্বা ভাঙ্গ
না ধরিলে আর
চলে না সংসার।
কিন্তু তাহে হয় খর্চ্চা
সে হেতু কবিতা চর্চ্চা
সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ ঔষধ
বাস্তবের অত্যাচার রদ
কবিতার তরে।
স্তরে স্তরে
কল্পনা করিয়া খাড়া
Fact এর বিষ দাঁড়া
ভাঙিয়া, যদি না
যেতে পারি ইস্পাহান, প্যারী, রোম অথবা মদিনা,
তবে এ বাঙালী নাম
কি এর রহিল দাম

মন্দা এ বাজারে ?
হাজারে হাজারে
ইন্দ্র, চন্দ্র, ভীমার্জ্জুন, কুবের, মদন
গোপিনীর বস্ত্রহারী শ্রীমধুসূদন,
আণ্টনি কি বোনাপার্ট,
রিচার্ড দি লায়ন হার্ট,
কিম্বা কাসানোভা ডন্ জুয়ান
কাব্যক্ষেত্রে পায় প্রাণ।
শুধু যদি আমি থাকি বাকি,
গোল পী জীবন হবে খাকি,
মালঞ্চে ফুটিবে শুধু কাঁটা,
দণ্ডক-অরণ্যে রবে পাঁঠা,
স্বর্ণ মৃগ স্থলে !
ছলে বলে অথবা কৌশলে
এ crisis পার হতে হবে ;
Help কর, হে পাঠক সবে,
ছন্দে যাহা কব
আমি তাই হব ;
আশীর্ব্বাদ কর ভাই
করিব আমিও তাই
তোমার বেলায়
নয়া বাংলায়।

শ্রীমধুকরকুমার কাঞ্জিলাল

"কামার্ত্তা হি প্রকৃতি-কৃপণা—"

পাশের বাড়ীর ওরা অতি চমৎকার লোক। কেন চমৎকার? কেন নয়, তাই জিজ্ঞাসা করি। জীবের মধ্যে সেরা মানুষ, মানুষের মধ্যে সেরা বণিক। কেমন? আর বাণিজ্যের সেরা কি? প্রকারান্তরে কথাটির জবাব দিতেছি। আমি বলি, যাহাকে এ দেশের মেয়েরা স্বামীর চেয়ে প্রিয় মনে করে—তাহার বাণিজ্যই শ্রেষ্ঠ। এ দেশের বলিলাম, কারণ দেশান্তরে এক-জাতীয় কুকুরের কথা উঠিতে পারে। মোটের উপর, উহারা বণিক-শ্রেষ্ঠ, এবং লোকও অতি চমৎকার,—অন্ততঃ সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই!

সেদিন ওবাড়ীর বারান্দায় উহাদের বিধবা বধূটি ঝাঁট দিতেছিল, আমি দেখিতেছিলাম, এবং ভাবিতেছিলাম, অন্য আর কিছু নয়, শুধু এই কথাটি যে উহারা অতি চমৎকার।

"হ্যাগা, জানালার বাইরে হাঁ করে তাকিয়ে কি দেখছ?"

কি আশ্চর্য! এইমাত্র উনি ত রান্নাঘরে ছিলেন, এরই মধ্যে এখানে কিরূপে! নাঃ, জীবন একটা ভ্রাজারি! আমতা আমতা করিয়া বলিলাম, "ওবাড়ীর ছাদে কি সুন্দর একটা মাছরাঙ্গা পাখী বসেছে দেখ!"

উনি মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন, "আহা ওটা বুঝি মাছরাঙ্গা! ওতো কাকাতুয়া।"

"অ্যাঁ, কাকাতুয়া! কিন্তু কি সুন্দর দেখ!"

"ছাই সুন্দর। কাকাতুয়া যেন কখনো দেখ'নি আর কি।"

কিন্তু ততক্ষণে সে চলিয়া গিয়াছে,—কাকাতুয়া নয়, সে সমস্তদিন ওখানে থাকে এবং মোষের গাড়ীর শব্দ অনুকরণ করিয়া ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ করিতে থাকে। কিন্তু সে আর ও বারান্দায় নাই। হয়ত আরও কিছুক্ষণ থাকিত, আরও কয়েক পাল্টা ঝাঁট দিত, আর তাহার ঝাঁটার আঘাতে আমার মনের অশোক-কুঞ্জ—

"বলি আজ কি নাইতে খেতে হবে না? না, সারাদিন হাঁ করে পাখীই দেখবে?"

"না, এইবার যাই আর কি।"

"আর দেখ, ওবাড়ীর কর্ত্তাকে ডেকে একবার বলে দিয়ো ত, ওদের মেয়েগুলো বড্ড বেহায়া, আমার রান্নাঘরের পাশেই যত জঞ্জাল ফেলবে! এরকম করলে ত আর পেরে ওঠা যায় না।"

শুষ্ক-কণ্ঠে কহিলাম, "হুঁ, বলে দেব।"

* * *

কিন্তু বলা আর হয় নাই, কাজেই জঞ্জালের স্তূপ ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছে। কি করিয়া বলি? যাহার বাঁচিবার সাধ আছে সে কি আত্মহত্যা করিতে চায়? ফলতঃ, এ পক্ষের তর্জ্জনগর্জ্জন যতই বাড়িতে লাগিল, ও পক্ষের ঝাটার ধূলায় আমার বাসনার বীজ আকাশে-বাতাসে ততই উড়িতে লাগিল। জানিতাম, ইহা বৃথা। বিবাহিত জীবন, বৈধব্য, জাতিভেদ, তাহাদের বারান্দা ও আমাদের জানালা এবং তন্মধ্যবর্ত্তী স্পর্শহীন আকাশ—এতগুলি দুর্গম গিরিসঙ্কট অতিক্রম করিয়া হয়তো কখনও আমাদের মিলন সম্ভব হইবে না, কিন্তু মন কোন যুক্তি মানিত না। মাঝে যেন একগাছা অন্তহীন দড়ি—তাহার একপ্রান্তে আমি, অন্যপ্রান্তে সে। আমি নিরন্তর টান দিতেছি, কিন্তু পথের দূরত্ব সম্পূর্ণ টেনশনটি ঢিলা করিয়া দিতেছে। এপারের আহ্বান ওপারে

পৌঁছিতেছে না। পথের অপর পার্শ্বে একটি বিড়িওয়ালা বরং সুখে আছে, তাহার অনেকটা সুবিধা। স্পষ্ট ঘরের মধ্যে তাহাকে সমস্ত দিন দেখিতে পায় এবং দেখেও। এপাশের বারান্দার প্রান্তভাগ ব্যতীত আমার কিন্তু কোন উপায় নাই, এবং কালেভদ্রে তাহার অপাঙ্গ-দৃষ্টির একটুখানি অস্পষ্ট সঙ্কেত,—অনিশ্চিত, জটিল এবং জলভারাক্রান্ত মেঘের প্রান্তে বিদ্যুৎস্ফুরণের মত অস্থির কিন্তু অগ্নিশ্রাবী!

সেদিন ফাল্গুনের শুক্লা দ্বাদশীর রাত্রি। প্রেয়সীর নাসিকার শব্দে হঠাৎ শেষরাত্রে ঘুম ভাঙিয়া গেল। প্রায়ই যায়, তবে অন্যান্য দিন কানে হাত-চাপা দিয়া পড়িয়া থাকি। সেদিন উঠিয়া জানালার ধারে আসিলাম। ও বাড়ীর ছাদের কিনারায় চাঁদ ঢলিয়া পড়িতেছে। ঠিক তাহারই পিছনে একখণ্ড সাদা মেঘ, নিস্পন্দ, নিশ্চল,—চাঁদ যেন তাহার রূপালি আলোকের উত্তরীয়খানি অলসভাবে মেলিয়া ধরিয়াছে। অদূরে কোন এক বৃক্ষশাখায় একটা ঘুমন্ত কোকিল ধরা-গলায় গুমরিয়া মরিতেছে। এক ঝলক দক্ষিণের বাতাস আমার চোখেমুখে লাগিল—রূপসী তরুণীর উষ্ণ নিশ্বাসের মত, (কিন্তু নিজের স্ত্রী হইলে কল্পনাটিই মাটি। কাজ কি? উপমাটি পরিবর্ত্তন করিয়া দিতেছি, যথা—) ভূরিভোজনান্তে অবসন্ন রসনায় চাটনির সোহাগের মত। মনের পর্দ্দা সহসা উড়িয়া গেল, চাহিয়া দেখি হুবহু পারস্যের গোলাপকানন,—গন্ধ ও রূপের ঢেউ খেলিয়া যাইতেছে! কিন্নরলোকের অশ্রুত সঙ্গীত বাজিতেছে, চিরযৌবনের ঝর্ণা অক্ষয় আনন্দের সহস্র ধারায় ঝরিয়া পড়িতেছে! আর সর্ব্বেন্দ্রিয় যেন এই ফাল্গুনের বাতাসে আমার দেহ-ঐরাবতের গলায় পারিজাতের মালার মত দুলিয়া উঠিতেছে!

শুধু যদি এই সময়টিতে সে একবার ও বাড়ীর বারান্দায় ঝাঁটা হাতে করিয়া দাঁড়াইত! আমি দেখিতাম, দেখিয়া মজিতাম, এবং স্পষ্ট

সে কথা তাহাকে বলিতাম। এমন রাত্রে কি না বলিয়া থাকা যায়? আপনারাই বলুন না!

কিন্তু ওকি? সত্যই ও বাড়ীর বারান্দায় দাড়াইয়া কে ও? সে-ই নয়? আমি এই কালি-কলম স্পর্শ করিয়া বলিতেছি নিশ্চয় ও সেই!: সেই তপ্তকাঞ্চন বর্ণাভা, সেই আয়ত চক্ষের ব্যথাতুর দৃষ্টি, সেই নিতম্ব-লম্বী কেশপাশ! হে আমার বসন্ত ঋতু, জীবন-সর্ব্বস্ব, প্রাণাধিক! নিশ্চয় তোমার যাদু-দণ্ড তাহার ঘুমের মাঝে স্পর্শ করাইয়াছিলে, নচেৎ, রাত্রির এই চতুর্থ প্রহরে সে এমন করিয়া আমার নির্ব্বাক প্রেমের নিঃশব্দ প্রতিদান দিবার জন্য বারান্দার বক্ষে তাহার রক্ত-কমল পা দু'খানি রাখিয়া দাঁড়াইত না! কিন্তু এ সুসময় বহিয়া যাইতে দিলে চিরজীবন হাহাকার করিয়া মরিতে হইবে। আজ মনের কথা তাহাকে খুলিয়া বলিবই, ফলাফল যাহাই হউক, গ্রাহ্য করিব না। না, না, ফাল্গুনের এ আহ্বান মিথ্যা হইতে পারে না! বার দুই গলাটা ঝাড়িয়া লইয়া সুরু করিলাম—

"আহা, কি সুন্দর রাত্রি!"

কোন উত্তর নাই!

পুনরায়—"আহা, কি চমৎকার বাতাস!"

তথাপি নিরুত্তর। কানে খাটো নাকি? হইতেও পারে,—যাই হোক, এইবার একটু চেঁচাইয়া বলাই ভাল। কিন্তু ও যেন এইবার বারান্দার প্রান্তে সরিয়া আসিল নয়? যেন নিবিষ্টভাবে আমাকেই দেখিতে লাগিল, যেন আরো কি বলিতে চাই তাহা শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব, উৎকর্ণ এবং উন্নেত্র হইয়া রহিল! আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম—তাহার চক্ষের রাগ অরুণ, তাহার নিশ্বাস দ্রুত, তাহার রক্তাধরে লজ্জা, হাসি ও ব্যাকুলতা! শুধু তাই নয়, ঐ যে বাসন্তী রঙের

ব্লাউজ সত্ত্বেও পূর্ণিমার জোয়ারের মত তাহার বক্ষ ফুলিয়া উঠিতেছে, এবং তাহারই তট-প্রান্তে কুঞ্চিত কালো কেশের রাশি সাগর-তরঙ্গের মত ভাঙিয়া পড়িয়াছে! আমি নিশ্চয়ই ঝাঁপ দিব, দিয়া মরিব, কোন কথা শুনিব না।

এইবার বলি তবে? না আর একটু দেরী করিব? শুভস্য শীঘ্রং,—বলিয়াই ফেলি, কি বলেন? তবে, কোন ভূমিকা নয়—একেবারে টু দি পয়েন্ট, কারণ বুকের রক্ত অনেকক্ষণ বয়েলিং পয়েন্ট অতিক্রম করিয়াছে। কিন্তু হৃদযন্ত্রটা এমন হাতুড়ি পিটিতেছে কেন? হাত-পা ঝিম ঝিম করিতেছে কেন? এখনই কি সরিষার ফুল জগৎ ছাইয়া ফেলিবে,—অথবা কেহ ধরিয়া শূলে চড়াইবে? ও না-হয় বড়-জোর বলিবে—"আমায় ক্ষমা করুন, আমি পারব না!" তাতে এমন ভয়ের কি আছে? হাজার হোক পুরুষ তো,—লজ্জা কিসের? না, না, কোন কথা নয়, এই—এক, দুই, তিন—

"ওগো, আমি, আমি যে পাগল হ'য়ে গেলাম তোমার জন্য—তা কি তুমি এখনও—"

বজ্রনির্ঘোষে উত্তর আসিল, "মশাই, কাকে কি কথা বলছেন!" সঙ্গে সঙ্গে বারান্দায় আলো জ্বলিয়া উঠিল—একি! মা ধরিত্রী! এ যে ও বাড়ীর কর্তা! কৃষ্ণকায়, পক্ক-গুম্ফ, বৃহন্নাসিক, ঘূর্ণিত-লোচন! চিকচিকে টাকের উপর বিদ্যুতের আলো কেরোসিন তৈলের মত গড়াইয়া পড়িতেছে!

"এত রাত্রে এ বাড়ীর কাকে লক্ষ্য করে এ সব কথা বলছেন মশাই? আপনি না ভদ্রলোক, ছিছি, আপনার এই ব্যাভার!"

মানুষের বিপদ কখনো একাকী আসে না। পৃষ্ঠে উষ্ণ নিশ্বাস লাগিল, প্রেয়সীও উঠিয়া পড়িয়াছেন, শঙ্কিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"হ্যাগা, এত রাত্রে কার সঙ্গে ঝগড়া করছ ?"

মুহূর্ত্তকাল মাত্র। ধন্য উপস্থিত-বুদ্ধি, আসন্ন সময়ে তুমি আমাকে রক্ষা করিতে পার আর নাই পার, তোমার স্খলিত অস্ত্রখানা একবার ধরিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিও।

কড়া করিয়া বলিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কণ্ঠে রোদনের আভাস ফুটিয়া উঠিল—"হ্যাঁ মশাই, আপনাদেরই খুব ভদ্রতা! রোজ রোজ বাড়ীর পাশে জঞ্জাল ফেলে এমন করেছেন যে—দুর্গন্ধে ঘরে টেকাই দায় হয়েছে,—আর সে কথা বলতে গেলেই আমি অভদ্র, নয়!"

"চুপ রও উল্লু কাঁহাকা! ওঃ, অভদ্র বলাটা ভারী অন্যায় হয়েছে! পাজী, বদমায়েস, বেহায়া, লম্পট, শূয়ার—"

"খবরদার মশাই, মুখ সামলে কথা বলবেন, নইলে—"

"নইলে কি ? আমাকে মারবে ? এস না একবার দেখি, জুতো-জোড়াটা খুলেই রেখেছি—"

"কি! এত বড় স্পর্দ্ধা।"

কিন্তু আর বলা হইল না, ইনি আমাকে টানিয়া লইয়া সশব্দে জানালা বন্ধ করিয়া দিলেন। কিন্তু জানালা-পারের গালাগালির সাপটে আমার জানালা, দরজা, চৌকাঠ, ঘরবাড়ী এবং আসবাবপত্রসহ স্বয়ং আমি প্রবলবেগে কাঁপিতে লাগিলাম। উনি মনে করিলেন—আমি ক্রোধে কাঁপিতেছি। বলিলেন, "কি হবে ছোটলোকের সঙ্গে ঝগড়া করে, সকালবেলাই একখানা দরখাস্ত পাঠিয়ে দিয়ো না, আপনিই শায়েস্তা হ'য়ে যাবে।"

পুনরায় রক্ত গরম হইয়া উঠিল, কহিলাম, "নাঃ, তুমি আমায় ছেড়ে দাও, আমি ব্যাটাকে দেখে নেব!"

"আহা চুপ কর না, আইন যখন হাতে আছে, কাজ কি ঝগড়া-ঝাটি করে!"

"তবে একগ্লাস জল দাও—গলাটা বড্ড শুকিয়ে গেছে।" বলিয়াই শয্যা আশ্রয় করিলাম।

উনি আমাকে জল খাওয়াইলেন; সর্ব্বাঙ্গ ঘামিয়া গিয়াছিল,—উনি পাখা করিতে লাগিলেন এবং আঁচল দিয়া কপালের ঘাম মুছিয়া দিলেন।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সিংহ

গর্দ্দভ-চরিত

গাধা সারা জীবন রজক সরকারে কাপড়ের বোঝা বয়ে বৃদ্ধ বয়সে পেন্‌শন নিলে।

ধোপা লোকটার দয়ামায়া ছিল। সে তার 'পোষ্ট' তার ছেলেকে দিতে চাইলে।

গাধা মাথা নেড়ে বললে—"না হুজুর! আমি সারা জীবন পরের দাসত্ব করেই কাটালাম! ছেলেটাকে আর দাসত্ব করতে দেব না। ওকে আমি লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করব।"

অতএব গর্দ্দভ-তনয় ইস্কুলে ভর্ত্তি হয়ে লেখাপড়া শিখে মানুষ হতে লাগল। পিতার উপদেশে সে জাত-ব্যবসার ধার দিয়েও গেল না। এবং সম-ব্যবসায়ীদের ঘৃণা করতে শিখল।

কিন্তু বুদ্ধি-সুদ্ধি তার মন্দ ছিল না। পড়াশুনা শেষ করে ভাল ভাবেই পাস করে বেরুল!

গাধা কিন্তু এতেই সন্তুষ্ট হল না। সে ছেলেকে বললে—"মানুষ তো হয়েছ; এইবারে দস্তুরমত ভদ্রলোক হতে হবে। শালীনতা যদি না থাকে, তবে বিদ্যের মূল্য কি?"

গর্দ্দভ-তনয় 'বাই নেচার' ভদ্রই ছিল। ইস্কুলের পুঁথিতে ভদ্রলোকের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি সম্বন্ধে পড়াশুনাও করেছিল। সে সহজেই ভদ্রলোক বনে' গেল। আদব-কায়দা শিষ্টাচারে একেবারে নিখুঁত।

তার পরেই সুরু হল মুস্কিল। ঘরে এবং বাইরে;—অর্থাৎ ঘরে বাইরে।

আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, পাড়া প্রতিবেশী, পরিচিত অপরিচিত, ডাক্তার, দালাল, উকিল, ফেরিওয়ালা, মহিলা বাস-যাত্রিণী, অবলা-সঙ্ঘের সেক্রেটারি—সকলকার কাছেই ভদ্রলোক-বনতে গিয়ে সে অসুবিধায় পড়তে লাগল।

গাধা বললে—"ভদ্রলোক হওয়ার এত বিপদ তা কে জানত!" কিন্তু ভদ্রতা তাকে ছাড়ল না। "Character of a Gentleman" তার ভাল করেই পড়া ছিল কিনা।

মামীর পিসতুত ভাইয়ের বিধবা শালাজ, যখন পাঁচটি ছেলে-মেয়ে নিয়ে তিন মাসের জন্য তার ওপরে চড়াও হলেন—সে মুখ ফুটে কিছুই বলতে পারলে না। নারীর প্রতি অসৌজন্য দেখায় কি করে?

এবং প্রতিবেশী দালাল এসে যখন তাকে দিয়ে তিনটে 'রুপি ইন্সিওরেন্স' করিয়ে নিতে চাইলেন, তখন সে এই 'রুপি ইন্সিওরেন্সের' স্থায়িত্ব সম্বন্ধে প্রথমে একটু সন্দেহ প্রকাশ করতে চেয়েছিল বটে; কিন্তু বন্ধু উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বললেন—"তুমি কি আমার কথা বিশ্বাস করছ না?" এবং তৎক্ষণাৎ সে বিনা বাক্যব্যয়ে টাকা তিনটি এনে তাঁর হাতে দিলে। প্রতিবেশীকে অবিশ্বাস করাটা কিছু নয়।

এবং এই ঘটনা শুনে, এর পরে যখন জনৈক লজিক-পড়া সহপাঠী নানাবিধ যুক্তিতর্ক অবতারণা করে প্রমাণ করলে—সে একটি আস্ত গর্দ্দভ, তখন (কথাটা সত্যি হলেও) সৌজন্যের খাতিরেই সে প্রতিবাদ করতে পারল না।

এবং বিয়ের রাত্রে শ্বশুর বাড়ীতে লাল জামা পরা ন'বছরের প্লীহা-স্ফীতা শ্যালিকা যখন সভার মধ্যে তার লম্বা কর্ণ দুটি মোলায়েম ভাবে মর্দ্দন করে দিলে, তখন সে ভয়ানক অপমানিত বোধ করলেও, ভদ্রতার খাতিরে যে শুধু কিছু বললে না তা নয়; হিঁ হিঁ করে দাঁত বের করে আর সকলের সঙ্গে হাসিতেও যোগ দিলে।

বাইরেও ব্যাপারটা একই রকম ঘটতে লাগল।

আগেই বলেছি, গর্দ্দভ-তনয়ের সহজ-বুদ্ধি মোটামুটি একরকম ছিল; এর ওপরে সে খাটতে পারত ঠিক গাধার মতন। এই দুটি গুণের সমাবেশ মানুষের ভিতর দেখা গেলে—মানুষ তাকে 'জীনিয়াস' বলে।

'জীনিয়াস' গাধা তার এই 'জীনিয়াস'ত্বের দ্বারা জাগতিক ক্ষেত্রে শীঘ্রই একটা বড় 'অ্যাচীভমেণ্ট' করে ফেলেছিল। অর্থাৎ, যা' থেকে প্রচুর অর্থাগম হতে পারে।

কিন্তু নিজের ঢাক নিজে পিটান ভদ্রলোকের পক্ষে অশোভন বিধায়, সে এ বিষয়ে রীতিমত 'প্রোপাগাণ্ডা' করেনি। এবং এর পরে যখন প্রেস রিপোর্টার তার এই কীর্ত্তি সম্বন্ধে বিবরণ নিতে এল, তখন যে সে শুধু বিনয়বশতঃ নিজের কৃতিত্ব বাড়িয়ে জাহির করেনি, তা নয়; 'সদা সত্য কথা বলিবে'—এই নীতি অনুসরণ করে তার অধীনস্থ সহকর্ম্মীদেরও যথাযোগ্য কৃতিত্বের অংশ দিয়েছিল।

এ রকম ক্ষেত্রে নিজের কৃতিত্ব কয়েকগুণ বাড়িয়ে বলা, এবং সহ-কর্ম্মীদের কীর্ত্তি আত্মসাৎ করাটাই রীতি। কাজেই প্রেস রিপোর্টার

এবং জনসাধারণ সহজেই বুঝে নিলে কীর্ত্তিটায় গাধার চেয়ে গাধার সহকর্ম্মীদেরই কৃতিত্ব বেশী। এমন কথাও শোনা গেল, যে বাস্তবিক পক্ষে গাধাই তার সহকর্ম্মীদের জিনিসটা নিজের নামে চালাতে চেষ্টা করেছে।

এ বিষয়ে বাদানুবাদ যতই বেড়ে চলল, ব্যাপারটা গাধার কাছে ততই নিরর্থক, এবং তার সহকর্ম্মীদের কাছে অর্থপূর্ণ হয়ে উঠতে লাগল।

অবশেষে জেরবার হয়ে গাধা তার স্ত্রীকে এসে বললে—"মানুষগুলো যে এমন নিরেট গাধা, তা কে জানত? বিধান করেছে, 'সদা সত্য কথা বলিবে'। সব সময়ে নিছক সত্যি বললে যে কোনো কথাই আর লোকে বিশ্বাস করে না—এটুকু বুঝবার মত বুদ্ধিও তাদের নেই।"

গর্দ্দভ-পত্নী সংক্ষেপে বললে—"জাত ব্যবসা ধর। এ সব তোমার কর্ম্ম নয়।"

ভদ্রলোকের পক্ষে দরকারমত অভদ্র না হতে পারাটা জীবনের ঘোড়দৌড়ে যে কতবড় 'হ্যাণ্ডিক্যাপ' গাধা তা টের পাচ্ছিল। কিন্তু আবাল্যের শিক্ষার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারলে না।

কেন না, এর পরেও দেখা গেল, বন্ধুদের 'অফার' না করে সিগারেট খাওয়া চলে না বলে, সে প্যাকেট ছেড়ে টিন কিনতে আরম্ভ করেছে; আর টিফিনের সময় সহকর্ম্মীদের চা-খাওয়ানো-রূপ শিষ্টাচার পালন করতে গিয়ে রেস্তোরায় মোটা দেনার অঙ্ক দাঁড় করিয়ে ফেলেছে।

অবশ্য এই শেষোক্ত ব্যাপারটির আরও একটি কারণ ছিল। সে একদিন শুনতে পেয়েছিল, রেস্তোরাঁর মালিক তাকে শুনিয়েই আর একজনকে বলছে—"গাধা লোকটি বাস্তবিকই ভদ্রলোক। বন্ধু বান্ধবদের

দেখতে পেলে, না খাইয়ে ছাড়ে না। কোথাকার যেন জমিদার ফ্যামিলির ছেলে।”

এমনি করে ঘরেবাইরে তার অবস্থা কাহিল হয়ে উঠল।

হয়ত, দেখা গেল, বন্ধু এসে বললে—“বিশেষ প্রয়োজন, দু'শো টাকা এখনি চাই”—এবং তার নিজের কাছে টাকা না থাকায়, সে ধার করে টাকা জোগাড় করে দিলে। এর পরে বন্ধু চলে গেল।—এবং টাকাও। কারণ কোনও রকম লেখাপড়া করে বন্ধুকে টাকা দেওয়া—অভদ্রতার চরম।

ভদ্রতার খাতিরে এটাও সে সহ্য করলে।

এটাও সে শীঘ্রই দেখতে পেলে, যে-বিষয়ে সে বিশেষজ্ঞ, সে-বিষয়ে সে ছাড়া আর সকলেই তার চেয়ে বেশী জানে। সে বুঝতে পারলে, বিশেষজ্ঞ হবার জন্যে, বিশেষ বিষয়ে বিশেষ অজ্ঞ হলেও চলে,—যদি গলার জোর বেশী থাকে। গাধার গলার জোর নেহাৎ মন্দ ছিল না। কিন্তু গলার জোর ছিল বলেই—ভদ্রতার খাতিরে সে অতিরিক্ত মিহিস্বরে কথা বলতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল।

দীর্ঘকাল পরে, উক্ত বন্ধুর ঠিকানা সংগ্রহ করে, অত্যন্ত প্রয়োজনে গাধা যখন তার কাছে গেল, বন্ধু তখন আর পাঁচজন বন্ধুর সঙ্গে ফ্লাশ খেলচে। গাধা যা বলবে মনে করে এসেছিল, তা' আর বলতে পারলে না। পাঁচজন ভদ্রলোকের মাঝখান থেকে বন্ধুকে উঠিয়েই বা নিয়ে যায় কি করে? খানিকক্ষণ উসখুস করে বিদায় নিল।

উঠবার সময় বন্ধু মৃদু হেসে বললে—“কোনো দরকার ছিল নাকি হে?”

গাধা ভদ্র হাসি হেসে বললে—“নাঃ, এই দিক দিয়ে যাচ্ছিলুম,—তাই একটু দেখা করে গেলুম।” এমনি তার ভদ্রতা!

বেচারা হতাশ হয়ে বাড়ী ফিরছিল। বাসে আর জায়গা ছিল না। বৌবাজারের কাছাকাছি একটি চটকদার সাজ-করা মহিলা বাসে উঠলেন। কণ্ডাকটর 'লেডিজ সীট' ছেড়ে দেবার অনুরোধ করবার আগেই 'শিভ্যালরাস' গাধা উঠে দাঁড়িয়ে টলতে স্বরু করে দিলে। সে মনে মনে একটু বিরক্ত হল; কারণ তার আর দাঁড়াবার ক্ষমতা ছিল না। তবু ভদ্রমহিলার প্রতি—

পরের ষ্ট্যাণ্ডেই একটি ঝাঁকড়া-চুল যুবক উঠে, তাকে ধাক্কা দিয়ে গিয়ে মহিলাটির পাশে ধপ করে বসে পড়ল। একগাল হেসে বললে—"বলি, আজকাল আর নজরেই পড়ে না যে।"

গাধা মনে মনে দস্তরমত চটে গেল। যদিও বাক্যে বা ভাবে ভঙ্গিতে তা প্রকাশ পেল না।

সম্ভবতঃ এর পরে সে বাড়ী ফিরে দেখতে পাবে,—'অবলা-সঙ্ঘের' সাহায্যার্থে বালিকাদের দ্বারা অভিনীত 'চ্যারিটি-পারফরমেন্সের' টিকিট বিক্রী করবার জন্যে সঙ্ঘের সেক্রেটারি 'অচলা-দি' সদলে অপেক্ষা করচেন। অতগুলি উন্মুখ রসনাকে নিরস্ত করা তার বর্ত্তমান অবস্থায় সম্ভব হবে না বুঝতে পেরে, হয়ত সে একখানা একটাকার টিকিট কেনবার জন্যে ব্যাগ খুলবে।

একমাত্র দশটাকার নোটখানি বার করবামাত্র অচলাদি যখন ছোঁ মেরে সেখানি ব্যাগস্থ করবেন, এবং অত্যন্ত অমায়িক ভাবে হেসে বলবেন—"ধন্যবাদ। আপনার মত লোকের কাছে এর-কম আশাই করিনি। এই দু'খানা পাঁচটাকার রইল। আপনি আর মিসেস্—" তখন গাধা প্রায় বিশুদ্ধ মাতৃভাষায় চেঁচিয়ে উঠতে চাইবে।

কিন্তু Character of a Gentleman তর্জ্জনী তুলে তাকে শাসন

করবে। এবং সে কেবলমাত্র অচলাদি'র গমন পথের দিকে কটমট করে চেয়ে থাকবে।

এর পরে হয়ত সে বলবে—"ড্যাত্তোর।"

তার পরদিন সকালে দেখা যাবে,—গর্দ্দভ-তনয় দরখাস্ত হাতে রজক-সরকারের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।

বেচারী গাধা!

"বায়রণ"

জামাই

বাংলা দেশে জামাইএর বিশেষ আদর। জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরার পূর্ব্বের ষষ্ঠীর দিনে ঘরে ঘরে (অবশ্য যাহাদের জামাই আছে) 'জামাই বাবু'র নিমন্ত্রণ, আদর, অভ্যর্থনা, আপ্যায়ন, ভূরিভোজন ইত্যাদি ইত্যাদি। যাঁহারা 'নূতন-জামাই' তাঁহাদের মনে মনে বিশেষ স্ফূর্ত্তি— কখন সন্ধ্যার পর নূতন শ্বশুরবাড়ী গিয়া হাজির হইবেন। এই জামাই ষষ্ঠীর ব্যাপারে পুরাণে বিশেষ করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের 'ধারা হারাইলে ১০৭' স্কন্দ পুরাণে কোন কথা পাওয়া যায় না। এই জন্য গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকায় লিখিত আছে—আচারাৎ জামাতুরর্চ্চনম্। আমাদের মনে হয় স্কন্দ পুরাণ যখন লিখিত হয় তখন জামাইবাবুর এরূপ আদর ছিল না বা এরূপ আদর, অভ্যর্থনা, আপ্যায়ন প্রভৃতির প্রয়োজন ছিল না, বা স্কন্দ পুরাণ বঙ্গদেশের জন্য লিখিত হয় নাই;

আদিশূরের সময় কান্যকুব্জ হইতে আগত পঞ্চ ব্রাহ্মণ তাঁহাদের সিদ্ধির ঝোলায় করিয়া ইহা বাংলা দেশে আনিয়াছিলেন। এই "জামাই" শব্দের উৎপত্তি লইয়া ভাষাতত্ত্ববিদ্ ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সহিত সাহিত্যরত্ন শ্রীযুক্ত রামদাস পণ্ডিতের ভীষণ মতভেদ। সুনীতি-বাবু বলেন, 'জামাই' জামাতা শব্দের অপভ্রংশ; আর জামাতা শব্দ সংস্কৃত "জামাতৃ" শব্দ হইতে উৎপন্ন। জামাতৃ=জায়া+মা+তৃচ্, জায়া পরিমাণ করা হইয়াছে যাহার, অথবা জায়া হইয়াছে মাতৃস্বরূপা যাহার। জামাতৃ কালক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া বা নিত্য ব্যবহারে ঘষিয়া ঘষিয়া জামাতা হইল; এবং জামাতা কালক্রমে তদ্রূপ 'জামাই'তে পরিণত হইল। রামদাস পণ্ডিত এই মত অগ্রাহ্য করিয়া বলেন যে ইহা আদৌ হইতে পারে না। যাহার "জামা-ই" সার সেই ব্যক্তি হইতেছে "জামাই"—তা তাহার বিবাহ হউক বা না হউক। আমরা কোন লোককে ফিট্‌ফাট্ সৌখীন বেশযুক্ত দেখিলে বলি—"কি হে জামাইটি যে!" বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য স্ত্রী থাকা। যাহার স্ত্রী নাই বা স্ত্রী ছিল, বর্ত্তমানে নাই, হয় মরিয়া গিয়াছে না হয় পলাইয়া গিয়াছে, তাহাকেও জামাই বলি। এই সম্বন্ধে রামদাস পণ্ডিত মহাশয় ইন্দোর বিজ্ঞান কংগ্রেসে Social Anthropology শাখায় একটি বাহান্ন পৃষ্ঠা ব্যাপী প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন।

বাংলা দেশে জামাইদের মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক—"ঘর জামাই", যাঁহারা বিবাহের পর হইতে আজীবন শ্বশুরবাড়ীতে বসবাস করেন। ইঁহাদের অন্যান্য বিসয়ে বড় আদর হইলেও একটি বিষয়ে কষ্ট। এই জন্য বাংলা দেশে বাঙালীর নিজস্ব প্রবাদ প্রবচন হইতেছে—"ঘর জামায়ের বড় আদর মাগের লাথি খায়"। অপর ভ্যারাইটি জামাইএর বিশেষ কোন নামকরণ হয় নাই, আমরা

তাহাদিগকে "স্বগৃহ"-পালিত বলিব। ইহাদের মধ্যে কেহ স্ত্রীর বাধ্য, অত্যন্ত বাধ্য, স্ত্রী উঠিতে বলিলে উঠেন, বসিতে বলিলে বসেন ; স্ত্রী বাপের বাড়ী যাইলে সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীর বাপের বাড়ীতে যান, এক কথায় যাঁহারা আমাদের পল্লীগ্রামের ঠান্‌দির ভাষায় "ভেড়ো"। বক্রী জামাইদের আমরা "বুনো"র কোঠায় ফেলিতে পারি—ইহাদের বড় রাগ। কথায় কথায় রাগ, জামাইষষ্ঠীর তত্ত্ব, পূজার তত্ত্ব, শীতের তত্ত্বর একটু ত্রুটি হইলেই রাগিয়া খুন। ইহাদের বশ করিতে শাশুড়ী ঠাকরুণ শশব্যস্ত। আমাদের মনে হয় এই প্রকার জামাইদের ঠাণ্ডা করিবার জন্য বাংলাদেশের "জামাই ষষ্ঠীর" উদ্ভব।

দেবাদিদেব মহাদেব প্রথমবার প্রজাপতি দক্ষের কন্যা সতীশিরোমণি সতীকে বিবাহ করেন। পরে দক্ষযজ্ঞে দক্ষ মহাদেবকে নিমন্ত্রণ না করার ফলে মহাদেব যে দক্ষ-যজ্ঞের ব্যাপার করিলেন এবং দক্ষের ছাগমুণ্ড হইল, সেই হইতেই শ্বশুরগণ জামাইদের ঠাণ্ডা করিবার উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত হইলেন। দক্ষযজ্ঞের স্থান হরিদ্বারের নিকটস্থ কন্‌খলে। ইহাতে মনে হয় দক্ষ ঐ প্রদেশের অধিবাসী এবং ছাতুভুক। মহাদেব দ্বিতীয় পক্ষে গিরিরাজ হিমালয়ের কন্যা উমাকে বিবাহ করিয়া কৈলাসে বসবাস করেন। মহাদেব কন্যা-সম্প্রদানের জল হাতে লইয়া মাটিতে ফেলিয়া দিলে উহা হইতে ত্রিস্রোতা বা তিস্তা নদীর উদ্ভব হয়। আর এই তিস্তা বাংলা দেশে। হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ—তা তাহার নাম ইংরেজী মতে মাউণ্ট এভারেষ্টই হউক, নেপালী মতে গোঁসাইনাথানই হউক, আর আমাদের দেশী মতে গৌরীশঙ্করই হউক বাংলাদেশের উত্তরে। গিরিরাজ হিমালয় রুদ্রমূর্ত্তি জামাই মহাদেবকে বশে আনিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। একেবারে গৃহপালিত 'ঘরজামাইয়ে' পরিণত করিতে না পারুন, তাঁহাকে বঙ্গ...নের Economic Nationa-

lismএর ভাষায় state subsidy দিয়া নিজের বাড়ীর নিকটেই অদূরবর্ত্তী কৈলাসে বসবাস করান। আমরা বাঙালীরা গিরিরাজ হিমালয়ের নিকট-প্রতিবেশী, তাঁহার নিকট হইতে জামাই-বশের বিদ্যাটিও বেশ আয়ত্ত করিয়া লইয়াছি। আর হিমালয়ের পরেই যে বাংলা দেশ মা দুর্গার বাপের বাড়ীর দেশ, তাহা মা দুর্গা বৎসরের পর বৎসর বাংলা দেশে পূজার সময় আগমন করিয়া প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন।

ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে জামাই-ষষ্ঠীর তুল্য আর কোন অনুষ্ঠানের বিষয় আমরা অবগত নহি। সুসভ্য ইংরেজ সমাজে শ্বশ্রূ-বিভীষিকা বিশেষ করিয়া প্রসিদ্ধ। জাপানে জামাইএর যে বিশেষ আদর আছে তাহা মনে হয় না। সুতরাং আমরা জামাইএর আদর বাংলা দেশের বিশেষত্ব বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি।

এইবার আমরা বাংলাদেশের "ঘর জামাইদের" উপবিভাগ বা বিশেষ বিশেষ শ্রেণী লইয়া কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটির উপসংহার করিব। বাংলা দেশের আবালবৃদ্ধবণিতা সকলের মুখেই একটি সংস্কৃত শ্লোক শুনিতে পাওয়া যায়। উহা হইতেই ঘর জামাইদের চারিটি শ্রেণী সম্বন্ধে আমরা কিঞ্চিৎ ধারণা করিয়া লইতে পারি। এবং এই চারি শ্রেণীর মধ্যে প্রথমটিকে "হরি" শ্রেণী, দ্বিতীয়টিকে "মাধব" শ্রেণী, তৃতীয়টিকে "পুণ্ডরীকাক্ষ" শ্রেণী ও সর্ব্বশেষ চতুর্থটিকে "ধনঞ্জয়" শ্রেণী বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। এক্ষণে উক্ত শ্লোকটি পাঠকগণের সুবিধার জন্য নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম —

"হবির্বিনা হরির্যাতি বিনা পীঠেন মাধবঃ।
কদন্নৈঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ॥

ইহা ছাড়া আর এক শ্রেণী আছে; যাহাকে ইংরেজী মতে residuary variety বলে; কিন্তু আমাদের মতে উহা "বেণীমাধব" ভ্যারাইটি। বেণীমাধবের স্ত্রী তাঁহাকে প্রথমে পদাঘাত, পরে লাঠিদ্বারা কোমরে আঘাত ও সর্ব্বশেষে খাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেও তিনি শ্বশুরালয় পরিত্যাগ করেন নাই।

বাংলা দেশের শতকরা ৫৫ জন অধিবাসী মুসলমান। সুতরাং যখন আমরা জামাইএর আদরকে বাংলা দেশের বিশেষত্ব বলিয়াছিলাম, আমরা হিন্দু সভার লোক হইলেও মুসলমানকে বাদ দিয়া কিছু বলি নাই। বাংলার মুসলমান সমাজেও "খানে-দামাদ্" প্রথা প্রচলিত আছে।

আমাদের এই প্রবন্ধটি ক্ষুদ্র হইলেও বিষয়টি বা বিষয়-বস্তুটি ক্ষুদ্র নহে। যদি কেহ আমাদের এই সামান্য লেখাটি পড়িয়া এই বিষয়ে বিশদ ভাবে বিস্তারিত আলোচনা করেন, তাহা হইলে আমরা আমাদের শ্রম সফল জ্ঞান করিব। ইতি—

শ্রীশমদত্ত

শবরী

পথে চলিতে
অলি গলিতে
লঘু চরণে,
ওগো শিকারী
আধ-নয়নে
চাহি' আলসে
মন গোপনে
ভরি স্বপনে
রস-লালসে
কত ফিরিবে
মৃগ-নয়না
অনুসরণে ?
তব অধরে
হেরি হাসিটি
মন-লোভনা।
তুমি ভাবিছ
মৃদু হাসিয়া
তারে ধরিবে ?
তব শাণিত
আঁখি শায়কে
বুঝি মরিবে

ভয় চকিতা
নব হরিণী
বন-ভবনা ?
পথ চারিণী
চিত-হারিণী
আঁখি তুলিবে ;
দুটি কপোলে
জানি ফুটিবে
আভা গোলাপী ;
বেণী দোলনে
খেলা করিবে
অহি কলাপী ;
রাঙা অধরে
মৃদু চকিত
হাসি দুলিবে ;
চল চরণে
যাবে চলিয়া
নত লোচনা ;
তুমি ভাবিবে
বুঝি মেয়েটি
লাজে সরমে
অতি কাতরা,--
ব্যথা বাজিবে
তব মরমে—

ওগো শিকারী
তব জাগিবে
অনুশোচনা।
নব-তরুণী
আঁখি তুলিয়া
পুন চাবে না।
আহা সরলা
কিছু জানে না
ছল-চাতুরী!
বুকে কেবলি
ভরা ভীরুতা
মধু মাধুরী—
রূঢ় নয়নে
তারে হেরিলে
ব্যথা পাবে না?
তুমি করিবে
ছেলে মানুষী
নানা ধরণে;
হিয়া কাঁপিবে
যেন বেতসী
থরথরিয়া;
নব- নাগরী
যত সুদূরে
যাবে সরিয়া—

তুমি ছুটিবে
তারি পিছনে
দ্রুত চরণে।
মনে ভাবিছ
তুমি শিকারী
বড় জবরই !
মিছে ছলনা !
ক্রমে বুঝিবে
সখা শিকারী,
তুমি তরুণী
হাসি- করুণা-
কণা ভিখারী
মৃগ নয়না
পথ-চারিণী
তব শবরী।

"চন্দ্রহাস"

পৃথিবীর পাগলামি

'ট্রান্‌স্‌-সাইবেরিয়ানে'র গাড়ী দিনের পর দিন ছুটে চলেছে, কিন্তু মন্থর গতিতে, কারণ রাশিয়ার দশদিক থেকে আগত মালে ভর্ত্তি সব গাড়ী, লাইন ক্রমাগতই বন্ধ করে দিচ্ছে।

'ইউনিয়নের' সকল অংশের শ্রমজীবীতে ট্রেন পরিপূর্ণ; তাছাড়া এ ট্রেনে বিশেষজ্ঞের দল ও oudarniks-এরও অভাব নেই। 'উদারনিক' হচ্ছে একজন লোক যে অন্য সকলকে কাজে এগোবার সাহস দেয়,, পথ করে দেয়, তাদের অগ্রসর হতে উত্তেজিত করে বা তাদের ঠেলে দেয় সামনে, অর্থাৎ যাকে বলে, 'travailleur de choc'।

যদি ধরা যায় যে, একজন 'উদারনিক'এর দল আর এক দলের তুলনায় খাট, তখন এ উদারনিকের কর্ত্তব্য, যেমন করে হোক নিজ দলকে অন্য দলের মত তৈরী করা। 'উদারনিকের' এরকম ব্রিগেডের সংখ্যা রাশিয়াতে দুলক্ষ এবং এদের লোকসংখ্যা ত্রিশলক্ষ। 'ফুটবলিষ্ট' দলেরা যেমন নিজেদের মধ্যে সর্ব্বদাই সংগ্রাম করছে, কখনও রেকর্ড রাখবার জন্য, কখনও বা চ্যাম্পিয়নশিপ পাবার জন্য, এই উদারনিকদের ব্রিগেড ঠিক তাই করছে সর্ব্বদা। *

---

* উদারনিকদের এক কথায় propagandiste d'elite বলা চলে। এরা হচ্ছে আমাদের দেশের স্বেচ্ছাসেবক দলের মত, শ্রেষ্ঠ কর্ম্মী; সব কাজেই নিজেরা ঝুঁকে পড়ে, সব বিপদই নিজেরা বুক পেতে নেয়, সবতাতেই নিজেরা অগ্রণী—এমনিভাবে দলের অন্য সকলকে তথা জনসাধারণকে উৎসাহিত ও উত্তেজিত করে। সমস্ত বিপদের ধাক্কা এরাই আগে সহ্য করে বলে, এদের 'travailleur de choc'ও বলা হয়।

এদের নিজেদের মধ্যে যে সংগ্রাম বা ম্যাচ, তার একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপার

গাড়ীর জানালার সামনে দিয়ে মাঠ, বন আর পাহাড় ছুটে চলেছে; তার যেন শেষ নেই। দুবছর আগেও এসব স্থানে বরফ ও নেকড়ে বাঘের রাজত্ব ছিল। লেখকের গাইড, অথবা অভিভাবক—যিনি লেখকের সঙ্গে Wajtkaতে পুনর্মিলিত হয়েছিলেন—একটা বড় ম্যাপের উপর ঝুঁকে পড়ে তার সেই প্রহেলিকাময় দুর্বোধ্য রক্ত, নীল সংখ্যা ও চিহ্ন সকল লক্ষ্য করছিলেন। হঠাৎ জানালার ধারে এসে লেখককে তিনি বললেন, 'এখানে এমন একটা কল বসানো হবে, যা ঘণ্টায় চল্লিশ মিলিয়ার্ড কিলো ওয়াট শক্তি দিতে পারবে। এই কথা শুনে লেখক বাইরে মুখটা বাড়ালেন, কিন্তু দেখলেন শুধু এক জঙ্গল, যার পাশে পাশে পাহাড়; এই সব পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে স্রোত বয়ে চলেছে। একটা কল নাকি ওখানে বসান হবে, কিন্তু কবে? ট্রেন একটা বাঁক ফিরল; দেখা গেল, পাথর, মাটি আর গাছের গুঁড়ির স্তূপ; কানে তালা লাগার মত ভীষণ বিস্ফোরণের কড়কড় শব্দ শোনা গেল। ডিনামাইটের সাহায্যে নদীর ধারের পাহাড় ও বন উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। কাছেই একটা 'ব্যারেজ' তৈরী হচ্ছে। এই জনহীন অরণ্যে কিছুদিনের মধ্যে এক কারখানার জন্ম হবে।

কিছু দূরে সমতল ক্ষেত্র। লেখকের গাইডের কথার বিরাম নেই,—Kusnetzkt regionএর কয়লার সঞ্চয় হচ্ছে ছ'শো মিলিয়ার্ড টন;

পরিষ্কার হবে। ধরা যাক, একটা মালগাড়ী মালে বোঝাই করতে হবে,—গমের বস্তা। সাইবেরিয়ার এক কোণের এক উদারনৈতিকের দলের সে কাজটা করতে দু ঘণ্টা লাগল, আগে আগে হয়ত সাড়ে দু ঘণ্টা লেগেছে। অমনি চারিদিকে রিপোর্ট গেল যে, এরা রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। কিন্তু মস্কোর দল এদের জানাল যে, এ কাজ তারা একঘণ্টা পঞ্চান্ন মিনিটে করেছে। এই রকম ধরণের রেকর্ড রাখার চেষ্টা সততই এদের মধ্যে দেখা যায়।

উরালে নতুন সোনার খনির সন্ধান পাওয়া গেছে, তাছাড়া প্ল্যাটিনাম ও পিতলের খনিও পাওয়া গেছে ; নতুন রকম Blast furnaceএরও আবিষ্কার হয়েছে।

বাইরে কৃষকদের ঝাঁকি দেওয়া গাড়ীর 'ক্যারাভান' দিগন্তে মিশিয়ে যাচ্ছে। লেখকের মস্কোর গাইড কিন্তু সর্ব্বদাই খালি মেশিন আর মাইন, কয়লা আর অন্য খনিজ বস্তুর কথা বলে চলেছেন। এই নতুন দৈত্যাকার সাম্রাজ্যের অধিবাসীরা এ ব্যাপার কি চোখে দেখবে, কে জানে ?

* * *

একদল রাশিয়ান মহিলা-'ডেলিগেটদের' সঙ্গে লেখক ভ্রমণ করছিলেন ; এরা সব মস্কোর কংগ্রেসে যোগ দিতে গিয়েছিল। এসিয়াটিক রাশিয়ার সর্ব্বস্থান থেকেই এদের আগমন হয়েছিল ; এ দলে গ্রাম-নির্ব্বাচিত সভ্যা অর্থাৎ 'delektas' ; মোটাসোটা ধরণের, পুরান পোষাকে-ঢাকা খাটিয়ে রমণীই বেশী। এক বৃদ্ধা Kirghize মুরগীর হাড় চিবোতে চিবোতে বললে, সরকার চাইছেন যে, ছেলেদের আট বছর থেকে স্কুলে পাঠাতে হবে। কিন্তু স্কুল থেকে ফিরে এসে হবে কি ?

একজন তাতার রমণী একথার উত্তর দিয়ে বললে, ছেলেদের যা দরকার, তা হচ্ছে চপেটাঘাত (une fessie), স্কুল নয়।

তুর্কীস্থানের এক রমণী জিজ্ঞেস করলে, আচ্ছা, ডাক্তারেরা—হ্যাঁ, কি নাম তাদের ?—ভুলে গেছি। আচ্ছা, তারা কি তোমাদের বাড়ীতেও আসে নাকি ? সোভিয়েটেরা আমাদের গ্রামে একজন ডাক্তার পাঠিয়েছে, সে তো একটা আস্ত শয়তান। তার গ্রামে আসার অশুভক্ষণেই আমার মেয়ের অসুখ ধরল ; আমার মেয়ে তো গাভীর মত

শুয়ে রইল—চোখ উলটে, খুব কষ্টে নিশ্বাস নিতে লাগল। ডাক্তার এল, কতকগুলো বড়ি দিলে, একটা বোতলে আরো যেন খানিকটা কি দিলে। ডাক্তার চলে যাওয়া মাত্রই আমি তো সে সব ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দিলুম। বাছার কপালে ও পায়ের চেটোয় খানিক জলপড়া দিলুম, বাছা আমার ভাল হয়ে উঠল।

করিডরে এই 'ডেলেক্তা'দের কতকগুলি শিশু বসেছিল; চুল খাট করে ছাঁটা, চোখ বড় বড়: সবে কথা বলতে শিখেছে, কিন্তু এর মধ্যেই একখানা ভাঁজ-করা সংবাদপত্রের লাইন বানান করছিল। কেমন একটা অদ্ভুত বৈস দৃশ্য; বাপমার মন থেকে এখনও পর্য্যন্ত কুসংস্কার আর প্রাচীন নিয়মকানুন মেনে চলার মোহ দূর হয়নি, অথচ তাদেরই ছেলেপিলেরা যেন কোন আশ্চর্য্য দৈবশক্তিতে অন্য রকম লক্ষ্য নিয়ে বেড়ে উঠছে। একটা ট্র্যাক্টর, একটা অটো, একটা এরোপ্লেন ছেলেদের মন যতটা আকর্ষণ করতে পারে, অন্য কোন্ জিনিষ তা পারে?

বাস্তবিকই, এই ধরণের তিন কোটি যুবক-যুবতী রাশিয়াতে আছে, যাদের বয়স এমনকি সাতাশ এখনও হয়নি; কাজেকাজেই এরা কমিউনিজম ছাড়া অন্য কোন প্রকার রাজনীতির কথা কখনও শোনেনি, নিরীশ্বরবাদীরা যে ধর্ম্মপদ্ধতি প্রচার করছেন তা ছাড়া অন্য ধর্ম্মের কথা এরা কখনও শোনেনি।

* * *

একটা বড় ষ্টেশন। অনেক কর্ম্মচারী গাড়ীতে উঠলেন, অধিকাংশই আমেরিকান ও জার্ম্মান এঞ্জিনিয়ার। স্থানাভাব, কাজেই করিডরই ভর্ত্তি হল।

লেখকের কমপার্টমেণ্টের সামনে এক এসিয়াটিক যুবক দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তার রোদেপোড়া রঙ, বুকের উপর

কামিজটা ছেঁড়া, এক হাতে সংবাদপত্রের একটুকরো কাগজে জড়ান একটা অর্দ্ধদগ্ধ সিগারেট, অন্য হাতে জিয়লজির এক বই।

মেয়েরা মেঝেয় বসে, কিন্তু সংবাদপত্রে মন-নিবিষ্ট; সমস্ত গাড়ীগুলিতেই এই ব্যাপার দেখা যায়। Kirghizes et Mongalsদের চোখ ফুটেছে। প্রায় সকলেরই হাতে হয় একখানা বই, না হয় খবরের কাগজ। এরা যে খালি পড়তে শিখেছে তা নয়, এদের মনের বাসনা—যা রাশিয়ার অন্য সর্ব্বত্রই দেখা যায়—কল-কারখানা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ। শ্বেত, পীত সব সমান; জাতিগত কোন বিভিন্নতাই নেই, তা সে মস্কোতেই হোক আর ককেসাসেই হোক। মেশিনের কালচার সকলকে পাগল করেছে; এদের কাছে টেকনিক জিনিষটাই একমাত্র ধর্ম্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ন্যাশনাল কষ্টিউমে ভূষিত এসিয়াটিক,—এদের সাজ-সজ্জা সব কো-অপারেটিভ থেকে প্রাপ্ত। অধিকাংশেরই পায়ে জুতো নেই, কিন্তু সকলেরই মাথায় এক রকমের টুপী।

যে ট্রেনে চড়ে চীনে আসা যায়, তাতে যে অনেক পীত জাতি দেখা যায়, এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই; খালি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, 'সোভিয়েট ইউনিয়নের' কর্ত্তাব্যক্তিদের স্থান, এই ১৯৩২ সালে, Trotski, Tehitcherine প্রভৃতি টাইপের লোকের বদলে শুধু এসিয়াটিক Tartars, Mongals প্রভৃতি জাতি কর্ত্তৃক দখলীকৃত বা নির্ব্বাচিত। রাশিয়াতে, সবচেয়ে বড় বড় পোষ্ট, ষ্ট্যালিনের পোষ্ট থেকে আরম্ভ করে প্রায় সবই এই এসিয়াবাসীদের হাতে। এই ঘটনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, রাশিয়ার যা কিছু স্বার্থ সবই পূর্ব্বাঞ্চলে। ক্রমশঃ

* * *

লেখক, জিসকা; অনুবাদক, শ্রীতরুণ ঘোষাল, প্যারিস।

পুরাতন সিদ্ধিদাতার নূতন মূর্ত্তি

গণেশ ও গ্যাস-মুখোস

নূতন নাইটহুডের পুরাতন মূর্ত্তি

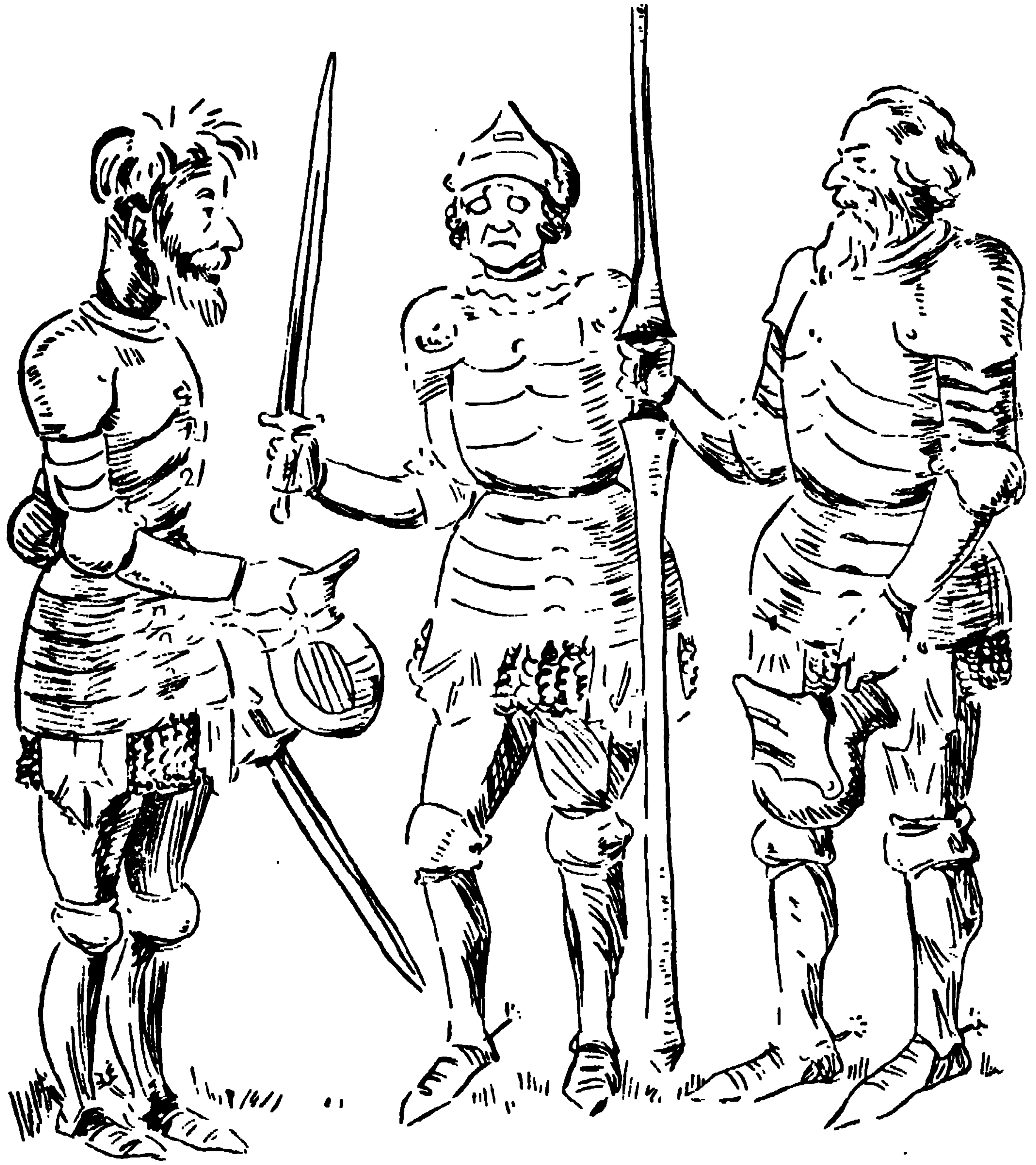

আমরা যদি জন্ম নিতাম

ইটালী-আবিসিনিয়া লড়াই

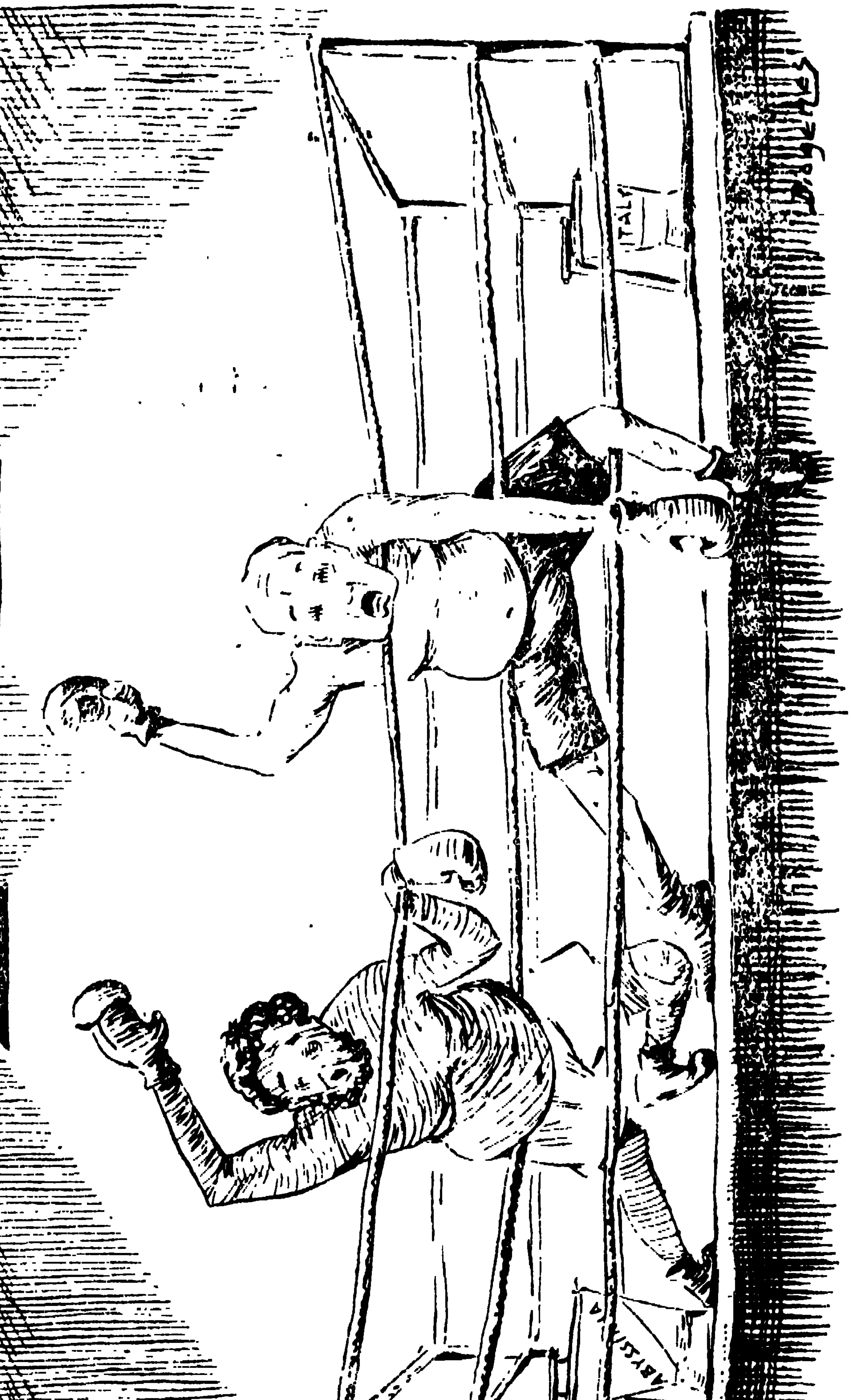

দুই পক্ষই জিতিতেছে

সেবা ও ব্যবসা

নিখিল বঙ্গ জাতীয় বুদ্ধি

সংবাদ সাহিত্য

বর্ত্তমান সংখ্যায় 'ডিটেকটিব' নামক নাটকের প্রস্তাবনা এবং প্রথম অঙ্ক প্রকাশিত হইল। আগামী সংখ্যায় ইহার দ্বিতীয় ও তৃতীয়, অর্থাৎ শেষ অঙ্ক প্রকাশিত হইবে। ডিটেকটিবের লেখক 'চন্দ্রহাস'। ভ্রমক্রমে ইহা লেখার সঙ্গে মুদ্রিত হয় নাই।

—

কামরূপে সবই সম্ভব। কিন্তু ভাষা বড় ধাঁধায় ফেলিতেছে—

> স্তব্ধ নিশীথে, ততোধিক স্তব্ধ এক পুষ্পবাটিকায় জনহীন একটি সুরম্য হর্ম্মে শক্তি প্রবেশ করিল চন্দনকে বুকে ফেলিয়া। (বিচিত্রা)।

প্রথম মনে করিয়াছিলাম, চন্দন চাদর কিংবা গামছা। কাঁধে না ফেলিয়া বুকে ফেলিয়াছে। দ্বিতীয়বার চিন্তা করিলাম। মনে হইল, শক্তি হনুমান, চন্দন তাহার বাচ্ছা। কিন্তু লেখক মনে করেন অন্যরূপ। তাঁহার মতে ইহারা দুইজন সাধক এবং সাধিকা।

—

কিন্তু পাঁচ অধ্যায়ের প্রথম লাইনেই আমাদের বুঝা উচিত ছিল উহারা কে। লেখক বলিতেছেন—

> এক তরুণ রাত্রি অকস্মাৎ নিথর হইয়াছে।

শেষে রাত্রিও 'তরুণ' হইল! বাংলাদেশে জন্মিয়া একবারও তরুণ সাজিল না এমন কি কিছুই নাই? ইহার পরে হয়ত অতি-আধুনিক রাত্রি, ultra-modern রাত্রি দেখিতে পাইব। তারুণ্য যেখানে রাত্রির

ধর্ম্ম, নায়িকাকে সেখানে গামছার মত কাঁধে বা বুকে ফেলিয়া চলা বিস্ময়কর নহে।

—

শক্তি চন্দনকে বলিতেছে—

"বুঝতে পারছেন না? আমার যে-রূপে আপনি চুমুক দিচ্ছেন সে-রূপ আপনারই!"

"তোমার ভিতর আমি?"

"নিশ্চয়ই! নইলে মেয়েমানুষ হয়ে আমি আপনার পানে চেয়ে রই?"

যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। চুমুক দিতে আমরাও দেখিয়াছি, কিন্তু এ সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন উঠিতে দেখি নাই।

—

কিন্তু চিত্র-রচনায় লেখক প্রকৃত শিল্পী-ধর্ম্মী। অর্দ্ধেক প্রকাশ করিয়াছেন, অর্দ্ধেক ইঙ্গিত করিয়াছেন।

এইবার সে কক্ষে প্রবেশ করিল—চোখে পাখীর কলরব, *মুখে উষার আলো, সর্ব্বাঙ্গ উড়াইয়া প্রভাত সমীরণ!*

চিত্রটি পরিপূর্ণ করিতে হইলে ইহার পরে বলিতে হয়—কানে কাগজের হকার—গলায় হোস্-পাইপ—চুলে প্রথম ট্রাম—পায়ে তরকারীর গাড়ি।

—

আর একটিমাত্র চিত্র আছে—সেটিও ছাড়া গেল না—

দেখিতে দেখিতে এক বিরাট নারী-বাহিনীর আবির্ভাব হইল—তাহাদের প্রত্যেকেরই একদেহ করিয়া রূপ, একমুখ করিয়া গান, একচোখ করিয়া চাহনি—হাতে একসাজি করিয়া ফুল।

দেহ মুখ প্রত্যেকের একটি করিয়াই থাকে—কিন্তু সাধারণত চোখ একটি থাকে না। কিন্তু ভাবাবেগ নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনায় এক-দেহের সঙ্গে এক-চোখ রাখিতে হইয়াছে। এরূপ আরও বলা যাইত, যথা—এককান করিয়া শ্রবণযন্ত্র—একনাক করিয়া ঘ্রাণেন্দ্রিয়—একদাঁত করিয়া রুচিকৌমুদী, এক আঙুল করিয়া চম্পককলি, একহাত করিয়া মৃণাল—ইত্যাদি।

—

'আজকে তুমি এলে একি বেশে' নামক প্রশ্নের উত্তরে বিচিত্রার কবিকে শুধু ইহাই বলিতে চাহি যে তিনি যে-বেশেই আসুন, কবিতা লিখিবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। কারণ, ইনশিওর্যান্স-এজেন্টের উপযুক্ত বেশটাই সর্ব্বদা প্রার্থনীয় নহে, অন্তত এখন তিনি যে-বেশে আসিয়াছেন, তাহাতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে বিবাহাদি করিয়া ঘরসংসার করা যাইতে পারে। ইহা কবিতা লেখার চেষ্টা হইতে অনেক ভাল।

—

অপর কবি গাহিতেছেন—

ভরিল বৃদ্ধ তরুর
শুকনো ডালে ফুল কলিতে!
কে এলে হাস্যমধুর
আস্যে মম মন ছলিতে?

আস্যের পর 'কমা' নাই দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। 'কমা'টা কি 'মম'র পর? কিন্তু মন ভুলাইবার জন্য কোনো বস্তুকে একেবারে মুখের মধ্যে আসিতে হয় কিনা তাহা আমাদের জানা ছিল না। আমাদের ধারণা ছিল, মন ভুলাইবার বস্তু বাহির হইতেই মন ভুলায়—কিন্তু কবি

তাহাকে একেবারে দাঁতে চাপিয়া ধরিয়া কবিতা লিখিতেছেন! কবি নিজের মন নিজে 'ছলিতেছেন' না ত?

—

শ্রীযুক্ত চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যামিনীরায়ের চিত্র-বিষয়ে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহার সহিত আমরা একমত হইতে পারিলাম না। যামিনীবাবুর শিল্প-পরিকল্পনা কি প্ল্যাঞ্চেটদ্বারা কালিঘাটের পটের প্রেতাত্মা আমদানিতেই পর্য্যবেশিত? তাঁহার মত শক্তিশালী চিত্রকর কাহাকে ভুলাইবার জন্য এই সহজ পথটি অবলম্বন করিয়াছেন? কাহাকেও ভুলাইবার প্রয়োজন তিনি আদৌ কেন অনুভব করিয়াছেন এ-বিষয়ে লেখকের বক্তব্য আরও স্পষ্ট হইলে ভাল হইত।

—

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রভূষণ গুপ্তের 'সিংহল বিজয়' চিত্রখানি কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের প্রাচীন চিত্রখানি হইতে এইটুকু তফাৎ যে এ চিত্রের নায়কের দক্ষিণহস্তখানি অকারণ বামহস্ত হইতে খাটো এবং ছবিখানির নাম সিংহল আবিষ্কার নহে—সিংহল বিজয়। যুদ্ধ হইতেছে সমুদ্রতীরের হাওয়ার সঙ্গে।

—

চা পান বিষপানতুল্য একথা বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন। কিন্তু একথায় লোকে ভয় পায় না, কারণ পৃথিবীতে বেশির ভাগ লোকেই পয়সা দিয়া বিষ কিনিয়া খাইতে প্রলুব্ধ হয়। যাহারা বিষ খায় না এবং যাহারা খায় এই উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরই শেষ পর্য্যন্ত মৃত্যু হয়। সুতরাং না খাইলে লাভ কোথায়? মদ, তামাক, আফিং, সিদ্ধি, কোকেন, চণ্ডু, চরস, চা—এ সবই বিষ। কিন্তু বিষ দুইপ্রকার, যাহা খাইবামাত্র মৃত্যু হয়, এবং যাহা খাইলে তৎক্ষণাৎ কিছুই হয় না। শেষোক্ত বিষকে

বিষ আখ্যা দিলে লোকে সে-কথা শোনে না—অনর্থক চীৎকার করাই সার হয়। সম্প্রতি চা খাওয়ার পক্ষে খুব প্রচার চলিতেছে। চা যদি বিষ হইত তাহা হইলে প্রচারকারীকে পুলিসে ধরিত। চা-কে একসময়ে কুলীর রক্ত বলা হইয়াছিল। দেখা গেল পানীয় হিসাবে কুলীর রক্তও বাজারে বেশ চলে। সুতরাং চা বিষ বা চা রক্ত, অতএব চা খাইও না—এরূপ যুক্তি সুযুক্তি নহে। চা খাইও না, ইহার পক্ষে অন্য যুক্তি আছে।

—

চা চীনদেশ হইতে আমদানী। কিন্তু শুধু সেই জন্যই ইহা অচল হওয়া উচিত নহে। আসলকথা চায়ের ব্যবসা ভারতবাসীর অধীন নহে। তাহা যদি হইত তাহা হইলে চা খাওয়ায় ভারতবাসীর লাভ হইত। কিন্তু লাভ হইতেছে না। যাহাতে ভারতবাসীর লাভ নাই এমন কোনো খাদ্য বা পানীয় যদি খাইতেই হয় তাহা হইলে চা ছাড়াও অন্য জিনিস আছে। আমাদের মতে সিদ্ধির পাতা চায়ের মত প্রস্তুত করিয়া খাইলে আমাদের দৈহিক ও নৈতিক উন্নতি হইবার সম্ভাবনা। ইহা সম্পূর্ণ স্বদেশী, ইহার জন্য শুধু গভর্ণমেণ্টকেই ট্যাক্স দিতে হয়—বিদেশী বণিকের অনুগ্রহপ্রার্থী হইতে হয় না। সিদ্ধির নেশা চায়ের নেশার চেয়ে অধিকতর কার্য্যকরী। ইহার দাম কম—এবং খাইতেও হয় সামান্য। ইহাও চায়ের মতই বিষ, সুতরাং ইহা খাইলে আর অতিরিক্ত বিষ খাইবার প্রয়োজন নাই।

—

কবি কাউপারের বহু-পরিচিত লাইন "A cup that cheers but not inebriates"-এর বাংলা অনুবাদ প্রায় প্রত্যেক চায়ের ষ্টলে লেখা

থাকে। ইহাকে তখন একটু পরিবর্ত্তিত করিয়া "A cup that inebriates and even cheers" কথাটি ব্যবহার করিতে হইবে।

—

রবীন্দ্রনাথ 'এডুকেশন উইকে' বলিয়াছেন, আমাদের দেশে শিক্ষিত-দের সঙ্গে সাধারণের কোনো যোগ নাই। ইহাতে 'অগ্রগতি' বড়ই দুঃখিত হইয়াছেন। 'সাধারণ'কে এরূপ ভাবে এক্সপোজ করা রবীন্দ্র-নাথের বড়ই অন্যায়। অগ্রগতি অবশ্য নিজেকে 'সাধারণ' শ্রেণীর বলিয়া গর্ব্বও করিয়াছেন।

—

'শিক্ষিত' শব্দের সঙ্গে 'অশিক্ষিত' কথাটি জুড়িয়া দিলে বোধ হয় উহার অর্থবোধ আরও সহজ হইত। কিন্তু শিক্ষিতের সঙ্গে পার্থক্য বুঝাইবার জন্য 'সাধারণ' কথাটি কি বড় বেশি দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে ?

—

এদেশে যাহারা শিক্ষিত নামে পরিচিত তাহাদের অধিকাংশই অর্দ্ধশিক্ষিত। ইহারাই সাধারণ। যাহারা কলেজে সাহিত্য বিষয়ে সকল রকম আলোচনা পাঠ করে, যাহারা ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলির সহিত পরিচিত হয় এবং সে সম্বন্ধে পড়িয়া এবং লিখিয়া পাস করিয়া বাহির হয় তাহারা আর ঐ ঐ বিষয় পরে বুঝিতে পারে না। কোথায়ও এ সব বিষয়ে আলোচনা হইলে তাহা পড়ে না, তখন তাহারা মাসিক পত্রে খোঁজে গল্প, সংবাদ পত্রে খোঁজে কুৎসা এবং সাপ্তাহিক কাগজে খোঁজে সিনেমা-সংবাদ। ইহার বেশি একধাপও উপরে উঠিতে পারে না। ইহারাই সাধারণ। শিক্ষিতদের-সঙ্গে ইহাদের যোগসূত্র ছিন্ন, রাগিয়া লাভ কি ?

শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর জন্য দুঃখ হইতেছে। সাপ্তাহিক কাগজ সম্পাদনায় কোনো মহিলার নাম যুক্ত না হওয়াই ভাল। তাঁহার শ্রীলেখার 'প্রদীপ' যেরূপ জ্বলিয়া উঠিয়াছে তাহাতে আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। পথে নামিলে গায়ে ধুলালাগা অনিবার্য্য, কিন্তু ধুলা লাগিবে এই লোভেই পথে নামা সুবুদ্ধির কাজ নহে। অন্তত "তনুতীর্থের বেলা-ভূমি পরে সে কি মহা আলোড়ন" ইহা ছাপিবার লোভটুকু ত্যাগ করাই উচিত ছিল।

—

দোলের সময় ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীর মনে আঘাত দেওয়া হিন্দুর পক্ষে ন্যায়সঙ্গত নহে। মধুসূদন দত্ত খ্রীষ্টান ছিলেন কিন্তু তাই বলিয়া তিনি-যে ভারতবর্ষের সন্তান, এ কথা ভুলেন নাই। অন্তত শুধু এই কারণেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করা উচিত। কিন্তু দেখিতেছি "দেশ" তাহা না করিয়া তাঁহাকে "দোল-লীলা" উপলক্ষে প্রথমেই আঘাত করিয়া বসিয়াছেন। মধুসূদনের "বন অতিরমিত হইল ফুল ফুটনে"—দেশের হাতে পড়িয়া "বন অতিরঞ্জিত হইল ফুল ফুটনে" হইয়া উঠিয়াছে। তাহার পরেই "দেশ" বলিতেছেন—

> খেলা চলিতেই ছিল, তোমার চোখে আজ তুমি দেখিতেছ বলিয়া মনে করিও না উহা আধুনিক। উহা *আধুনিক নহে, এখনকার নয়-উহা সনাতন। বসন্তের বাতাসের* মহিমায় গুপ্তলীলা ব্যক্ত হইতেছে।

লিখিতে লিখিতে উচ্ছ্বাসের মাথায় লেখকের ভোটের মরশুমের কথা মনে পড়িয়াছে। এ সময়ে গুপ্ত লীলা ছাড়া অন্য কিছু ব্যক্ত হয় না।

কিন্তু এত কেচ্ছা প্রচার সত্ত্বেও ভোটপ্রার্থী ভোটারকে বলে—

এসো এসো, এসো আমার প্রিয়, এসো আমার দয়িত, আমাদের আদরের ধন [লক্ষ্মী সোনা মাণিক আমার এসো,] এসো আমার বুকে ছুটিয়া আইস। আমাকে না পাইলে যে তোমার শক্তি নাই, তৃপ্তি নাই, তুষ্টি নাই। আবার তোমাকে না পাইলেও আমার শক্তি নাই, তৃপ্তি নাই—নিরবধি রাই লো তোমার অনুরাগে নাহি খাই অন্ন পানি বুলি বনভাগে'। তুমি এসো, তুমি এসো।

ইহাই দেশের দোল-লীলার গুপ্ত কথা।

—

'মাতৃভাষা মায়েরই মত পবিত্র!'—হাঁক ছাড়িয়া এবং সে হাঁকে নিজেই অবাক (আশ্চর্য্যবোধক চিহ্ন দ্রষ্টব্য) হইয়া বাতায়ন সম্পাদক, কাজি নজরুল ইসলামকে ভারি লজ্জা দিয়াছেন। কাজি নজরুল ইসলাম যে বিবৃতি দিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ (কাজি পরে ইহার প্রতিবাদ করিয়া জানাইয়াছেন, তিনি কোনো বিবৃতি দেন নাই)—তাহা সত্য হইলে তাহা অবশ্যই প্রতিবাদযোগ্য, অবশ্য যদি প্রতিবাদকারীর কথায় বস্তু থাকে এবং তাহার এ বিষয়ে বলিবার কিছু অধিকার থাকে। শ্রীযুক্ত অবিনাশ ঘোষাল মনে করিয়াছেন, তাঁহার ভাষা বিষয়ে কিছু বলিবার অধিকার আছে; কিন্তু কেন তাঁহার এরূপ মনে হইয়াছে তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

—

বাংলা ভাষা সম্বন্ধে তাঁহার প্রধান বক্তব্য, "সংস্কৃতই হচ্ছে বাংলা ভাষার জননী।"—এইরূপ উক্তি দ্বারা ঘোষাল মহাশয় প্রথমেই বাংলা ভাষার কুল বিষয়ে তাঁহার জ্ঞানের পরিচয় দিয়া পাঠককে বাঁচাইয়া

দিয়াছেন। ইহার পর আর অগ্রসর হইবার দরকার ছিল না—কিন্তু লেখকের বিশেষ অনুরোধে (টাইপ করা লাল কাগজের অনুরোধ) লেখাটার সবটাই পড়িতে হইল। বাঙালী হইয়া বাঙালীকে রক্ষা করা উচিত ছিল, কিন্তু পারিলাম না। কারণ ইতিমধ্যে শ্রীযুক্ত অবনী রায় প্রমুখ পাঠক এ প্রবন্ধে মুগ্ধ হইয়াছেন এরূপ দেখা গেল।

—

মুগ্ধ আমরাও হইয়াছি। না হইয়া উপায় ছিল না। কারণ বাংলা ভাষা গোত্রের বাহিরে মেলামেশা করার দরুন যে-সব ভিন্ন গোত্রীয় ভাষা বাংলা ভাষায় আসিয়া মিশিয়াছে তাহার মধ্যে "প্রাকৃতিক" ভাষা নাকি অন্যতম! বীরবলের "ঘোষাল"কে আমরা দেখিয়াছি। সে নেশা করিত কি না জোর করিয়া বলা যায় না, কিন্তু তাহার বানাইয়া গল্প বলিবার মধ্যে একটা নিপুণতা ছিল। সুতরাং এ ঘোষাল বীরবলের ঘোষালের সহিত তুলনীয় নহে। বুদ্ধির স্থূলতাই ইহার "প্রাকৃতিক" বিশেষত্ব।

'দুন্দুভি' নামক সাপ্তাহিকে কাজি নজরুল ইসলামের একটি চিঠি বাহির হইয়াছে। চিঠিখানি আমাদের ভাল লাগিয়াছে। কিন্তু এ চিঠি 'প্রতিবাদ' হইলেও উপরি-উক্ত অনধিকারীর কটূক্তির উত্তর নহে। ইহা 'দুন্দুভি'র প্রতিবাদ। কাজি লিখিয়াছেন—

> বাঙলা সাহিত্যে আমি আরবী ফার্সী শব্দ ব্যবহার করেছি—বহুস্থলে হয়ত মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে—সে আমার অক্ষমতা বা রুচির অভাব যা ইচ্ছা বলতে পারেন, তাই বলে আমার লেখার চেয়েও আমায় যাঁরা জানেন—তাঁরা কখনো বলতে পারবেন না, আমার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার এতটুকু

বিষ আছে। যদি কেউ বলেন, তাঁকে সৌজন্যের সীমা অতিক্রম করে মিথ্যাবাদী বলতে বাধ্য হব।

—

শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু 'শ্রীলেখা'য় অভিলাষ নামক কবিতায় বলিতেছেন—

তুমি হ'য়ো জায়া মোর
আমি হব স্বামী,
প্রেমে হবো দুজনের
দোঁহে অনুগামী।

কবিতার ভিতর এরূপ হিসাব এবং বৈষয়িক বুদ্ধি সচরাচর দেখা যায় না। তবে লেকের ধারে ছোঁক ছোঁক করিয়া ঘুরিয়া বেড়ানোর চেয়ে ইহা ভাল।

—

আর একটি কবিতায়—

পৃথিবীর হৃতকোণে যবে ছিনু কুসুম কলিকা
ছিনু যবে উচ্চকিত প্রদীপের শিখা :

হৃত-কোণ পৃথিবী-ত্রিভুজের কোথায় অবস্থিত তাহা জানি না ; আমরা কয়েকটি কোণের সংবাদ জানি, তন্মধ্যে 'হৃত' নহে, নৈ-ঋত কোণ অন্যতম। কবিতার নীচে লেখা আছে, "'চলন্তিকা'র দ্বিতীয় অধিবেশনে পঠিত", চলন্তিকার দ্বিতীয় সংস্করণে কিন্তু এরূপ শব্দ মুদ্রিত হয় নাই।

—

শ্রীযুক্ত স্মৃতিশেখর উপাধ্যায়ের 'বৃন্দাবনে'র (পুষ্পপাত্র) একটি উপমা খুব ভাল লাগিল—

বুড়ো ? সে ত লাঠির ডগায় কাক-তাড়ানো পোড়া হাঁড়ি—
কিন্তু ইহার পরেই সুর হাঁড়ি ভাঙিয়া গিয়াছে।

—

শ্রীকল্পনা দেবী "নিশীথে"র কথা (অর্চ্চনা ফাল্গুন) যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা বাঙালী গৃহস্থবাড়ির রাত্রির কথা বলিয়া মানিয়া লইতে ইতস্তত করিতেছি—

প্লাটিনাম আংটিটা খোয়ালে ত ওখানেই !
বলছিল অঞ্জলি
ওরি বোন,—তাই বলি,
আঙুলে না উঠিতেই লোপাট সে নিমেষেই !
কীযে হাসো ! বে-সরম ইডিয়ট হাসি ওই !
লজ্জা কি নেই মোটে ?
কপালে আমারি জোটে
'ইমর‍্যাল', 'ভালগার' যত সব 'উড়ো খই'।

বড়ই দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। মর‍্যাল এবং ডীসেণ্ট একটাও জুটিল না ! ইহার পরে কবি লিখিতেছেন, "দুষ্টমী সুরু হ'ল ? খোঁপাতে যে লাগে টান !"—কিন্তু একথার পরেও যে-স্বামী (অবশ্য যদি স্বামী হয়) এরূপ ভাবে দুষ্টামি করিতে পারে, সে হয় অত্যন্ত নীরেট না হয় অত্যন্ত ঘুঘু।

—

অর্চ্চনার 'বসন্তে' নামক চিত্রখানি নানা কারণে আমাদের ভাল লাগিয়াছে। তাহার মধ্যে প্রধানতম কারণ এই যে—চিত্রে কাশফুলের রাশি, প্রস্ফুটিত পদ্মের অর্ঘ্য এবং নীল আকাশে শাদা মেঘ চিত্রিত

হইয়াছে। আমরা আশা করিতেছি এই চিত্রই ভবিষ্যতে 'গ্রীষ্ম', 'বর্ষা,' এমন কি 'শরৎ' নামে অর্চ্চনায় মুদ্রিত হইবে।

—

ভারতবর্ষের 'বাড়ীর পথে' চিত্রখানিতে একটি স্ত্রীলোক পথে চলিতেছে বটে, কিন্তু কি অদ্ভুত ড্রইং আর কি প্রেরণা! স্ত্রীলোকের দৈর্ঘ্য সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি—কিন্তু তাহার পা হইতে উপরের দিকের তিন-ইঞ্চি দশবৎসরের খুকীর, তারপর এক ইঞ্চি পঞ্চাশ বৎসরের এবং মাথাটি চল্লিশবৎসরের স্ত্রীলোকের; বাম হস্ত দক্ষিণ হস্তের অর্দ্ধেক এবং হাতে মাথায় নাকে মুখে গহনা গোঁজা। মোটের উপর এই পাকা স্ত্রীলোকটি পিগমি-জাতীয়। অঙ্কনকারীর নামের পুর্ব্বে "শিল্পী" বিশেষণটি যুক্ত হইয়াছে। ভাবিতেছি, ৩নং রেগুলেশনের ব্যবহারটা যদি আরও ব্যাপক হইত!

—

শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় দীর্ঘজীবী এবং তাহার একটি কারণ এই যে তিনি সংযমী। সংযম সেকালের লোকের প্রধান বিশেষত্ব। আমাদের কালে লোকের আয়ু কমিয়া গিয়াছে—এবং সংযমের অভাবই যে তাহার কারণ এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। 'স্মৃতিতর্পণ' নামক ভারতবর্ষে প্রকাশিত একটি নিবন্ধে শ্রীযুক্ত জলধর সেন সংযমের একটি শ্রেষ্ঠ নমুনা দেখাইয়াছেন। শ্রেষ্ঠ বলিলাম এইজন্য যে এরূপ আত্মসংযম আমাদের কাহারও দ্বারা সম্ভব হইত না। নিজের ঢাক নিজে পিটাইয়া বেড়ানো যে-দেশে রীতি সেই দেশে ঢাক স্বহস্তে ফুটা করিয়া রাখা যেন অবিশ্বাস্য বলিয়া বোধ হয়। স্ত্রীলোকেরা অবশ্য কোনো কথাই গোপন রাখিতে পারে না, এবং পারে না বলিয়াই ডিটেকটিব উপন্যাস লেখা তাহাদের পক্ষে শক্ত। হত্যাকারীর নাম

তাহারা প্রথম অধ্যায়ের গোড়াতেই প্রকাশ করিয়া বসে একথা ইংরেজরা বলে। কিন্তু স্ত্রীলোক দূরে যাক, আমাদের দেশের আধুনিক যুগের পুরুষেরা চরিত্রের সংযম হারাইয়া ফেলিতেছে। শ্রীযুক্ত জলধর সেনের লেখাটি পড়িয়া আমাদের এই কথাগুলি মনে আসিল। তিনি লিখিয়াছেন—

> হিমালয়ের বনজঙ্গলের মধ্যে অনেক সাধু সন্ন্যাসীরও দর্শনলাভ হয়েছে। তাঁদের কারো কারো বিশেষ ক্ষমতাও দেখেছি। এমনও দেখেছি, কোন সন্ন্যাসী কোন একটা গাছের পাতা দিয়ে মুমূর্ষু রোগীর জীবন ফিরিয়ে এনেছেন। তাঁর কাছে সে পাতার সন্ধানও নিয়েছি। সেদিন স্বামী বিবেকানন্দকে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখে এবং তাঁর চিকিৎসার কোনো সুবিধাই নাই দেখে আমার সে গাছের কথা মনে হয়েছিল। আমি তখন তাড়াতাড়ি কুটীর থেকে বেরিয়ে এসে সেই প্রায়ান্ধকারে গঙ্গার বালুকাময় চড়ায় সেই গাছের অনুসন্ধান করে সৌভাগ্যক্রমে অনতিদূরেই সেই গাছ পাই! তারি ২।৩টি পাতা এনে হাতে রগড়ে রস বের করে স্বামীজির মুখে দিলাম। দেখিই না কেন—সন্ন্যাসীর এ গাছ ফলপ্রদ হয় কিনা। তারপর ঔষধের ফলাফল দেখবার জন্য কুটীরের বাইরে বালুকার আসনে বসে রইলাম।
>
> প্রায় আধঘণ্টা পরে স্বামীজি চৈতন্যলাভ করলেন। তাঁর সঙ্গীরা তখন কুটীরের ভিতরে ছিলেন। স্বামীজি ধীরে ধীরে বল্লেন—তোরা ভয় পাচ্ছিস কেন আমি মরব না—আমার অনেক কাজ আছে। আমি দুয়ারের কাছ থেকে এই কথা শুনে

৮

ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে আমার সদাব্রতে এসে উপস্থিত হলাম।

এই যে আমাদিগের সেদিনকার এত আনন্দ—এর মধ্যে কিন্তু ঘূণাক্ষরেও হৃষীকেশে আমার সেই অভাবনীয় বা অপ্রত্যাশিতভাবে স্বামীজির দর্শনলাভের কথা উল্লেখ করিনি।··· সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হয়ে স্বামীজির পরলোকগমন উপলক্ষে একদিন মাত্র টাউনহলের শোকসভায় হৃদয়ের আবেগ সংবরণ করতে না পেরে হৃষীকেশের ঘটনার সামান্য উল্লেখমাত্র করেছিলাম। আজ তাঁর স্মৃতির তর্পণ-প্রসঙ্গে কথাটা এতদিন পরে উল্লেখ না করে থাকতে পারলাম না।

এই-জাতীয় ঘটনা সম্ভবত শ্রীরামকৃষ্ণ দেব সম্পর্কেও ঘটিয়া থাকিতে পারে—কিন্তু অদ্যাবধি তাহা কেহ প্রকাশ করেন নাই। আমরা কিন্তু আশা করিয়া রহিলাম।

আর একটি কথা। যে-গাছের সন্ধান সন্ধ্যার সময়েও পাওয়া যায় —সে গাছের নাম নিশ্চয়ই সেন মহাশয়ের জানা আছে। হৃদয়-আবেগে ঘটনা প্রকাশের সঙ্গে গাছের নামটাও প্রকাশ করিয়া দিলে আরও ভাল হইত। আর ইতিমধ্যে যদি কোনো কবিরাজের সঙ্গে বন্দোবস্ত হইয়া গিয়া থাকে তাহা হইলে সেই কবিরাজের নামটা আমরা জানিতে চাই।

চিঠি

শ্রীযুক্ত শনিবারের চিঠি সম্পাদক মহাশয়,

আপনারা কি সেন্টিমেণ্ট লইয়া আরও অলোচনা করিবেন?—করিতে পারেন, কিন্তু আমরা আর ইহার মধ্যে নাই। কারণ আমাদের পরস্পর দেখা হইয়াছে এবং দেখা হইয়া আমরা সকলেই খুব খুশী হইয়াছি। কি করিয়া দেখা হইল সে এক ভারি মজা। কিন্তু সে মজা প্রকাশ করিলাম না। আমরা পরিচয় পাইবামাত্র এত হাসিয়াছিলাম যে আমাদের প্রত্যেকেরই বুকে ব্যথা ধরিয়া গিয়াছিল। শেষে চুল ধরিয়া টানাটানি! অবশ্য ঝগড়া করিয়া নহে, হাসিতে হাসিতে।

আমাদের ভিতরকার একজনের চুল সাড়ে তিন ফুট—তাহারই ক্ষতি হইয়াছে বেশি। নিজেদের কথা নিজেরাই প্রকাশ করিলাম। আর সেন্টিমেণ্ট নহে, আমরা এখন সারাদিন রঙ্গ-রহস্য করিতেছি। প্রায় পাশাপাশি বাড়িতেই থাকি এবং এক গলিতে। এখন কিছুদিন শান্তিতে থাকিতে চাই, পরে ইচ্ছা হইলে আবার লিখিব। নমস্কার জানিবেন। ইতি

শ্রীতপতী দেবী
শ্রীলীলাবতী দেবী
শ্রীশ্যামলিয়া দেবী

—

'শৈনিক' মহাশয় সমীপেষু,

আমার যতদূর মনে পড়িতেছে (ক্যাবলাদার মেমারি ট্যাবলেট খাইব নাকি ?) কয়েক মাস পূর্ব্বে আপনারা প্রবাসী বাঙালী তথা প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন লইয়া কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছিলেন।

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন লইয়া অনেক কিছু আলোচনা হইয়া গেল ও হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবেও। আপনারাও করিয়াছেন। সেই ভরসাতেই এই ধৃষ্টতা।

দিল্লীর লাড্ডুর আস্বাদ কিরূপ তাহা খুব কম লোকেই জানে। যে পাইয়াছে সেও পস্তাইয়াছে—যে পায় নাই সেও। আপনারা খুব সম্ভবতঃ পান নাই, না পাইয়াই "পস্তায়া হ্যায়"। (অথচ আপনাদের অভিজ্ঞতা নাই, একথাও বলিবার সাহস নাই)। আমি গত X'masএর ছুটিতে উহা আস্বাদন করিয়াছি, এবং হলপ করিয়া বলিতে পারি ঋষি-বাক্য বিফল হয় নাই। লেখনী ধরিবার ইহাও একটি কারণ বটে।

আর একটি নিগূঢ় কারণ আছে। আপনারা যাহাদের মহত্তর বাঙালী বলিয়াছেন আমি তাহাদেরই অন্যতম। সেইজন্য মনে মনে খুশী হইয়া পড়িয়াছি। আপনাদিগকে ধন্যবাদ।

প্রথমেই নাম সমস্যা। প্রচলিত কথাটি প্রবাসী বাঙালী। ইহার অর্থ এইরূপও দাঁড়াইতে পারে যে বাঙালী দুই প্রকার—এক, বাঙালী; অন্য, প্রবাসী। এ যেন দেশী গাই ও বিলাতী গাই (বিলাতী গাভী বলাই সঙ্গত—কারণ তাহা হইলে পূর্ণ মর্য্যাদা দেওয়া হইবে)। এতকাল জানিতাম তিন প্রকার বাঙালী আছে—বাঙ্গাল, বাঙালী আর ইঙ্গ-বঙ্গ। এবার আর একটি বাড়িল!

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন বলিলে কি ইহাই বুঝায় না (অন্ততঃ

আমার নিকট বুঝায়) যে বঙ্গ সাহিত্য দুই বা ততোধিক প্রকারের— অর্থাৎ বাঙালীরা যে-সাহিত্যের চর্চ্চা করে বা রসগ্রহণ করিয়া থাকে তাহা বাংলার বাহিরের বাঙালীদের সাহিত্য হইতে বিভিন্ন।

তবে ভাষা যখন মোস্‌লেম বাংলা ও হিন্দু বাংলা পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে তখন প্রবাসী বাঙালায় উঠিতে বোধ হয় কাহারও আপত্তি থাকিবে না।

বৃহত্তর কথাটিতেও আমার আপত্তি আছে (অবশ্য আমার আপত্তিতে কিছুই যায় আসে না। বাংলাকে বাদ দিয়া বৃহত্তর বঙ্গ গড়িয়া উঠিতে পারে না, মাতৃভূমির সহিত ওতপ্রোতভাবে সংস্রব না থাকিলে (বাংলা সাহিত্য, ভাষা নয়, বাদ দিলে অন্য আর একটি মাত্র সংস্রব বাকী থাকে; সেটি বিবাহ) বৃহত্তরের কল্পনা অসম্ভব। অথচ বাংলাদেশ তথা বাঙালীই যদি যোগদান করিল তবে তো সেটা বাঙালী বা বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন হইয়া গেল। বৃহত্তরের সার্থকতা বা প্রয়োজনীয়তা রহিল না।

আবার ইহা প্রবাসী বলিয়া বাংলার বাঙালীরা মুখ ফিরাইয়া রহিলেন অথচ যেটি বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন নামে অভিহিত সেটির অস্তিত্ব নাই। ইহা আশ্চর্য্য ও অন্যায়।

বৃহত্তর কথাটির যে সার্থকতা নাই তাহাও বলিতে পারি না। বাঙালী "হতভাগা মেড়ো"র উপরে উঠিতে না পারিলেও বেহারীরা 'শালা বাঙালী' পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। মনে হয় তাহারা শনিবারের চিঠি পড়িয়া থাকে। আবার ছাতুটা এখনও বাঙালী রপ্ত করিতে পারে নাই, তত্রাচ বেহারীরা মাছ খাওয়া আর লম্বা কোঁচা দোলান আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে। আমরা ইংরেজদের গুণগুলিকে বর্জ্জন করিয়া দোষগুলি গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকেই গালাগালি দিই। এদেশবাসীরা এসব বিষয়ে বাঙালীদিগকেই মহাজন পাকড়াইয়াছে। আমরা যেমন

ইংরেজী প্রবন্ধাদির অনুবাদের নীচে ঋণ স্বীকার করিয়া নিজেদের মৌলিকতাকে খর্ব্ব বা অস্বীকার করিতে চাহি না, সেইরূপ ইহারাও বাংলা রচনা বেমালুম গায়েব করিয়া বাঙালীদেরই পদাঙ্ক অনুকরণ করিয়া থাকে।

সুতরাং সাহিত্য সম্মেলন কথাটি যদি রাখিতেই হয়, তবে 'প্রবাসী' কথাটি বাদ দেওয়া কর্ত্তব্য, অন্যথায় বাংলা (বা বঙ্গ) শব্দটাই উড়াইয়া দেওয়া উচিত। অবশ্য কালির আঁচড়েই বা কলমের খোঁচায়।

আপনারা সাহিত্য-সম্মেলন স্থানে ভাষাসম্মেলন ব্যবহার করিবার পক্ষপাতী। এবং কথাটি সব দিক দিয়াই ঠিক। তবে সেটিও কি প্রবাসী হইবে? এই সূত্রে আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতার কিছু কিছু বর্ণনা করিবার ইচ্ছা আছে। এবং ভরসা আছে যে আপনারা আমার উনিশ টাকা তিন আনার অভিজ্ঞতার কিছু মূল্য অবশ্যই দিবেন কারণ ঐ টাকাটা আমার যাতায়াতে খরচ হইয়াছে।

এই-জাতীয় সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য কি তাহা বুঝিয়া ওঠা দুষ্কর। সাহিত্যচর্চ্চা নিশ্চয় নহে। কারণ রবীন্দ্রনাথের নজীর রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ—হয়ত দেখা গেল সাহিত্যবিভাগের জন্য মাত্র দুই ঘণ্টা নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। সভা আরম্ভ হইতেই পনেরো মিনিট কাটিয়া গেল। সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পড়িতে পড়িতে দেড় ঘণ্টা কাটাইয়া দিলেন। বাকী পনেরো মিনিট। তখন দুইতিনটি প্রবন্ধের দুচার লাইন করিয়া পড়িতে দিয়া, অনুপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের লেখাগুলি বাক্সজাত করিয়া, অন্যান্য লেখাগুলিকে পঠিত বলিয়া গৃহীত করা ছাড়া গত্যন্তর রহিল না। যে ভদ্রলোক হয়ত সারা বৎসর ধরিয়া এই দিনটির অপেক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন—হতবাক হইয়া

রহিলেন। কোন একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ মন দিয়া শুনিতেছি— ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, সময় হইয়াছে।

সভাগৃহের ভিতরে ঢুকিতে চান—প্রবেশপত্র দেখান। বাহিরে আসিতে চান—পদে পদে কোট-প্যাণ্ট শোভিত ভদ্র পুঙ্গবদের (এবং তাহারা বাঙালীই) সহিত গাত্রস্পর্শের বা তাহার আশঙ্কামাত্রেই ক্ষমা প্রার্থনার প্রয়োজন হইবে। ঘরেবাহিরে সর্ব্বত্রই অতিব্যস্ত স্বেচ্ছা-সেবিকাদের দেখিলে বুঝিতে পারিবেন না যে তাঁহারা কেন এবং কি কাজে সেখানে উপস্থিত আছেন। (কথাটা রূঢ় হইলে তাঁহারা আশাকরি নিজগুণে মার্জ্জনা করিবেন)।

এই গেল সাধারণভাবে যে-কোন সম্মেলনের কথা। এসব কথা সকলেই জানেন—অন্ততঃ জানিবার কথা এবং জানা উচিত। এবং ইহাতে হতাশ হইবার বা নিরাশ হইবার প্রয়োজন নাই।

আর একদিন সভামণ্ডপ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সামনের রাস্তায় বেড়াইতেছি এমন সময় একটি বাঙালী ভদ্রলোক আসিয়া করুণস্বরে বলিলেন, 'ভিতরে ঢুকতে টিকিট নিচ্ছে, না?' ভদ্রলোকের অপরাধ—তিনি দরিদ্র। তিনিও বাঙালী। তবে এ-জাতীয় সম্মেলনের সার্থকতা কি?

শুনিয়াছি কিছুকাল পূর্ব্বে স্বেচ্ছাসেবকদের তামাক সাজিবার হুকুম পর্য্যন্ত দেওয়া হইত। ভাগ্যে সিগারেট আসিয়াছে!

হয়ত বিজ্ঞান শাখার অধিবেশন হইতেছে। দেখা গেল শ্রোতার অভাব—কেবলমাত্র সভাপতি মহাশয় ও যাঁহারা প্রবন্ধাদি লিখিয়া আনিয়াছেন তাঁহারাই আছেন। এমন কি অন্যান্য বিভাগীয় সভাপতিগণ অনুপস্থিত। কিংবা মূল সভার অধিবেশনের সময় উপস্থিত। দলে দলে মহিলারা আসিতেছেন। উঠিয়া পালানো বা চেয়ার ছাড়িয়া দেওয়া (অর্থাৎ পালানো) ছাড়া উপায় নাই।

যাক।—আপনারা বাংলার বাহিরের বাঙালীদের মহত্তর বলিতে প্রস্তুত আছেন। আমার এতটা ঔদার্য্য নাই বলিয়াই প্রতিবাদ করিতেছি। প্রবাসী বাঙালীর বাকসংযম নাই—ছাপান পত্রিকা না থাকিলেও লেখকের অভাব নাই, হাতে-লেখা পত্রিকার অভাব নাই। ছাপান পত্রিকা না থাকিবার কারণ ইহাই যে প্রবাসী বাঙালীর enterprise নাই। ইহার আর একটি প্রমাণ যে প্রবাসী বাঙালী পরিচালিত কলকারখানা প্রভৃতি কমই আছে। যে কাজ পূর্ব্বে বুদ্ধি আর গায়ের জোরে হইত, এখন প্রবাসী বাঙালীরা তাহাই—অর্থাৎ চাকরি—কান্নার জোরে পাইতে চেষ্টা করিতেছে।

পনেরো বছর অস্তিত্বের পর প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের দেড়শত সভ্য হয় নাই। ইহাও কি মহত্বের লক্ষণ?

প্রবাসী বাঙালী মহত্তর হইতে পারে না। প্রমাণ—বেরিবেরি।

দেখিয়া, শুনিয়া, ভাবিয়া আমার মনে হয় যে এই ধরণের সম্মেলন যদি করিতেই হয়—অন্য যদি 'সম্মেলন' কথাটি বজায় রাখিতেই হয়—তবে প্রবাসী, বৃহত্তর, মহত্তর কথাগুলি তো বাদ দিতেই হইবে, তাহার উপর সাহিত্য কথাটিও উড়াইয়া দিতে হইবে। অর্থাৎ কিনা নাম হইবে "বাঙালী সম্মেলন"। অন্য কিছু নহে।

মনে হইতেছে আপনার অনেকক্ষণ সময় লইয়াছি। সুতরাং নমস্কার। তবে আমার কথাগুলির কিছু মূল্য দিবেন কি? অন্ততপক্ষে পড়িয়া দেখিবেন—ইহাই অনুরোধ।

আর একটি অনুরোধ—বাংলার তথা বাঙালীর, বাঙালীর ভাষা তথা সাহিত্য, সব কিছুরই শবব্যবচ্ছেদ হইতে আপনারা দিবেন না—অর্থাৎ কিনা allow করিবেন না। ইতি—

বিনীত

ম. চ. স.

পুস্তক প্রসঙ্গ

সুর ও সঙ্গতি—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ভারতীভবন—২৪।৫ এ, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১০২ পৃষ্ঠা—মূল্য এক টাকা।

সঙ্গীত সম্বন্ধে ধূর্জ্জটিপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথের সহিত কয়েকটি পত্র-বিনিময় করিয়াছিলেন—বইখানি তাহারই সংগ্রহ। এই পত্র-বিনিময়ের ইতিহাস ধূর্জ্জটিবাবু তাঁহার উপসংহারে সংক্ষিপ্তভাবে বলিয়াছেন। ধূর্জ্জটিবাবু হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের একজন অনুরাগসম্পন্ন এবং অতি উচ্চ স্তরের শ্রোতা। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সার্থকতা এবং ললিতকলা হিসাবে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ঔদাসিন্য ভাঙিবার জন্যই যেন ধূর্জ্জটিবাবু তাঁহার অনুভব এবং যুক্তির সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া রবীন্দ্রনাথকে এই আলোচনায় আহ্বান করিয়াছেন। শুধু তাঁহার অনুভূতির গভীরতা এবং যুক্তির সারবত্তাই যে রবীন্দ্রনাথকে এই আলোচনায় প্রবৃত্ত করিতে পারিয়াছে তাহা নহে, তাঁহার আহ্বানের আন্তরিক শ্রদ্ধাও তাঁহাকে বিচলিত করিয়াছে। তিনি যে তাঁহার শেষ পত্র কয়টির মধ্যে কতকটা acquiescenceএর ভাব দেখাইয়াছেন, তাহা ধূর্জ্জটিবাবুর ধারণাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিবারই নামান্তর বলা যাইতে পারে। "অর্জ্জুন পিতামহ ভীষ্মের প্রতি মনের মধ্যে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখে দরদ রেখে শর-সন্ধান করেছিলেন"—ধূর্জ্জটিবাবুর যুক্তির প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির মধ্যে তাঁহার স্বীকারোক্তির যথেষ্ট ইঙ্গিত আছে।

ধূর্জ্জটিবাবুর দীর্ঘতম পত্রখানি অতিশয় প্রাণবান এবং চিন্তা-উদ্দীপক। সব পত্রগুলি পড়িয়া শেষ করিবার পর বেশ প্রতীয়মান হয় যে রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টিশীল এবং সুসমঞ্জস হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ হইতে না পারিলেও—তাঁহার প্রধান আপত্তি সৃষ্টিকুশলতাহীন নির্জ্জলা ওস্তাদিরই বিরুদ্ধে। কিন্তু ধূর্জ্জটিবাবু মূলতঃ যে বস্তুর বিচারে প্রবৃত্ত, অর্থাৎ রাগ-আলাপের শ্রেষ্ঠ "বিকাশ ও বিবর্দ্ধন,"—সেখানে বোধহয় উভয়ের গরমিলটা অগ্রাহ্য করা চলে। শেষকালে রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করিতেছেন—"তথাপি ভালো তো লাগে।" কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ এককালে বলিয়াছিলেন—যদি কাহারও রচনা কখনও ভাল লাগিয়া থাকে, তবে যখন তাঁহার অন্য রচনা ভালো ঠেকিবে না তখন "it is useful...to give him so much credit for this one

composition as may induce us to review what has displeased us with more care than we otherwise have bestowed on it." রবীন্দ্রনাথের স্থায় রস-স্রষ্টা এবং রসজ্ঞের নিকট সেই হৃদয়বানতা আশা করা যে অবশ্যই সঙ্গত—তাহা ধূর্জ্জটিবাবু সম্যক উপলব্ধি করিয়াছেন। মানুষের শক্তির প্রকাশ যে সর্ব্বক্ষণ চূড়ান্ত হইবে—তাহা আশা করা যায় না। যখন একাধিকবার আনন্দ পাইয়াছি কিন্তু ততোধিকবার পাই নাই—তখন অপেক্ষা করিয়া থাকাটাই মনুষ্যত্ব এবং আর্টিষ্টের প্রতি বিশ্বাস ও সহানুভূতির পরিচায়ক।

রবীন্দ্রনাথ আর্টের মধ্যে যে সমাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন—তাহা আলাপের ক্ষেত্রে অনেকটা অবান্তর, সেকথা তিনিও একপ্রকারে বলিয়াছেন। ইহা ব্যক্তি-বিশেষের ক্ষমতার উপরই নির্ভর করে। তিনি যে পর্য্যন্ত রস-সঞ্চার পর্য্যাপ্ত রাখিতে পারিবেন—ততক্ষণ রসগ্রাহীর নিকট সময়ের দীর্ঘতা অথবা অল্পতার বোধ থাকে না। কথাটি ধূর্জ্জটি-বাবু অতি নিবিষ্টভাবে গুছাইয়া বলিয়াছেন।

তথাপি, আলাপের কথায় রবীন্দ্রনাথের বাকসংযম এবং কতকটা grudging compliment—অনেকের নিকট স্বাভাবিক বোধ না হইলেও—ইহা অর্থহীন নহে। তিনি জগতের একজন শ্রেষ্ঠ কবি এবং ভাষা তাঁহার বাহন। ভাষার মধ্যে তিনি যাহা বলিয়াছেন এবং যাহা বলিতে চাহিয়াছেন—ঠিক সেই জিনিষটিই যদি তিনি সুরের সাহায্যে বলিবার চেষ্টা করিতেন—তিনি হয়ত একজন শ্রেষ্ঠ গায়ক হইতেন, শ্রেষ্ঠ কবি হইতেন না। প্রত্যেক শিল্পীই নিজের শিল্পকে তাঁহার ভাব-প্রকাশের উৎকৃষ্ট উপাদান মনে করেন—করাই স্বাভাবিক এবং তাঁহার পক্ষে বাঞ্ছনীয়ও বটে। রবীন্দ্রনাথ কোন প্রতিভাবান সুর-শিল্পীর রাগ-আলাপে যতই মুগ্ধ হন না কেন, তাঁহার কাব্যকে আশ্রয় করিয়া তিনি যে ছবি আঁকিতে চাহিয়াছেন—তাহার অসামান্যতা কোন মুহূর্ত্তে ভুলিয়া থাকা তাঁহার পক্ষে সুকঠিন। সেজন্য সঙ্গীতে বাঙালীর "বৈশিষ্ট্যের" কথা বলিয়া বাণী ও সুরের মধ্যে যে সোলেনামার কথা তিনি বলিয়াছেন—তাহারও অন্তরালে বোধহয় বাণীর শ্রেষ্ঠত্বের একটা অব্যক্ত ইঙ্গিত আছে। ৮৭ পৃষ্ঠায়:—"যা কিছু বলবার, আগেভাগে তা ভাষা দিয়েই ব'লে দিলে, ভৈরবী রাগিণীর হাতে খুব বেশী কাজ রইল না। বাঙালীর এই স্বভাব নিয়েই তাকে গান গাইতে হবে।" অবশ্য বাঙালীর পক্ষে সুরের সাধনায় রবীন্দ্রনাথের এই ধরণের কথা যথেষ্ট উৎসাহের সঞ্চার করে না,—তবে ইহাও যে

তাঁহার শেষ কথা নহে—তাহা মনে করিবার মত যথেষ্ট আভাস তাঁহার লেখাতেই পাওয়া যায়। এজন্য বিশেষ করিয়া যন্ত্র-সঙ্গীতের কথাটা মনে হয়। যন্ত্রের ভাষা নাই, সুর ও ছন্দই আছে। অথচ তাহার appeal একপ্রকারে অদ্বিতীয় বলিতে পারা যায়,—সেখানে বাঙালীর "বৈশিষ্ট্য" হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকে অতিক্রম করিয়া কোন রূপ গ্রহণ করিবে? বাস্তবিকপক্ষে "বৈশিষ্ট্য" বোধহয় ব্যক্তিগত জিনিষ—অর্থাৎ তাহা প্রত্যেক শিল্পস্রষ্টারই আছে—তিনি বাঙালীই হোন, মারহাটিই হোন আর হিন্দুস্থানীই হোন। কিন্তু এক একটি প্রদেশের পক্ষে এক একটি জাতিগত বৈশিষ্ট্যের ধারণা—সঙ্গীতের ক্ষেত্রে অনেকটা অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়। ইহার অস্তিত্বও বোধ হয় theoretical. মোটের উপর সৌন্দর্য্যের প্রকাশই সত্য, তাহার জাতীয়তাবোধের অস্তিত্ব থাকে যদি থাক—তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, কিন্তু তাহাকেই শিল্পের মৌলিকত্ব বোধ করিয়া একান্ত-ভাবে তাহারই অনুশীলন করিতে গেলে,—শুধু যে অনেক সঙ্কীর্ণতার অবকাশ ঘটিবে তাহাই নহে, সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির পথেও নিরন্তর বাধা ঠেকিবে। শক্তি থাকিলেই স্বাতন্ত্র্য থাকিবে—ইহা ত জানা কথা। শক্তি যেখানে নাই—সেখানে বৈশিষ্ট্যের দোহাই পাড়িয়াও কোন লাভ হইবে না, এবং সে যেখানে আছে সেখানেই সে আপন মহিমায় সর্ব্বত্র আলোকপাত করিবে—স্বাতন্ত্র্য অন্বেষণ করিয়া ফিরিতে হইবে না।

শুধু সঙ্গীত সম্বন্ধে কেন, সব শিল্পকলা সম্বন্ধেই উভয়ের পত্রাবলি সকলের নিকট অতিশয় হৃদয়গ্রাহী এবং শিক্ষাপ্রদ হইয়াছে। উভয়েই উপমার ঐশ্বর্য্য দিয়া নিজের নিজের মতটি অতি সুন্দরভাবে সাজাইয়াছেন,—ইহাতে অবশ্য তত্ত্বকথাটি একটু objective ধরণের হইয়া পড়িয়াছে, যথা—রাগিণীর বিস্তারের সহিত সুন্দরী নারীকে অলঙ্কার ও বেশভূষায় সাজাইবার তুলনা,—তথাপি প্রকাশের ভঙ্গি যে অতিশয় সমৃদ্ধ হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। উভয়েরই শিল্পবিশ্লেষণ ব্যাপক, সুগভীর এবং বুদ্ধির প্রভায় উজ্জ্বল। তবে ধূর্জ্জটিবাবুর উপসংহারে একটি কথা কৌতূহল উদ্রেক করে। তিনি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কেও রবীন্দ্রনাথের সহিত একাসনে বসাইয়া শরৎ বাবুর গান শুনিবার অধৈর্য্যের মধ্যে "সঙ্গীতে সঙ্গতির সুনিশ্চিত ইঙ্গিত" ঘোষণা করিয়াছেন। সঙ্গীতের বড় সমঝদার হিসাবে রবীন্দ্রনাথের সহিত একনিশ্বাসে তাঁহার নামোল্লেখ দেখিয়া মনে হয় ধূর্জ্জটিবাবু নিশ্চয় পরোক্ষভাবে শরৎ-প্রতিভার এই দিকটার পরিচয় পাইয়াছেন। আমরা এতদিন তাহা পাই নাই।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সিংহ

আমার গল্প লেখা

সেদিন বন্ধুবর হিরণ্যকুমার আমাকে বলিল, বেকার বসে থাক, কিছু সাহিত্য চর্চ্চা কর না কেন? গল্প লেখ, নভেল লেখ, পদ্য লেখ, প্রবন্ধ লেখ, তাহাতে মনের উৎকর্ষ সাধন হইবে।" সেই থেকে আমিও ভাবিতেছি, মন্দ কি? তবে "কাজ না থাকিলে কাঁথা সেলাই করার উপদেশ পাওয়া যায়। তাহাতে অন্ততঃ শীতের সময় কিছু কাজ দিতে পারে। কিন্তু গল্প লেখা, বই লেখা—এ সব কেই বা পড়িবে, কেই বা দেখিবে? কবিবর বলিয়াছিলেন, "হায় মা ভারতী, এ অখ্যাতি রহিবে ভবে" ইত্যাদি। গল্প লেখা বা পদ্য লেখাতে ত আর পেট ভরিবে না। "অন্ন চিন্তা চমৎকারা কাতরে কবিতা কুতঃ"।

একএকবার সত্যই ভাবি, কি হইবে লিখিয়া? পৃথিবীতে সকলেই সকল কাজ যে কোন-একটা উদ্দেশ্য নিয়ে করে তাহা মনে হয় না। আমারও না হয় এটা নিরুদ্দেশ অভিযানই হইল। কেহ পড়িবে না? এই ত? তা' না হয় নাই পড়িল, লেখার চেষ্টা করিতে দোষ কি? সুতরাং গল্পই লেখা যাউক। সংবাদপত্রে প্রতি মাসে পাতায় পাতায় ভরা যে সব গল্প ও নভেল বাহির হয় আমি কি তাহার কোন একটার মতও কিছু লিখিতে পারিব না? কে যেন সাহাজাহানের নাটকীয় ভাষায় আমার কানে কানে বলিতেছে, "এ সাহস হারিও না বৎস"!

কিন্তু হায়, প্লট?—এ পোড়া দেশে যে প্লট নাই—প্লট রচনা

করিবার মালমশলা নাই! আচ্ছা, না হয় ধরিয়াই লইলাম, গল্পের প্লটের কোন দরকার নাই, কোন form অথবা shape এরও দরকার নাই। কিন্তু সব জিনিষের মধ্যেই ত একটা দেশ কাল পাত্র সমন্বয় আছে ত! তাহা কল্পনা-করিয়া যোগাড় করি কি ভাবে? ইংরেজী সাহিত্যের একটা সুবিধা আছে, তাহাতে সমস্ত পৃথিবীর সব দেশেই কার্য্যক্ষেত্র করা যায়। অ্যালাস্কা হইতে আরম্ভ করিয়া, দক্ষিণ আমেরিকার Cape Horn পর্য্যন্ত স্থানের যে কোন একটা নির্দ্দেশ করা যায়। Scope কি বাংলা ভাষাতে আছে? বড় জোড় ট্রেনের কল্যাণে ভারতবর্ষ কিম্বা নেহাৎপক্ষে বিলাত পর্য্যন্ত সংযোজন করা চলিতে পারে, (অনেক আধুনিক গল্প দ্রষ্টব্য) কিন্তু কেহ যদি Hall Caine এর মত, আবিসীনিয়া কিংবা স্কাণ্ডিনেভিয়াতে পাত্রপাত্রীকে লইয়া বাংলায় গল্প লিখিতে বসেন তবে বঙ্গভাষাসেবী সকলেই তাহাকে রাঁচি পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন। বঙ্গ ভাষার এ অসম্পূর্ণতা এখন দূর করা চলিবে না। তারপর ইংরেজী ভাষাতে রেল, মোটর, জাহাজ, এয়ারোপ্লেন প্রভৃতি অনেক প্রকার সরঞ্জাম, ঘটনা, বৈচিত্র্য যোগ দেওয়া যায়। কিন্তু বঙ্গ ভাষার কোন গল্পে তাহা লিখিতে গেলে হয় শুধু বড়লোকদের ইতিবৃত্তই লিখিতে হয়, নচেৎ অসংবদ্ধ plot mind লইয়া একটা অক্ষম প্রয়াস বা খেলা করা চলে। এরূপ যে বঙ্গ সাহিত্যে দেখা না দিয়াছে তাহা বলা যায় না। বিলাতী এবং বৈদেশিক সাহিত্যে সময় ও পাত্রপাত্রীনির্ব্বাচনে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না। কারণ পুরাকালের বিভিন্ন দেশের ইতিহাস আছে। তাহার উপর প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক মৌলিক গবেষণা আছে—দরকার হইলে সবই সংগ্রহ করা যায়।

হাওড়া ষ্টেশন হইতে সকালে মান্দ্রাজ মেল ছাড়িতেছে এরূপভাবে

গল্প আরম্ভ করিলে অবশ্য বিশেষ ক্ষতি নাই। কারণ মাদ্রাজ মেল সকালে ছাড়ুক বা বিকালে ছাড়ুক, গল্পের আখ্যানবস্তুর তাহাতে যায় আসে না। কিন্তু যদি কেহ লেখেন যে নায়িকাকে উদ্ধার করার জন্য নায়ক (বাঙালী) জাহাজ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া endurance swimming-এর রেকর্ড ব্রেক্ করিয়া সাত দিন সন্তরণ করিয়া দ্বীপে আসিয়া দেখেন নায়িকা সেখানে বসিয়া স্বচ্ছন্দমনে চুল শুকাইতেছেন, তবে তাহা গল্পহিসাবে উপভোগ্য হইলেও ভাল সাহিত্যে স্থান পাওয়ার উপযুক্ত কেহ বলিবে না। আমি অবশ্য উদাহরণস্বরূপ ইহা উল্লেখ করিলাম। মনে হয় গল্প লিখিতে গেলে এরূপ স্থান ও কালের সামঞ্জস্য ও সৌকর্য্য রক্ষা করা কম কথা নয়। অনেক লেখক আছেন যাঁহাদিগকে বলা যায় "They run away with their character"—লক্ষ্য হয় ত থাকে চরিত্রবিশ্লেষণ কিন্তু তাহা দেখাইতে গিয়া অনেক ঘটনা জোড়াতালি লাগাইতে তাঁহারা যেন বাধ্য হ'ন।

শৈশব অবস্থায় আরব্য উপন্যাস এবং পারস্য দেশের উপকথা এবং Folk tales গুলি বড় ভাল লাগিত। তাহার প্রধান কারণ এই যে তাহাতে যখন যাহা দরকার, সম্ভব, অসম্ভব, আজগুবী যাহা বাস্তব জীবনে প্রমাণ করার এবং প্রত্যক্ষ দেখার কোন উপায় নাই। বস্তীসাহিত্য এবং অভিজাতসাহিত্য—ইহারাও যেন এই রকমের—অর্থাৎ লেখক যে কোন দিন বস্তীতে বাস করিয়াছেন কিম্বা আভিজাত (enlightened) সম্প্রদায়ের কেহ একজন ছিলেন বা আছেন তাহা হয়ত আদৌ নয়, অথচ কল্পনা-বলে তিনি যেন অনেক জিনিষই স্বচক্ষে দেখিয়াছেন এমন ভাবে লিখিয়া যাইতেছেন। পাঠকগণ তাহা স্বচক্ষে দেখিবার অথবা প্রমাণ সংগ্রহ করার কোন উপায়ও খুঁজিয়া পান না, চেষ্টা করিতে গিয়া হয়ত বিপদেই পড়িবেন। এমন একটা

যহা সুবিধা থাকিতে আমার গল্প লেখার ভাবনা? কিন্তু মনে একটা সন্দেহ জাগে, গল্প অবশ্য নাটকও নয়, ইতিহাসও নয়, কিন্তু তাই বলিয়া গল্পের মধ্যে কিছু গল্পত্ব কি থাকিতে নাই?

কিন্তু তাহা না থাকুক—কেন গল্প লিখিব? বেশ আছি।

শ্রীকালীদাস বাগচী

পুস্তক সমালোচনা

জল্পনা। শ্রীহেমলতা দেবী। প্রকাশক শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, ১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। ক্রাউন অক্টেভো, ১৫৫ পৃঃ মূল্য ১৷০।

লেখিকা স্বয়ং সমাজ-সেবায়, বিশেষ করিয়া নারীজাতির কল্যাণ-কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। তিনি কার্য্যক্ষেত্রে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, সেই অভিজ্ঞতার বাণী ছোট ছোট রচনার সাহায্যে ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রত্যেকটি প্রবন্ধ এবং গল্প অতিশয় স্পষ্ট এবং সহজ-বোধ্য। পড়িতে খুব ভাল লাগে এবং শিক্ষা লাভ হয়।

বৃদ্ধ ধাত্রীর রোজ নামচা, দ্বিতীয় ভাগ। শ্রীসুন্দরীমোহন দাস। প্রকাশক শ্রীপ্রেমানন্দ, যোগানন্দ দাস, ৫৭।১।১ এ, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৸০ আনা।

বৃদ্ধ ধাত্রীর রোজ নামচা বৃদ্ধ প্রসূতি-চিকিৎসকের ডায়েরি। ব্যাধি-বর্ণনা নহে মানব-চরিত্রের রহস্য বর্ণনা। ভাষায় বিদ্রূপের ধার আছে, খোঁচাইয়া অনেককে বিপদগ্রস্ত করা হইয়াছে।

নিমন্ত্রণ প্রাপ্তি

গত সরস্বতী পূজা উপলক্ষে আমরা নিম্নলিখিত স্থান হইতে নিমন্ত্রণ লিপি পাইয়াছিলাম।—

১। জলি মেডিক্যাল্‌স ৩৪, বি, চিত্তরঞ্জন আভিনিউ। ইহারা, শনিবারের চিঠিতে (১৩৪২ বৈশাখ-শ্রাবণ) শ্রীআশু দে লিখিত "ত্রয়ী" নামক নাটক অভিনয় করিয়াছিলেন।

২। রামমোহন রায় হষ্টেল, ১০২, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।

৩। কলিকাতা য়ুনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট।

ইহা ছাড়া—

১। বিবেকানন্দ সোসাইটি, (স্বামী বিবেকানন্দের ৭৪ বার্ষিক জন্মোৎসব)

২। শিশিরকুমার ইন্‌ষ্টিটুট, বাগবাজার। ইহারা গত আশ্বিন-কার্ত্তিকের শনিবারের চিঠিতে প্রকাশিত শ্রীপ্রমথ বিশী লিখিত 'ঋণং কৃত্বা'—নামক নাটক অভিনয় করিয়াছিলেন।

৩। Y. M. C. A. কলেজ ব্রাঞ্চ, ৮৬, কলেজ ষ্ট্রীট (বার্ষিক ভোজ) ইহারা 'ঋণং কৃত্বা—' অভিনয় করিয়াছিলেন।

হারমোনিয়ম কিনিতে হইলে

ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মই কেনা উচিত

৫০ বৎসর ধরিয়া ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম সুরের মাধুর্য্য, গঠন, স্থায়িত্ব ও অন্যান্য গুণের জন্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। অন্য হারমোনিয়ম কিনিবার পূর্ব্বে একবার ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম সম্বন্ধে খোঁজ করিবেন। নব-প্রকাশিত সচিত্র মূল্য-তালিকার জন্য আজই পত্র লিখুন।

সোনোরা ডবল-রীড্ বক্স হারমোনিয়ম ৩ অক্টেভ, ৫ ষ্টপ বাক্সসহ ৩০৲ টাকা।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্

১১নং এস্‌প্লেনেড, কলিকাতা

শ্রীপরিমল গোস্বামী এম-এ কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও রঞ্জন পাব্লিশিং হাউসের স্বত্বাধিকারী শ্রীকপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীসজনীকান্ত দাসের পক্ষে ২৫।২, মোহনবাগান রো, শনিরঞ্জন প্রেস হইতে শ্রীপ্রবোধ নান কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Bound by

Bharati.

13, Patwarbagan Lane,

Date..... [illegible]..MAY..1960

059/SAN/B

23782